সখা, সখা ও সাথী

প্রথম খণ্ড : প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ

সম্পাদনা
অরুণা চট্টোপাধ্যায়

ক ল্লো ল
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কোলকাতা ৬

গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬

প্রকাশক : কুণালকান্তি ঘোষ
কল্লোল। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কোলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কোলকাতা ৬

পত্রিকার কথা

'সখা পড়িয়াছি। সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। 'সখা' প্রধানতঃ বালক বালিকাদের সহায় বটে কিন্তু এ 'সখা'র সাহায্য অনেক পলিত কেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। বালক-বালিকার এমন সদ্বন্ধু অতি দুর্লভ। এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয়গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচি মার্জিত।···আপনি যশস্বী এবং কৃতকার্য হউন জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।'

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালে জানুয়ারি মাসে 'সখা'র ১ম সংখ্যা হাতে পেয়ে সখার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন সম্পর্কে উক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন। তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সখা'র আবির্ভাব এবং অবদান অনস্বীকার্য। আজও 'সখা' বহু পঠিত এবং আলোচিত। 'সখা'র পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বালক-বালিকাদের উপযোগী মাসিক সাময়িকপত্র ছিল না বললেই চলে। 'সখা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কর্মবীর প্রমদাচরণ সেন 'সখা'র প্রকাশ করে যশস্বী ও কৃতী হয়েছিলেন।

বাংলা গদ্যের শৈশবযুগে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ডন ক্লার্ক মারশম্যান। 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' এবং ধর্ম প্রচারই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি শিশুপাঠ্য মাসিক 'পশ্বাবলী' প্রকাশ করে। বিভিন্ন জন্তুর বিবরণ এবং কাঠ খোদাই করে সেই জন্তুর ছবি 'পশ্বাবলী'তে ছাপা হতো। ১৮৩১-এ কৃষ্ণধন মিত্রের সম্পাদনায় মাসিকপত্র 'জ্ঞানোদয়' ; ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' ; ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশ করে 'সত্যপ্রদীপ' ; ১৮৬৩-তে 'অবোধবন্ধু' এবং ১৮৬৯-এর জুলাই মাসে 'জ্যোতিরিঙ্গন' প্রভৃতি মাসিকপত্র বিষয়বস্তু এবং স্থায়িত্বের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে সচিত্র বালকপাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা 'বালকবন্ধু' কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কিশোর-কিশোরীদের পাঠ্য উপযোগী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আর্য্যকাহিনী'র নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তখন পর্যন্তও বাংলা গদ্য-পদ্যের ভাষা শিশু উপযোগী হয়নি। নীতিজ্ঞান, ধর্মপ্রচার এবং আনন্দ দেওয়াই ছিল এইসব পত্রিকার উদ্দেশ্য।

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আর্য্যকাহিনী'র দু'বছর বাদে 'সখা'-পত্রিকার আবির্ভাব এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। বালক-বালিকাদের একান্ত প্রিয় 'সখা' প্রায় ১২ বছর চলেছিল। প্রমদাচরণ সেন ১৮৮৩-র ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৮৫-র ২১ জুন পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন। তারপর প্রমদাচরণের অকস্মাৎ মৃত্যুতে ১৮৮৫-র ৭ম সংখ্যা থেকে ১৮৮৬ অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত 'সখা'র সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রমদাচরণের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন। এরপর থেকে যতদিন 'সখা' প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন শিশুসাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

ভুবনমোহন রায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'সাথী'। 'সাথী'র আগে 'সখা'র জনপ্রিয় নামটি জুড়ে দেন তিনি। তখন হয় 'সখা ও সাথী'। এই 'সখা ও সাথী' সম্পর্কে শেষ খণ্ডে আমরা আলোচনা করব।

'সখা' সৃষ্টির মূলে যে আদর্শনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ মনীষীর আত্মত্যাগ, উৎসাহ এবং অধ্যাবসায় রয়েছে তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। প্রমদাচরণ সেন ছিলেন 'সখা'র প্রাণপুরুষ। তাঁর জীবনচরিত পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে কলকাতার এন্টালীতে প্রমদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারিণীচরণ সেন সেই সময় এন্টালী থানার দারোগা। যশোহর জেলার সেনহাটি গ্রামে পৈত্রিক ভিটের পাঠশালায় প্রমদাচরণের শিক্ষাজীবন শুরু। প্রকৃতিতে দুরন্ত, ডানপিটে প্রমদাচরণ কুসঙ্গে পড়ে বিপথগামী হওয়ার জন্য গুরু মশাইয়ের 'চোদ্দপোয়া', 'ঘুঘুপোড়া' প্রভৃতি শাস্তি যেমন একদিকে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে আবার বাবা-মা এবং দাদার প্রহারও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ঘরে-বাইরে এই ধরনের শাস্তি পেয়ে প্রমদাচরণের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনে অমূল্য বারোটা বছর এইভাবে নষ্ট হয়। সাত বছর বয়েসে প্রমদাচরণের মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

প্রমদাচরণ ১৮৭২-এ নিজের গ্রামের বাংলা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রমদা হেয়ার স্কুলে আমার নিকট পড়িত, এবং সে সময় আমি ছাত্রদিগকে লইয়া যে সকল সভা-সমিতি করিতাম তাহাতে উপস্থিত থাকিত। সেই সময় হইতে সে আমাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত এবং সর্ব্ববিষয়ে আমার অনুসরণ করিত। ধর্ম্মপুত্র কথাটি যদি কাহারও প্রতি খাটা উচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে প্রমদা আমার ধর্ম্মপুত্র ছিল।' এই শিক্ষকের সাহচর্যে প্রমদাচরণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং মানসিক স্থৈর্য বেড়ে যায়। প্রমদাচরণ নিজগুণে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। শিবনাথ শাস্ত্রী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য ছাত্রদের আদেশ দেন। কর্মী প্রমদাচরণ শিক্ষকের আদেশ শিরোধার্য করে চারশত টাকার ওপরে চাঁদা তুলেছিলেন। প্রমদাচরণ স্কুলে গড়ে তুলেছিলেন আলোচনা সভা, সেখানে ক্লাস শেষের পর সমস্ত ছাত্ররা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসত। এই ধরনের গঠনমূলক কাজের মধ্যেই প্রমদাচরণের সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৮৭৬-এ প্রমদাচরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি সহযোগে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এল. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। হেয়ার স্কুলে পাঠের সময় থেকে প্রমদাচরণের মনে বাসনা ছিল ইউরোপে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার। সেই বাসনা নিয়েই তিনি গিলখ্রিস্ট পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রেসিডেন্সি ছেড়ে সেন্টজেভিয়ার্সে ভর্তি হন। এখানে তিনি লাতিন ভাষা শিক্ষা শুরু করেন আর বাড়িতে বসে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। ১৮৭৮-এ তিনি এল. এ. পরীক্ষা দেন। কিন্তু তাঁর একটি বিষয়ের উত্তরপত্র জমা দিতে দেরি হওয়ায় জনৈক সাহেব পরীক্ষক তাঁর উত্তরপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। প্রমদাচরণ আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে গিলখ্রিস্ট পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও তিনি বৃত্তি পেলেন না। ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা তখনও মনে মনে পোষণ করছেন। প্রমদাচরণ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে পত্র দিয়ে কলকাতায় বসে লন্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মতি দিলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সদস্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে একমত হতে না পারায় প্রমদাচরণের বি. এ. পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। লন্ডনে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল সেই সময়ে প্রমদাচরণের পক্ষে সেই টাকা যোগাড় করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

প্রমদাচরণ ছাত্রাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পিতা ত্যাজ্যপুত্র করলেন, কলেজের পড়ার খরচও বন্ধ করে দিলেন। এক ব্রাহ্মবন্ধুর ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কিছুদিনের জন্য দু'বেলা সেখানে খেতেন। কিন্তু জীবনের তাগিদেই তাঁকে জীবিকার সন্ধান করতে হয়। চব্বিশ পরগণার নকিপুর এন্ট্রাস স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রমদাচরণ গ্রহণ করলেন ; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নকিপুরের স্কুলটি উঠে যায়। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের 'ব্রাহ্মকেল্লা'য় আশ্রয় নেন। এই সময় ব্রাহ্মকেল্লার বাসিন্দা ছিলেন গগনচন্দ্র হোম, উপেন্দ্রকিশোর রায়, হেমেন্দ্রমোহন বসু, পরেশনাথ সেন, মথুরানাথ নন্দী, কালীপ্রসন্ন দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রমদাচরণ সিটি কলেজিয়েট স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের স্নেহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের সঙ্গে প্রমদাচরণের সৌহার্দ্য এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের সামনে ভাল আদর্শ স্থাপন করা যে প্রয়োজন—প্রমদাচরণ সেটা বুঝেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিশুদের আর একটা জগৎ গড়ে তোলার জন্য তিনি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শিশুপ্রীতি সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য অনুধাবন করা যায় : 'একজন সুপ্রসিদ্ধ শিরস্তত্ত্ববিদ প্রমদাচরণের মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রকৃতিতে শিশু বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল।...শিশুদিগকে প্রমদা এরূপ ভালবাসিতেন, নানা গল্প ও নানা আমোদে তাঁহাদের হৃদয় জয় করিতে এমন পারিতেন যে এই বিষয়ে তাঁহার মত লোক আমরা আর বড় দেখিতে পাই নাই।' এই শিশু বাৎসল্য তাঁর 'সখা' সৃষ্টির মূল উৎস এবং প্রেরণা। মাসিক ২৬৲টাকা বেতনের কিছু অংশ প্রমদাচরণ দান-ধ্যান এবং শিশু কল্যাণে ব্যয় করতেন। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নিয়ে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই রকমই এক শিক্ষামূলক ভ্রমণে বরাহনগর বাগানবাড়িতে গিয়ে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে 'সখা' প্রকাশের ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেন। শুধু তাই নয় 'সখা'র আখ্যাপত্রের ছবি নিজেই আঁকলেন, 'সখা'র অনুষ্ঠানপত্র ছেপে প্রচার করতেও তিনি শুরু করলেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই ধনী বন্ধুদের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চাইলেন। কিন্তু পেলেন না। প্রমদাচরণ আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজে অর্ধাহার অনাহারে থেকে নিজের বেতন থেকে কিছু জমিয়ে এবং কিছু অর্থ ধার করে পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প তিনি বাস্তবায়িত করলেন। সৎ, কর্মবীর, নিয়মনিষ্ঠ এবং আদর্শবাদী প্রমদাচরণের প্রচেষ্টা সফল হল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি প্রমদাচরণ 'সখা'কে তাঁর ছোট বন্ধুদের হাতে তুলে দিলেন। খুশির হাওয়া বইল। শুধু শিশু কিংবা বালক-বালিকারা নয়, সবার কাছেই

'সখা' গ্রহণীয় হল। 'সখা' প্রকাশিত হয়েছিল ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতার 'সখা' কার্যালয় থেকে ; আর মুদ্রিত হয়েছিল ৮১ বারানসী ঘোষ স্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মণিমোহন রক্ষিত দ্বারা। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা। 'সখা'র আখ্যা পত্রে লেখা থাকত 'The child is father of the man'। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার আখ্যা পত্রটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে আখ্যাপত্রে লেখা আছে—প্রথম ভাগ, ১৮৮৩ ; দ্বিতীয় সংস্করণ। আমরা ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্র পাইনি। ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্র মুদ্রিত হলো। আখ্যাপত্রের একেবারে শেষে মুদ্রকের নামের পরে ১৮৮৪ সাল দেওয়া আছে। তাহলে অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, ১৮৮৩-তে ১ম বর্ষ প্রকাশিত হবার পর তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং পাঠকদের প্রবল চাহিদার জন্য ১৮৮৪-তে আবার ১ম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ হয়।

প্রভূত পরিশ্রমের ফলে কঠিন ক্ষয়-কাশ ব্যধিতে প্রমদাচরণ আক্রান্ত হলেন। গগনচন্দ্র হোম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'প্রমদাচরণ সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। একদিন হিন্দু স্কুলের থিয়েটারে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন ; সেই দিনই গভীর রাত্রিতে প্রমদাবাবু আমার ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—শীঘ্র উঠে আসুন। যাইয়া দেখি তাঁহার রক্তবমন হইতেছে। পরদিন সকালে সংবাদ পেয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী এলেন। ডাক্তার করুণাচন্দ্র সেন প্রমদাচরণের বুক পরীক্ষা করে এবং রক্ত দেখে বললেন, এ রোগ সারবার নয়। চিকিৎসা চলল, জলবায়ু পরিবর্তন করা হলো। পরেশনাথ সেন, কালীপ্রসন্ন দাস, উপেন্দ্রকিশোর রায় এবং গগনচন্দ্র হোম পালা করে রাত জেগে প্রমদাচরণের সেবা করতেন। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী যুবক প্রমদাচরণকে কিছুতেই বাঁচান গেল না। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২১ জুন রবিবার ২৬ বছর বয়েসে প্রমদাচরণ খুলনায় বড় দাদার বাড়িতে পরলোক গমন করলেন। চিরপরিচিত 'সখা'র সঙ্গে শৈশবেই প্রমদাচরণের বিচ্ছেদ ঘটল। বালকবালিকারা তাদের সুহৃদ এবং চিরসখাকে এইভাবে হারাল।'

প্রমদাচরণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না সত্য, কিন্তু এমন কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করতেন যে, তাঁর উদ্যমশীলতা সর্বদাই সুফলদায়ক হতো। ধৈর্য, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও যত্ন তাঁর সোৎসাহ জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। 'সখা'র দীপ্তি ক্রমে ক্রমে বহুদূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়েছিল। উপন্যাস, গল্প, উপকথামালা দেশী-বিদেশী মহৎ লোকের জীবনী, সারগর্ভ নীতিবাক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়গ্রাহী কবিতা, লোক বিস্ময়কর কার্য বিবরণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল 'সখা'র পাতা। 'সখা'কে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য বিবিধ প্রসঙ্গ সংবাদ স্তম্ভে দেশী-বিদেশী সংবাদ ছাপা হতো। 'সখা'তেই প্রথম রাজনৈতিক জীবনীমূলক নিবন্ধ বিপিনচন্দ্র পালের লেখা 'সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস' ১ম বর্ষে প্রকাশিত হয়। ধাঁধা, চিঠিপত্রের উত্তর, শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা 'সখা'-পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিবন্ধ, খাবার প্রস্তুত থেকে সেলাই বোনা মেয়েদের অসংখ্য বিষয় 'সখা'-তে বেরোত। একটি আদর্শ সাময়িক পত্রিকার প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'সখা'তে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। সাবলীল গদ্য-পদ্যের ভাষা, ঝকঝকে ছাপা, ছবি ও রচনাশৈলীগুণে 'সখা' বালক-বালিকাদের মনে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল। 'সখা'র প্রতিটি পাতাই ছিল শিক্ষনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। কাঠ খোদাই করে ছবি ছাপা হলেও সেগুলি

ছিল স্পষ্ট। দেশীয় ছবির সাথে বিদেশী গ্রন্থ থেকে নেওয়া বেশ কিছু ছবির নিদর্শন সখা পত্রিকায় মেলে।

প্রমদাচরণ যতদিন বেঁচে ছিলেন কিভাবে 'সখা'কে উন্নতমানের করা যায় সেই প্রচেষ্টাই করে গেছেন। তিনি বাংলা হরফ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। বাংলা সাময়িক পত্রের মধ্যে সখাতেই সর্বপ্রথম ড্রপ লেটার (Drop letter) রীতি প্রমদাচরণ প্রয়োগ করলেন। এই রীতি অনুযায়ী লেখার প্রথম বর্ণটি (Decorative) বৃহদাকার ও অলঙ্কৃত এবং বড় হয়। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই ড্রপ লেটারের প্রচলন হয়। 'সখা'র বেশির ভাগ লেখার প্রথম বর্ণটি কাঠ খোদায়ের মাধ্যমে অলংকৃত করে নিয়ে পরের বর্ণগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধাতুর হরফে সাজানো হয়েছে। প্রমদাচরণ এই রীতি অনুসরণ করে তাঁর শিশু-কিশোর পাঠকদের দৃষ্টিনন্দনভাবে আকর্ষণ করে ছিলেন।

সখা পুনর্মুদ্রণের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলো। বর্তমান খণ্ডটিতে ১৮৮৩ সালের ১ম ভাগ বা ১ম বর্ষ এবং ১৮৮৪ সালের ২য় ভাগ বা ২য় বর্ষের সমস্ত লেখা মুদ্রিত হয়েছে। এই দু'বছরের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়, প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমারী হেমলতা দেবী, বিপিনবিহারী সেন, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী** দেবী, কুমারী হিরন্ময়ী দেবী, শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দেবী, বিপিনচন্দ্র পাল, কুমারী* দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী, ভুবনমোহন রায়, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী ঘোষ প্রমুখ। প্রমদাচরণ প্রত্যেকটি লেখককে তৈরি করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের সচিত্র 'মাছি' নিবন্ধটি ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে এটি তাঁর প্রথম রচনা। 'সখা'য় উপেন্দ্রকিশোর সর্বপ্রথম চলিত ভাষায় লেখেন। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 'ঠাকুর দাদা' ছদ্মনামে বিজ্ঞান ও ভূগোলের জ্ঞান সমৃদ্ধ নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। ১ম ও ২য় বর্ষ এবং ১০ম ও ১১শ বর্ষের সখায় 'ঠাকুরদাদার গল্প'-নামে যে কটি বেরিয়েছিল সবগুলিই বর্তমান ১ম খণ্ডে পরপর মুদ্রিত হয়েছে। ১ম বর্ষের ১১শ সংখ্যায় প্রমদাচরণের লেখা 'খোলা ভাঁটীর ফল', 'রাধালতার দুঃখের কথা' এবং ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় ও ৩য় সংখ্যায় প্রমদাচরণ সেনের লেখা যথাক্রমে 'মদ্যপানের ফল', 'ভিক্ষা দাও মা' এবং 'মদ্যপানের ফল' একই স্থানে মুদ্রিত হয়েছে। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'ভীমের কপাল' প্রমদাচরণ সেনের লেখা সর্বপ্রথম কিশোর উপন্যাস, ১ম বর্ষেই মুদ্রিত হল। ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায় লিখিত 'সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়' ২য় বর্ষেই রাখা হল। ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ যথাক্রমে ১ম এবং ২য় বর্ষ, একই খণ্ডে পরিবেশন করা হয়েছে। ২য় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সংগৃহীত 'খোসগল্প' আমরা একই স্থানে দিয়েছি।

বর্তমান খণ্ডে বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাজন করা সম্ভব হয়নি। ১ম বর্ষে যেসব লেখকের লেখা কবিতা, গল্প, নিবন্ধ কিংবা ধাঁধা, মহিলাদের বিষয়, গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতি মূল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ১ম বর্ষেই সেগুলি রাখা হয়েছে। ১ম বর্ষের সঙ্গে ২য় বর্ষ মিশিয়ে দেওয়া হয়নি। মূল পত্রিকার বানান বজায় রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে।

'সখা' পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীতা আজও আছে। উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কিশোর পাঠ্য 'সখা'র পুনর্মুদ্রণ আমাদের নতুন করে কিছু জানবার ভাববার এবং চিন্তা করার অবকাশ এনে

দেবে। 'সখা' সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক পত্রিকা ; শুধু কিশোর-কিশোরী বা বালক-বালিকাদের নয়, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছেও এর সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা আজও রয়েছে। একবিংশ শতকে 'সখা'র মত উন্নতমানের পত্রিকা পাওয়া খুবই কঠিন। 'সখা'র লেখকগোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিল ১২-২০-র মধ্যে। তাঁদের লেখার মধ্যে তাঁদের চিন্তার এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কৃতী এবং যশস্বী লেখক-লেখিকা হয়েছেন। 'সখা' পাঠ করে আজকের প্রজন্ম সেই সব লেখক-লেখিকার লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন এটা আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া বাংলা সাধু গদ্য কিভাবে তার শৈশব কাটিয়ে শ্রুতিমধুর এবং সুসংগঠিত আকার ধারণ করেছিল তার নিদর্শন 'সখা'-পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের ভাষা যে এতটা সহজবোধ্য এবং স্বাভাবিক হতে পারে 'সখা' সেই উদাহরণ স্থাপন করেছিল। 'সখা'য় পরিবেশিত অসংখ্য ছবির মেলা আজকের পড়ুয়াদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। সখায় বিষয়বৈচিত্র, রচনাশৈলী, পরিশীলিত রুচিবোধ আজকের পাঠকের কাছে আগ্রহের বিষয়। সখাতে সর্বপ্রথম মৌলিক গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ রচনার জন্য বহুমুখী 'সখা' সর্বকালেই আদরণীয় হয়ে থাকবে।

'সখা' পুনর্মুদ্রণের প্রতিটি খণ্ডের সঙ্গে ভূমিকা থাকবে। প্রতিটি খণ্ডের মধ্যে 'সখা'র যে যে বছরগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার ওপরে ভিত্তি করেই ভূমিকা লেখা হবে। 'সখা পড়িবার নিয়ম' ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ২য় বর্ষে সখা সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন সেটি ১ম খণ্ডেই মুদ্রিত হল। 'সখা' এবং 'সখা ও সাথী'র পূর্ণাঙ্গ সূচী থাকবে শেষখণ্ডে। এ ছাড়া 'সখার ক্রোড়পত্র' এবং 'সখা ও প্রমদাচরণ'-সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পরের খণ্ডগুলিতে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

'সখা' পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে যে সব গ্রন্থাগার থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষকরে নাম করতে হয়, আদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল পত্রিকার অবস্থা এতই জীর্ণ যে, রেখাচিত্র (XEROX) করা যায়নি। সেজন্যে দীর্ঘ সময় ধরে হাতে কপি করতে হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার থেকে 'সখা'র কিছু কিছু ছবি নেওয়ার অনুমতি তিনি আমাকে দিয়েছেন। শ্রীমতী গৌরী মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরঋণী, তিনি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে দীর্ঘ সময় ধরে হাতে কপি করার কাজটি করে দিয়েছেন। শ্রীসোমনাথ ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার জন্য। শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীতরুণ পাইন এবং ডাঃ দেবাশীষ বসুকে ধন্যব্রাদ জানাই আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। কল্লোল-এর শ্রীকুণালকান্তি ঘোষ-এর সহযোগিতা এবং বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স-এর শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতা ও ভূমিকা বিশেষ করে স্মরণীয়।

অরুণা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

উপন্যাস

গল্প/নিবন্ধ/জীবনী

কবিতা/ধাঁধা ও অন্যান্য

দ্বিতীয় ভাগ

উপন্যাস

গল্প/নিবন্ধ/জীবনী

কবিতা/ধাঁধা ও অন্যান্য

সখা

প্রথম ভাগ।

১৮৮৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন-কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN"

৫০, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৬।

সখা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগর মূল /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাক টিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালক বালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্ত্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্যাধক্ষ্য।

প্রস্তাবনা

প্রমদাচরণ সেন



মাদিগের দেশে একটী বড় সুন্দর নিয়ম অতি পূর্বকাল হইতে অদ্য পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে;—আমাদের দেশে কোনও কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে দেবতার নাম করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক কোন কার্য করিবার পূর্বে ভগবানের নাম লইলে যেন মনে বল বাড়ে, আশা হয় যেন সে কার্য সফল হইবে, এবং আর কোন ভয় থাকে না। আমরা এই জন্যই আজ সর্ব প্রথমে পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের এই কার্যের সহায় হউন।

এতদিন পরে "সখা" প্রকাশিত হইতে চলিল। এইরূপ পত্রিকা আমাদিগের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমাদিগের হতভাগ্য দেশে বালকবালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না ; অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এই জন্যই "সখা"র জন্ম হইল। "সখা" পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে। যাহাতে বালকবালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য 'সখা'র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—ফলতঃ যাহাতে পত্রিকাখানির 'সখা' এই নাম সার্থক হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে।

কিন্তু এই সুবৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমস্ত শিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিতা রমণীদিগের সাহায্য আবশ্যক হইবে। শিক্ষিত পিতামাতাদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আপন আপন বালকবালিকাকে শিক্ষা দিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে তাঁহাদের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করেন। এই পত্রিকায় লিখিত গল্প প্রভৃতির দ্বারা বালকবালিকাদিগের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদিগের লক্ষ্য, সুতরাং যদি তাঁহারা দেখেন এই লক্ষ্যের বহির্ভূত কোনও বিষয় পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, তখন যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান, এবং যে প্রণালীতে লেখা হইতেছে, তৎ সম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্বক সে বিষয়েও পরামর্শ দেন। বালকবালিকাদিগের সকলের মনের গতি সমান নহে, সুতরাং একই উপদেশ যে সকলের পক্ষে সমান কার্যকর হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহপূর্বক পত্রদ্বারা আমাদিগকে আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র বিষয়ে জানান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী গল্পময় প্রস্তাব সকলেরও অবতারণা করিতে পারি।

বালকবালিকাদিগের নিকটেও আমাদের একটী নিবেদন আছে ; তাঁহারা যদি তাঁহাদের যখন যে কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে যতদূর সম্ভব সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বালকবালিকাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিকট আরও একটী কথা এই যে, তাঁহাদের রচনাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য আগামী মাস হইতে এই পত্রিকার মধ্যে খানিকটা স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া যাইবে ; মনে করুন, চাষার ছেলেদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা

উচিত কি না, এই বিষয়ে আলোচনা হইল। একজন লিখিলেন 'শিক্ষা হওয়া উচিত' এবং কেন উচিত তাহা লিখিলেন ; পরের মাসে অপর কেহ তাহা উচিত নয় বলিয়া কারণ দেখাইলেন ;—এইরূপে আলোচনা চলিতে থাকিল ; শেষে যথেষ্ট আলোচনা হইলে যে যত ঠিক তাহা প্রকাশিত হইল।

আমাদিগের আর অধিক বলিবার নাই। ভবিষ্যতের ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; এখনকার জীবন এবং উন্নতি পাঠকপাঠিকার স্নেহ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

১ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১।


সখা
উপন্যাস



প্রমদাচরণ সেন

প্রথম অধ্যায়

একদিন শরৎকালের সন্ধ্যাবেলা দৌলতপুরের বাজারে দুটী বালক বসিয়া কি আলাপ করিতেছিল। আকাশে একটুকুও মেঘ দেখা যাইতেছে না ; পরিষ্কার চাঁদ আকাশে উঠিয়া কেমন করিয়া নিকটবর্তী নদীর জলে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে, মাঝিরা কেমন করিয়া স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া কেহ বা রান্না করিতেছে, কেহ গলা কাঁপাইয়া গান করিতেছে, দুটী বালক দোকানের বারন্দায় বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর আলাপ করিতেছিল। এই দুটি বালকের মধ্যে বয়স একজনের ১৭, নাম বিপিন ; আর একজনের বয়স ১৫, নাম ভীমেন্দ্র। বিপিন ও ভীমেতে শিশুকাল হইতেই বেশ ভাব—সর্বদা একসঙ্গে বেড়ায় ; কিন্তু দুই জনের চরিত্রে অত্যন্ত ভেদ। বিপিন স্থির, শান্ত, বিনয়ী ; ভীম নামে যেমন কাজেও তেমনি,—একগুঁয়ে, গোঁয়ার, উদ্ধত। এইরূপে দুই প্রকৃতির লোক হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ বন্ধুতা ছিল, ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে আরও একটু ভিন্নতা ছিল—বিপিনের বাড়ী বাখরগঞ্জ, ভীমের বাড়ী কলিকাতা। কলিকাতার ছেলেরা যে প্রকার পূর্বদেশের ছেলেদের ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাতে ভীম ও বিপিনের ভালবাসার কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হয়। ভীম কখনও বিপিনকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঘৃণা করে নাই—ঘৃণা করা দূরে থাকুক, 'বাঙ্গাল' বলিয়া তাহার মনে কিছু মাত্র বিরক্তির ভাবও উদয় হয় নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেমন পূর্বদেশের ছেলেদের দেখিলে তাহাদের তিনপুরুষের দোষের কথা বলিয়া নিজেদের যে সব ভালো, তাহাই ঠিক করিয়া বসেন—ভীম গোঁয়ার হইলে কি হয়, তাহার এ দোষ ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত গরম হওয়াতে ভীমেন্দ্র ও বিপিন দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে আসিয়া বসিয়াছিল এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিল। আজ হঠাৎ, "পশ্চিমের ছেলেরা ভালো না পূর্বের ছেলেরা ভালো", এই বিষয়ে কথা উঠিল। কথা উঠিবার সূচনা এই ;—বিপিন ও ভীমেন্দ্র কলিকাতায় পড়িত—দুজনেই হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়িত ; বিপিন এন্ট্রান্স ক্লাশে ও ভীমেন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে। উভয়েরই মামার বাড়ী দৌলতপুরের নিকট। পূজার ছুটিতে দুজনে মামার বাড়ী যাইবে, ঠিক করিয়া তাহারা হেদো দীঘির কাছে কি কি জিনিশ ক্রয় করিতে আসিল। এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা বড় ঘরে অনেক লোক জমিয়াছে। তাহারাও ব্যাপারটা কি দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল জনৈক সুবিখ্যাত বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। তাহারা শুনিতে পাইল তিনি বলিতেছেন যে, পূর্বদেশের ছেলেদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কম, আর পশ্চিম দেশের ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিশেষ বুদ্ধিমান হয়। ভীমেন্দ্র একে ত কলিকাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিত না, তাহাতে এই

বক্তৃতা শুনিয়া আর "বাঙ্গালদের দেশে" যাইতে চাহিল না, কিন্তু বিপিনের সম্বন্ধে তাহার ভালোবাসা ইহাতে কমিল না। অবশেষে তাহার মাতার কথায় সে মামার বাড়ীতে গেল বটে, কিন্তু 'বাঙ্গালদের' উপর যেটুকু ভালবাসা ছিল,—বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তাহার অর্ধেকও রহিল না। আজ নদীর ধারে বসিয়া বিপিন বলিতেছিল—"দেখ, এই সময়ে সকলে একেবারে চুপ করিয়া রহিয়াছে—সন্ধ্যাবেলা পৃথিবী যেন বোবা হইয়া গিয়াছে। এই সময় যদি কেহ চীৎকার করিয়া, বক্তৃতার দ্বারা আমাদের দুঃখের কথা আমাদের বলিয়া দেয় তবে কেমন হয়?" ভীমেন্দ্র বলিল, "—বাবুর মত বক্তা হলে তবে হয় ; তিনি ভাই, কি চমৎকার বক্তৃতা করেন!"

বিপিন।—তিনি বক্তৃতা করেন বেশ। কিন্তু তিনি বাঙ্গালদের ঘৃণা করেন—এটা বড় দুঃখের বিষয়।

ভীমেন্দ্র।—উচিত কথা বললেই তো ঘৃণা করা হল—না? বাঙ্গালদের মধ্যে রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর এঁদের মত একটা লোক দেখাওত। বিপিন এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া রহিল ;"ঈশ্বরের রাজ্যে যেখানে লোক যায় না, সেখানেও ত সুন্দর ফুল ফোটে ; সমুদ্রের তলায় কত মণিমাণিক্য পড়ে থাকে, কে তাদের খোঁজ রাখে? তা ভাই, পশ্চিমের লোকই বল, আর বাঙ্গালই বল, ঈশ্বর সকলকেই বড় লোক করতে পারেন।" এইরূপ কথাবার্তার পর আকাশে মেঘ উঠিতেছে, দেখিয়া তাহারা নদীতীর হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তৃতীয়ার চাঁদ পৃথিবীকে অন্ধকারে পুরিয়া ঐ বড় অশ্বত্থ গাছের আড়ালে লুকাইতেছিল, এমন সময় তাহারা গৃহে গেল।

বিপিন ও ভীমেন্দ্র উভয়ের মাতুল দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয় একজন সেকেলে হিন্দু। বাড়ীতে দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় হয়—কিন্তু সে ব্যয় অপব্যয় নহে। দরিদ্রদিগকে দান করিতেই প্রায় তাহার অর্ধেক যাইত, অপরার্ধের কিয়দংশ নিঃস্ব আত্মীয়গণের ছেলেমেয়েদের কাপড়, খেলনা প্রভৃতিতে ব্যয় হইত। এবং কিয়দংশ আমোদ ও পূজার উপকরণাদিতে খরচ হইত। দুর্গাপূজার আর তিনদিন মাত্র বিলম্ব আছে, সুতরাং সেই বৃহৎ বাটী আলোক দ্বারা সজ্জিত। কর্তা বাহিরে বসিয়া দুই একজন সমবয়স্ক লোকের সহিত উৎসবের বন্দোবস্ত করিতেছেন—কাহাকে কোন্ কার্যের ভার দিবেন—কে কোন্ কার্য সুবিধামত নির্বাহ করিতে পারিবে—কোন্ সময়ে কোন্ জিনিশ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। পাশে দুই একজন খোসামুদে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসিয়া "বাবু বড় ভক্ত," "বাবু বড় হিসেবী লোক," "আশীর্বাদ করি" এই রকমের নানা কথা বলিয়া কর্তাকে খোসামোদ করিতেছে। দুর্গাদাসবাবু সে দিকে মন না দিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় বিপিন ও ভীমেন্দ্র বাড়ীতে আসিল। ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, "তোমরা কোথায় ছিলে? পূজার সময় তোমাদের দুজনের উপর একটা কাজের ভার রহিল—তোমরা গরিবদের খাওয়া তদারক করিবে।" উভয়ে আহ্লাদে স্বীকৃত হইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। মাতুলানী আহার প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছিলেন, আসিবা মাত্র উভয়কে ডাকিয়া বসাইলেন, "এটা খাও," "ওটা খাও," "আর একটু দি," "আর একটু খাও," ইত্যাদি কথা বলিয়া পরিতোষ মত আহার করাইলেন। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হয় হয়, তখন ভীমেন্দ্রের এক বিপদ উপস্থিত হইল—ভীমেন্দ্র দেখিল থালার একপাশে লম্বা একগাছা চুল রহিয়াছে। দেখিয়াই ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। "ওয়াক" "ওয়াক" করিয়া সমস্ত খাবার বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে মামীকে, শেষে "পোড়া বাঙ্গালদের দেশ"-কে গালাগালি

দিতে লাগিল। পাঠক-পাঠিকাদিগকে বলা আবশ্যক যে ভীমেন্দ্র দুটি জিনিশকে বড় ঘৃণা করিত—পাতে লবণ এবং ভাতের ভিতরে চুল। ভীমেন্দ্র চটিয়া বলিল, "আমি এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাবো। পঞ্চাশ দিন বলিছি, আমি ভাতে চুল থাকলে খেতে পারি না, তবুও চুল?" মামী বিস্তর বুঝাইলেন,—কর্তা গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন—কারণ জানিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা! না দেখে পড়েছে, অত রাগ করো না। লক্ষ্মী বাবা আমার!" ভীমেন্দ্র রাগে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। আকাশ এতক্ষণ মেঘে ঢাকা ছিল—অল্প অল্প বৃষ্টি আসিল। সে খারাপ সময় পশুপাখী পর্যন্ত খোলা জায়গায় বাহির হয় না ; কিন্তু পনেরো বৎসরের বালক ভীমেন্দ্র রাগের ভরে ঐ বৃষ্টি মাথায় করিয়া মামার বাড়ী ছাড়িল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২—সালের দুর্গা-বিসর্জনের দিন যদি কেহ মধুডাঙ্গা ও গোপালপুরের মধ্যের রাস্তায় বেলা সাড়ে সাতটার সময় উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, এক স্থানে কি একটা জিনিশ দেখিবার জন্য ছোট বড় পুরুষ মেয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল— কাহারও মুখেই কথা নাই। অবশেষে একজন বলিয়া উঠিল "ছোট বাবু, মিছে চেষ্টা ; ছেলেটী বোধ হয় মারা পড়েছে।" যাঁহাকে এ কথা বলা হইল তিনি ভিড়ের মধ্যে বসিয়া একটী অজ্ঞান বালকের মূর্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—সেই অজ্ঞান বালকের মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে ; চক্ষে জল ; বালকের এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি 'হাউ', 'হাউ' করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ সেবন করাইতেছেন, আহা! এই দয়াবান বাবুটী কে? ইনি গোপালপুরের নিকটবর্তী সুজনখালীর মিত্রদের ছোট্ট ছেলে, নাম দীনদয়াল মিত্র, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইনি মেডিকেল কালেজে পড়িতেন বটে, কিন্তু হোমিওপেথী ঔষধে বড় বিশ্বাস ; তাই সুযোগ পাইলেই হোমিওপেথী ঔষধ লইয়া গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। দীনদয়াল বাবু পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন, এখনও যান নাই। গ্রামস্থ পরিচিত বৃদ্ধের ওই কথাগুলি দীনদয়াল বাবুর হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দুটী তিনটী ঔষধ সেবন করাইলেন, তথাপি বালকের চৈতন্য নাই। আহা, কি দয়া! পরের ছেলে রাস্তায় পড়িয়া আছে শুনিয়া দীনদয়াল শত কাজ ফেলিযা ঔষধের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না, 'আহা, কি হবে' এই ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির! পাঠকপাঠিকাগণ, যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহার কষ্ট দেখিলে কি তোমাদের এইরূপ দয়া হয়?

হঠাৎ এ কি? ওই যে সকলে 'ওই চোক খুলেছে' বলিয়া চীৎকার করিল?—দীনদয়াল বাবুর ঔষধ ও সেবার গুণে বালক চক্ষু মেলিল। "বিপিন, এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ" বলিয়া বালক চারিদিকে চাহিল। পাঠকপাঠিকা! চিনিয়াছ বালকটী কে? এই আমাদের সেই ভীমেন্দ্র। কিন্তু ভীমেন্দ্রকে আর চেনা যায় না। চোখ কোটরগত—মুখ হল্‌দে বর্ণ, শরীর হাড়ময় বলিলেও হয়। ভীমেন্দ্র এখানে কি প্রকারে আসিল, তাহা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বলা যাইবে। চৈতন্য হইবার পূর্বে ভীমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন চারিদিক হইতে তাহাকে সাপে আক্রমণ করিয়াছে—সাপগুলি তাহার পায়ের মধ্যে, পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে, টানিলেও বাহির হয় না তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল 'বিপিন!' স্বপ্নে দেখিল যেন বিপিন আসিয়াছে,

তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়াছে ; অমনি সর্পগুলি বিপিনকে দেখিয়া পলাইয়া গেল। তখন সে আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিল "এখানে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ?" দীনদয়াল বলিলেন "আমি বিপিন নই। তুমি কে? আচ্ছা থাক্, এখনও তোমাকে বড় দুর্বল বোধ হইতেছে; আমাদের বাড়ীতে চল সুস্থ হইলে সকল শুনিব।"—পাল্কী প্রস্তত ছিল। দীনদয়ালের ইঙ্গিতে বেহারারা ভীমেন্দ্রকে তুলিয়া সুজনখালীর দিকে লইয়া চলিল। দীনদয়াল পাল্কীর পাশে হাটিয়া চলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভীমেন্দ্র বাহির হইল, কাহারও কথা শুনিল না ; বৃষ্টির জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশাইয়া ভীমেন্দ্র ছুটিল। অন্ধকার ; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে, তখন ভীমেন্দ্র রাস্তায়। কি ভয়ানক রাগ! এরাগে কাহার ক্ষতি ভীমেন্দ্র তাহা বুঝিল না। মাতুলালয় ছাড়িয়া কতক দূরে গেলে ভীমেন্দ্র দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুড়ে ঘর। ভীমেন্দ্র অনেক বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই কুড়ে ঘরে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র জানিত না এই কুড়ে ঘর কাহার, জানিলে হয়ত ঢুকিত না। সেই গ্রামে এই ঘরখানি 'মা শীতলার ঘর' বলিয়া বিখ্যাত—এক পাগল সেই ঘরে থাকিত, গ্রামবাসীরা ভয়ে কেহই সন্ধ্যার পরে ঐ ঘরে যাইত না। ভীমেন্দ্র এইখানে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছিল "কেন, পরমেশ্বর এ হতভাগা বাঙ্গালদের দেশে এসেছিলাম—এত কষ্টও কপালে ছিল। বিধাতার মনে এতও ছিল।" ভীমেন্দ্র! ভীমেন্দ্র! সাবধান তোমার সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের নিন্দা করিও না ; নিজের দুর্বুদ্ধির ফলভোগ করিয়া, ভগবানের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ? মূর্খ তুমি!

ভীমেন্দ্র নিজের মনে বকিতে লাগিল—"এমন হতভাগা দেশও থাকে? কেন আমার মামার বাড়ী এ দেশে হ'ল। কি অসভ্য, এক মুটো ক'রে নুন খায়—ভাতের মধ্যে চুল? চুলোয় যাক্। এইবার যদি মরি তবুও—" হঠাৎ কে গাইল :—

"কে জানে কার কপাল পোড়ে, ঝড় বাদলে ঘুরে ঘুরে ছিষ্টি নষ্ট কল্লে যত দুষ্টমতি যমের চরে।

আমার বাগান, আমার বাড়ী
আমার ঘোড়া আমার গাড়ী,
ভবের হাটের তাড়াতাড়ি,
দম্ভ দেখে প্রাণ শিহরে।
কোথা এল, কোথা যাবে,
এ ভবে কজন তা ভাবে,
অন্তিমে সব ধাক্কা খাবে,
ভবের নৌকায় যেতে পারে।"

ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া শুনিল। এইবার তাহার ভয় হইল ; দেখিল এক পাগল কুড়ে ঘরের দিকে আসিতেছে। ভীমেন্দ্র উঠিয়া ঘরের কোণে গেল। পাগল ঢুকিয়াই ভীমেন্দ্রকে দেখিতে পাইল এবং বলিল "বাবা চোর, আমার কাছে পরশু দিন এস,—সে দিন আমার শ্রাদ্ধ হবে, অনেক গরিব দুঃখীকে পয়সা দিব ; পারত তাদের দলে মিশে যেও ; এখন কি কর্তে আগমন, প্রভু রঘুনাথ।" ভীমেন্দ্র ভয়েতে কাঁপিতেছিল ; বৃষ্টিতে বাহির হওয়াও কাঁপিবার একটা কারণ। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তুমি যেই হও, আমি চোর নই।" পাগল উত্তর করিল,

"চোর নও, তবে কাঁপছ কেন? এ কি সত্যি যুগ, যে তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে— কিন্তু, পুকুরের মধ্যে পড়লে, মাছে খেয়ে ফেলে দেবে, বেহালার কৃষ্ণধন ঘোষের মার মতন—কাঁপেন থর থর—তার কি?" ভীমেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পাগল ধরিবার চেষ্টা করিল না, কেবল হাসিয়া বলিল, "ওরে ইন্দুর, পাগলের ধন নষ্ট করা সিঙ্গির দাঁত নইলে হয় না, একি তামাসা না কি?"

পাগলের বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি এক জন ধনী বণিক ছিলেন, কৃষ্ণধন ঘোষ নামে তাঁহার একজন সহযোগী ছিল। কৃষ্ণধনই সমস্ত কার্য করিত, পাগল এক এক বার দেখিয়া অবশিষ্ট সময় দান ধ্যানে কাটাইতেন। কৃষ্ণধন সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবার আশায় মাতার পরামর্শানুসারে সহকারীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দেয়। তদবধি তিনি পাগল।

ভীমেন্দ্র যখন বাহির হইল তখন ঝড় বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনে এত ভয় হইয়াছিল, যে সেই রাত্রিতে অধিক দূরে যাইতে সাহস হইল না—খানিক দূরে গিয়া একটা বট গাছের উপর রাত্রি কাটাইবার জন্য তাহাতে উঠিয়া বসিল। উঠিতে কত কষ্ট হইল, বুক, হাত ছিঁড়িয়া গেল ; ভীমেন্দ্র অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে বটগাছের একটা ডাল এরূপ ভাবে বেঁকান ছিল যে তাহার উপর বসিয়া ভীমেন্দ্রের পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় রহিল না। তখন সে সেইখানেই নিদ্রিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল। পাখীগুলি অনেকক্ষণ ঝড় বৃষ্টিতে কাতর রব করিয়াছিল ; সম্প্রতি সূর্যের লালবর্ণ আলোক দেখিয়া আনন্দে গান করিতে লাগিল। ভীমেন্দ্র জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিল। কিন্তু উঠিয়া দেখিল সমস্ত শরীর বেদনাতে পূর্ণ। গাছ হইতে নামিয়া ভীমেন্দ্র পথ চলিতে লাগিল ; কিন্তু বালক রাগ করিয়া কতদূর চলিতে পারে। যে স্থানে ভীমেন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিকটেই একটি নদী, নাম বেগবতী। ভীমেন্দ্র মনে ভাবিল এই নদী পার না হইতে পারিলে মাতুলালয় হইতে লোক আসিবে। ভীমেন্দ্র নদী পার হইবার জন্য বসিয়া রহিল—ক্ষেয়া নৌকা ওপারে ছিল। ভীমেন্দ্র বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আজ কোথায় যাই? এখান থেকে কলিকাতা কত দূর। কি করে যাই? তাইতো, রাগ না কর্‌লেও হ'ত। যাক্, ওসব আর ভেবে কি হবে—যদি ফিরে যাই, আবার সেই কষ্ট, আবার সেই রকম কাণ-জ্বালানে কথা! আর যাই বা কোন্ মুখে? মামা এমন ভালবাসেন তাঁর হাত ছাড়িয়ে যখন চলে এসেছি, তখন আবার কি বলে তাঁর কাছে গিয়ে একটু থাকবার যায়গা ভিক্ষা চাহিব?" এইরূপে ভীমেন্দ্র নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মন সহজে বুঝিতে চাহিল না। কিসে যেন মনের ভিতর ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ভীমেন্দ্র,—তোমার এ ব্যবহারে তোমার মামার বাড়ীর সকলে মনে ক্লেশ পাইতেছেন—তোমাদের বাড়ী যখন সংবাদ যাইবে তখন তোমার বিধবা মা কষ্ট পাইবেন। আর ঈশ্বর তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।" ভীমেন্দ্র শুনিয়াও শুনিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না ; ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে আসিয়াছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহাতে গিয়া উঠিল। পাটনী পার করিয়া সকলের কাছে পয়সা চাহিল। সকলেই পয়সা, দিল, ভীমেন্দ্র পয়সা কোথায় পাইবে? পাটনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পয়সা কই?"

ভীমেন্দ্র। আমার পয়সা নাই। আর এখানে যে পয়সা লাগে তা আমি জানিতাম না।

পাটনী।—তিলকরাম পাটনী সকলের কাছেই একটা করিয়া পার করিবার পয়সা লয়!— এখন তুমি পয়সাটী ফেলে যেখানে খুসী সেখানে যাও।

ভীমেন্দ্র কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিল, "আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি—তবুও পয়সা দাও? এ জামাটা নিলে যদি হয়, তবে নিতে পার। আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি, আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ছি? অবিশ্বাস কর্‌ছো, ভারী ছোট লোকতো?" পাটনী সহজে ছাড়িবার লোক নয়, আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল "কি? পয়সা দেবে না আবার উল্‌টে ছোট লোক? তোমার জামা নিয়ে কে গোলে পড়বে বাপু? আমি ও সব বুঝি না। এখন যদি মঙ্গল চাও যেখান থেকে পার পয়সা এনে দাও ; নইলে—" পাটনী আর অধিক বলিল না—যা হউক, সমুদায় কথা বলা শেষ না হইলেও চারি ধারের লোক সকলেই তাহার মুষ্টি বন্ধ দেখিয়া মতলব বুঝিতে পারিল।—ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ কিছুই বলিল না। একজন সদয় দর্শক বলিল "তিলকরাম, দেখ্‌ছো ছেলে মানুষ পয়সা সঙ্গে নাই ওকে ছেড়ে দাও।"—পাটনী তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল—বলিল "ওর পয়সাটী তুমিই দাওনা কেন—যদি এত দয়া হয়ে থাকে?" তিলকরাম এই কথা বলিয়া ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে বাঁধিল এবং ভীমের দুই হাত খুব জোরে ধরিয়া জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

বল্লভগঞ্জের জমীদারের কাছারী জমীদারের বাড়ীর বাহিরে খোলা মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আট চালা ঘরে হয়। জমীদার রামজীবন বাবু প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাছারী করিয়া থাকেন—দুঃখী প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনেন, ও যাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রজাদিগকে তিনি নিজের ছেলেদের মত ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের জন্য রাস্তা ঘাট, হাসপাতাল, ইস্কুল করিয়া তাহাদের সকলরূপ সুবিধা করিয়া দিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। কাহারও কোন বিপদ হইলে তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসিত ; তাঁহারই পরামর্শ লইয়া কাজ করিত। ফলতঃ রামজীবন বাবু যে বল্লবগঞ্জের জমীদার, তাহা তাঁহার ভাবগতিকে বুঝিবার যো ছিল না ; পোষাক সামান্যরূপ—সর্বদা প্রজাদের বাড়ীতে গিয়া কখনও বা মাটীতে বসিয়া আছেন, কখনও বা গরিব প্রজার কাদা-মাখানো ছেলেগুলি কোলে পিঠে করিতেছেন, এরূপ দেখিলে কাহার সাধ্য বুঝিয়া লয় তিনি জমীদার। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কখন কখন বলিয়াছেন 'এরূপ করিলে মান থাকিবে না'। রামজীবন বাবু হাসিয়া বলিতেন, "প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিলে যদি মান যায়, যাক্। যাহার অবস্থা খারাপ তাহার সহিত মিশিলেই যে মান যায়, তাহা নহে।"

তিলকরাম ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া টানিতে টানিতে এই জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল। তখন বেলা ১০টা। রামজীবন বাবু এই কতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন—তিনটার পূর্বে বাহির হইবেন না, সুতরাং ভীমেন্দ্রকে দেওয়ানজি মহাশয়ের হাতে পড়িতে হইল। দেওয়ানজি মহাশয় একটী ছোট খাট নবাব, কিন্তু বাবুর জ্বালায় কিছুমাত্র কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। সকল প্রজাই বাবুর কাছে আইসে তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না, এ দুঃখ দেওয়ানজি মহাশয়ের অনেক দিন হইতে ছিল। এখন একজনকে হাতে পাইয়া নিজের তেজ কত তাহা দেখাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিলকরাম দেওয়ানজি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ভীমেন্দ্রের সকল কথা কহিল। দেওয়ানজি মহাশয় গোঁপে হাত দিয়া, চোক ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে? কেন তুমি পয়সা দাও নাই?" ভীমেন্দ্র বলিল, "আমার পয়সা ছিল না তাই দিই নাই ; আমার ঠকাবার ইচ্ছা ছিল না।" দেওয়ানজি রাগিয়া বলিলেন "খুব বাচাল ছেলেতো? পয়সা ছিল না, তবে পার হতে এসেছিলে

কোন্ বুদ্ধিতে?" ভীমেন্দ্র কি উত্তর করিতে যাইতেছিল ; দেওয়ানজি মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "এ জমীদারের কাছারী, তা হিসাব নাই! মুখে মুখে উত্তর? কোই হ্যায়?" দুজন বেহারা যোড়হাত করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দেওয়ানজি হুকুম দিলেন "রাস্তার ধারের ছোট ঘরে পূরে চাবি বন্ধ করে দাও।" একজন ভদ্রলোক দেওয়ানজির কানে কানে বলিলেন "কর্তা শুনলে কি বল্‌বেন?" দেওয়ানজি ষাঁড়ের মত চেঁচাইয়া বলিলেন "আমার হুকুম। লে যাও।" —দুজন বেহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল। এই বার গোঁয়ার ভীমেন্দ্র দুঃখ কি তাহা বুঝিল। বাড়ীর সুখের কথা, মাতুল মাতুলানীর স্নেহ, বিপিনের প্রাণের ভালবাসা, সকলি এক সঙ্গে ভীমেন্দ্রের মনে পড়িল। দুঃখেতে কষ্টেতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—সে প্রাণ খুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেহারাদের পাহাড়ের মন, তাহাতে ভিজিল না ; তাহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

দেওয়ানজি মহাশয় যে ছোট ঘরের কথা বলিলেন, তাহার কথা একটু বলা আবশ্যক। রামজীবন বাবুর পিতা বড় অত্যাচারী ছিলেন, তিনি যাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহাকে এই ঘরে পুরিয়া রাখিতেন। ঘরটী ইঁদুর ছুঁচো, আরশুলাতে পরিপূর্ণ। এই ঘরে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর বেহারা ভীমেন্দ্রকে বন্ধ করিল। এখন ভীমেন্দ্রের ক্রন্দন বাতাসেই মিশিয়া গেল! এখন ভীমেন্দ্র বুঝিল অনর্থক রাগ করার ফল কি? ভীমেন্দ্র বালক বটে, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল "কেন রাগ করিলাম? কেন সামান্য কারণে এত বিরক্ত হইলাম? কেন মাতুলের মিষ্ট কথা শুনিলাম না? বিপিন না জানি আমার কথা ভাবিয়া কত ক্লেশ পাইতেছে? যখন আমার মা একথা শুনিবেন, তখন তাঁর কত কষ্ট হইবে?" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জলে ভীমের বুক ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভীমেন্দ্র অচেতন হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহর বেলা—ভীমেন্দ্র তখনও আহার করে নাই, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে। ভীমেন্দ্র অনেকক্ষণ পর্যন্ত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল ; জমীদার রামজীবন বাবুর হুকুম লইয়া একজন চাকর উপস্থিত হইয়া বলিল, "তুমি যাইতে পার। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে বাবু হুকুম দিয়াছেন।" ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? এদিকে অসহ্য ক্ষুধা, পথ চলা কষ্ট, ওদিকে অসহ্য শরীর বেদনা—ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? ভিক্ষা করিলে আহার যোঠে বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র ভদ্রলোকের ছেলে কি বলে ভিক্ষা করে? অবশেষে ক্ষুধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক ময়রাদোকানের কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিল। দোকানের মধ্যে একটী বালক বসিয়া খাবার খাইতেছিল, সে ভীমেন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাহার যত খাবার ছিল, সকলি ভীমেন্দ্রকে দিল। ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও ভুলিয়া গেল;খাবার খাইবার সময় ভীমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীমেন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে আরও পাঁচ দিন কখন কোন চাষার বাটীতে, কখন কোন ময়রা দোকানে, কখন বা পেটের জ্বালায় জোর করিয়া যৎসামান্য আহার যোগাড় করিয়া ভীমেন্দ্র নবমীর দিন রাত্রিতে গোপালপুরের রাস্তায় উপস্থিত হইল, কিন্তু কতক দূরে গিয়া ভীমেন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কথা বন্ধ হইয়া গেল। ভীমেন্দ্র মৃতের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেল—তাহার চৈতন্য রহিল না। প্রাতে রাস্তার লোকে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সেইখানে যুঠিল। অল্প সময়ের মধ্যে চারি দিকের গ্রামে এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ীতে এ খবর গেল। দীনদয়াল বাবু তাড়াতাড়ি

কতকগুলি ঔষধ লইয়া, একটা পাল্কী সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দীনদয়াল বাবুর ভাইবোন অনেকগুলি ছিল ; কিন্তু তাঁহারা এখন ভাই বোনে দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছেন ; সুতরাং বাপ মা তাঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন। দীনদয়াল এবং তরলা যাহা কিছু করিবে, অন্যায় না হইলে, কর্তার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। গৃহিণী বড় কোমলস্বভাবা ছিলেন। এইরূপ বাপ মায়ের সন্তান বলিয়াই দীনদয়াল দয়াতে পূর্ণ এবং তরলা করুণার ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহাদের ধন সম্পত্তি তত অধিক না থাকিলেও তাঁহারা এরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন, যে সংসারের খরচ নির্বাহ হইয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ থাকিত। দীনদয়াল বাড়ীতে আসিলেই এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া বেড়াইতেন, এবং যদি দেখিতেন কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন, অমনি তাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিতেন। চতুর্দশবর্ষীয়া তরলা এসকল বিষয়ে দাদার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা দু-ভাইবোনে গরিব দুঃখীদের জন্য যে কত কাঁদিয়াছেন তাহার সীমা নাই। দাদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃখী, রোগী সংগ্রহ করিতেন, বোন তাহাদের রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ফলতঃ দীনদয়াল বাবু বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর দশা কিরূপ হইত তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে বুঝা যাইতে পারে ;—একদিন চাকরেরা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গৃহিণীর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল "মা, আমাদের মাইনে হিসেব করে দিন, আমরা থাকিব না।" গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে কি হয়েছে ?" চাকরেরা বলিল, "আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের চাকরী ক'রে দুটো করে খাব বলে এসেছি—কিন্তু ছোট বাবুর জ্বালায় আর তরু দিদির উৎপাতে রোজ এক দল ছোটলোকের খান্‌শামাগিরি কর্‌তে হয়, তা আমরা পারি না, এতে আমাদের মানের হানি হয়।" গৃহিণী মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, জলখাবারের জন্য সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিলেন।

সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী দয়ার মন্দির বলিলেও হয়। এই দয়ার মন্দিরে দীনদয়াল ভীমেন্দ্রকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। চাকরেরা দেখিবামাত্র পরস্পরকে টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল, "যা বলিছি, ঐ আর একটা উৎপাত যুঠিয়ে এনেছেন।" দীনদয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই ছুটিয়া মাতার নিকট গেলেন এবং কি অবস্থায় ভীমেন্দ্রকে পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া তরুকে তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তরু তখন স্নানের পর চুল শুকাইয়া চুল বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দাদার কথা শুনিয়া কেশবিন্যাস রাখিয়া ছুটিয়া গেল। তাহারা দুজনে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে একটা বিছানায় শোওয়াইয়া খানিকটা পুষ্টিকর ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উপযুক্ত রূপ খাদ্য প্রস্তুত হইল। ভীমেন্দ্রকে দীনদয়াল পরিতোষমত আহার করাইলেন ;—ভীমেন্দ্র সুস্থ হইল। প্রায় ৭ দিন ভীমেন্দ্র মিত্রদের বাড়ী রহিল।

উদ্ধত গোঁয়ার লোকের স্বভাবই এই, তাহারা কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতে পারে না, এবং অনেক কাল অপরিচিত কাহারও আশ্রয়ে (বিশেষ আবশ্যক হইলেও) থাকিতে ভালবাসে না। ভীমেন্দ্র দেখিল দীনদয়ালদের বাড়ীর সকলেই তাহাকে নিজের বাড়ীর ছেলের মত দেখেন ; দীন দয়াল, তরলা যখন যাহা প্রয়োজন সাধ্যমত তাহা যোগাড় করিয়া দেন, তথাপি ভীমেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল ; সেখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা হইল না। এক দিন বিকালে বেড়াইবার নাম করিয়া ভীমেন্দ্র নদীর ধারে গেল, একজন মাঝির সহিত

কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ভীমেন্দ্র কি মুর্খ! মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করিল না। মিত্রদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিগা কাহাকেও কিছু বলিল না ; অবশেষে যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন ভীমেন্দ্র ধীরে ধীবে ঘর হইতে বাহির হইল।

ভীমেন্দ্র! কি করিলে? যাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় বাঁচিয়া গেলে, যাইবার সময় তাঁহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? আর যাইবার সময় সিদ্ধি দাতা পরমেশ্বরের নামও লইলে না? ধন্য তোমার বুদ্ধির গতি!

অন্ধকার রাত্রিতে ভীমেন্দ্র কোন মতে পথ চিনিয়া গেল, এবং শীঘ্রই নৌকায় উঠিল। মাঝিরা জাগিয়াছিল, ভীমেন্দ্র উঠিবা মাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল। একটা বড় আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখনও বিপরীত স্রোত হয় নাই। পরদিন প্রাতে যখন দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে ভীমেন্দ্র কোথায় গেল খোঁজ আরম্ভ হইল, এবং স্নেহময়ী তরু ছল ছল চক্ষে বসিয়া পড়িল, তখন ভীমেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরে নৌকার মধ্যে। দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে শীতে কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু নৌকায় ভীমেন্দ্র ভয়ানক কষ্ট পাইল। প্রাতে সূর্য ভালরূপ উদয় হইলে ভীমেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইল ; কিন্তু আশ্চর্য হইয়া দেখিল গত কল্য যে নৌকা ভাড়া করিয়াছিল এবং যে মাঝির সহিত কথা বলিয়াছিল এ সে নৌকা নহে, এবং এ নৌকায় সে মাঝি নাই। মাঝিরাও আশ্চর্য হইয়া টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "এ কোন্ বাবুরে!"—কিন্তু চেঁচামেচি করিল না। ভীমেন্দ্রের কিছু আশঙ্কা হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। নৌকা চলিতে লাগিল। রাত্রি শেষে একটা ছোট নগরের নিকটে নৌকা থামিল। মাঝিরা অপরাহ্নে রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু ভীমেন্দ্রের যে কি হইবে তাহা তারাও জিজ্ঞাসা করে নাই, ভীমেন্দ্রও তাহা ভাবে নাই। নৌকা থামিলে মাঝিরা বলিল "বাবু নামুন।" ভীমেন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া নামিল। মাঝিরাও টাকা চাহিল না, ভীমেন্দ্রও দিল না। সেই নগর মধ্যে ভীমেন্দ্র প্রবিষ্ট হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় কিছু আশ্চর্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তাইতো, কেমন হ'লো? টাকা না নিয়েই চলে গেল! ব্যাপারটা কি?" সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া এই খানেই বলিয়া রাখি ব্যাপারটা কি? যে নৌকা ভীমেন্দ্র ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিল, তাহার মাঝিরা প্রথমতঃ স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র চলিয়া গেলে, তাহারা পরামর্শ করিল যে ওরূপ ছেলেমানুষকে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এই স্থির করিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া পরপারে গিয়া বাঁধিয়া থাকিল। এদিকে আর একখানি নৌকা সেই ঘাটে আসিয়া বাঁধিয়া ছিল, এ নৌকা বগুড়ার পুলীশের দারগা বাবুর। গঙ্গাধর বাবু কোন সরকারী কাজে সুজনখালীর নিকটে আসিয়াছিলেন ; রাত্রিতেই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার কথা,—তিনি পুলীশের লোক, চোরডাকাত ধরিবার জন্য সর্বদা সাবধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝিরা তাঁহার অনুমতি পাইয়াছিল, "আমি নৌকায় উঠিলেই নৌকা খুলিয়া দিবে, কোনও কথাবার্তার প্রয়োজন নাই—তাহা না হইলে কাজ উদ্ধার করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে" ; আবার যখন ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিয়াছিল, বাবুটীরও সেই সময় আসিবার কথা ছিল ; সুতরাং ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিবা মাত্রই মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পূর্বে বলিয়াছি ভীমেন্দ্র শীতে কষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু সে ভীমেন্দ্রের দোষ ;—নৌকায় বেশ বিছানা ছিল, কিন্তু ভীমেন্দ্রের তাহা ব্যবহার করিতে সাহস হইল না। অর্ধেক পথে গিয়া

যখন মাঝিরা দেখিল ভীমেন্দ্র তাহাদের বাবু নহে, তখন তাহারা ভাবিল, "এখন যদি ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে দারগা বাবু বিরক্ত হইবেন, যদি বগুড়া পর্যন্ত যাই, তাহা হইলেও বিরক্ত হইবেন,—তবে একবার বগুড়ার ঘরে যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া তাহারা ভীমেন্দ্রকে লইয়া আসিয়াছিল। ভীমন্দ্রকে নামাইয়া দিয়া মাঝিরা কিছুকাল বিশ্রাম করিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ঘর হইতে লইয়া পরে দারগা বাবুকে কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

ভীমেন্দ্র নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। স্থানে স্থানে নদীর ধারের শোভা অতি মনোহর—বিশেষতঃ যাহারা নূতন আসিয়াছে তাহাদের পক্ষে। ভীমেন্দ্র এ শোভা দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। সেই আত্মীয় স্বজন শূন্য স্থানে ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মলিন মুখে একাকী বেড়াইতে লাগিল। প্রাতঃকালে অনেক বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ভীমেন্দ্রকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, ভীমেন্দ্রও কাহাকে কোন কথা বলিল না। এক জন ১৫ বৎসরের বালক কতক্ষণ এইরূপে বেড়াইতে পারে? পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমেন্দ্র একটা ঝাউগাছের তলে বসিয়া পড়িল। বাতাসের সহিত মাথা নাড়িয়া ঝাউগাছগুলি হুঁ হুঁ করিয়া যেন ভীমেন্দ্রের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ভীমেন্দ্র সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময়ে মুনসেফ আদালতের উকিল হরিপদ বাবু এই রাস্তায় যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন একটী শীর্ণকায় বালক পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই নগরের মধ্যে হরিপদ বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। যাঁহারা হরিপদ বাবুকে চিনিতেন না, তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাকে গালাগালি দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন। হরিপদ বাবু অধিক লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত। উকিল হইলেই প্রবঞ্চক হইতে হয় যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শুনিলে কি মনে করিবেন জানি না, হরিপদ বাবু অসত্যের, প্রবঞ্চনার ছায়াতেও থাকিতেন না, যে মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া হরিপদ বাবুর বিশ্বাস হইত, যথেষ্ট অর্থের আশা থাকিলেও তাহাতে তিনি হাত দিতেন না। হরিপদ বাবুর আর একটী অসাধারণ গুণ এই ছিল যে তিনি সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কোনও ধর্মকেই পরিহাস করিতেন না, এই জন্যই হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম হইয়াও সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হরিপদ বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন, "ওহে, তুমি কে এখানে ঘুমুচ্ছো?" ভীমেন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিল। হরিপদ বাবু পুনশ্চ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভীমেন্দ্র বলিল "আমি কে, কোথায় আছি, তা কিছুই জানি না।" এইরূপ উত্তরে হরিপদ বাবু কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, "তুমি কে তাও জান না, কোথায় এসেছ তাও জান না? —ভাল, এখানে এলে কি করে?"

ভীমেন্দ্র বলিল, "তাও জানি না।"—ভীমেন্দ্র এইরূপে কথার উত্তর দিতেছে কেন বোধ হয় পাঠকপাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন। দুটী কারণে ভীমেন্দ্র এইরূপ করিতেছে, প্রথম কারণ কিরূপে নিজের পরিচয় দিলে বাবুটী চিনিতে পারিবেন তাহা, ভীমেন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিল না, কোন্ স্থানে এই রূপ কথাবার্তা হইতেছিল, ভীমেন্দ্র বাস্তবিকই তাহা জানিত না; তাহার পর এই স্থানে আসিবার ব্যাপার এত আশ্চর্য যে যদিও পাঠকপাঠিকা কি ঘটনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভীমেন্দ্র এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই; দ্বিতীয় কারণ ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছে, এখন সবিশেষ বলিতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই! হরিপদ বাবু বালকের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন বালকটি কোন বিপদে পড়িয়াছে; তখন তিনি স্নেহের সহিত তাহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন "আমার বাড়ীতে এস; কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, তাহার

পর সকল কথা শুনিব।" ভীমেন্দ্র কলের পুতুলের ন্যায় উঠিল এবং ভাবিতে ভাবিতে, হরিপদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়ীর কর্তা ধার্মিক হইলে বাড়ীর কেহই যে অসৎ থাকিতে পারে না, হরিপদ বাবুর বাড়ী তাহার এক প্রমাণ। ভীমেন্দ্র যখন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে গেল, তখন হরিপদ বাবুর ছেলেমেয়েগুলি ছুটিয়া আসিল এবং "ইনি কে, বাবা?" "আমাদের বাড়ীতে থাকবেন কি?" ইত্যাদি কথা বলিয়া ৫ মিনিটের মধ্যেই ভীমেন্দ্রকে আপনার লোক করিয়া তুলিল। একটী ছেলে বলিল "বাবা, এঁকে কি ব'লে ডাকবো?" হরিপদ বাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ডাকবার বন্দোবস্ত পরে হবে, আগে ওঁর জলখাবারের বন্দোবস্ত কর দেখি, উনি বোধ হয় অনেকক্ষণ কিছু খান নাই।" ছেলেরা যেন বিদ্যুতের মত হরিপদ বাবুর বাড়ী আলো করে ছুটিয়া গেল। মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া একটী বড় ছেলে দোকান হইতে খাবার লইয়া আসিল ; একটী মেয়ে আসন ও জলের গেলাশ আনিল—যাহারা কিছুই লইয়া যাইতে পারিল না, তাহারা বড় দুঃখিত হইল, এবং এই দুঃখের কিছু উপশম করিবার জন্য আগে গিয়া খবর দিল "বাবা, খাবার আস্‌ছে।" গোঁয়ার ভীমেন্দ্র অসুখের অবস্থায় দীনদয়াল ও তরুর নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিল, দেখিল এখানে তদপেক্ষা কম নহে, বরং অধিক।—হরিপদ বাবুর আয় তত অধিক নহে—অথচ পরিবারে লোক সাত আটটী, সুতরাং হরিপদ বাবুর একটী বই দাসী নাই। হরিপদ বাবু টাকা হাতে হইলে একেবারে অনেক দিনের জন্য জিনিশ কিনিয়া রাখিয়া দেন, তাহাতে পয়সার সুবিধা হয়।—হরিপদ বাবুর স্ত্রী নিজে রন্ধন করেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান, এবং ঘরদ্বার সজ্জিত করেন।—এই সকল কার্য সমস্ত দিন করিয়াও বসন্তবালা দেবীর মুখ কখনও মলিন দেখা যায় নাই—ফলতঃ আলস্য বলিয়া একটী কথা হরিপদ বাবুর বাড়ীতে শুনা যাইত না।—এইরূপ স্নেহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ভীমেন্দ্রের গোঁয়ার প্রকৃতি যে কোথায় গেল, তাহার স্থিরতা রহিল না।—সকল ছেলেমেয়েরাই ভীমেন্দ্রকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকে, এখন ভীমেন্দ্র কাহার উপর রাগ প্রকাশ করিবে? ভীমেন্দ্র বালকবালিকাদিগকে নিজের ভাই বোনের মত ভালবাসিতে শিখিয়াছে ; ভালবাসায় তাহার মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে—সে মনে আর রাগের বা তেজের স্থান কোথায় হয়? পাঠকপাঠিকা, জান কি কে প্রায়ই গোঁয়ার বা একগুঁয়ে হয়? যে কাহারও জন্য ভাবে না, সে মনে করে তাহার জন্য কেউ ভাবে না, সেই কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যখন ভালবাসিবার লোক ভগবান যুঠাইয়া দেন, যখন আমার আপনার জনের জন্য ভাবিতে এবং তাহাদিগকে ভালবাসিতে ভগবান শিক্ষা দেন, তখন আর গোঁয়ারের ভাব থাকে না। ভীমেন্দ্র একথা বুঝিল। —ভীমেন্দ্র আর একটা বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিল—সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের সহিত মিলিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে, এবং ঈশ্বরের নাম করে। ভীমেন্দ্রের এতদিন বিশ্বাস ছিল, গান করাটা একটু খারাপ কাজ, সুতরাং বাপ-মায়ের সাক্ষাতে গান করা কখনই হইতে পারে না ;তাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের নাম করা, ধর্মকর্ম করা, এ সকল বৃদ্ধদের কাজ, ছেলেদের নহে ; সুতরাং এখানে তাহার বিপরীত দেখিয়া কিছু অবাক হইল। ভীমেন্দ্র কখনও ঈশ্বরের নাম করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং হরিপদ বাবুর বাড়ীতে যখন উপাসনা হইত, তখন ভীমেন্দ্র এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং ভাবিত "এ বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত যে ভাল একি এই ঈশ্বরের নাম করার গুণে? তাহা যদি হয় তবেতো ঈশ্বরোপাসনা ভাল।" ভীমেন্দ্র এইরূপ ভাবিত কিন্তু উপাসনা কি রূপে

করিতে হয়, জানিত না বলিয়া কখনও উপাসনা করিত না!

এইরূপে পাঁচ ছয় দিন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল বাবুদের বাড়ী হইতে ভীমেন্দ্র দীনদয়ালকে দুঃখিত করিয়া, তরুকে কাঁদাইয়া, সকলকে ব্যস্ত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, ভীমেন্দ্র এখান হইতে পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না ; কিন্তু কিছুকাল পরে কলিকাতায় যাইবার জন্য অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—একদিন বসন্তবালাদেবী রন্ধন গৃহে আপনার কার্য করিতেছিলেন, এমন সময় ভীমেন্দ্র সেইখানে গেল। ভীমেন্দ্রকে সেইখানে দেখিয়া ছেলেগুলি দুটী একটী করিয়া সেইখানে গিয়া যুঠিল। ইহাদের ছাড়িয়া যাইবার কথা কেমন করিয়া গৃহিণীকে বলিবে ভাবিয়া ভীমেন্দ্রের চোখে জল আসিল। একটী ছোট বালিকা তাহা দেখিতে পাইয়া ছোট মুখটী কাল করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং মায়ের মুখে হাত দিয়া বলিল "ওমা! মা! দাদাবাবুর খিদে পেয়েছে—দাদবাবু কাঁদ্‌ছে।" সরলার বিশ্বাস ক্ষুধা না পাইলে মানুষ কাঁদে না ; কারণ হরিপদ বাবু কখনও বালকবালিকাদিগকে প্রহার করিতেন না। বসন্তবালা ভীমেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন চোখের কোণে জল শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বসন্তবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীমেন! বাবা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?" পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন দুঃখের সময়ে যদি কেহ দুটো মিষ্ট কথা বলে, তাহা হইলে দুঃখটা আরও যেন অধিক বোধ হয়—আর চোখের জল রাখা যায় না। ভীমেন্দ্র বাটীর গৃহিণীর এইরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিছুই বলিল না। অবশেযে অতি কষ্টে বলিল, "আমি অনেক কাল মাকে দেখি নাই আমার বিধবা মা আমার জন্য না জানি কত ব্যথা পাইতেছেন ; আমার কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু—"। ভীমেন্দ্র আর বলিতে পারিল না। ছেলেমেয়েদের কোমল হৃদয়ে ভীমেন্দ্রের রোদনে আঘাত লাগিল, তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। বসন্তবালা দেবী আঁচলের কোণে চক্ষু মুছিলেন। অবশেযে হরিপদ বাবু আফীশ হইতে বাড়ীতে আসিলে স্থির হইল যে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ভীমেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে—বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১ বার—স্কুল ছুটি হইলে বগুড়ায় আসিতে হইবে ; যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হরিপদ বাবু দিবেন। ভীমেন্দ্র যে চলিয়া যাইতেছে ছেলেদের একথা জানান হইবে না। এইরূপ বন্দোবস্তের পর হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কিছু পথের খরচ দিলেন, একটী বাক্স পুরিয়া কিছু কাপড় ও খাবার দিলেন। হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে একখানি গরুর গাড়ী করিয়া দিলেন, তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাড়া আগেই দিলেন এবং ভীমেন্দ্রের বাক্সটী তাহাতে তুলিয়া দিলেন। ভীমেন্দ্রের টাকা পয়সার থোলেটী বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দিল ;—পরিচিত গাড়োয়ান, ভয় কি? এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কর্তা ও গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া, ঈশ্বরের নাম করিয়া (ভীমেন্দ্র যাত্রার সময় ঈশ্বরের নাম করিল, কিন্তু তাহা গৃহিণীর অনুরোধে) ভীমেন্দ্র বগুড়া পরিত্যাগ করিল।

সপ্তম অধ্যায়

বগুড়া হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে চৈতন্যগ্রাম পর্যন্ত গরুর গাড়ীতে আসিতে হয়। তথায় বিশ্রাম না করিয়া গরুর পক্ষে চলা কষ্ট, সুতরাং তৎকালে এইরূপ নিয়মই ছিল যে বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে চৈতন্যগ্রামে গিয়া গাড়ী বিদায় দেওয়া হইত। পূর্বে নৌকা করিতে গিয়া যেরূপ ঠকিয়াছিল ভীমেন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল, সুতরাং সে এবার মনে করিয়া 'কাহার গাড়ী' একথা জানিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা গরুর গাড়ীর আড্ডায়

গিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দু-তিন খানা গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, ভীমেন্দ্র একখানার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'একি খোদাবক্সের গাড়ী?' গাড়োয়ান বলিল হাঁ। ভীমেন্দ্র নিশ্চিত মনে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান গরু যুতিয়া গাড়ী হাঁকিতে লাগিল।

ভীমেন্দ্র কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ে নাই, সুতরাং যখন এক একবার মাথা নীচের দিকে পা উপর দিকে যাইতে লাগিল, এক একবার যখন গড়াইতে গড়াইতে গাড়ীর এপাশ ওপাশ করিতে হইল, তখন ভীমেন্দ্রের কিছু ক্লেশ বোধ হইল। যাহা হউক এইরূপে সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল, ভীমেন্দ্র অর্ধ জাগরণে অর্ধ নিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে ভীমেন্দ্র গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল 'আর কতদূর আছে?' গাড়োয়ান বলিল "আর ১ ক্রোশ ; এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিব।" অবশেষে একটী বড় গ্রাম বা বন্দর দেখা যাইতে লাগিল। ভীমেন্দ্র মনে করিল ঐ চৈতন্যগ্রাম' ;—জিজ্ঞাসা করিল 'ঐ বুঝি দেখা যায়?' গাড়োয়ান বলিল "হাঁ বাবু!" যথাসময়ে গাড়ী থামিল। ভীমেন্দ্র নামিয়া বলিল "গাড়োয়ান! বাক্সটা কই?" গাড়োয়ান কহিল "কই, আমার এই গাড়ীতে কেউ কোন বাক্স দেয় নাই ত!" ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার গড়োয়ানের সহিত যে কথা বার্তা হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মর্ম এই ; এস্থান চৈতন্যগ্রাম নহে—ভীমেন্দ্র এবারেও ভুল করিয়া অন্য গাড়ীতে আসিয়াছিল। বগুড়ার এক পার্শ্বে খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান বাস করিত, তাহার অনেকগুলি ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী ছিল। সকলগুলিই 'খোদাবক্সের আড্ডার গাড়ী' এই নামে পরিচিত। সুতরাং বিশেষ করিয়া গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা না করাতেই এই গোলমাল ঘটিয়াছিল। যে দিন ভীমেন্দ্র চৈতন্যগ্রামে যাইবার জন্য খোদাবক্সের একটা গাড়ীতে বাক্স তুলিয়া দিয়াছিল, সেইদিনই আর একটা গাড়ীতে বগুড়ার মুন্সেফ বাবুর দূর সম্পর্কীয় ভাইপোর রশুলপুর যাইবার কথা ছিল। এখন পাঠকপাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ভীমেন্দ্র কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। রশুলপুরে ভীমেন্দ্র আসিল, কিন্তু তাহার যে বাক্সের মধ্যে টাকা, খাবার, সমস্তই রহিয়াছে সে বাক্স না পাইয়া ভীমেন্দ্র বড় দুঃখিত হইল। তখন সে ভাবিল, "ভাল, এই গাড়ীতেই বগুড়ায় ফিরিয়া যাই না কেন?" গাড়োয়ানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে গাড়োয়ান বলিল "আমার গরুকে না ঠাণ্ডা করে আমি যেতে পারি না। পরশু আমি এখান থেকে যাব।" তবেইত বিপদ! অন্য গাড়ী করিতে হইলে নিয়মানুসারে আগেই ভাড়াটী দিতে হয় ,ভীমেন্দ্র টাকা কোথায় পাইবে? তখন সে গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইয়া খানিকটা দূরে গিয়া ভাবিতে বসিল। রশুলপুরের বাজার দেখিলে বোধ হয় যেন রশুলপুর খুব একটা প্রকাণ্ড গ্রাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেই গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে দুদিন হাট বসে, নানা স্থান হইতে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি এবং অনেক লোকের জনতা হয় ; এই জন্য বাজারটি খুব বড়। ফলতঃ রশুলপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহাতে চাষা, জেলে, ইত্যাদি জাতি ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। ভীমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, কি ভাবিল তাহা ভীমেন্দ্রই জানে ; বোধ হয় কলিকাতা হইতে মামার বাড়ীতে যাত্রা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই ভীমেন্দ্রের মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামে অপরিচিত একটী লোক আসিয়াছে, ভীমেন্দ্রের আসিবার অল্পকালের মধ্যেই এই সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। তখন গ্রামের প্রাচীনলোকেরা ৪/৫ জন ভীমেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ; দেখিয়াই তাঁহারা খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। রশুলপুরের দরিদ্র ছোট লোকদিগকে 'তিনি' 'তাঁহারা' এরূপভাবে উল্লেখ করিতেছি কেন, জানিতে চাও? ইহাঁদের মত ভদ্র, নিরহঙ্কারী, নির্বিবাদী, সহজ-সন্তুষ্ট লোক

আমি আর দেখি নাই। রশুলপুরের চাষাদের সহিত যে একবার আলাপ করিয়াছে সেই তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ধর্ম, সৎভাব, প্রভৃতি কেবল বড়লোকের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহাদিগের যে অত্যন্ত ভুল, রশুলপুরের চাষাদের জীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ইনি ভদ্র, উনি অভদ্র, এরূপ প্রভেদ যদি কেবল বংশেতেই হইত, তাহা হইলে এই চাষাদের মান্য করিতাম না। আমি ভদ্রবংশে এরূপ ছোটলোক দেখিয়াছি, যাহাদিগকে 'তুই' বলিয়া কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ হয় ; আর রশুলপুরের ঐ যে ৫ জন চাষা ভীমেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উহাঁদের পবিত্র জীবন দেখিয়া উহাঁদের প্রতি ভক্তি না দিয়া কি থাকিতে পারা যায়? পাঠক! তুমি যদি নীচবংশে জন্মিয়া থাক, লজ্জিত হইও না—রশুলপুরের এই চাষাদের মত হও ; আমি তোমাকে ভদ্র বলিব। আর যদি ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্রোচিত গুণ না পাইয়া থাক, তবে তোমাকে ছোট লোক ভিন্ন কি বলিব?

বদন জেলে, কেরামতালি চাষা, হারাণ কামার, জগন্নাথ তেলী এবং ভগীরথ নাপিত সেই গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত। —ইহাঁদের কার্যদক্ষতা এবং ধর্মভয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাঁদের দ্বারা আপনাদের আবশ্যকীয় কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল "ছোট লোকেরা" তাহাদের সৎচরিত্র এবং পরিশ্রমী হস্তের গুণে মহাসুখে কাল কাটাইতেছিল। তুমি বিদ্বান, তুমি হয়ত নিজের বিদ্যায় মনে মনে অহঙ্কৃত হইয়া আমার এইরূপ বর্ণনায় হাস্য করিবে, কিন্তু তোমাকে একটী কথা বলিয়া রাখি—লেখা পড়া শিখিয়া বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশের প্রশংসা-ভাজন হও, তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু যদি সৎচরিত্র এবং শ্রমশীলতা এই দুটী জিনিশের তোমার অভাব হয়, যদি যথেচ্ছাচারকে এবং আলস্যকে তোমার অঙ্গের ভূষণ করিয়া থাক, যদি উদরান্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রমকে তুমি ছোটলোকের কাজ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরতথাক তাহা হইলে তোমার বিদ্যা তোমার সুখের কারণ না হইয়া, গলগ্রহ মাত্র হইয়া উঠিবে।

ভীমেন্দ্র খানিক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখিল কয়েকজন প্রাচীন লোক কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ; ভীমেন্দ্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না ; ভীমেন্দ্র অপরিচিত লোকের চাউনি সহ্য করিতে পারিত না ; একবার ভাবিল অন্যত্র চলিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হারাণ কামার এবং ভগীরথ নাপিত একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনন্তর উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, হারাণ কামার ভীমেন্দ্রের নাম, বয়স, অবস্থা, সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমেন্দ্র নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিল। বুড়ো কেরামতালি এই দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আল্লা কখন কাকে কোন্ দুঃখ ফেলেন তা তিনিই জানেন। সে বার মক্‌বুলালির ছেলে খেতাবদিন যে কোথায় গেল, আর তাকে পাওয়া গেল না। হয়ত মারা পড়েছে। আল্লাতালা আমাদের বুড়োদের না নিয়ে ছেলেদের কেন যে নেন তা বুঝি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কেরামত ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন "বাবা! এস আমাদের বাড়ীতে কি যেখানে খুশি, এস—এখানে তুমি ছেলেমানুষ, পড়ে থাকলে আমরা বুড়ো মানুষ কোন্ প্রাণে ঘরে যাই?" সেই লোকেদের মধ্যে কে ভীমেন্দ্রকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে এই লইয়া বাদানুবাদ হইল। অবশেষে স্থির হইল, ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতেই থাকিবে। সকলে আসিয়া তাহাকে রোজ দেখিয়া যাইবে, এবং হাটের দিন বাবুরা আসিলে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। 'বাবুরা' এ কথার অর্থ এই যে রশুলপুরের বাজার যাঁহার সম্পত্তি, প্রতি হাটবারে তাঁহার দুজন প্রধান

কর্মচারী সকলরূপ গোলমানল নিবারণের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। ইহাঁরাই 'বাবুরা' এই নামে পরিচিত। এইরূপ স্থির হইলে অসহায় ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গেল। অন্যান্য চাষারাও আপন আপন কর্মে গেল।

অষ্টম অধ্যায়

পাঠকপাঠিকা, তোমরা কি কেহ কখনও ভীমেন্দ্রের মত বিপদে পড়িয়াছ? ভীমেন্দ্র এতবার বিপদে পড়িল, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কতবার ভীমেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছে তাহার কপাল দোষেই সে বিপদে পড়িতেছে এবং তাহার কপালগুণেই সে প্রত্যেকবারে মাথা রাখিবার স্থান পাইতেছে। আমরা বলি বিপদে পড়া তাহার অবিবেচনার ফল এবং ভীমেন্দ্র যে বিপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহা জীবন মরণের সহায় জগদীশ্বরের কৃপা।—ভীমেন্দ্র আজিও কৃতজ্ঞ হইতে শিখে নাই ; কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে ভীমেন্দ্র ভাবিত তাহার নিজের কপালের জোরে সে উপকার পাইল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কত রকমে যে শিক্ষা দেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে দুঃখী ছিল, ঈশ্বর তাহাকে দেখাইলেন, তাহার অপেক্ষাও দুঃখী পৃথিবীতে আছে, অমনি সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইল ; যে ঈশ্বরের কথা ধর্মের কথা ভাবিত না, ঈশ্বর তাহার কোন ভালবাসার বন্ধুকে লইয়া গেলেন, অমনি সে ধর্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন দিল ; যে রোগের জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বর তাহাকে শিখাইলেন—তাঁহারই উপর নির্ভর না করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে না এবং হাত পা ছাড়িয়া ঈশ্বর যা করেন বলিয়া বসিয়া পড়িলে, সেই দুর্যোগেই ঈশ্বর মানুষের সহায় হন। এই জন্যই বলিতেছি মানুষের দুর্যোগে ঈশ্বরের সুযোগ। ভীমেন্দ্রের জীবনটী পড়িলেও তাই মনে হয়। পাঠক-পাঠিকা, এ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ঈশ্বর ভীমেন্দ্রকে কেমন করিয়া কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—প্রথম, সামান্য কারণে রাগ করা অনুচিত ; দ্বিতীয় বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া কোন কাজে হাত দেওয়া অন্যায় ; তৃতীয়,—ভালবাসার লোক যত অধিক হয় মানুষ ততই নিজের সুখ ভুলিয়া তাহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। ভীমেন্দ্র বালক, এখনও তাহার অনেক শিখিবার ছিল—ঈশ্বরানুগ্রহে ভীমেন্দ্র সকলি শিখিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই জানাইতেছি।

ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতে গেল। সেখানে গিয়া এক আশ্চর্য কাণ্ড দেখিল। কামারের বাড়ী অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভীমেন্দ্র কল্পনাও করে নাই।—বাড়ীতে তিনখানা বই ঘর নাই, তাহাও অত্যন্ত বৃহৎ নহে ; কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই যেন একটু পবিত্রতার ভাব মনে হয়। উঠানটী শাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, তাহাতে কামার গৃহিণীর যত্নে ঘাস জন্মিতে পারে না। ছেলেগুলি কখনও ময়লা কাপড় পরে না ; কামারের স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ক্ষার দিয়া সমস্ত কাপড়গুলি নিজ হাতে কাচিয়া থাকেন। হারাণ কামারের বাড়ীতে গেলে হারাণের মিষ্ট ব্যবহার, কামারপত্নীর স্নেহ, ছেলেগুলির সহাস্য মুখ এবং বাটীর চারিপার্শ্বের পরিষ্কার শোভা দেখিয়া, বাস্তবিকই বোধ হয়—

"পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে,
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।"

ভীমেন্দ্র এই কামারের বাড়ীতে গেল।—হারাণ কামার প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আপনার কাজ করিতেন—তাঁহার কার্যে এত অধিক নিপুণতা ছিল যে তাঁহার

হস্ত সর্বদাই কার্যে পরিপূর্ণ থাকিত।—হারাণ কামার যখন বাড়ীতে আসিতেন, তখন ছেলেগুলি পিতার চুম্বন লাভের জন্য ছুটিয়া আসিত, গৃহিণী স্নানের জন্য তেল আনিয়া দিতেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা কেহ গামছা কেহ কাপড় আনিয়া দিত—বাড়ীর আদরে হারাণ প্রাতঃকালের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতেন—ফলতঃ হারাণের দুঃখ ছিল না। দুঃখ ছিল না, একি কথা বলিতেছি? এ পৃথিবীতে এমন লোক দেখি না, যে কখনও দুঃখে পড়ে না। তবে এ কি কথা? ইহার অর্থ আছে। পাঠকপাঠিকা, জান কি, এ জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহারা কখনও দুঃখ পান না? সেই লোকই সুখী যে জানে সুখ দুঃখ দুই-ই ভগবান দিতেছেন। —সেই দুঃখী যে সুখকে ভগবানের দান আর দুঃখকে অপদেবতার দান ভাবে। সেই সুখী যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই দান ভাবিয়া দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক অকাতরে সহ্য করে, সেই দুঃখী যে বিপদের সময় ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারে না।—এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হারাণ কেন সুখী হইবে না। ভীমেন্দ্র এই খানে থাকিয়া চাষাকে ভালবাসিতে শিখিল ; কলিকাতায় থাকিতে "ছোট লোক" দিগের উপর যে ঘৃণা ছিল, হারাণ কামারের বাড়ীতে থাকিয়া ভীমেন্দ্রের সে ভাব রহিল না, ভীমেন্দ্র আস্তে আস্তে অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—ভগবান ভদ্রলোকের প্রতি অধিক সদয় চাষার প্রতি কম সদয় নহেন ;—ভীমেন্দ্র বুঝিল চাষাও ভদ্রলোক হইতে পারে এবং কেবল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি করিয়া, বুকে থোপ করিয়া চাদর বাঁধিয়া, গোলদীঘিতে, নদীর ধারে, এখানে সেখানে বেড়াইলে ভদ্রলোক হয় না।—ভীমেন্দ্র চাষার সহিত চাষার ভাবে ৩/৪ দিন এইখানে থাকিল। বুড়ো কেরামতালি প্রভৃতি সকলেই ভীমেন্দ্রকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন, এবং যতদিন ভীমেন্দ্র রশুলপুরে ছিল কিসে তাহার সুখ হইবে, কিসে বিদেশে থাকার ক্লেশ যাইবে, তাহার চেষ্টা করিতেন। অবশেষ হাটের দিন উপস্থিত হইল। ৩টার সময় হাট বসিল। আজ "বাবু"দের আসিবার কথা ; ভীমেন্দ্র কতক আহ্লাদ কতক দুঃখের সহিত, কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুঃখের কারণ এই এত ভালবাসা যাহারা দেখাইল সেই সকল সরলহৃদয় দরিদ্র চাষাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ভীমেন্দ্র অনেক শিখিয়াছে কিন্তু ভীমেন্দ্র কৃতজ্ঞতা শিখিতে পারে নাই—সুসভ্য লোকেরা যেমন মুখে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সে কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি না। উপকার পাইলে উপকারীর প্রতি যে প্রাণের টান হয়, আমরা এখানে সেই কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি। —কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ভীমেন্দ্র যে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছেনা, ইহাইত তাহার প্রাণের টানের একটা প্রমাণ। তদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। এত কাল সুখে ছিল, এখন আবার কোথায় গিয়া আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া ক্লেশ পায় মনের এই অনির্দিষ্ট ভয়ের জন্য দুঃখ। চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটে গিয়াছিল—'ভদ্রলোক' কাজে কাজেই 'প্রধান' বলিয়া ভীমেন্দ্রের এখন আর কোন অভিমান নাই। সকল চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটের মধ্যে একটা বটগাছ তলায় বসিয়া কিছয় কিছয় ভাবিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। —কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ, মুখে শাদা দাড়ি, তিনি, হাটের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কাল, কিন্তু তাহাতে এমনই একটু সৌন্দর্য আছে যে দেখিতে ইচ্ছা করে—হাতে কতকগুলি পুস্তক, অপর হাতে একটী ছাতা ; বাবুটী হাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন ; ইনি পূর্বে কখনও এখানে আইসেন নাই, আজ নূতন আসিয়াছেন—সুতরাং অল্পকালের মধ্যে তাঁহার চারিদিকে অনেক লোক জমিল। তিনি প্রথম আসিয়াছেন সুতরাং অনেকে গিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞসা করিল, এই দলে ভীমেন্দ্রও ছিল। আমরা তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম প্রচারক

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বসু ; ইনি অনেককাল পর্যন্ত বেতন লইয়া প্রচার করিতেন, সম্প্রতি প্রাচীন বয়সে পেনস্‌ন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করিয়া ও অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াও ইনি বিশ্রাম করিতে চান না ; ইহাঁর ইচ্ছা "ঈশ্বরের শরীর যত দিন ঈশ্বর রাখিবেন, ততদিন এ শরীরের দ্বারা তাঁহারই কার্য করিব।" বাবুটী সম্প্রতি বগুড়া হইতে আসিয়াছেন ; হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা ; রশুলপুরের হাটে অনেক লোকের সমাগম হয় শুনিয়া তাঁহার যে ধর্মে বিশ্বাস সেই ধর্মের কথা লোককে শুনাইতে আসিয়াছেন। হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা, এ কিরূপ কথা? হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম, ইনি খৃষ্টীয়ান ; তবে কিরূপে হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা হইলেন, সে কথা বলা আবশ্যক। বিপ্রদাস বাবু হরিপদ বাবুর পাঠাবস্থায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—প্রায়ই তাঁহাকে আপন বাটীতে ডাকিতেন। এইখানেই হরিপদ বাবুর সহিত বসন্ত বালার পরিচয় ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিপ্রদাস বাবু এই ভালবাসা দেখিয়া তাহাতে বাধা দেন নাই ;—শেষ কালে বড় হইয়া যখন হরিপদ বাবু ও বসন্ত বালার পরস্পরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, বিপ্রদাস বাবুর মন এত উদার যে তিনি তাহাতে মহা সুখে সম্মত হইয়া সেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবু ভীমেন্দ্রকে ওরূপ ব্যগ্রভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "তুমি কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোক, এখানে কোথায় থাক?" ভীমেন্দ্র সমস্ত কথা বলিল;—ধর্ম প্রচারক এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আমি বগুড়ায় ফিরিয়া যাইতেছি—যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারি।" ভীমেন্দ্র স্বীকৃত হইল। অনন্তর বিপ্রদাস বাবু একখানি পুস্তক খুলিয়া খানিকক্ষণ পাঠ করিলেন। চাষারা অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। অবশেষে তিনি ঈশা খৃষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। ঈশা খৃষ্টের নাম সেখানে কোন চাষারই কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং যখন বিপ্রদাস বাবু কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ঈশা খৃষ্টর ধর্মের জন্য লোকের অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছিলেন, তখন অনেকের অনেক দুঃখের কথা মনে পড়িয়া কান্না পাইতে লাগিল—অল্পকাল মধ্যে সেই সরল চাষাদের মধ্যে কান্নার স্রোত দেখা গেল ;—ধন্য বক্তা! ধন্য বক্তৃতা! বক্তৃতা শেষ হইল—অনেকে—বিপ্রদাস বাবুকে আসছে হাটে আসিতে বলিল—বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্যের ফল দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।—ভীমেন্দ্র এইবার কৃতজ্ঞতা শিখিল। যাঁহার নিকট এমন সুন্দর ভাবের কথা শুনিল ভীমেন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিল না—চাষারাও সকলে খুব আশ্চর্য হইয়া শুনিল। বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য শেষ করিয়া যাহারা যাহারা পড়িতে পারে, তাহাদের নিকট পুস্তক বিতরণ করিলেন। অবশেষে ভীমেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি বগুড়াতে যাইতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত যাইতে পার।" ভীমেন্দ্র যাঁহাদিগের বাটীতে এতদিন ছিল তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত বগুড়া যাত্রা করিল।

নবম অধ্যায়

এইবারে জগদীশ্বরের কৃপায়—ভীমেন্দ্র বিপ্রদাস বাবুর সহিত নিরাপদে বগুড়ায় পৌঁছিল। যতক্ষণ ভীমেন্দ্র গাড়ীতে ছিল সমস্ত সময়টা ভীমেন্দ্র কল্পনায় হরিপদ বাবুর ছেলেদের সহিত কথা বলিতেছিল এবং কখন এই কল্পনা কাজে ফলিবে, তাহাই ভাবিতে ছিল।—যথাসময়ে ভীমেন্দ্র হরিপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং যতক্ষণ বিপ্রদাস বাবু জামাতার

সহিত বাহিরবাড়ীতে আলাপ করিতেছিলেন, ভীমেন্দ্র ততক্ষণ 'খোকা' 'খোকা' করিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ছোট্ট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীর সব ছেলেগুলি ভীমের সঙ্গে যুঠিয়াছে—কেহ কাঁধে, কেহ কোলে, কেহ পিঠে—ভীমেন্দ্র ২ মিনিটের মধ্যে যেন ছেলে বিক্রীর দোকান খুলিয়াছে।—ভীমেন্দ্র এইরূপ সুখে কিছুকাল কাটাইয়া বসন্তবালাকে নিজের অবস্থার কথা বলিল। বসন্তবালা বলিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে তাহা জানিতাম না, তার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি যে রশুলপুর পর্যন্ত গিয়াছ, তাহা জানি, কারণ এখানকার মুন্‌সেফ বাবুর ভাইপোর যে গাড়ীতে যাবার কথা ছিল, তিনি গিয়া দেখিলেন—সে গাড়ী নাই—এক গাড়ীতে একটা বাক্স রহিয়াছে। তখন তিনি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ বাক্স কার?' গাড়োয়ান বাবুর নাম করিয়া বলিল, তাঁহার। সে বাক্স আমরা পাইয়াছি।—তা, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে তোমার জন্য যে কত দুঃখ করিয়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তুমি বাবার সঙ্গে আসিয়াছ, তবু সুখের কথা—তা না হলে, আবার হয়ত কোথায় গিয়া পড়িতে"—ভীমেন্দ্র এই শেষের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া কোনও কাজে হাত দিব না।—ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা কথায় সে দিন কাটাইল। আবার ভীমেন্দ্র বালকদিগের মনোরঞ্জন কার্যে নিযুক্ত হইল;—একটী কথা এখনও বলা হয় নাই—হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না।—হরিপদ বাবু দেখিয়া ছিলেন অনেক ভাল ছেলে স্কুলে গিয়া অসৎ ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ-প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যতদিন ছেলেদের পরিপক্ক বুদ্ধি না হয়, যতদিন তাহারা ভালমন্দ বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান অন্যায়, হরিপদ বাবুর এই ধারণা ছিল; সুতরাং হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না। বসন্তবালা দেবী দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; সময় হইলে হরিপদ বাবুও এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন; কিন্তু সাধারণতঃ মাতার দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন হইত।—ভীমেন্দ্র ইতিপূর্বে যতদিন এখানে ছিল ছেলেরা দাদাবাবুর কাছেই পড়িতে চাহিত; সুতরাং ভীমেন্দ্র যতদিন এখানে ছিল বসন্তবালা ছেলেদের পড়াইতে পারেন নাই, সমস্তই দাদাবাবু করিয়াছেন—আবার ভীমেন্দ্রের উপর সেই.ভার পড়িল। আবার ছেলেরা 'দাদাবাবু' নহিলে আর কাহারও কাছে পড়িতে চায় না। ভীমেন্দ্রের উপর ছেলে পড়াইবার ভার পড়িল—তবে বসন্তবালা সাধারণ ভাবে এক একবার ছেলেদের দেখেন। এইরূপে অনেক দিন এইখানে কাটিয়া গেল। ভীমেন্দ্র প্রায় দুমাস কলিকাতা হইতে দূরে রহিয়াছে—অবশেষে হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন—আবার পূর্বের ন্যায় বাক্সে পুরিয়া কাপড় ও খাবার দিলেন, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক পাথেয় দিলেন; কিন্তু যাহাতে গাড়ীতে ভুল না হয়, হরিপদ বাবু তদ্রর্থে বিশেষ চেষ্টা করিলেন—সুতরাং এবারে কোনও গোল হইল না। আবার রাত্রিতে ছেলেদের ভুলাইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীতে উঠিল। ভীমেন্দ্র গাড়ীতে দেখিল—বাক্স আসিয়াছে কিনা—গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, যাহার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই গাড়োয়ান কিনা—তখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল কিন্তু উঠিয়াও পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'চৈতন্য গ্রাম যাইতে হইলে এই পথে যাইতে হয় কিনা'—'আমরা চৈতন্য গ্রামে যাইতেছি কিনা'—এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক খবর লইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীর ঝাঁকুনির মধ্যেও নিদ্রিত হইল।—অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ী চলিল। ভীমেন্দ্র 'ছোট খোকা'-কে স্বপ্ন দেখিতেছিল—দেখিতেছিল যেন 'ছোট খোকা' তাহার কাণ ধরিয়া টানিতেছে, এবং মুখের জল পেটে

গড়াইয়া পড়িতেছে এই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁত-শূন্য মাড়ি খুলিয়া মনের সাধে হাসিতেছে।—ভীমেন্দ্রের এমন সুখের স্বপ্ন কে ভাঙিল? গাড়োয়ান ভয়ানক ব্যস্তভাবে বলিল "বাবু, ও বাবু—শীগ্‌গির ওঠ।"—ভীমেন্দ্র উঠিল কিন্তু উঠিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারিল না।—দেখিল খানিকটা দূরে কতকগুলি আলো জ্বলিতেছে" আর কতকগুলি প্রকাণ্ড মোটা লোক ভয়ানাক চীৎকার করতঃ 'মার' 'মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারও কথা বলিবার সময় হইল না।—পলাইবারও সময় হইল না। ডাকাইতের দল নিকটে আসিয়াই আলো নিবাইয়া দিল।—অন্ধকার রাত্রে যখন কে কোথায় লক্ষ্য রহিল না—তখন দলের মধ্যে ২/৩ জন গাড়ীর উপরে লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল। ভীমেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গাড়োয়ান একটু জোর করিয়াছিল—কিন্তু ডাকাইতের সর্দারের লাঠির ঘা মাথায় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দলের মধ্যে একজন হুকুম দিল—"আলো জেলে দেখ্ কোন জিনিশ আছে কিনা।" আলো জ্বালা হইল।—দেখা গেল গাড়োয়ান রক্তময় শরীরে গাড়ীর পাশে পড়িয়া আছে।—গরুগুলি দড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই আর একটী বালক গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে বাক্স বাহির করা হইল—তখন ভীমেন্দ্র বিপদে 'যাহা হয় হবে' ভাবিয়া জোর করিল। অমনি একজন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল আর একজন মাথায় লাঠি মারিল। ভীমেন্দ্র অচেতন হইল। হা জগদীশ্বর!—ভীমেন্দ্র আর কত কষ্ট সহ্য করিবে? কবে ভীমেন্দ্র বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ভীমেন্দ্রকে বালক দেখিয়া একজন ডাকাতের দয়া হইল!—সে বলিল "আহা বালক একে অত শাস্তি কেন?" মেঘের ডাকের মত গলা চড়াইয়া একজন উত্তর করিল "কি! রঘুরামের কাজের উপর কথা? খবরদার!!"—রঘুরাম শিকদার ডাকাতের দলের সর্দার ; রঘো ডাকাতের নাম সে সময় কাহারও অজানা ছিল না, ইংলণ্ডে রবিনহুডের নামে যেমন ছেলেরা কাঁপিত, আমাদের দেশে রঘো ডাকাতের নামেও সেইরূপ ছেলেরা কাঁপিত। রঘো ডাকাতের এই তাড়না শুনিয়া কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিল না। তখন সকলে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে বাঁধিল ; বাক্স ভাঙ্গিয়া দেখিল খাবার রহিয়াছে—অট্ট হাস্য করিয়া খাবার গুলি খাইল ; এবং টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্রকে কেন কাঁধে করিয়া লইয়া গেল তাহা ঈশ্বরই জানেন।

দশম অধ্যায়

যখন ভীমেন্দ্রের চেতনা হইল, তখন সে দেখিতে পাইল এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে সে রহিয়াছে। সন্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়? এ কোন্ স্থান?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "বলিতে নিষেধ আছে।" ভীমেন্দ্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল, আমাকে এখানে কে আনিয়াছে এবং কেনই বা আনিয়াছে?" দাসী উত্তর করিল "বোধ হয় ডাকাতেরা তোমাকে তাহাদের চাকর করিয়া রাখিবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছে।"—ভীমেন্দ্রের মনে রাগ, ঘৃণা, দুঃখ এক সঙ্গে উদয় হইল। সে বলিয়া উঠিল "কি? আমি যদি চাকরী না করি?" —বুড়ী চেঁচাইতে বারণ করিয়া বলিল "তাহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি পলাইয়া পুলীশে খবর দিতে যাও, তা হলেও রক্ষা নাই। রঘো ডাকাতের নামে দেশশুদ্ধ কেঁপে যায়, তোমার কি সাহস যে পলাইয়া বাঁচিবে।"—ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভয় পাইল—আর তাহার কোন কথা বলিতে সাহস

হইল না। যৎকালে এইরূপ কথা বার্তা চলিতেছিল, সেই সময় ডাকাতের সর্দার রঘুরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দিনের বেলায় ভীমেন্দ্র রঘুরামকে দেখিয়া লইল—তাহার প্রকাণ্ড শরীর লৌহ নির্মিত বলিলেও হয়—হাত পা গুলি গাছের মত—কপাল বিলক্ষণ চওড়া। দস্যু আসিয়াই দাসীর দিকে চোখ লাল করিয়া তাকাইল, এবং বলিল, "যার তার সঙ্গে তোর কি কথা বার্তা হয়?" অনন্তর ভীমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "রঘো ডাকাতের বাড়ীতে বসেই রঘো ডাকাতের বিপক্ষে পরামর্শ কর্‌ছো?" ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। দস্যু আবার বলিল "আজ থাক ; কাল্‌কে তোমাকে যা কর্তে হয় কর্‌বো।"—এই বলিয়া দস্যু সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি পলাইবার কোন উপায় নাই? তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় বলে দাও। আমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ভয় হইতেছে।" দাসী উত্তর করিল "কেন বাছা, আবার ঐ কথা বলিয়া বিপদে পড়িবে? আর আমাকেও বিপদে ফেলিবে? এখান থেকে পালাবার যদি কোনও উপায় থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই বুড়ো বয়সে এদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকি?" ভীমেন্দ্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, ভাবিল যে কোন উপায়ে পারি পলায়ন করিতে হইবে। এই রকমের নানা ভাবনায় ভীমেন্দ্র সে দিন কাটাইল—মাথায় ঘা শুকাইয়া উঠিয়াছে। পর দিন ভীমেন্দ্র আপনার ঘর হইতে বাহিরে একটু বেড়াইতে আসিল—চারিদিকে লোক জন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এক স্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'হাহা' করিয়া হাস্যের শব্দে গৃহটীকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এক স্থানে কতকগুলি লোক অস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে—তন্মধ্যে এক জন ভীমেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিল ; বলিল "আমিও তোমার মত এক সময় ছিলাম কিন্তু রঘো ডাকাতের দলে পড়ে এখন আমি ডাকাত হইয়াছি। তুমিও থাক তোমার শরীরটী বেশ দেখ্‌চি—তুমি কালে খুব একজন ভাল ডাকাত হ'তে পারবে?"—ভীমেন্দ্র ঘৃণায় কোনও কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিল যে স্থানে ভীমেন্দ্র রহিয়াছে, তাহা রঘুরামেরই জমীদারী। সমস্ত লোক তাহার অধীন—সুতরাং রঘো ডাকাতের পুলীশের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।—এমন কি এরূপ গুজব শোনা যায় যে রঘো একবার ৫ জন পাহারাওলার হাতে পড়ে ;—রঘো একা তাহাদিগকে আধমরা করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে মিশাইয়া লয়। রঘুর বিরুদ্ধে কে কি বলিবে? দুই তিন দিন গেল—ভীমেন্দ্র পলাইবার পথ পায় না। রঘুও ভীমেন্দ্রকে কিছু বলে না। অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভীমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় রঘো ডাকাত সেইখানে আসিল। সে আসিয়াই ভীমেন্দ্রকে কহিল "দেখ্, আমরা একটা বড়লোকের বাড়ী লুটপাট কর্‌তে যাব ; তুই আমাদের সঙ্গে থাকিস, তা হলে 'কেমন করে ডাকাতি করতে হয় তা অভ্যাস হবে এখন। প্রস্তুত হ।" ভীমেন্দ্রের ভয় থাকিলে কি হয়, তাহার দ্বারা একটা অন্যায় কাজ করাইয়া লইবে, ইহাতে ভীমেন্দ্র প্রাণান্তেও রাজি হইবে না, স্থির করিয়া বলিল "ডাকাতি করাটা আমি অন্যায় মনে করি—আমি কখনও যাব না।" রঘো ঠাট্টার সুরে বলিল "বাবু অন্যায় মনে করেন বটে—তবে আপনাকে এইখানে শোয়াইয়া রাখিয়া যাই।" এই বলিয়া জোরের সহিত ভীমেন্দ্রের মাথায় লাথি মারিল—ভীমেন্দ্র আপনার দুর্বল শরীর লইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রঘো চোখ্ লাল করিয়া "আরও কিছুকাল লাগিবে," এই কথাগুলি বার বার বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দস্যু সেখান হইতে চলিয়া যাইবা

মাত্র দাসী তথায় ছুটিয়া আসিল এবং চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল—দাসীর দুচোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক্ষণ পরে ভীমেন্দ্রের চৈতন্য হইল। ভীমেন্দ্র বুঝিল কে একজন পাশে বসিয়া আছে—সে মনে করিল রঘো ডাকাত। তখন সে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলিল "এমন লোক দেখি নাই—যে জোর ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে চালাতে পারে। তুমি আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিলেও আমার দ্বারা তোমার সিকিপয়সারও কাজ হইবে না।" দাসী বলিল "আমি ডাকাত নই, আমি তোমার দুঃখে দুঃখী"—চক্ষু খুলিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে পাখার বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র এই দয়া দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিল না। দুজনে মিলিয়া নিজের নিজের দুঃখের কথা বলিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল। এইরূপে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামবাসী কাহাকেও নিজের অবস্থার কথা বলিলে, রঘোর ভয়ে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখ দেখায় না। ভীমেন্দ্র মরুভূমিতে রোপিত লতার ন্যায় দুঃখে শোকে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ডাকাত সর্বদা আসিয়া প্রহার করে। —তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে বলিলে ভীমেন্দ্র কেন তাহাতে রাজি হয় না? পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এইরূপ কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি হয়ত এরূপ অবস্থায় পড়িলে, মার খেয়ে মরা অপেক্ষা ডাকাতের দলেই মিশিয়া যাইতেন। ভীমেন্দ্র অন্যায় কার্য জানিয়া কেমন করিয়া তাহাতে যোগ দিবে? ভীমেন্দ্র যে কাজ করিবে না, কাহার সাধ্য তাহাকে দিয়া সে কাজ সম্পন্ন করায়? একগুঁয়ে ভীমেন্দ্রের স্বভাবই এই ছিল। সুতরাং রোজ ভীমেন্দ্রকে অসহ্য প্রহার, যাতনা সহ্য করিতে হইত। ডাকাত ভাবিল এক রত্তি ছেলে—তিন দিনের শাস্তিতেই সোজা হইয়া উঠিবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডাকাত হুকুম দিয়া গেল "ছোঁড়াটাকে রোজ ১ঘা বেত মারিও"। প্রত্যহই ভীমেন্দ্র বেত খায়, কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্রের সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল—আর ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে পারে না। তখন ভীমেন্দ্র ভাবিল জলে ডুবিয়া মরি। ঈশ্বর জানেন ভীমেন্দ্র আর যদি সহ্য করিতে পারিত কখনও এই অন্যায় কাজের কথা ভাবিত না ; ভীমেন্দ্র অনেক সহ্য করিয়াছিল, বালক আর সহ্য করিতে পারিল না। যদি পলাইয়া বাঁচিতে পারিত, তাহা হইলেও ভীমেন্দ্র আত্মহত্যা করিতে যাইত না ; কি সর্বনাশ! পলাইবার পথও যে বন্ধ! রঘুরামের উপদ্রবে তাহার অধীনস্থ কাহারই পলাইয়া বাঁচিবার যো ছিল না। ভীমেন্দ্র তখন যাঁহার প্রাণ তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় একটি নিকটবর্তী পুষ্করিণীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার চেহারা দেখিলেই যে সে বুঝিতে পারিত, ভীমেন্দ্র জীবনে আশা ছাড়িয়া আসিয়াছে। কিছুদূরে একটী বালক একটা গাছতলায় বসিয়া এইটী লক্ষ্য করিল। দেখিতে দেখিতে ভীমেন্দ্রের চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে না পরিয়া, নিজের দুটী পা গামছা দিয়া বাঁধিল, এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই উচ্চ তীর হইতে জলে পড়িল। ও ভীমেন্দ্র তুমি যে তোমার মায়ের বুক যুড়ানো ধন, তুমি যে অনেকের ভালবাসার পাত্র ; সে সকলকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যাও?—ভীমেন্দ্র,—এ কি করিলে? যাহাদের ভালবাসিতে তাহাদের বলিয়া গেলে না?—যাহারা তোমাকে না দেখিয়া কাঁদিবে, তোমার মন তাহাদের জন্য একটু কাল বিলম্ব করিল না? কি কষ্ট! কি কষ্ট!—হা ঈশ্বর, এই কি ভীমের কপাল?—যে বালক অদূরে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ একটী বালককে এইরূপে জলে পড়িতে দেখিয়া অবিলম্বে তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল—নিজের জামা খুলিয়া রাখিয়া জলে পড়িল এবং অতি কষ্টে অচেতন বালককে

টানিয়া তীরে তুলিল। পরম সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময়ে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর ছিল বলিয়া কেহই সেখানে ছিল না। নূতন আগত বালকের চেষ্টায় ভীমেন্দ্র অল্পকাল পরে চেতন পাইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল কিন্তু যাহা দেখিল সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—দেখিল সেই বালক আর কেহ নহে তাহার মাসতুত ভাই এবং প্রিয়তম বন্ধু বিপিন!—ভীমেন্দ্রের ইচ্ছা হইল যদি তাহার এক শত মুখ থাকিত, তাহা হইলে একেবারে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বিপিনকে জড়াইয়া ধরিত। এখন কিছুই বলিতে না পারিয়া বলিল 'বিপিন'।—বিপিনও দেখিয়া চিনিল ভীমেন্দ্রই বটে, কিন্তু সমুদায় শরীর ক্ষত-বিক্ষত ইহার কারণ জানিয়া বিপিন যে কত কাঁদিল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু ভীমেন্দ্র নিজের অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া বিপিনকে অধিকক্ষণ ডাকাতদের দেশে থাকিতে নিষেধ করিল,—বলিল "আমার যা হয় হবে ; তুমি এখানে থাকলেই মারা পড়বে। আমাকে যাতে উদ্ধার করতে পার, অন্যত্র গিয়া তাহার চেষ্টা দেখ।" বিপিন জামার পকেট হইতে একখানা চিঠির কাগজ, ও একটা টিকিট-লেফাপা ও পেন্সিল দিয়া ভীমেন্দ্রকে গোপনে কলিকাতার ঠিকানায় তাহাকে চিঠি লিখিতে বলিয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়

বিপিন এখানে কেমন করিয়া আসিল, তাহা বলা আবশ্যক। যেদিন রাত্রিতে ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, বিপিন সেই রাত্রিতেই অনেক ক্ষণ পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না, তখন বিমর্ষভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিপিন মাতুলালয় হইতে বিদায় লইয়া ভীমেন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইল। মাতুলের আদেশ ছিল যখন যেখানে যাইবে, সেইখান হইতেই আমাকে জানিয়ে দিবে ভীমেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইলে কি না, অথবা কতদূর সন্ধান হইল। এইজন্য বিপিনের পকেটে কতগুলি ডাক কাগজ, টিকিট-লেফাপা এবং একটা পেন্সিল সর্বদা থাকিত। বিপিন বল্লভগঞ্জ পর্যন্ত অনায়াসেই সন্ধান করিতে করিতে গেল—সেখানে গিয়া শুনিল বিপিন যেরূপ বালকের কথা বলিতেছে সেইরূপ একটী বালক আসিয়া জমিদারের বাড়ীতে বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর সে যে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিপিন খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য একটী ময়রা দোকানে গিয়া বসিল, সেখানে শুনিল ভীমেন্দ্রের মত একটী বালক সম্মুখে রাস্তা দিয়া খাবার খাইতে খাইতে চলিয়া গিয়াছে। বিপিনের আশা হইল ; তখন সে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া শুনিল—একটি ছেলে আর একটী ছেলেকে বলিতেছে মার্‌তে পাল্লি না? না চেয়েই কেড়ে নিলে? কতবড় সে ছেলেটা? যাহাকে বলা হইতেছিল সে উত্তর করিল "মস্ত বড় ছেলে—মাল্লে পার্বো কেন? আর মারতে ইচ্ছে হলো না, দেখে বোধ হল যেন কদিন খায় নাই।" বিপিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন্ ছেলের কথা বল্‌ছ? তাহার কি এই রকম চেহারা?" ছেলেরা বলিল হাঁ। বিপিন বলিল, "ভাল, সে ছেলেটী কোন্ পথে গিয়াছে বলিতে পার?" এক জন বালক পথ দেখাইয়া দিল। বিপিন অনেক্ষণ সেই পথে চলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একটা গাছতলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল, এবং নিকটে গোপাল নগরের ডাকঘরে মাতুলের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে লাগিল। যে রাস্তায় বিপিন যাইতেছিল সেই পথের প্রত্যেককেই বিপিন ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে

করিতে যাইতে লাগিল। এইরূপে কতদূর গিয়া বিপিন শুনিল দুজন প্রাচীন লোক নিজের দুষ্ট ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দুষ্টমতি, পিতামাতার কথার অবাধ্য এই কথা বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের কপালের নিন্দা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "লোকের যদি ছেলে হয় তবে যেন সুজনখালীর মিত্রদের ছেলের মত হয় তাহার বাপ মাকে কি ভক্তি! গরিব দুঃখীকে কি দয়া! সেদিন একটী পরের ছেলেকে রাস্তায় মরার মত পড়ে আছে দেখে কি যত্নটাই কর্‌লে। আজও সে ছেলেটী তাদের বাড়ীতে রয়েছে।" বিপিন বলিল 'মহাশয় সে ছেলেটীর নাম কি জানেন?' প্রাচীন বলিলেন 'ভীমেন্দ্র'। বিপিন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বলিল "মহাশয় সে বাড়ী কোথায় আমাকে বলিতে পারেন? সে বালকটী আমার ভাই, রাগ করিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে।" প্রাচীন সুজনখালী যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। বিপিন কি ভাবে সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী গেল তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন যিনি কোন ভাই অথবা ভগিনী বহুকাল পরে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিতেছে শুনিয়া নদীর কাছে অথবা রেলওয়ের ধারে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে যান! বিপিন মিত্রদের বাড়ীতে গেল। শুনিল ভীমেন্দ্র গত রাত্রিতে কি অদ্য ভোর বেলায় যে কোথায় গিয়াছে তাহার এখনও খোঁজ হইতেছে না। অল্পকালের মধ্যেই সন্ধান হইল গ্রামের একজন লোক গত কল্য বিকাল বেলা ভীমেন্দ্রকে নদীর ধারে দেখিয়াছে। তখন বিপিন দীনদয়াল বাবুর সহিত মিলিত হইয়া নদীর ধারে গেল, এবং ভীমেন্দ্র কোনও নৌকায় চলিয়া গিয়াছে কি না তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। এক মাঝি বলিল "আপনারা যে রকম চেহারার কথা বলিতেছেন, সেই রকম একটী ছোট্ট বাবু কলিকাতায় যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাই নাই ; ঘাটে যত নৌকা বাঁধা ছিল তাহার মধ্যে কেবল বগুড়ার নৌকা খুলিয়া গিয়াছে। আর সকল নৌকাই রহিয়াছে যদি সে নৌকায় গিয়া থাকেন, তাহা বলিতে পারি না।" নৌকায় বগুড়ায় যাইবার সম্ভাবনাও যত হাঁটিয়া অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনাও তত। তখন দীনদয়াল বিপিনকে কি করিতে পরামর্শ দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ উভয়ে স্থির হইয়া নদীতটে বসিয়া রহিলেন—তখন বিপিন বলিল বগুড়ায় যাওয়া অগ্রে উচিত। দীনদয়াল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিলেন। অবশেষে যে নৌকায় ভীমেন্দ্রের যাইবার কথা ছিল, সেই নৌকার মাঝির সহিত বগুড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। মাঝিকে কিছু বায়না দিয়া বিপিন দীনদয়ালের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে গেল। মধ্যাহ্নে দীনদয়ালের বাড়ীতে আহার করিয়া ভীমেন্দ্রের উপকারকর্তা দীনদয়াল ও তাহার ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিপিন নৌকায় উঠিল। দীনদয়াল ও তরু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যেন ভীমেন্দ্রের সন্ধান করা হইলেই, তাঁহাদিগকে পত্র লেখা হয়। নৌকা সুজনখালীর নিকটবর্তী নদীর ঘাট হইতে খুলিয়া গেল।

যথাসময়ে নৌকা বগুড়ায় পৌঁছিল। বিপিন নামিয়া সহর খুঁজিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন সন্ধানই হয় না—তখন সে পুনশ্চ নদীর ঘাটে আসিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল "বগুড়ার যে নৌকা সেই রাত্রিতে খুলিয়া আসিয়াছিল, সে নৌকা কাহার জন্য?" মাঝিরা বলিল, 'এখানকার দারোগা গঙ্গাধর বাবুর।" তখন বিপিন খুঁজিতে খুঁজিতে দারোগা বাবুর বাড়ীতে গেল এবং তাঁহার নৌকাতে কোনও বালক আসিয়াছে কি না, বাড়ীর লোকদের তাহা জিজ্ঞাসা করিল। দারোগা বাবুর বাড়ীর বহির্বাটীতে একজন লোক বসিয়াছিল সে দারোগা বাবুর মাঝিদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিল—সে বলিল 'হ্যাঁ এই রকম একটী ছেলে

এসেছিল বটে কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না।' বিপিন কতক আশ্বস্ত হইয়া আবার খুঁজিতে বাহির হইল। এই বারে সৌভাগ্য-ক্রমে হরিপদ বাবুর সহিত দেখা হইল। হরিপদ বাবু বিপিনকে এদিকে ওদিকে তাকাইতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কেন এসেছ?" বিপিন নিজের অবস্থা এবং তথায় আসিবার কারণ বলিল। তখন হরিপদ বাবু বলিলেন, "ভীমেন্দ্র আমার বাড়ীতেই" ছিল বটে, কিন্তু সে গত রাত্রিতে চৈতন্যগ্রামে গিয়াছে; কোনও ভয় নাই, বোধ হয় কলিকাতায় শীঘ্রই পৌছিবে।" তখন হরিপদ বাবু জানিতেন না ভীমেন্দ্র ভুলিয়া রসুলপুরে গিয়া পড়িয়াছে। বিপিন বিদায় লইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম খুঁজিতে খুঁজিতে চৈতন্যগ্রামে চলিল। পথে ১০/১২ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন বিপিন দেখিতে পাইল একজন গাড়োয়ান শুধু গাড়ী গরুর বদলে নিজে টানিয়া আনিতেছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বিপিন তাহাকে এইরূপ অবস্থায় পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গাড়োয়ান সমস্ত খুলিয়া বলিল। পাঠকপাঠিকা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এ সেই গাড়োয়ান। বিপিন গাড়োয়ানের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল ভীমেন্দ্র হয় ডাকাতের হাতে মরিয়াছে, না হয় ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এত পরিশ্রম করিয়া বিপিন কি এই সংবাদ শুনিতে আসিল? বিপিন অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং তেজের সহিত প্রতিজ্ঞা করিল হয় ভীমের কি হইয়াছে সন্ধান করিব, নতুবা দস্যুদের যাহাতে জব্দ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। বিপিন কিছু না বলিয়া পথ চলিতে লাগিল। কত দূরে গিয়া দেখিল রাস্তায় খানিকটা রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিপিন দেখিয়া বুঝিল, এইখানেই ভীমেন্দ্র দুস্যদিগের হাতে পড়িয়াছে। পাগলের মত বিপিন নিকটবর্তী মাঠ দিয়া ছুটিল, এবং অনেক দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। বিপিন ভাবিতেছিল "যদি ভীমেন্দ্রের দেখা না পাই, তবে আর কলিকাতায় যাইব না। যখন মাসীমা ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন কি বলিব? জগদীশ্বর, এইবার যেন ভীমেন্দ্রের দেখা পাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে বিপিন আবার চলিতে লাগিল, আবার একটা গ্রামের মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় যাইতে যাইতে বিপিন বিশ্রামের জন্য একটা গাছতলায় বসিল। খানিকক্ষণ বসিয়া বিপিন দেখিল একটী বালক আসিতেছে; সে আসিয়া কাঁদিল, গামছায় পা বাঁধিল, এবং জলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িল। বিপিন অবিলম্বে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরের ঘটনা পাঠকপাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিপিনকে দেখিয়া ভীমের মনে আশার উদয় হইল। বিপিনকে বিদায় দিয়া ভীমেন্দ্র গৃহে গেল। তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ভীমেন্দ্র মন খুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। প্রাণের কাতরতার সহিত ঈশ্বর যা' করেন বলিয়া ভীমেন্দ্র যেন নূতন লোক হইয়া গেল। ভীমেন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঈশ্বর তাহা নিশ্চয় করিবেন। তখন ভীমেন্দ্র দুঃখের ভাব ছাড়িয়া, প্রফুল্ল হইল। দাসী এটা বুঝিতে পারিল। তখন ভীমেন্দ্র তাহার নিকট যাহা হইয়াছে সমস্ত ঘটনা বলিল। বুড়ী কাঁদিয়া, হাসিয়া ভীমেন্দ্রের মাথায় হাত দিল এবং আশীর্ব্বাদ করিল "বাবা! যেখানে থাক সুখে থেক আর বুড়ীকে মনে রেখ।" রঘুরাম সেই হইতে দেখিল ভীমেন্দ্র ১০ ঘা বেত খাইয়াও দুঃখ প্রকাশ করে না। রঘুরাম ভারি চতুর লোক— বুঝিতে পারিল ভীমেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, এবং পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে তাহার

আশা হইয়াছে। রঘো ডাকাত তখন অল্পকালের মধ্যেই তাহার দলের লোকদের ডাকিল, এবং ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে কি কর্তব্য তাহা জানিতে চাহিল। অনেকেই পরামর্শ দিল 'মারিয়া ফেল'। রঘো সে পরামর্শ শুনিল না। বলিল "আমার যে ধন চুরী গিয়াছে তাঁহার মত যাহাকে পাই, তাহাই মঙ্গল; উহাকে শাস্তি দিতে পার, প্রহারে আধমারা করিতে পার, কিন্তু মারিও না, মারিলে আর হবে না।" রঘু ডাকাত এরূপ দয়ার কথা কেন বলিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়? তবে শোন। রঘু একজন ভয়ানক অত্যাচারী জমীদারের প্রজা ছিল। জমীদারের অত্যাচারে তাহার ও তাহার প্রতিবেশীদিগের আর কষ্টের শেষ ছিল না। একদিন জমীদার একটা সামান্য ছল করিয়া এক দল লোক লইয়া রঘুরামের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার ৬/৭ বর্ষ বয়সের ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া, স্ত্রীকে প্রহারে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। সেই রাত্রিতেই রঘুরাম তাহার প্রতিবেশীদের সহিত বনে আসিয়া ডাকাতির দল করে। এ আজ ৮/৯ বৎসর পূর্বের কথা। যে দিন ভীমেন্দ্রের গাড়োয়ানকে ও ভীমেন্দ্রকে প্রহার করিয়া রঘোর দল তাহাদের জিনিশাদি কাড়িয়া লইয়াছিল রঘুরাম সেদিন রাত্রিতে দেখিয়াছিল ভীমেন্দ্রের মুখ তাহার হারাণ ছেলের মত; পাছে মমতা হয়, এই জন্য প্রদীপ নিভাইয়া দিতে বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। আলো জ্বালা হইলে যখন ভীমেন্দ্র জোর করিয়াছিল, তখন সে ভীমেন্দ্রের মাথায় লাঠি মারিয়াছিল—সেও পাছে কেউ কাপুরুষ মনে করে, এই ভয়ে এবং যখন একজন ডাকাত বালকের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন রঘো মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেও নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য রাগের ভান করিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে একদিন বই রঘু নিজে প্রহার করে নাই, এবং কখনও একাকী পায় নাই বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কিন্তু রঘোর নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইয়াছিল ভীমেন্দ্র তাহার পুত্র,—সুতরাং তাহাকে যে প্রহার করিয়াছিল, অথবা করিতে অনুমতি দিয়াছিল—সেও এই জন্য যে ভীমেন্দ্রের উচিত রঘুরামের সহিত মিশিয়া অত্যাচারী জমিদারদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করা। যাহা হউক এখন মূল ঘটনার কথা বলা যাউক। এখন বোধ হয় সকলে বুঝিয়াছেন—'আমার যে ধন চুরী গিয়াছে' ইত্যাদি যে সকল কথা রঘু বলিয়াছিল, তাহার অর্থ কি! রঘু—ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে অন্য একরূপ বন্দোবস্ত করিল। স্থির হইল যে যতদিন ভীমেন্দ্রের পলায়নের ইচ্ছা না যায়, ততদিন তাহাকে অন্য স্থানে নিয়া রাখিতে হইবে। এই স্থির হইলে তাহারা কয়েকজন সেই রাত্রিতেই দাসীটীকে ও ভীমেন্দ্রকে চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিল। কতক গরুর গাড়ীতে, কতক নৌকায়, কতক হাঁটিয়া পুনশ্চ গরুর গাড়ীতে পুনশ্চ নৌকায়, এইরূপে অনেক পথ চলিয়া ভীমেন্দ্র এক বাড়ীতে পৌঁছিল। তখন ভীমেন্দ্র ও দাসী উভয়ের চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল। রঘুরাম ভীমেন্দ্রকে স্বাধীনতা দিল, কিন্তু দুজন লোক সর্বদা সঙ্গে থাকিত এবং মনোযোগ করিয়া দেখিত ভীমেন্দ্র কখনও পুলিশের থানায় না যাইতে পারে। আমরা এই গল্প পড়িতে পড়িতে এখন আশ্চর্য হই, ভাবি ভীমেন্দ্র কেন ছুটিয়া গিয়া পুলিশে খবর দিল না; কিন্তু তখন পুলিশে খবর দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না। তখন পুলিশের অধিকাংশ ছোট কর্তারা ডাকাতদিগের নিকট হইতে ঘুস লইয়া তাহাদের সহায়তা করিতেন। একি এখনকার দিন? ভীমেন্দ্র কি করিবে? তবুও রঘুরাম সতর্ক হইয়া ভীমেন্দ্রকে পুলিশ থানার কাছে যাইতে দেয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া ঘরে বসিয়া বিপিনকে পত্র লিখিল, তাহাতে বাড়ীটী কিরূপ যায়গায়, কি রকম, ভীমেন্দ্র তাহা খুলিয়া লিখিল, এবং অনেক দিন সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন

গোপনে ডাকঘরে ফেলিয়া দিল। ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গেল। তাহার সঙ্গীরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। যথা সময়ে বিপিনের হাতে চিঠি পড়িল—বিপিন দেখিল চিঠিতে খিদিরপুরের ছাপ। তখন বিপিন ভীমেন্দ্রের একজন কাকার নিকটে গেল। তিনি আলিপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। তাঁহাকে পত্র দেখাইয়া বিপিন তাঁহাকে ইহার উপায় করিতে বলিল। বলা বাহুল্য তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাড়ী বাহির করিলেন, এবং একদল পুলিশের দ্বারা বাড়ী ঘেরাও করিয়া রঘুকে গ্রেপ্তার করাইলেন। আলিপুরে তাহার বিচার হইল। ভীমেন্দ্র ও বৃদ্ধার সাক্ষ্যে রঘু যে একজন ভয়ানক ডাকাত তাহা প্রমাণ হইল—ইতিপূর্বে তাহার নামে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, রঘু পাহাড়ের মতন স্থিরভাবে বিচারপতির নিকটা দাঁড়াইয়া সে সকল স্বীকার করিল ; কিন্তু অশিক্ষিত মূর্খ চাষা রঘু যখন বিচার হইবার পূর্বে কেন সে ডাকাতি কার্যে যায়, তাহার কথা বলিতে লাগিল—যখন অত্যাচারী জমীদারের ভয়ানক অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিল—তখন অনেকেরই খুব আশ্চর্য বোধ হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বিচারপতি বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তরের আজ্ঞা দিলেন। রঘু একবার ভীমেন্দ্রের দিকে তাকাইল—কঠিন হস্তে চক্ষুর জল মুছিল, এবং পাহারাওয়ালাদের সহিত জেলঘরে গেল।

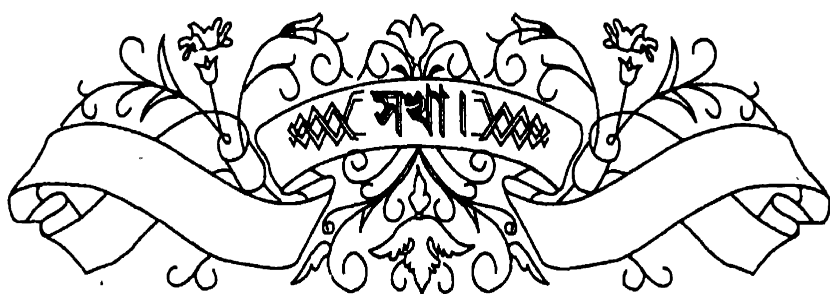
ভীমেন্দ্র তাহার কাকাকে দেখিয়া যখন বাড়ীতে যাইতে চাহিল, তখন বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল 'বাবা, আমার কি হবে? আমাকে এখন কে দেখ্‌বে? ভীমেন্দ্র কাকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।"

ভীমেন্দ্র আর বিলম্ব করিতে পারিল না। বিপিনের সহিত আলিপুর হইতে বাড়িতে আসিল। তাহার বিধবা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া গিয়াছিলেন—একমাত্র ছেলেকে বহুকাল পরে আসিতে দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অচিরাৎ তাঁহার মূর্ছাভঙ্গ হইল। তখন জননীর আহ্লাদের কথা কে বুঝিবে?' যে সকল বালক অথবা বালিকা অকারণে বা সামান্য কারণে মাতার উপর রাগান্বিত হইয়া কটূক্তি করিতে ছাড়ে না ; যে সকল বালক অথবা বালিকা মাতার দুঃখ, ক্লেশ বুঝিতে না পারিয়া, মাতা কখনও একটু কর্কশ কথা বলিলে সমস্ত দিন মুখ ফুলাইয়া কাল কাটায় এবং আহার না করিয়া বিছানা পত্র উল্টা পাল্টা করিয়া রাগ প্রকাশ করে, তাহারা এই স্নেহের কথা কি বুঝিবে?

ভীমেন্দ্র ঘরে ফিরিল। বুড়ী মৃত্যু পর্যন্ত ভীমেন্দ্রের বাড়ীতে স্থান পাইল। ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা বিপদে আপদে পড়িয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা লাভ করিল পাঠকপাঠিকা তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। বাল্যকালে ভুগিয়া ঠেকিয়া যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহার মনে গাঁথা আছে। কিন্তু এইরূপে শিক্ষালাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেই যথার্থ বিজ্ঞ, যে বিপদে পড়িবার পূর্বে আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত শিক্ষা করিয়া রাখে।'

শেষ হইল—ভরসা করি এইখান হইতে পাঠক পাঠিকাদিগের শিক্ষার আরম্ভ হইবে।

১ : ১ : জানুআরি ১৮৮৩, পৃ ২-৪। ১ : ২ : ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩, পৃ ২১-২২, ২২-২৪। ১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৩৯-৪০। ১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৬০-৬১। ১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৬৬-৬৯। ১ : ৬ : জুন ১৮৮, পৃ. ৮১-৮৫। ১ . ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ৯৭-১০০। ১ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৩, পৃ. ১১৩-১১৫। ১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১২৯-১৩২। ১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৪৫-১৪৭, ১৪৭-১৪৯।


সখা
গল্প/নিবন্ধ/জীবনী

মহাত্মা হেয়ার সাহেব

প্রমদাচরণ সেন



লিকাতা পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অনেক বালক বেড়াইতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই গোলদীঘির দক্ষিণপার্শ্বে অদ্যকার চিত্রের ন্যায় খানিকটা স্থান নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা কি, এবং কিসের জন্য গোলদীঘির মধ্যে আসিল, ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে সকল বালক একটু বড় তাঁহারা জানেন উটী হেয়ার সাহেবের গোর। কিন্তু তাঁহারাও বোধ হয় জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টা করেন নাই যে গোরের উপরের গোলাকার থামের গায়ে কি লেখা আছে। আমরা প্রথমতঃ তাহাই জানাইতেছি ;—

"এই গোর-স্থানের মধ্যে ডেবিড হেয়ারের শরীর রহিয়াছে ; এই স্থানটী তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র এবং বন্ধুদিগের দ্বারা নির্মিত। হেয়ার সাহেবের জন্মভূমি স্কট্‌লণ্ডে ; তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই সহরে আগমন করেন, এবং ঘড়ি নির্মাণ ব্যবসায়ে পরিশ্রম ও সৎচরিত্রের গুণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে পরলোকগত হন। অল্পকালের জন্য এই দেশে আসিয়া তিনি এই দেশকেই নিজের দেশ করিয়া লন, এবং যতদিন জীবিত ছিলেন সমস্ত সময় আহ্লাদের সহিত অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও যত্নসহকারে বাঙ্গালীদিগের শিক্ষা এবং চরিত্র বিষয়ক উন্নতি, এই একমাত্র প্রধান এবং প্রিয় উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করেন ; এই কার্যে শারীরিক ক্লেশ, অর্থ, বা বাচনিক উপদেশ, তিনি কিছুই বাকী রাখেন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তি দিয়াছে এবং আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে পিতৃতুল্য প্রিয়তম এবং স্বার্থশূন্য বন্ধু বলিয়া খেদ করিতেছে।"

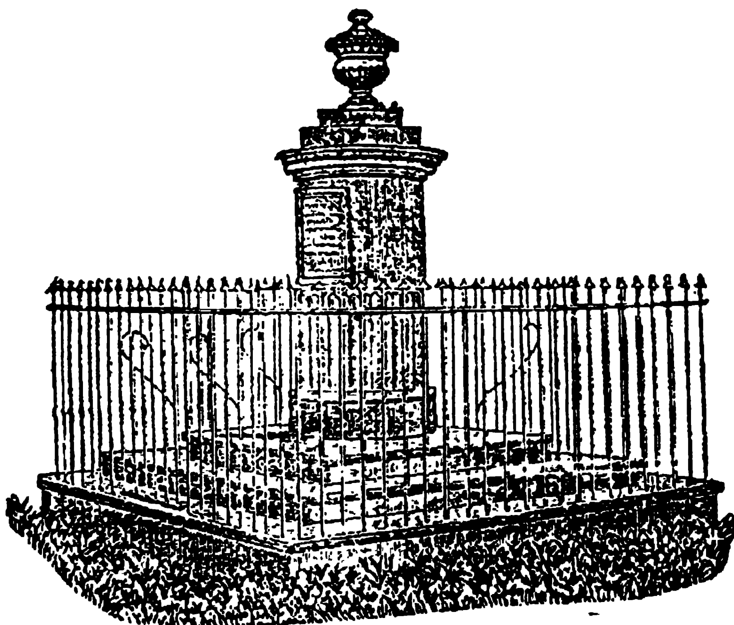
যাঁহারা সদা সর্বদা গোলদীঘিতে বেড়াইয়া বেড়ান তাঁহারা হয়ত এ কথাগুলি দেখিয়াও দেখেন না। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, কিসের জন্য তিনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-তুল্য, এ সকল কথা জানিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এই জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের কথা কিছু কিছু লিখিব। তবে সর্বপ্রথমে এই বলিয়া রাখি যে আমরা এখন যে ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছি, এই ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হেয়ার সাহেবই সর্বপ্রথমে করেন।

যখন হেয়ার সাহেব এদেশে প্রথম আইসেন তখন আমাদের দেশের লোকের বড় দুরবস্থা ছিল। হেয়ার সাহেব দেখিলেন এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে এই দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তখন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু দেশের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরাজী স্কুল করিতে পরামর্শ দেন। ইংরাজী শিক্ষা দিলে দেশের উপকার হইবে, এ কথা মহাত্মা রামমোহন স্বীকার করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে হেয়ার সাহেবকে ভালরূপ সাহায্য করেন নাই। তখন হেয়ার সাহেব নিরাশ না হইয়া সেই সময়কার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার্ হাইড্ ঈষ্ট্ সাহেবের

নিকট মনের কথা খুলিয়া বলেন। স্যার্ হাইড্ এই প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান লোকের মত জানিলেন ; যখন শুনিতে পাইলেন ইংরাজী শিক্ষা করিতে অনেকেরই মত আছে, তখন হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইল (১৮১৬ খৃষ্টাব্দ)। সে আজ প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্বকার কথা। হেয়ার সাহেব যদিও নিজে শিক্ষক ছিলেন না তথাপি তিনি এত অধিক সময় স্কুলের বালকদিগের সহিত থাকিতেন, যে বালকেরা শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক চিনিত।

হিন্দুকালেজের স্থাপনার পর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে দুটী সভা হয়, একটীর নাম স্কুল সোসাইটী, অপরটীর নাম স্কুল-বুক সোসাইটী। যে সকল বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া, যে সকল দেশীয় পাঠশালা সাহায্য-অভাবে ভালরূপ চলে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অথচ দরিদ্র কতকগুলি বালকের কালেজের বেতন দ্বারা সহায়তা করা, প্রধানতঃ এই সকল কার্যের জন্য স্কুলসোসাইটীর জন্ম হয়। এই সভার উদ্যোগে অনেকগুলি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত



হয়, তন্মধ্যে চাঁপাতলা স্কুল এবং ঠনঠনিয়া স্কুল বিখ্যাত। এই দুটী স্কুল নানা কারণে কিছু কাল পরে একত্র মিশিয়া 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' এই নাম ধারণ করে, এবং আজকাল 'হেয়ার স্কুল' এই নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটীর উদ্যোগে অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়িবার পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সভাটী আজিও আছে।

হেয়ার সাহেব নাম কিনিবার ইচ্ছা করিতেন না। তিনি সর্বদা বালকদিগের সন্ধান লইতেন, স্কুলে দেখা না পাইলে তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, এবং কখন তাহাদিগের সহিত খেলা করিয়া, কখন মিষ্ট তিরস্কার করিয়া তাহারা যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।

ঘড়িনির্ম্মাণ-ব্যবসায়ে হেয়ার সাহেব যে টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে গেলে, তিনি মহাসুখে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু এ দেশের বালকদিগের প্রতি তাঁহার কেমনই একটু মায়া জন্মিয়া গেল যে আর তাহাদিগের উপকারের চেষ্টা না করিয়া যাইতে পারিলেন না। হেয়ার সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল সত্য ঘটনার কথা শুনা যায়, তাহা বলিলে হয়ত অনেকে মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহার এক তিলও মিথ্যা বা অতিরিক্ত বলা নহে। আমাদের এখানে আর অধিক স্থান নাই। সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা বলিয়া অন্যবারে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প বলিব।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে এত ভালবাসিতেন যে তাহাদের পীড়া হইলে অনেক সময় তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। বাড়ীর মেয়েরা হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না। বরং ছেলের পীড়া হইলে যদি সাহেব দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবনা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। বিছানার নিকটে হেয়ার সাহেব বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন, অন্যদিকে বাড়ীর মেয়েরা বসিয়া আছেন,—এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়াছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ৬৭ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে দয়ার সাগর বাঙ্গালীর "পিতৃতুল্য বন্ধু" হেয়ার সাহেবের প্রাণ যায়। তাঁহার পীড়ার সম্বাদ সকলে পাইতে না পাইতে তাঁহার মৃত্যু হইল। সে দিন ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু হেয়ার সাহেবের নিকট যাহারা উপকার পাইয়াছে, তাহারা বৃষ্টি মানিবে কেন। জলে ভিজিয়া দলে দলে বাঙ্গালী হেয়ার সাহেবের মৃত শরীরের চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের পরম প্রিয় বন্ধুকে জন্মের শোধ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেবদিগের গোরস্থানে হেয়ার সাহেবকে গোর দেওয়া হয় নাই; যে স্থানে মহাত্মা হেয়ার বাঙ্গালীদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই স্থানের নিকটে, এবং যে বাঙ্গালীদিগের উন্নতির জন্য হেয়ারের প্রাণ গেল, তাহাদেরই মধ্যে হেয়ার সাহেবের শরীর মৃত্তিকার নীচে পোতা হইল।

উপকারীর প্রতি কে না কৃতজ্ঞ হয়? যাঁহার নিকট আমাদেব জাতি বিশেষ উপকার পাইয়াছে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল গাঁথা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

১ : ১ : জানুয়াবি ১৮৮৩. পৃ. ১০-১২।

২


ত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াও হেয়ার সাহেব এদেশের উপকার করিয়া গেলেন, আর আমরা নিজের দেশে থাকিয়াও দেশের কোন উপকার করিতে পারি না কেন? ইহার কারণ এই যে হেয়ার সাহেবের চরিত্রে এমন সকল গুণ ছিল যাহা আমাদিগের নাই। মহাত্মা হেয়ার সকলকেই ভালবাসিতেন. এবং তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ ছিল। এই ভালবাসা ও এই দয়াতেই বাঙ্গালী তাঁহার বশ ছিল। আমরা হেয়ার সাহেবের যে সকল গল্প পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার গুটীকযেক বলিলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।

১। হেয়ার সাহেব পীড়িত বালকদিগের বাটীতে যাইতেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পাল্কীতে আবশ্যক মত প্রায় সমস্ত ঔষধ থাকিত। কেবল পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে ; যাহাতে পীড়া না হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। হেয়ার সাহেব জানিতেন বালকদিগের অনেক পীড়াই অপরিষ্কার শরীরে থাকার জন্য হইয়া থাকে ; এই জন্য তিনি প্রতিদিন তাঁহার স্কুল ছুটি হইবার পর এক খানা গামছা হাতে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং বালকেরা বাড়ী যাইবার সময় এক এক করিয়া প্রত্যেকের গায়ের ধূলি মুছাইয়া দিতেন, এবং ঘসিয়া দেখিতেন গায়ে ময়লা আছে কি না। রাত্রি জাগিয়া যাত্রা ইত্যাদি শুনিলে শরীর, মন, দুয়েরই অপকার হইতে পারে, এই জন্য মহাত্মা হেয়ার কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে চুপি চুপি সেখানে গিয়া পরিচিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতেন। এই ভালবাসাতেই ছেলেরা তাঁহার বশীভূত ছিল ; এবং হেয়ার সাহেবের দিকেই এই ভালবাসার টান ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর ছেলেরা তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। যে বাড়ীতে হেয়ার সাহেব থাকিতেন, তাহা যেন বাঙ্গালীর বাড়ীর মত হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে ছোট বড় বাঙ্গালীর ছেলে, হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে ছুটোছুটি করিয়া ফিরিত— তাহাদের উৎপাত সহ্য করিতে সাহেবের কিছু মাত্র কষ্ট হইত না।

২। হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়া ছিল। যদি শুনিতে পাইলেন কোন দরিদ্র বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে অমনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অথবা তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার কিরূপ অবস্থা সেই বিষয়ে সম্বাদ লইতেন। যদি প্রকাশ পাইল যে বালকের অবস্থা ভাল নহে, তাহা হইলে হেয়ার সাহেবের দয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই বালকের বিদ্যালয়ের বেতন এবং পুস্তক প্রভৃতি যোগাইতে থাকিলেন। একবার আমাদের কার্যালয়ের নিকটবর্তী কোন স্থানে একটী বিধবা তাঁহার ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। বিধবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করেন, কিন্তু টাকা নাই বলিয়া তিনি সর্বদা দুঃখ করিতেন। অবশেষে এক দিন তিনি তাঁহার ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া ঠনঠনিয়ার স্কুলে উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব বিধবার অবস্থা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু যে শ্রেণীতে বালকটী পড়িতে পারে তাহাতে আর স্থান নাই বলিয়া বিধবার পুত্রকে ভর্তি করিয়া লইতে পারিলেন না। বিধবাটী তাঁহার ছেলেকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেলেন। হেয়ার সাহেব এই ক্রন্দন দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইলেন, এবং এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে বিধবার বিষয়ে ভালরূপ জানিবার জন্য সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা স্ত্রী-লোকটী শুনিতে পাইলেন হেয়ার সাহেব আসিয়াছেন ; তখন তিনি ছেলেটীকে লইয়া সাহেবের নিকট আসিলেন। সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কোন কথা বলিবার সাধ্য হইল না। দয়ার সাগর হেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে কেবল বালককে স্কুলে 'ভর্তি' করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; তাহার ও তাহার মাতার খরচের জন্যও নিজের টাকা হইতে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৩। বালকদিগের চরিত্রের দিকে মহাত্মা হেয়ারের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। পরস্পরের প্রতি কুৎসিত কথা ব্যবহার করিলে হেয়ার সাহেব বড়ই বিরক্ত হইতেন। যে সকল বালক কুৎসিত কথা ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে শিক্ষকদিগকে বলিতেন, এবং সকল বালককে

এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। একবার একটী বড় লোকের ছেলে অপর একটী বালকের সহিত 'চটাচটি' করিয়া তাহার নামে অতি কুৎসিত একটি পদ্য লিখে; এবং সেইটী ছাপাইয়া প্রায় রাত্রি একটার সময় একবয়স্ক কয়েকজন বালকের সাহায্যে পটলডাঙ্গার স্কুলে (যাহা এখন 'হেয়ার স্কুল' এই নাম পাইয়াছে, তথায়) দেয়ালে মারিয়া দিতে আইসে। হেয়ার সাহেব কোন উপায়ে 'এই বড় লোকের ছেলে'র অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিরপরাধী বালকের পাছে নিন্দা হয়, এই জন্য সেই ভয়ানক রাত্রিতে তিনি স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখন সেই ছেলেগুলি আসিবে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। বৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার চক্ষু নাই। একটী অসচ্চরিত্র বালককে খারাপ কাজ করিতে না দেওয়া এবং একটী সৎ বালকের নামে মিথ্যা দুর্ণাম হইতে না দেওয়া, এই দুই প্রয়োজনে হেয়ার সাহেব রাত্রিতে স্কুলে আসিলেন, এবং চুপি চুপি এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে যখন সেই দুষ্ট 'বড় লোকের ছেলে' তাহার কুৎসিত পদ্যের কাগজ খানা দেওয়ালে মারিয়া দিতে যাইতেছিল, তখন হেয়ার সাহেব জলে ভিজিয়া ভূতের মত সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির—দৌড়িয়া কে কোন্ দিকে পলাইবে তার স্থিরতা রহিল না!

হেয়ার সাহেবের দয়া ছোট, বড়, আপনার, পর, চিনিত না! যে দয়ার উপযুক্ত সেই দয়া পাইয়াছে, যে উৎসাহের উপযুক্ত, সেই উৎসাহ পাইয়াছে হেয়ারের কাছে গিয়া কেহ মুখ শুষ্ক করিয়া ঘরে ফিরে নাই।

৪। আহারের বিষয়ে হেয়ার সাহেব প্রায় হিন্দু ঋষিদিগের মত ছিলেন। মদ মাংস ভাল বাসিতেন না; গোদুগ্ধ নারিকেল দুগ্ধ এবং ফল মূল, ইহাই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল। অথচ তাঁহার গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল। যাঁহারা বলেন সর্বদা মাংস না খাইলে শরীরে বল হয় না, তাঁহারা ইহাতে বোধ হয় কিছু আশ্চর্য বোধ করিবেন। তাঁহার বলের দুটি দৃষ্টান্ত দিব। একবার একটী সাহেবের সহিত 'জিদ' করিয়া হেয়ার সাহেব বারাকপুর (কলিকাতা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে) হাটিয়া যান, এবং বিশ্রাম না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্লেশ হয় নাই। অন্য কেহ হয়ত এইরূপে ক্রমাগত ১৪ ক্রোশ পথ চলিলে দুদিন পায়ের বেদনায় পড়িয়া থাকিত, কিন্তু হেয়ার সাহেবের সবল শরীরে ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। আর একবার একজন মাতাল জাহাজীগোরা পটলডাঙ্গা স্কুলে আসিয়া ভয়ানক উপদ্রব করে; একজন ধনীর ছেলের গাড়ী রাস্তায় ছিল, লাঠি দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং সইস্, কোচায়ানকে মারিতে যায়। স্কুলের দ্বারবান অসুবিধা দেখিয়া ঘরে লুকাইল। মাতাল গোরা গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া একদিকে চলিয়া যায়, এমন সময় হেয়ার সাহেবের পাল্কী দেখা দিল। দ্বারবানের নিকট ব্যাপার কি জানিতে পারিয়া, হেয়ার সাহেব সেই মাতালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন, এবং ১০ মিনিটের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পুলিশে দিলেন।

হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে আমরা অনেক গল্প শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি, কিন্তু আর অধিক বলিবার স্থান আমাদের নাই। একটী কথা বলিয়া আমরা শেষ করিব। হেয়ার সাহেব আমাদিগের জন্য এত চেষ্টা করিয়া গেলেন আমরা তাহার কি শোধ দিলাম? যদি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয় তবে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিলেই কি হইবে? অথবা

তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিয়া স্কুল কালেজের সম্মুখে রাখিলেই চলিবে? যদি বাস্তবিক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাই, তাহা হইলে তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র হইতে বলিয়া গিয়াছেন আইস সেইরূপ হই।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১৯-২১।

রামায়ণের উপদেশ

প্রমদাচরণ সেন



মাদের পাঠক ও পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় কেহই সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন নাই ; অনেকে হয়ত কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণও পড়েন নাই, অথচ অনেকেরই রামায়ণের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমাকে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি বালকের নিকট রাম্যয়ণের গল্প বলিতে হইত, তাহাতেই দেখিয়াছি ছোট ছেলেরা রামায়ণের গল্প বড় ভালবাসেন। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াছি রামায়ণ পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় তাহা লিখিব। রামায়ণের গল্প পড়িতে যেমন সুন্দর, রামায়ণের উপদেশও সেইরূপ সুন্দর। কিন্তু অনেক স্থানে গল্প এত বাড়াইয়া লেখা যে কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কষ্টকর। সূর্য পৃথিবী হইতে কতগুণে বড়, তাহা তোমরা সকলেই জান, অথচ হনুমান এই সূর্যকে বগলে পূরিল। ইহাও কি সম্ভব হয়? এইরূপ আরও অনেক অসম্ভব গল্প আছে। যাহা হউক, সে সকল কথা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। রামায়ণে কি উপদেশ পাওয়া যায়, আমরা সেইটী দেখিব। রামায়ণের কথা শেষ হইলে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের কথাও বলিব ; কিন্তু এখন তোমাদের আশা দিয়া কাজ নাই। এই উপদেশগুলি মনে রাখিলে রামায়ণ পড়িতে আরাম বোধ হইবে, আর এখন পড়িতে গেলে অনেক স্থলে মিথ্যা বাজে গল্প দেখিবে। তোমরা বোধ হয় জান, রামায়ণ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম বাল্মীকি মুনি। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়া আরম্ভ করিতেছি। রামায়ণের উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। যে ডাকাত ছিল সে কিরূপে মুনি হইল, তাহা জানিয়া যদি উপদেশ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে স্থানান্তরে 'রত্নাকরের মুক্তি লাভ' এই প্রস্তাবটী মনোযোগের সহিত পড়িও।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৩৩।

(ক) রত্নাকরের মুক্তিলাভ



তি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের এক বনে রত্নাকর নামে এক ডাকাত বাস করিত। রত্নাকর ব্রাহ্মণের ছেলে অথচ বাপ মায়ের অযত্নে অথবা নিজের দোষে কিছু মাত্র লেখা পড়া শেখে নাই। 'দশকর্মান্বিত' বামণের ছেলেরা যেরূপ মন্ত্রতন্ত্র পড়াইয়া দু-দশ টাকা ঘরে আনে, মূর্খ রত্নাকরের বোধ হয় ততটুকু বিদ্যাও হয় নাই। এদিকে বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি, তাহাদের না খাইতে দিলে চলে না ; এইরূপ অবস্থায় রত্নাকরকে বাধ্য হইয়া এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজে যাইতে হইয়াছিল। রত্নাকর যে বনে 'আড্ডা' করিয়াছিল

তাহার মধ্য দিয়া একটি রাস্তা গিয়াছে ; এখান দিয়া প্রত্যহই অনেক লোক যাতায়াত করে। রত্নাকর কাহাকেও ছাড়ে না ; ছোট, বড়, ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে যাহাকে পায়, রত্নাকর মারিয়া কাপড় ও পয়সা লয়। এইরূপে অনেক দিন রত্নাকর সেই বনে থাকিয়া দিনপাত করিতেছিল, এমন সময় একদিন ব্রহ্মা ও নারদ ঋষি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন, দেখিয়া রত্নাকরের কঠিন মনে একটুকুও দয়ার উদয় হইল না। সে লোহার মত হাতে লোহার মুগুর তুলিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে গেল। ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু! তুমি কে? কেন আমাদের মারবে?" রত্নাকর উত্তর করিল "আমি এই বনে থাকি, নাম রত্নাকর ; এই পথ দিয়া যে লোক জন যায় তাদের মেরে পয়সা রোজগার করে দিন চালাই—তোমরা আমার হাতে পড়েছ, তোমাদের রক্ষা থাক্‌বে না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু, রত্নাকর! তুমি যে রোজ রোজ এই পাপ কর এই সব কার জন্য কর? তোমার এ পাপের ভাগী কি কেউ হবে? তোমার কে আছে? তাদের জিজ্ঞাসা করে এসতো।" রত্নাকর মনে ভাবিল "বুড়ো ব্রাহ্মণ দুটো কি চালাক! এই বলে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু রত্নাকর শর্মার কাছে ওসব ফিকির খাট্‌বে না।" পরে বলিল "ওগো, তোমাদের ওসব চালাকি রেখে দাও। রত্নাকর শর্মা তোমাদের মত ঢের লোক দেখেছে। আমি এখন বাড়ীতে খবর জানতে যাব ; আর তোমরা এদিকে মার্ টেনে দৌড়—হুট্! ওসব কি আর আমি বুঝিনে?"

ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু! আমরা বুড়ো মানুষ, কবে মরে যাই, এখন অধর্ম কর্‌বো? তা বাপু, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও!" তখন রত্নাকরের মনে একটু ভয় হইল ভাবিল "তবে কি সত্যই আমার পাপের ভাগী কেউ নাই? না, এমন হবে না! যাদের জন্য পাপ করি তারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগী হবে। আজ না জানি কি হয়।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুজনকে গাছে বাঁধিয়া এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রত্নাকর ঘরে গেল।

রত্নাকর ঘরে গিয়াই আপনার বৃদ্ধ পিতার নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল. "পিতা, আমি যে আপনাদিগের জন্য ও আমার নিজের জন্য এই পাপ করিতেছি, ইহার জন্য কি আমি একা দায়ী হইব না আপনিও দায়ী আছেন?" পিতা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন 'বাঃ! আমি কেন দায়ী হব? তুমি যত দিন বালক ছিলে, গায়ের রক্ত জল ক'রে তোমাকে মানুষ করিয়াছি; এখন তুমি মানুষ হয়ে আমাদিগকে প্রাচীন বয়সে পালন করবে, এই ত নিয়ম। তা, এখন কি উপায়ে টাকা উপার্জন কর, তা আমি কি জানি?" রত্নাকর কোন কথা না বলিয়া মায়ের নিকট গেল। মাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও পিতার ন্যায় উত্তর করিলেন। তখন রত্নাকর নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল; স্ত্রী রত্নাকরের আসিবার কথা জানিয়া বলিলেন "তুমি যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন আমাকে পালন করিতে তুমি বাধ্য; কি উপায়ে তুমি টাকা আন তাহা আমি শুনিতে চাই না। যদি অসৎ পথ বোধ হয়, ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে যাও ; আমাকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য তোমাকে অসৎ কাজ করিতে আমি কখনও বলি নাই; তবে কেন আমি তোমার পাপের ভাগী হইব?" স্ত্রীর এই কথায় রত্নাকরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি এত বৎসর ধরিয়া রত্নাকর যে সমস্ত পাপ করিয়াছে তাহার কেহ ভাগী হইবে না? রত্নাকর ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এতদিন আশা ছিল যে যাহাদের জন্য পাপ করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই পাপের কিছু কিছু অংশ লইবে কিন্তু

এখন যখন সে আশা রহিল না, যখন পিতা মাতা স্ত্রী সকলেই এক বাক্যে সমস্ত পাপের বোঝা রত্নাকরের ঘাড়ে ফেলিয়া দিলেন, রত্নাকর বুঝিল পাপের বোঝা কি ভয়ানক। আর সে গৃহে থাকিতে পারিল না ; ভবিষ্যতে পাপের ইচ্ছা ত গেলই, কিন্তু যাহা হইয়াছে, কিসে তাহা হইতে উদ্ধার হইবে, এই ভাবনায় রত্নাকরের শরীরের রক্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল। অস্থির হইয়া রত্নাকর গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং 'কি হইবে' এই ভাবিতে ভাবিতে যেখানে বৃক্ষডালে ব্রহ্মা ও নারদ বাঁধা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। রত্নাকর অবিলম্বে তাঁহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার সদ্‌গতির কি হইবে তাহার পরামর্শ চাহিল। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন "বাপু! তখনই বলিয়াছিলাম, তা বিশ্বাস কর নাই। এখন দেখিলেত? যা হউক তুমি এক কর্ম কর। পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া অতি সহজ কাজ। যিনি পাপীর রক্ষাকর্তা ভগবান, পাপ যাঁহাকে দেখিলে পলায়ন করে, সেই দয়াময়ের চরণ সার করিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত সরল প্রাণে ডাক, কোনও পাপ থাকিবেনা।" রত্নাকরের আশা হইল, কিন্তু যে জিহ্বা জীবনে কখনও ধর্মের কথা বলে নাই, কোনও মিষ্ট কথা উচ্চারণ করে নাই, সেই পাপময় জিহ্বায় ঈশ্বরের নাম আসিল না। তখন ব্রহ্মা ও নারদ অনেক ভাবিয়া, অনেক উপায়ে রত্নাকরকে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁহার দয়ার কথা বলিলেন ; এবং কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রত্নাকর ব্রহ্মার নিকট যে অমুল্য উপদেশ লাভ করিলেন তাহাতেই তিনি মহামুনি হইয়া গেলেন। এই উপদেশ রত্নাকর জীবনে কখন বিস্মৃত হন নাই। ব্রহ্মার কথা অনুসারে রত্নাকর ঘোর তপস্যা অর্থাৎ একমনে ঈশ্বরের নাম করিতে আরম্ভ করিলেন ; তিনি ঈশ্বরের নামে এত মজিয়া গেলেন যে আহার নিদ্রার দিকে মন রহিল না, বাহিরের জ্ঞান বন্ধ হইয়া গেল ; তাহার শরীর পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরেতে ডুবিয়া রহিল। রামায়ণে উল্লেখ দেখা যায় যে রত্নাকর তপস্যা করিতে করিতে উইপোকা তাঁহার শরীরের চারিদিকে মাটীর ঢিবি নির্মাণ করিয়া, তাহার মাংস চর্ম খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রহ্মা রত্নাকরের কুশল জানিতে আসিয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড উইঢিবির মধ্য হইতে ভগবানের নামের শব্দ হইতেছে। তিনি উইঢিবি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্নাকরকে বাহির করিলেন, এবং বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি হইতে বাহির করিলেন বলিয়া রত্নাকরকে বাল্মীকি নাম দিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে রামায়ণ রচনা করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। পাঠকপাঠিকা! রামায়ণে বাল্মীকির সম্বন্ধে অনেক অতিরিক্ত লেখা হইয়া থাকিলেও বাল্মীকির জীবন হইতে কি এই শিক্ষা পাইতেছি না যে যে ব্যক্তি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও একপ্রাণে ভগবানের চরণকে সার বলিয়া ধরে তাহার পাপ থাকে না? মাঘ মাসের কুয়াসা গাঢ় হইলেও সূর্যের কিরণে কতক্ষণ থাকিতে পারে? তেমনি পাপের অন্ধকার পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ জগদীশ্বরের সম্মুখে থাকিতে পারে না। তাই বলিতেছি যদি পাপ করিয়া ভবিষ্যতের দুঃখ হইতে বাঁচিতে এবং পাপের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাল্মীকির ন্যায় দয়াময়ের চরণ সরল মনে ধারণ কর। দেখিবে, তোমার মনে বল হইবে, আশা হইবে, এবং তুমি সমস্ত বিপদাপদের হস্ত ছাড়িয়া ধর্মের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৩৬-৩৯।

(খ) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গবাস ও পতন


রিশচন্দ্রের পূর্বে অযোধ্যাতে অনেক রাজা ছিলেন—কিন্তু কেহই আমাদের ভক্তি পান নাই, আর রাজা হরিশচন্দ্রকেই বা এত ভক্তি করি কেন? ভক্তি করিবার কারণ আছে; হরিশ্চন্দ্রের জীবন উপদেশে পূর্ণ। আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? বড়লোক হইলে প্রায়ই ধার্মিক হয় না—যাহার টাকা আছে সে প্রায়ই অহঙ্কারে মাতিয়া পরম ধন যে ধর্ম তার দিকে মন দিতে চায় না। এই যখন পৃথিবীর দশা, তখন যদি দেখি একজন বড়লোক রাশি রাশি টাকার অধিকারী হইয়াও অহঙ্কারী নন্, যদি দেখি একজন রাজা হাজার হাজার লোকের প্রধান হয়ে, কখনও তাদের কটু কথা বলেন না, বা অপকার করেন না, যদি দেখি পৃথিবীতে যত সুখ থাকিতে পারে সে সকল সুখে সুখী হয়েও একজন অতি প্রধান পুরুষ ধর্মের জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর আমাদের আশ্চর্যের সীমা থাকে না। এই জন্যই আমরা ভক্তির সহিত, আশ্চর্যের সহিত হরিশ্চন্দ্রের গল্প পড়িয়া থাকি বা শুনিয়া থাকি। যে সময় হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন, তখন অযোধ্যাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব প্রধান নগরী ছিল, তখন অযোধ্যার রাজার নামে চারিদিকের রাজারা ভয়ে কাঁপিতেন। হরিশ্চন্দ্র এত বড় রাজা হইয়াও কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; সৎপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন করাই হরিশ্চন্দ্র পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যার রোহিতাশ্ব নামে সবে একটী পুত্র ছিল। হরিশ্চন্দ্র এই রোহিতাশ্বকে অধিক ভাল বাসিতেন, কি আপন প্রজার উপকার করাকে অধিক ভাল বাসিতেন, তাহা স্থির করা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া অর্থাৎ পশুশিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজকার্য করিয়া অবসর পাইলেই অথবা মন্ত্রীকে রাজকার্যের ভার দিয়া হরিশ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে আপন রাজ্যের নানা স্থানে বনে বনে বন্যপশু মারিয়া ফিরিতেন।

এই মৃগয়া করিবার জন্য একদিন হরিশ্চন্দ্র এক প্রকাণ্ড বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্তু ওজন্তু শিকার করিয়া অবশেষে হরিশ্চন্দ্র একটা বরাহ অর্থাৎ বুনো শূকর বধ করিবার জন্য এত মত্ত হইলেন, যে তাঁহার সঙ্গীরা কেহই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিল না। তিনি একটা বন হইতে আর একটা বনে, অল্পবন হইতে বেশী বনে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি বরাহ বধ হয় না—হঠাৎ তাঁহার কাণে কি একটা শব্দ আসিল। যে দিক হইতে শব্দটী আসিতেছিল, সেই দিকে কাণ পাতিয়া হরিশ্চন্দ্র শুনিতে পাইলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, এবং 'কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রক্ষা কর!' এই বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছে। পরম ধার্মিক হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় এই কাতর বাক্যে বড়ই ব্যথিত হইল—তিনি বরাহ বধ ছাড়িয়া দিয়া যে দিক হইতে রোদনের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন, এবং 'ভয় নাই, ভয় নাই', এই কথা বলিতে বলিতে শীঘ্রই সেই গভীরবন ছাড়িয়া একটা নিকটবর্তী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যেখানে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাকে বাড়ী বলা যায় না; চারিদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ মিলিয়া একটী ঘরের মত হইয়াছে—তাহার ভিতরে একটী বেদী অর্থাৎ বসিবার আসন। দুএকখানি কুঁড়ে ঘর যা আছে, তাও ঘর নয় বলিলেও হয়। কিন্তু এই স্থানের স্বাভাবিক শোভা অতি সুন্দর। এই রূপ স্থানটী মুনি বিশ্বামিত্রের আশ্রম বা তপোবন; এইখানে বসিয়া মুনি, দেব-পূজা বা তপস্যা করেন—এখানে আসিলেই চারিদিকের

সৌন্দর্য দেখিয়া মন পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। এইখানে যে বিশ্বামিত্রের তপোবন, তাহা হরিশ্চন্দ্র জানিতেন না, সুতরাং যখন তিনি আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক বাঁধা রহিয়াছে এবং প্রাণ যাইবার ভয়ে তাহারা কাঁদিতেছে—তখন তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র সংবাদ পাইলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া যে মেয়েদের তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখনি তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—মনে মনে ভাবিলেন "কি? আমার তপোবনে আমার অনুমতি না নিয়ে



এসে আবার আমারই উপর অত্যাচার? এর শোধ যদি না দিই তবে আমার নাম বিশ্বামিত্রই নয়!" এই ভাবিয়া বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বজ্রের ন্যায় কর্কশ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে দুরাত্মা, তুমি রাজা হয়ে বড় অহঙ্কৃত হয়েছ? তোমার কি সাহস—আমার তপোবনে গিয়ে সেই মেয়েদের খুলে দিয়ে এসেছ?" বিশ্বামিত্রের রাগ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের ভয় হইল ; তিনি বলিলেন "ঠাকুর, আমিতো জানি না আপনি বেঁধেছেন?

আমি শুনিলাম কতকগুলি স্ত্রীলোক 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতেছে ; আমি ক্ষত্রিয়, দান করা, রক্ষা করা, এসকল আমার স্বধর্ম, তাই নিজ ধর্মানুসারে মেয়েদের ছাড়িয়া দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের এই মহৎ কথাগুলি শুনিয়া কিছু হটিয়া গেলেন— কিন্তু তিনি জব্দ করিতে আসিয়াছিলেন, এই কথাতেই চুপ করিয়া গেলেতো জব্দ করা হয় না! তাই বলিলেন "তুমি দান করে থাক, না? আচ্ছা আমাকে দাও দেখি কি দেবে?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "প্রভু আপনাকে ধন-জন-পূর্ণ আমার সমস্ত রাজ্য দিলাম।" বিশ্বামিত্র ইহাতেও না পারিয়া দক্ষিণার ছল করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বিপদে ফেলিলেন। তোমরা বোধ হয় সকলেই জান ব্রাহ্মণেরা পূর্বকালে কাহারও বাড়ীতে আহার করিতেন না, অথবা কাহারও দান লইতেন না ; যদি কাহাকেও এই বিষয়ে অনুগ্রহ করিতেন তাহা হইলে এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিছু টাকা দিতে হইত ; এই টাকার নাম দক্ষিণা। এখনও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা কাহারও বাটীতে আহার করিলে এইরূপ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তোমার দান আমি লইলাম ; যেমন দান তেমনি দক্ষিণা চাই, এই দানের মতন দক্ষিণা সাত কোটী মোহর আমাকে দিতে হইবে।" হরিশ্চন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ; এত টাকা কোথায় পাইবেন?—নিজের ধনাগারে টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতো দান করিয়াছেন ; কাহার ধন কাহাকে দিবেন? হরিশ্চন্দ্রকে ভাবনায় পতিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র মনে মনে ঘৃণার সহিত হাসিলেন, এবং ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠিলেন "বড় নিজের ধর্মের জাঁক করা হচ্ছিল! হারে পামর! এখন দক্ষিণা দেবার বেলা মুখ শুকিয়ে গেল কেন?" হরিশ্চন্দ্র স্থির ভাবে বলিলেন "ঠাকুর, আপনি অনুগ্রহ করে এক মাস অপেক্ষা করুন ; আমি উপার্জন করে আপনার দেনা পরিশোধ করিতেছি।" বিশ্বামিত্র আরও রাগিয়া বলিলেন "তুমি রোজগার করেই আন আর চুরি করেই আন—এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে ; আর আমার এ রাজ্য থেকে তুমি চলে গিয়ে যা খুসি তাই করগে। কাশী আমার পৃথিবী রাজ্যের মধ্যে নয়, তুমি সেইখানে যাও।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ; হরিশ্চন্দ্রও দুঃখিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের দুঃখের কারণ এ নহে যে তিনি কেন না বুঝিয়া পৃথিবী দান করিলেন ; কিন্তু উহাঁর দুঃখের কারণ অনেকগুলি ;—প্রথম তিনি না জানিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া. কোন একজন মুনির ক্ষতি করিলেন? দ্বিতীয়,—মুনি যদি রাগান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের কোন অপকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই দোষে তাঁহার প্রজারা কষ্ট পাইবে ; তৃতীয়,—দক্ষিণার টাকা উপার্জনে যে ক্লেশ হইবে, তাহাতে তিনি কাতর নন, কিন্তু সেই কষ্টের সময় মহারাণী শৈব্যা ও বালক রোহিতাশ্ব কোথায় দাঁড়াইবে? কার মুখ চেয়ে বাঁচিবে? তিনি তাঁর সত্যের জন্য দায়ী—প্রাণ দিয়ে নিজের সত্য পালন করিবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য অন্য লোকে কষ্ট সহ্য করিবে, একি বিষম বিপদ এইরূপ ভাবনাতেই হরিশ্চন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি মলিনমুখে অন্তঃপুরে—যেখানে রাজরাণী ও রাজকুমার ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈব্যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের পথ চাহিয়া ছিলেন ; তিনি আসিলে তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না. হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শৈব্যা ভয় বা কষ্ট কিছুই বোধ করিলেন না। বরং স্বামী যাহাতে নিজের কথা রাখিয়া ধর্মে বজায় থাকিতে

পারেন, তাহার জন্য স্বামীর সহিত কাশীতে যাইতে চাহিলেন। বালক রোহিতাশ্বও পিতার সাহায্য করিবে বলিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের দুটী একটী প্রধান কর্মচারী ভিন্ন, আর কেহই এ সম্বাদ জানিল না। জানিলে তাহারা তাহাদের পিতৃতুল্য রাজার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিত। রাত্রির অন্ধকারে প্রজাদিগকে ফাঁকি দিয়া প্রজার পিতা হরিশ্চন্দ্র ধর্মপালনের জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র চলিয়া গেলে অযোধ্যার দশা কি হইল তাহা বলিতে চাই না ; হরিশ্চন্দ্র রাণীকে এবং রোহিতাশ্বকে লইয়া কোথায় গেলেন, আইস তাহাই দেখি। যথাসময়ে হরিশ্চন্দ্র কাশীতে পৌঁছিলেন।—অনেক দিন, কি করিবেন এই ভাবনাতেই গেল।—অবশেষে বিশ্বামিত্রের টাকা দিবার দিন আসিল।—শৈব্যা আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন "আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার অর্থ পরিশোধ করুন, আর ভাবিয়া কি হইবে?—যখন শৈব্যা এই কথা বলিতেছিলেন, তখন দুঃখে তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল—তিনি যে দাসী হইবেন, তাহাতে কষ্ট কি? কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে হরিশ্চন্দ্রের ক্লেশ হইবে—বালক রোহিতাশ্ব কাহার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।—শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ—আর বিলম্বে কাজ নাই। যাহাতে নিজের কথা থাকে তাহা করুন।" হরিশ্চন্দ্র ব্যথিত মনে 'কেউ দাসী কিনিবে? কাহারও দাসীর প্রয়োজন আছে?' এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে দাসী বিক্রী ক'চ্ছে, বাপু? আমার একটী দাসী চাই। 'এই—এই দাসীটী—তা বেশ! বাপু, কত হলে দাসীটী পাওয়া যায়?" হায়! হায়! ধর্মের জন্য কি কষ্ট স্বীকার। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৩ কোটী মোহর চাই"। ব্রাহ্মণ তাহাতেই রাজি হইলেন, কিন্তু যখন রোহিতাশ্ব—'মাকে কোথায় নিয়ে যাও' বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, তখন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। শৈব্যা বলিলেন "ঠাকুর, আপনাকে পয়সা দিতে হইবে না—এ ছেলেটীকেও আপনি ক্রয় করুন ; আপনার পূজার আয়োজন করা, ফুলটুল তুলে দেওয়া, এসব পারবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না বাপু, আর আমি বেশী লোক নিয়ে খেতে দিতে পারবো না ;—আবার ছেলে মানুষ, কত দুষ্ট, তা কে জানে।" ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর?—ঐ দেখ শৈব্যা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন—একটী ছোট ছেলেকে মা ছাড়া করে রাখিতে চাহিতেছ? কি নিষ্ঠুর?—শৈব্যা বলিলেন "আমার পুত্র আপনার চাকর হইয়া থাকিবেক ; উহাকে আহার দিবার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না—আমাকে যাহা দিবেন, তাহা হইতেই উহার আহার চলিবেক।"

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৫০-৫৩।

(গ) হরিশ্চন্দ্রের গল্প

ধন্য মায়ের স্নেহ! এমন মাকে কত নিষ্ঠুর বালক অত্যাচার করিতে, কষ্ট দিতে ছাড়ে না। ওরে নির্বোধ বালক ! মা কি ধন আজ তাহা চিনিতেছ না ; কিন্তু যে দিন মা মরিয়া যাইবেন—যে দিন 'আহা' বলিবার আর দুটী লোক থাকিবে না,—যখন 'মা' এই মিষ্ট কথা আর মুখে বলিতে পাইবে না—তখন বুঝিতে পারিবে, কি ধন ছিল, কি ধন গেল ! আমরা মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি—এখন ভাবনার বোঝা মাথায় পড়িয়াছে ;—

যখন কষ্টে অস্থির হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই—(হতভাগা আমাদের মা নাই)—সেই ভাবনায় প্রাণের সহিত দুটো মিষ্ট কথা বলে এমন লোক নাই যখন দেখি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে ইচ্ছা হয়,—"মা আমার! এতকাল তোমাকে কষ্ট দিয়াছি—সেই দুঃখে কি মা আমাকে ছাড়িয়া গেলে? ফিরিয়া আইস ;—তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তার দশগুণ কষ্ট দিয়া যদি সুখী হও, মাথা পাতিয়া দিলাম—তবুও ফিরিয়া আইস। আমি যে এখন বড় হইয়াছি,—ভাবনা, পাহাড়ের মত চারধারে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে ;—এ সময়ে আপনার ভাবিয়া প্রাণের টানে দুটো স্নেহের কথা কে বলে?"—শৈব্যার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাহাড়ের ন্যায় মনও গলিয়া গেল ; তিনি অগত্যা শৈব্যা ও রোহিতাশ্ব উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র কিছুই বলিলেন না ;—ভয়ানক দুঃখে কান্না পায় না—কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার প্রাণের তলা পর্যন্ত পুড়িয়া গেল। শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট বিদায় লইলেন ; একদিন যাঁহার শত শত দাসী ছিল, সেই শৈব্যা আজ পরের ঘরে দাসীর কাজ করিতে গেলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র দিন গণিতেছিলেন, কখন রাজাকে তাড়া দিবার দিন আসিবে—কাজেই সময় মত কাশীতে দেখা দিলেন। গিয়া দেখেন অর্ধেক টাকা যোগাড় হইয়াছে ;—তখন বিশ্বামিত্রের আর রাগ দেখে কে? বলিলেন "এই যতটুকু বেলা আছে, এর মধ্যেই যোগাড় করে রাখ, নইলে বড় ভদ্রস্থতা নাই ; আমি এখন স্নান করে আসি।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কাশীর বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিনিতে চাহে না। অবশেষে এক চণ্ডাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপরিষ্কার কালীর মত কাপড়ে চর্বির গন্ধ, গলায় হাড়ের মালা, চোখ বসিয়া গিয়াছে, চুলে এত ধুলো দেখিলেই বোধ হয় যেন সমস্ত রাস্তাটা পা দিয়া না হাটিয়া মাথায় হাটিয়া আসিয়াছে, লম্বা লম্বা চুল কপাল ঢাকিয়া, চোখ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া পেচকের মত মিটির মিটির করিয়া তাকাইতে তাকাইতে, মূলোদাঁতে হাসিতে হাসিতে চণ্ডাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে চাকর বেস্তিচে? মুই তোকে কিনমু। বালো অইচে; এড্ডা চাকর পালিতো মুই বেঁচে যাই। তোর দাম কতরে?" চণ্ডালের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই হরিশ্চন্দ্রের বিরক্তি হইল, কিন্তু তিনি স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে বাপু"? চণ্ডাল আবার মূলোদাঁতে হাসিল, কপালের চুল সরাইয়া হরিশ্চন্দ্রের পা অবধি মস্তক পর্যন্ত বিশেষ করিয়া দেখিল, এবং বলিল "মুই বড্ডিলোক, হকোল মশানের কর্‌তা—মোরে না পুছ ক'রে কোনো মড়া কেউ পোড়াতি পারে না—তোর দাম কত?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "দামের কথা শেষে হবে ; তোমার কি কাজ কর্‌তে হবে, আগে তাই বল।" শ্মশানের কর্তা বলিলেন—"মোর ঝা কাম হকোলি তোকে কর্‌তি অবে। শোর চরাবি, মড়ার কাপড় যড়ো কর্‌বি, ঝে মড়া পোড়াতি আসবে, তার কাছে হোলো কাহন কড়ি লবি। লে, লে হব মোকে দিবি। এখন বল্ তোর দাম কত।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৪ কোটী মোহর।" চণ্ডাল বলিল "তুই ঝা চাস তাই তোকে দিচ্ছি ; এখন আয় মোর সাথে আয়।" এই কথা বলিয়া চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ৪ কোটী মোহর দিল ;—বিশ্বামিত্র ৭ কোটী সোণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, তাহা আমাদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পর হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কি হইল, তাহাই দেখা যাউক। চণ্ডালের চাকর হইয়া হরিশ্চন্দ্র তাহার সমস্ত কার্য করিতে লাগিলেন, শ্মশানে মৃত দেহের কাপড় ইত্যাদি তুলিয়া রাখেন, যাহারা পোড়াইতে আসে তাহাদিগের নিকট পয়সা লন, এবং অন্যান্য সময়ে শূকর চরান। বিধাতা কেন যে অনেক সময় মহাধার্মিকদিগকে মহাক্লেশে ফেলেন আর মহাপাপীরা পরের সর্বনাশ করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাতন করিয়াও পায়ের উপর পা রাখিয়া মহাসুখে জীবন কাটায় এ সকল প্রথম প্রথম বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ধার্মিকদিগের এইরূপ পরীক্ষা তাঁহাদের উপকারের কারণ। স্বর্ণ অগ্নিতে পোড়াইলে যেমন অধিক উজ্জ্বল হয়, প্রদীপের আলো যেমন গভীর অন্ধকারেই অধিক শোভা পায়, ধার্মিকের চরিত্রও সেই-রূপ বিপদাপদের মধ্যেই পরীক্ষিত হইয়া সুন্দর শোভা ধরে। সমস্ত বিপদাপদের মূলে এইরূপে দেখিলে দেখা যায় যে সেখানেও ঈশ্বরের দয়া! এই জন্যই ধার্মিক পুরুষগণ ভয়ানক বিপদে পড়িলেও হাত দুটী যুড়িয়া বলিয়া থাকেন, 'ঘোর বিপদেও ব'লব তোমায় দয়াময়!'

শ্মশানে ও অন্যান্য অপরিষ্কৃত স্থানে চণ্ডালের কার্য করিয়া হরিশ্চন্দ্রের আর পূর্বের ন্যায় শ্রী রহিল না ; কিছুকাল পরে তাঁহাকে আর চেনা যায় না ; সামান্য চণ্ডালের ন্যায় অযোধ্যার পূর্বের রাজা এইরূপে ধর্মের জন্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাণী শৈব্যা রাজকুমার রোহিতাশ্বকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর কার্য করিতে লাগিলেন, রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের দেবপূজার ফুল, বিল্বপত্র সকল খুঁজিয়া আনে এবং শৈব্যা ঘরের অন্যান্য কার্য করেন। এইরূপে অনেক দিন যায় ; এক দিন রোহিতাশ্ব ফুল সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদে পড়িল। যে গাছ হইতে রোহিতাশ্ব ফুল আনিতে গিয়াছিল, সেই গাছে সাপ ছিল ; রোহিতাশ্ব ফুলের জন্য গাছ নাড়িবা মাত্র সর্প তাহাকে দংশন করিল। বালকের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, সে বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া দৌড়িয়া গৃহে আসিল, এবং 'মা! আমার কি হ'ল' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শৈব্যা পাগলিনীর ন্যায় তাহাকে 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলিয়া কোলে করিলেন, কিন্তু প্রাণ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। আহা! মায়ের প্রাণ কি তাহা বুঝে! শৈব্যা ব্রাহ্মণ প্রভুর অনুগ্রহে চিকিৎসক পাইলেন, কিন্তু মৃত্যু যাহাকে ধরিয়াছে, চিকিৎসক তাহার কি করিবে? আহা! রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইয়াও যে একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচেছিল, আজ সেই বুক-চেরা ধন তাকে ফাঁকি দিয়া গেল। কি কষ্ট! যত প্রতিবেশীর মেয়েরা আসিয়াছিল, সকলেই শৈব্যার মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বাধ্য ছিল, সকলেই সেই 'সোণার চাঁদ' ছেলের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিক দয়া হইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাছা! তোমার ছেলেকে শ্মশানে ফেলে এসো! আমার বাড়ীতে রাত্রিতে মড়া থাকিতে পারিবে না।" শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন। মৃতপুত্র কোলে করিয়া শৈব্যা শ্মশানের দিকে চলিলেন। তোমরা দেখ, কে কোথায় আছ, একবার চেয়ে দেখ! রাজ রাজেশ্বরী আজ মৃতপুত্র কোলে ক'রে শ্মশানের দিকে যাইতেছেন। আহাহা! বিধাতার নিয়ম বুঝা ভার। কেন আজ শৈব্যা এত ক্লেশে পড়িলেন! আমি কেন তাঁহার ক্লেশের ভাগী হইতে পারিলাম না! যদি আমার দ্বারা তাঁহার কষ্টের কিছু শান্তি হইত, তাহা হইলে আমি যে মহা আহ্লাদে তাহা করিতাম। যাহারা চিরকাল সুখে কাটাইয়াছে, তাহাদের হঠাৎ এই অবস্থা-পরিবর্তনের ক্লেশ যে সহ্য হয় না! শৈব্যা শ্মশানে গেলেন, যে শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র কার্য করিতেন,

এ সেই শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি ; তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন ; কাঁদিতে কাঁদিতে শৈব্যা সেই শ্মশানে গেলেন। হরিশ্চন্দ্র অন্য অন্য দিনের ন্যায় আজও শ্মশানে কার্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে ফিরিলেন ; তাঁহার কোমল মন উথলিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যখন অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প দেখিতে পাইলেন, যে একটী স্ত্রীলোক মৃত বালককে কোলে করিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। 'আমার রোহিতাশ্ব নয়তো!' হায়রে দুঃখ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দেখ কি! তোমারই রোহিতাশ্ব ওই গেল! তুমি চিনিতে পারিলে না! হরিশ্চন্দ্রের মনে দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখেতে পাছে আপন প্রভুর নিয়মানুসারে কড়ি ও কাপড় লইতে ভুলিয়া যান, এই জন্য দুঃখ দূর করিলেন। যেখানে শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন, হরিশ্চন্দ্র সেইখানে আসিলেন ; এবং অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন 'ওগো আমার কড়ি দাও'। বিদ্যুতের আলোতে সেই হস্ত দুখানি দেখিতে পাইয়া শৈব্যা চিনিতে পারিলেন এবং 'মহারাজ! সর্বনাশ হইয়াছে' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন হরিশ্চন্দ্রের যে ক্লেশ তাহা কে বর্ণনা করিবে। কাটা ছাগলের মত হরিশ্চন্দ্র ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, এবং শৈব্যাকে বাতাস দিয়া যাহাতে তাঁহার জ্ঞান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শৈব্যা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু আবার সেই শোকের আগুন জ্বলিল। আর কত কষ্ট তাঁহারা সহ্য করিবেন? যখন কষ্টের চূড়ান্ত হইল, তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে দেখা দিলেন ; দৈব ঔষধের গুণে রোহিতাশ্বের প্রাণ বাঁচিল। রোহিতাশ্ব অবাক্ হইয়া পিতামাতাকে শ্মশানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, রোহিতাশ্ব সকলে মিলিয়া নগরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার বিশ্বামিত্র আসিতেছেন দেখিয়া শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন "ভয় নাই। যাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায়, পৃথিবীতে তাহাদের ভয় কি? আজ তোমাদের সুদিন। সত্যধর্মে স্থির থাকিয়া তোমরা পৃথিবী ও স্বর্গ দুইই জয় করিয়াছ। আর ক্লেশে প্রয়োজন নাই। তোমাদের রাজ্য তোমরা লও, তোমাদিগকে দান করিলাম।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি চলিয়া গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্বার রাজা হইলেন। রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের মত চরিত্র আর একটীও নাই। কিসে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের এত খ্যাতি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে বিধাতা আমাদিগকে পরম সুখে অথবা ভয়ানক দুঃখে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, যদি সেই সকল অবস্থাতেই তাঁহারই চরণে মন রাখিয়া ধর্মপথে থাকিতে পারি, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিব, এবং সেই সুখী হইবার একমাত্র উপায়।

রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে আরও একটু উল্লেখ দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রের ধর্মের গুণে হরিশ্চন্দ্র আপনার সমস্ত প্রজার সহিত স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গীয় কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপুহে! তুমি স্বর্গে আসিলে কোন্ গুণে?" তখন হরিশ্চন্দ্র নিজে যে যে কার্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। অমনি হরিশ্চন্দ্রের পতন হইল। ইহার তাৎপর্য এই যে যতই সৎকার্য কর না কেন, একমাত্র অহঙ্কারই সকলকে নষ্ট করে। অতএব উপদেশ এই, যে কার্য করিবে, তাহাতে তোমার নিজের বল না দেখিয়া ঈশ্বরের দয়া দেখিবে। 'আমিই

এই কার্য করিলাম' ইহা না ভাবিয়া, মনে করিও 'ঈশ্বরের দয়াতে এই কার্যটী হইল' কারণ তাঁহার দয়া না হইলে কি কোন কার্য হয়? এইরূপে সমস্ত কার্য ঈশ্বরকে দিলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৬৭-৭২।

গার্‌ফীল্‌ডের বাল্যকালের দুটী গল্প

প্রমদাচরণ সেন



মহাত্মা গার্‌ফীল্‌ডের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শোন নাই। তিনি কিছুকাল পূর্বে উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ প্রদেশের সর্ব প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে কখনও রাজ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া, কখন ছুতারের কাজ করিয়া, কখন চাষার কাজ করিয়া, গার্‌ফীলড্‌ টাকা উপার্জন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা বিধবা মার সাহায্য করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচও চালাইয়া দিতেন। এইরূপ চেষ্টা ও সুবুদ্ধির বলেই তিনি অত্যন্ত ছোট অবস্থা হইতে উঠিয়া এত বড় হইয়া ছিলেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং পরম ধার্মিকা ছিলেন বলিয়া গার্‌ফীল্‌ডের চরিত্র অল্প বয়স হইতেই ভাল হইয়া উঠে। আমরা অন্য সময়ে এই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠক-পাঠিকাদিগকে জানাইব ; এখন কেবল সংক্ষেপে তাঁহার বাল্যকালের দুটী মাত্র গল্প লেখা যাইতেছে, এই গল্প দুটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে তিনি বাল্য-কালেও কি চমৎকার লোক ছিলেন।



গার্‌ফীল্‌ডের একটী পোষা বিড়াল ছিল ; বিড়ালটী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তিনি যেখানে যাইতেন, প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—বোবা পশু পর্যন্ত যেন বুঝিয়াছিল যে গার্‌ফীল্‌ডের মত বালকের কাছে থাকিলে তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। একদিন গার্‌ফীল্‌ড আপনাদিগের বাড়ীর বাগানে কাজ করিতেছিলেন,—বিড়ালটী সঙ্গে ছিল—এমন সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক একটী বালক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্য দশ জন বালক যেরূপ এই বালকটীও সেইরূপ কুকুর বিড়াল প্রভৃতির উপর উৎপীড়ন করিয়া আমোদ বোধ করিত। কাজেই গার্‌ফীল্‌ডের বিড়ালটী দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল একবার ঢিল ছুঁড়িয়া লয়! দুই একঘা ঢেলা খাইয়া বেচারা বিড়াল দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া গেল, নিষ্ঠুর বালক নিজের মনে হাসিতে লাগিল।

বিড়ালের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া গার্‌ফীল্‌ড অবাক হইয়া গেলেন। তাহার পর খানিকক্ষণ পরে বলিলেন—"আমি এরূপ ব্যবহার ভালবাসি না।" বালক একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল "আঃ এমন কি ব্যবহার? একটা সামান্য বিড়াল বইতো নয়।"

গার্‌ফীল্‌ড।—বিড়াল সামান্য হইলেও একটী প্রাণী।

বালক।—তাহা হইলে ইন্দুর, ছুঁচো, টীকটিকিও একটা প্রাণী।

গার্‌ফীল্‌ড।—তাতে আর সন্দেহ কি? ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য করিয়াছ; যে এই বয়স হইতেই বোবা পশুর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেছে সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও অভদ্র ব্যবহার করিবে। বালক গার্‌ফীল্‌ডের এই কথাগুলিতে একটু থতমত খাইয়া বলিল—'তুমি আমার হইয়া তোমার বিড়ালের নিকট ক্ষমা চাহিও' এই রূপ কথাবার্তার পর দুজন বালক দুদিকে চলিয়া গেল,—গার্‌ফীল্‌ড বিড়ালের হইয়া দুকথা বলিতে পরিয়াছেন, এই আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে গেলেন, এবং অন্য বালকটী সমবয়স্ক গার্‌ফীল্‌ডের কথায় চিন্তিত হইয়া পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল।

আর একবার আর একটী ঘটনাতে, গার্‌ফীল্‌ড ভদ্র ব্যবহার করিতে কত ভাল বাসিতেন, তাহা বুঝা গিয়াছিল। 'সখা'র পাঠকগণ বোধ হয় জানেন (অন্ততঃ যাঁহারা সহরে অথবা বড় নগরে থাকেন, তাঁহারা জানেন) যে কোন স্কুলে একটী বালক নূতন ভর্তি হইলে তাহাকে কত কষ্ট পাইতে হয়। ছোট বড় সকল ছেলেই তাহাকে ক্ষেপাইয়া তোলে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' বলিয়া ঠাট্টা করে। আমরা নিজে জানি এই রূপ নূতন ছেলেরা কষ্ট পায়। গার্‌ফীল্‌ড যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন, সেইখানে একবার একটী ছোট ছেলে নূতন আসিয়া 'ভর্তি' হয়। সকলেই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, 'এটা পাড়াগেঁয়ে ভূত,' কেহ বলিলেন,' এটা নিতান্ত বাচ্ছা,' এইরূপে এক এক জন এক এক কথা বলিয়া বেচারা ছোট বালককে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দু-চার ঘা চড় চাপড় দিতেও ছাড়েন না। ন্যায়বান গার্‌ফীল্‌ড্ এই সকল দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন, এবং একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "যে এই বালককে কষ্ট দিবে তাহাকে আমি আমার শত্রু বলিয়া মনে করিব।" গার্‌ফীল্‌ডের এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "ওঃ এত দয়া যে? এমন কি গুণ ওর আছে যে তোমার মন ভিজিয়া গেল?" গার্‌ফীল্‌ড্ বলিলেন 'গুণ থাকুক বা না থাকুক, উহার পিতা অথবা উহার বড় ভাই কেহই এখানে নাই; এমন সময়ে উহাকে এই অত্যাচার হইতে না রক্ষা করিলে কে উহার মুখের দিকে তাকায়?" বালকেরা হাসিয়া বলিল "তবে তুমি ছোট বালকের বাবাও হইবে, দাদাও হইবে?" গার্‌ফীলড্ এই কথার উত্তরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "বাবাই হই, আর দাদাই হই, আর যাই হই, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, এই কথা মনে রাখিও যে আমার অপেক্ষা যদি কাহারও গায়ে জোর অধিক থাকে, তাহা হইলে এই বালকের প্রতি অত্যাচার করিতে আসিও, নতুবা মঙ্গল হইবে না।" গার্‌ফীল্‌ডের এই কথায় বালকদিগের মনে ভয় হইল, তাহারা সেই অবধি নূতন বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল; ছোট বালকেরাও বিপদাপদে গারফীল্‌ডকে দেখিলে সাহস পাইতে লাগিল।

এইরূপ সচ্চরিত্র বালকই ধন্য। যাঁহারা বাল্যকালে এইরূপ ভাল হন, বড় হইলে তাঁহারা যে সকলের নিকট প্রশংসা পান এবং চরিত্রের গুণে সকলের উপরে থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৪৪-৪৫।

জেম্‌শ এব্রাম গার্‌ফীল্‌ড

প্রমদাচরণ সেন



থমে দুটী কথা বলা আবশ্যক। বিদেশীয় নামগুলি লইয়া কোন কোন বালক আমাদিগকে বড়ই ত্যক্ত করিয়াছেন; তাহারা বলেন, "প্রথমটীই নাম, শেষেরটীতো বংশের উপাধি, তবে সাহেবদিগকে শেষের নামে ডাকা হয় কেন? ইহাতে এক বংশের অনেকের মধ্যে গোল হয় না?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। সাহেবদিগের শেষের নামটী বংশের;—যেমন সেন বংশ, দাস বংশ কি রায় বংশ, সেইরূপ গার্‌ফীল্‌ড বংশ, একথা সত্য, এবং পূর্বের নামগুলি পিতামাতার দ্বারা তাঁহাদের নিজের নামের সহিত মিলাইয়া বা কোন বড় লোকের নামের সহিত মিলাইয়া রাখা হয়, সুতরাং সেইগুলি যথার্থ নাম, তাহাও সত্য, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে এই নিয়মই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে যে প্রত্যেককে বংশের নাম ধরিয়া ডাকা হয়। তবে পিতা মাতা কিংবা বয়সের বড় অন্য কোন নিকট আত্মীয় হইলে, তাঁহারা প্রথম নামেই ডাকেন। যদি এক স্থানে এক বংশের দুই তিন জন থাকে, তাহা হইলে প্রথম ও শেষের নাম দুই ধরিয়া বাছিয়া লওয়া হয়। এই সম্পর্কে আর একটী কথা আছে। সাহেবদের বংশের নামের আগে যে দুটী নামই থাকিবে তাহার অর্থ নাই—কাহারও একটী কাহারও বা তিনটী থাকে; সুতরাং আমাদের যেমন 'সতীশ' বলিলেই 'চন্দ্র' তাহার পরে আপনি বসে—সাহেবদিগের সেইরূপ একটী নাম আর একটা নামের উপর নির্ভর করে না; প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

আমাদিগের দ্বিতীয় কথা আমেরিকার সম্বন্ধে। উত্তর আমেরিকার খানিকটা স্থান পূর্বে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অত্যাচার করাতে সেই স্থানের লোকেরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই দলের কর্তার নাম জর্জ ওয়াশিংটন। ইহাঁর সম্বন্ধে এখন কিছুই বলিবার নাই, তবে এই বলিলেই চলিতে পারে যে যখন ইংরাজরা ইহাঁদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সে দেশের রাজকার্য কি ভাবে চলিবে, ইনি সে বিষয়ে অনেক পরামর্শ দেন এবং ইহাঁরই চেষ্টাতে স্থির হয় যে এ দেশের কেহই রাজা থাকিবেন না, সকলে মনোনীত করিয়া একদল লোক বাছিয়া দিবেন, তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কাজ চলিবে, এবং সকলে মনোনীত করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য এমন একজনকে বাছিয়া দিবেন, যিনি এই মহাসভার কর্তা হইবেন, এবং যাঁহার নামে আমেরিকার সমস্ত রাজকার্য চলিবে। এই কর্মচারীর নাম 'প্রেসিডেণ্ট'। যে উপযুক্ত হইবে সেই এই কার্য পাইতে পারিবে, ইহাতে ছোট বড় বিচার থাকিবে না; একজন সামান্য পথের মুটে পর্যন্ত আশা করিতে পারিবে যে. লেখা পড়া শিখিয়া খুব বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত হইলে সেও একদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। গরিবের ঘরে জন্মিলে আমেরিকার কোন ভয় নাই, গুণ থাকিলেই প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত আদর পায়।

এমন আমেরিকা দেশে এক গরিবের ঘরে মহাত্মা গার্‌ফীল্‌ড জন্মগ্রহণ করেন। গার্‌ফীল্‌ড তাঁহার বাপ মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, এই জন্য বাপ মায়ের বড় ভালবাসার পাত্র ছিলেন। যখন গার্‌ফীল্‌ডের বাপ মরিয়া যান, তখন গার্‌ফীল্‌ড অতি অল্প বয়স্ক। গার্‌ফীল্‌ড-পরিবার

যেখানে বাস করিতেন, তাহার চারিদিকেই জঙ্গল ; তাহার মাঝের একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা নিজেদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একবার এই বনে আগুন লাগিয়া গেল, ভয়ানক রৌদ্রে গাছপালা প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং চারিদিক পোড়াইয়া ভয়ানক বেগে আগুন গার্‌ফীল্‌ডদিগের ঘরের দিকে আসিতে লাগিল। বাড়ী ঘর, ছেলে মেয়ে, সকলই বুঝি এইবার যায়, এই ভয়ে গার্‌ফীল্‌ডের পিতা ভয়ানক সাহসের সহিত সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গাছ কাটিয়া আগুনের পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর অগ্নি থামিল বটে, কিন্তু ভয়ানক গরমে শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহার পর অনেকক্ষণ শীতল বাতাসে বসিয়া থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যে কাশরোগে হঠাৎ গার্‌ফীল্‌ডের পিতা মরিয়া গেলেন ; যে পরিবারটীকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজে মারা পড়িলেন, তাহাদের জন্য কিছুই পুঁজি করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কেবল মরিবার সময় গার্‌ফীল্‌ডের মাতাকে এই কথা বলিয়া গেলেন,—"যে ঈশ্বর এতদিন রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এখনও রক্ষা করিবেন ; আমার বালক বালিকাদিগকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা ইহাদিগকে চালাইও।

গার্‌ফীল্‌ডের পিতার মৃত্যু হইলে অনেকে তাহাদিগকে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু গার্‌ফীল্‌ডের মাতা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমশীলা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় পুত্র টম্ ভয়ানক পরিশ্রমের সহিত ক্ষেতের কাজ করিতে লাগিল ; কাজেই সেই পরিবারের বিশেষরূপ কষ্ট ছিল না। যদিও বা কখনও কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাবিয়া সকল কষ্ট ভুলিতেন যে সৎপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলে, তাহাতে দুঃখ নাই।

টমের বয়স এই সময় ১১ বৎসর মাত্র, কিন্তু পরিশ্রম করিতে তিনি বুড়ো মানুষের মত মজবুত ছিলেন। লাঙ্গল চষা, গাছ রোপণ করা, বীজ ছড়ান, কাঠ কাটা, গরু দোহা, এইরূপ অনেক কাজে টম প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মা বাড়ীতে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য কাপড় প্রস্তুত করেন। এইরূপে সেই গরিব পরিবারটি অনেককাল সেই স্থানে কাটাইলেন। নিজেদের বাড়ীর আবশ্যকীয় কাজ করিয়াই যে টম স্থির থাকিতেন, তাহা নহে ; তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে একটী পরিবারের একজন চাকরের প্রয়োজন হইয়াছিল ;—টম্ মায়ের পরামর্শে অমনি সেখানে গিয়া চাকরী আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যে টাকা উপার্জন করা হইল, বালক গার্‌ফীল্‌ডের জন্যই তাহা কাজে আসিল ; তাহার একজোড়া জুতা হইল, (ইহার পূর্বে আর জুতা ছিল না ;—গরিব কোথায় পাইবেন?) এবং তাঁহার স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত হইল। সেই জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা দূরে যে একটী স্কুল ছিল, ৩/৪ বৎসরের বালক গার্‌ফীল্‌ডের সাধ্য ছিল না সেখানে হাটিয়া যান, কাজেই তাঁহার দিদি তাঁহার ঘোড়া হইলেন। দিদির ঘাড়ে চড়িয়া গার্‌ফীল্‌ড প্রত্যহ স্কুলে যাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের দিনে ঘরের কাজ কর্ম, চাষবাস করিতে হইত, সুতরাং সে সময় পড়াশুনার তত বেশী সুবিধা হইত না ; যে সময় শীত আসিত, ভয়ানক শীতে চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই তাঁহাদের পড়িবার সময়। তেলের পয়সা জুঠিত না, বাড়ীতে আগুন পোহাইবার জন্য যে কাঠ জ্বালা হইত, তাহাতেই আগুন পোহান এবং পড়াশুনা, দুয়েরই কাজ চলিয়া যাইত। যাহা হউক এইরূপে কষ্টে পড়িয়াও গার্‌ফীল্‌ডের পড়াশুনার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই।

আট বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখন তাঁহাকে তাঁহার জানিত বিষয়ে কেহই ঠকাইতে পারিত না, কারণ তিনি কিছুই অর্ধেক শিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ক্ষেত্রের কাজেও তিনি এই সময়ের মধ্যে পটু হইয়াছিলেন। আর না হইবেনই বা কেন? ছোট ছেলেরা যেমন কোন কাজ করিতে বলিলে, বলিয়া বসেন 'আমি পারিব না,' গার্‌ফীল্‌ডের সে অভ্যাস ছিল না। বরং তিনি কোন কাজ করিতে পাইলেই, আনন্দের সহিত 'আচ্ছা যাই' বলিয়া ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার মা সর্বদাই তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ বাছা! কোন কাজ করিতে হইলে, 'পারিব' বলিয়া মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস থাকিলেই সে কাজের অর্ধেক হইয়া যায়" ; গার্‌ফীল্‌ডেরও মনে মনে এই বিশ্বাস চিরকাল ছিল।

ইহার কিছু কাল পরে টম্ চাকরী করিবার জন্য বিদেশে যান, কাজেই ক্ষেতের সমস্ত কাজ গার্‌ফীল্‌ডের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে এই অল্প বয়সেই গার্‌ফীল্‌ডের একরূপ সংসারের আরম্ভ হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে দুটী অমূল্য উপদেশ দিলেন—(১) "ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন, তিনি যে তোমার মঙ্গলই করিবেন, এটী বিশ্বাস করিও, এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য চাহিও, কারণ তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই হয় না।" (২) "যাহা ঠিক বুঝিবে তাহা করিতে ভয় পাইও না। পৃথিবীর মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা ভীত যে ভাল কাজ করিতে ভয় পায়।" শেষের উপদেশটী শুনিয়া গার্‌ফীল্‌ড বলিলেন, "মা যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদের ভাল কাজ করিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি এই কথা বলিতেছ?" মাতা উত্তর করিলেন, "কেবল তাহা কেন? বালকদিগের কথাও বলিতেছি। অনেক বালক ভাল কাজ করিতে সাহস পায় না। মাতা অথবা শিক্ষক একটা কাজ করিতে হয়তো বারণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে একবয়স্ক সঙ্গীরা ঠাট্টা করে এই ভয়ে অনেক বালক সেই কাজ করিয়া ফেলে, এরূপ করা ভয়ানক অন্যায়। যে দিকে ভাল কাজ সেই দিকেই ঈশ্বর থাকেন ; তবেই বোঝ, যদি ঈশ্বর তোমার দিকে থাকিলেন, হাজার বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করিলে বা চটিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি?"

এইরূপ উপদেশ পাইয়া গার্‌ফীল্‌ড চলিতে লাগিলেন। ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কোন কষ্ট হইত না! বিশ্রাম যে এক দ্রব্য তাহা তিনি চাহিতেন না। কাজ করিয়া অবকাশ পাইলেই সে সময়টুকু পড়াশুনায় কাটাইয়া দিতেন, আবার পড়া শুনা করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময়টুকু নূতন নূতন কাজ শিখিয়া কাটাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছুতোরের কাজ শিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার দাদা টাকা উপার্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে, তাঁহার সাহায্যে মাতাকে একখানি সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন রকম কাজ করিয়া গার্‌ফীল্‌ডের বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার সমুদ্রে চাকরী করিতে যান। তিনি গল্পের পুস্তকে সমুদ্রের নানারূপ গল্প পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই ইচ্ছাটী কিছু প্রবল হইল ; মাতা গতিক বুঝিয়া বলিলেন, "আপাততঃ সমুদ্রে গিয়া কাজ নাই, নিকটবর্তী হ্রদে যাও, সেখানে গিয়া যদি সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা অধিক হয় তখন যাইও?" এইরূপে পুত্রকে বিদায় দিয়া স্নেহময়ী মাতা ভয়ানক কষ্টে দিন শেষ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গার্‌ফীল্‌ড আপনার 'পুঁজিপত্র' বাঁধিয়া হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং এক জাহাজে উঠিয়া সেই জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। তিনি পুস্তকে পড়িয়াছিলেন কাপ্তেন সাহেবরা বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল।

ভয়ানক মাতাল একটা লোক সকলকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। যাহা হউক ইহারই নিকটে কোন একস্থানে গার্‌ফীল্‌ড একটুকু আশ্রয় পাইলেন; একজন ভদ্রকাপ্তেন দয়া করিয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন। এইখানে কিছুকাল থাকিয়া গার্‌ফীল্‌ডের সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা চলিয়া গেল। শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার ফল পাইতে পাইতে তিনি বাড়ী আসিলেন। যদিও কম্পজ্বরে ভুগিতে ছিলেন, তথাপি পূর্বের ন্যায় প্রফুল্লভাবেই তিনি বাটী আসিলেন, এবং মা কি করিতেছেন দেখিবার জন্য চুপি চুপি জানলা দিয়া তাকাইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, তিনি সেই আলোতে দেখিতে পাইলেন ঘরের এককোণে তাঁহার মা হাটু পাতিয়া বসিয়াছেন, সম্মুখে চেয়ারে একখানি পুস্তক খোলা। মা কি পড়িতেছেন? গার্‌ফীল্‌ড কাণ পাতিয়া এই কথা শুনিলেন—(তাহাতে তাঁহার মনে কি রূপ ভাব হইল, আমরা বলিতে চাহিনা, পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়া লইবেন) —তিনি শুনিলেন ;—"হে জগদীশ্বর, আমায় দেখা দাও, আমাকে দয়া কর। তোমার দাসীর মনে বল দাও, এবং তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর।" ধন্যা মা! ধন্যা মা! আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বর হাতে হাতে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার ভালবাসার ধন ঘরে গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল,—আহ্লাদে মায়ের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

এইখানেই তাঁহার বাল্যজীবন একরূপ শেষ হইল। তাহার পর তিনি কেমন করিয়া নিজের চেষ্টায় টাকা উপার্জন করিয়া ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন, স্কুল হইতে কালেজে, কালেজ হইতে সংসারে, কেমন করিয়া তিনি নিজের সদ্‌গুণের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার দেশীয় মহাসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কেমন করিয়া হতভাগ্য কাফ্রীদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিলেন, কেমন করিয়া সকলের মনের সম্মতিতে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইলেন, সামান্য কাঠের ঘর ছাড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিলেন, এ সকল বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান আমাদের নাই।

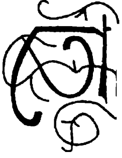
একজন পাগলের বন্দুকের গুলিতে অবশেষে গার্‌ফীল্‌ডের প্রাণ গেল। যখন তিনি বাঁচিবেন কি মরিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না, তখন একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন 'গার্‌ফীল্‌ড মরিয়া গেলে আমেরিকার ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠিবে।" আজ তাহাই হইয়াছে—এমন লোক আমেরিকাতে নাই, যে না আজ এই মহত্মার মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছে। এইরূপ জীবনই ধন্য! ধন্য গার্‌ফীল্‌ড! ধন্য আমেরিকা।

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৫৩-৫৬।



গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্রযাত্রা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



মরা—'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্' কোথায় জান? পৃথিবীর মানচিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু ; দেখিতে দুইটী দেশের মত দেখায়। এই দুইটীর উপরেরটীর নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটীর নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ তার মধ্যে সকলের বড়!

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ী। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স ৩৩ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাসা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না। 'ছুতোরকে বলিলেন, আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও।' ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দীর্ঘে ১২ হাত, চওড়ায় ৪ হাত আর উঁচুতে ২ হাত হইল ৫৫ মোন জিনিশ ধরে। নাম রাখিলেন পাসিফিক। সাহেব বলিলেন জলবিহার করিয়া করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬৮০০ মাইল দূরে।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্য সামগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯-এ আগষ্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নীচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিশগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল,—এই একটু অসুবিধা। এর পর প্রায় একমাস পর্যন্ত কোন দিন বাতাস পান কোন দিন বা বাতাস থাকে না ; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাসা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না ; খাবার জিনিশও বেশী নাই ; সাহেব দেখিলেন অত বেশী খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস লইয়া উঠিল। বেশী খাইতে পারেন না—সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্বে ৩।৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্ ঠক্ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন হাঙ্গরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগী দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বড়যির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙ্গরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার যায়গায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন ; তাহাতে হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে। সুতরাং ঠক্ ঠকি থামিল।

১০ই নবেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার

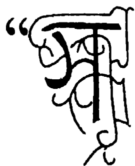
চাহিয়া লইলেন। তার পর কয়েক দিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে এক দিন প্রায় ১০৬ মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন ; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন, এবং নঙ্গরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘণ্টায় নৌকাটীকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশী হুড়ো হুড়ি করিতে লাগিলেন—নৌকাখানি আবার উল্টিয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না ; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছু কাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিশপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারী একটী পাখী উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ই জানুয়ারী আর একটী পাখী ধরিলেন। কখন কখনও দুই একটী 'উড়ুক্কু' মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার হালটী ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর একটী করিয়া লইলেন। ইহার পর আর এক দিন একটী পাখী ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১-এ হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড়গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর একদিন গুলি করিয়া একটী পাখী মারিয়াছিলেন ; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখী ধরিয়া দেশলাই-এর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তার পর এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। একদিন হেট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—একটা জাহাজ! তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন ; জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল। খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই বহি হইতে ইংরেজী পত্রিকায় এই গল্পটী ছাপা হইয়াছে।

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৮৩-৮৫।

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস

বিপিনচন্দ্র পাল

“খার” পাঠকেরা বোধ হয় প্রায় সকলেই বাবু সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করিয়া জানেন। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতার ছেলেদের দেবতা। তিনি কলিকাতার যুবকদলের মনে একটী নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের আপনার যে একটা দেশ আছে, ইহা ভাল করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা জানিতেন না। মাতৃভূমির ঠিক অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ; এবং এই ক্ষমতাগুণে তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করেন ; আমাদের আইন কানুন তাঁহারাই

প্রস্তুত করেন ; আমাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আমাদের টাকা তাঁহারাই আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় বা অপব্যয় করেন, আমাদিগের তাহাতে কোন হাত নাই। ইহাতে অনেক সময় দেশের ঘোর অনিষ্ট হয়। ভাল কাজে যে টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মন্দ কাজে সে টাকা খরচ হয়। তারপর আমরা নিজেরা নিজেদের আইন কানুন তৈয়ার করিতে পারি না বলিয়াও অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইংরাজেরা বিদেশী লোক, ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম স্বতন্ত্র ও আমরা যে ভাবে খাই, থাকি তাঁহারা সে ভাবে খান, থাকেন না। কাজে কাজেই আমাদিগের যে কি দরকারী ও কি দরকারী নহে, ইহাঁরা সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের দরকার মত আইন কানুনও সবসময় তৈয়ার হয় না। তারপর দেশের বড় বড় কাজ যত—যাহাতে অধিক চিন্তা, অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ও যাহাতে বেশী মাহিয়ানা পাওয়া যায়, তাহাও সবই প্রায়ই তাঁহাদের দখলে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের উপকার করিয়াছেন ; তাঁহারা দেশে আছেন বলিয়া এখনও আমাদের অনেক উপকার হইতেছে ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের যতই চোখ্ ফুটিতেছে, যতই আমরা জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতেছি ততই সমস্ত কাজ চালাবার ভার আমাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই সকল ভাব দেশের যুবকগণের ও জনসাধারণের মনে প্রধানতঃ সুরেন্দ্রবাবু গাঁথিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্বে আমরা এ কথা ভাবিতাম না ; দশ বৎসর পূর্বে দেশের শাসন-কার্য যাহাতে ভাল হয়, অপর অপর জাতির মত যাহাতে আমরাও আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের স্বদেশের শাসনভার পাইতে পারি, এবিষয়ে লোকের মনোযোগ প্রায় ছিল না বলিলেও হয়। সুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়া ও কাগজে লিখিয়া আমাদের এই কর্তব্যভার সজাগ করিয়াছেন। বিগত আট নয় বৎসর কাল তিনি প্রাণপণে আমাদের জন্য, তাঁহার স্বদেশের উপকারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম বন্ধু ; তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের পরম হিতৈষী। মাতৃভূমির দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদে, ও দেশের নরনারীর ঘোর দুর্দশা দেখিয়া তিনি সর্বদা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান। ধন্য সেই ব্যক্তি যে আপনার মাতৃভূমির ও আপনার স্বজাতির দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া প্রাণে ভয়ানক ক্লেশ পায়। দেশের জন্য যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, সে পুণ্যবান। তাহার এই সামান্য এক এক ফোঁটা চোখের জল স্বর্গে ভগবানের নিকটে মুক্তাফলের মত শোভা পাইয়া থাকে!

বেঙ্গালী নামক একখানি অতি সুন্দর ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে। সুরেন্দ্র বাবু এই পত্রের সম্পাদক। কিছুদিন হইল ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান নামক আর একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের নামে কয়েকটী কথা লেখা হয়। নরিস সাহেব আজ প্রায় নয় মাস হইল এ দেশে আসিয়াছেন। প্রথমে লোকে তাঁহার একটী ভাল কাজ দেখিয়া বড়ই সুখী হয়। চৌরঙ্গীর রাস্তায় তিনি একদিন গাড়ীতে যাইতেছিলেন ; এমন সময়ে আর একজন সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া একটী বৃদ্ধা মেয়েমানুষ আহত হয় ; সাহেব তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না ; সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন ; নরিস সাহেবের প্রাণে আঘাত লাগিল। নিষ্ঠুর-হৃদয় সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জোরে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া কি আপনার উচিত নয়?" নিষ্ঠুর সাহেব বলিয়া উঠিল,— "এদেশের সাহেবদের গাড়ীর চাপে কোনও দেশীয় লোক পড়িলে, তাহাকে হাসপাতালে

পাঠাইবার নিয়ম নাই।"—উচ্চমনা নরিস এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। নিজে গাড়ী করিয়া বৃদ্ধাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া সাহেবেরা অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। নরিসেরও স্বভাব উল্টাইতে লাগিল। তিনি দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের উপর অপমান অত্যাচারও করিতে আরম্ভ করিলেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" পত্রে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দার কথা বাহির হইল। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বেঙ্গালী পত্রে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ানের লিখিত একটী প্রবন্ধ তুলিয়া দেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" লিখিয়াছেন যে নরিস সাহেব জোর করিয়া হিন্দুদের দেবতা শালগ্রাম ঠাকুরকে খোলা কাচারিতে আনিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু এই কথা উপলক্ষ করিয়া নরিস সাহেব হাইকোর্টের জজিয়তির উপযুক্ত নন, এ কথা বলেন। বহুদিন হইল বিলাতে জেফ্রিজ নামে অতিশয় অধার্মিক ও অত্যাচারী একজন বিচারক ছিলেন ; সুরেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধে নরিস সাহেবের অত্যাচার, অবিচারের কথা বলিবার সময় এই জেফ্রিজ ও তাঁহারই মতন অত্যন্ত অধর্মপরায়ণ স্ক্রগ্স্ নামে অন্য একজন জজের নাম করেন। "ইংলিশম্যান" নামে ইংরাজদের একখানা খবরের কাগজ আছে। এই খবরের কাগজ চিরকালটা বাঙ্গালীদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কাটাইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর উপরি উক্ত লেখাটী নকল করিয়া "ইংলিশম্যান" পত্র লেখেন যে এত দ্বারা হাইকোর্টের অপমান করা হইয়াছে। জজ নরিসের ইংলিশ ম্যানের কথা পড়িয়া মনে হইল,—"তাইত!" আর অমনি তিনি বেঙ্গালী পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু ও ঐ পত্রের ছাপাওয়ালা বাবু রামকুমার দের উপর সমন অর্থাৎ আদালতে আসিবার হুকুম জারি করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সমন পাইয়াই, হাইকোর্টে আসেন, এবং তথায় জানিতে পান যে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান শালগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে। অর্থাৎ জজ নরিস জোর করিয়া শালগ্রাম আনেন নাই। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামতেই তিনি হিন্দুদের একজন দেবতাকে হাইকোর্টের বারান্দায় আনিয়া উপস্থিত করেন। পরদিন প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব, নরিস সাহেব ও অপর দুইজন ইংরাজ জজ ও আমাদের দেশের রত্ন জজ রমেশচন্দ্র মিত্রকে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর বিচার করিতে বসেন। সুরেন্দ্র বাবুকে লোকে এত ভালবাসে, ও এই বিচারে কিরূপ হইবে সে বিষয়ে লোকের এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বিচারের দিন হাইকোর্টের গার্থ সাহেবের এজলাসে, বারান্দায়, উঠানে পর্যন্ত তিল ফেলিবার স্থান ছিল না। কেবল হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়িটী যে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা নহে ; বাহিরের রাস্তায়, ও পাশের মাঠে পর্যন্ত হাজার হাজার লোক জড় হইয়াছিল।

কোনও বিষয়ে ভুল হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহা অবিলম্বে স্বীকার করা ও তৎক্ষণাৎ তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সত্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায় ; ইহাদ্বারা চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রমাণ হয়। যথার্থ বীরত্বের লক্ষণই এই। সুরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের যে কথা সত্য বলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক সত্য নহে জানিতে পারিয়া, আপনার ভুল স্বীকার করিলেন। এবং ভুল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জজ নরিসের প্রতি কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই রূপ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই ; এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন। তবে ক্ষমতা আছে কিনা এ বিষয় ভাল করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে অনেক আইন কানুন, অনেক নজির ও

অনেক খাতা পত্র খুঁজিতে হইবে ; সুতরাং তিনি জজদিগের নিকট কিছুকালের জন্য তাঁহার মোকদ্দমা মূলতবি অর্থাৎ থামাইয়া রাখিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি যে বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি সুরেন্দ্র বাবুর এই প্রার্থনায় দুকথা বলা উচিত বোধ করিলেন না। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলিলেন না। জজেরা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—ও পরদিন সুরেন্দ্র বাবুকে বিনা পরিশ্রমে দুই মাস কাল প্রেসীডেন্সী জেলে (হরিণবাড়ীতে) কয়েদ থাকিতে হুকুম দিলেন।

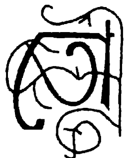
এই কারণেই আজ আমাদের প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে। "সখা" বালক বালিকাদিগের পত্র, তাঁহার আইন কানুন লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু অন্যায় করিয়াছেন কি না, হাইকোর্টের তাঁহাকে এই রূপ শাস্তির দিবার অধিকার আছে কিনা, অথবা যে দোষে কিছুদিন পূর্বে এই হাইকোর্টের ইংরাজ টেইলর সাহেবের কেবল জরিমানা হইয়াছিল, ও ইংলিশম্যান পত্রের সম্পাদক সাহেব ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে বাঙ্গালী সুরেন্দ্র নাথের দুমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্র বাবু ছেলেদের—'সখা'র অনেক পাঠকের—শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্র বাবুর অপমানে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সুরেন্দ্র বাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালা অবমানিত হইয়াছে, এ কথা বলিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "আমরা সুরেন্দ্র বাবুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।" তাঁহারা ভ্রান্ত। সুরেন্দ্র বাবুর আবার দুঃখ কি? আপনার কর্তব্য কাজ করিয়া যে কষ্ট পায় তাহার কি দুঃখ? দেশের উপকার করিতে গিয়া যাঁহার কষ্ট হয়, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিব কেন? সুরেন্দ্র বাবু পুণ্যবান, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন, তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব হইল মনে করিতেছি। তাঁহার শাস্তিতে এই হতভাগা জাতির কাল মুক আজ উজ্জ্বল হইল! পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য মাতৃভূমির জন্য এক ফোঁটা চক্ষুজল, ফেলিতে শেখ! একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, এক দিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে ; একদিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে!

১ : ৬ : জুন ১৮৮৬, পৃ. ৮৮-৯১।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন সাহেব

প্রমদাচরণ সেন



মরা সকলেই বোধ হয় ইচ্ছা কর, বড় লোক হই ; এমন কেউ আছেন কিনা জানি না, যিনি বড় লোক হইতে চান না। মনের কথা বলিতে কি, আমারত বড়ই ইচ্ছা করে ; আমি যখন কোন বড় লোকের জীবনচরিত পড়ি, বা কোন বড় লোকের গল্প শুনি, তখন আমার বড়ই চোখ টাটায়, 'আমার কিছুই হইল না, আমি বড় লোক হইতে পারিলাম না,' 'আমি ইহার মত ভাললোক হইতে পারিলাম না' এইরূপ অনেক কথা আমার মনে হয়। দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তবুও বড় লোকের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, কারণ বড় লোকের কথা শুনিতে শুনিতে বড় লোক হইতে ইচ্ছা হয়।

আমি টাকার বড় লোক হইতে চাই না, কারণ টাকা থাকিলেই মানুষ সুখী হয় না—এমন কত লোক আছেন যাঁহারা ধর্মের জন্য টাকা কড়ি উপার্জন করা ছাড়িয়া দিয়া গরিব হইয়াছেন,—কিন্তু যেকাজ করিলে মানুষ হওয়া যায়, যেরূপ চরিত্র থাকিলে পাপের দিক হইতে মন ফিরিয়া গিয়া ভাল কাজে বসিয়া যায়, আমার বড়ই ইচ্ছা করে আমার কপালে সেইরূপ হয়।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন সাহেবের বাড়ী ইংলণ্ডের উত্তরে ছিল। পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি ছেলে বেলা স্কুলে পড়িতে পান নাই। কিন্তু অনেক ছেলে যেমন স্কুলে যাইতে না পাইয়া বাঁদর হইয়া যায়, বাপ মায়ের গুণে ডেভিড্ লিভিষ্টোনের সেরূপ দোষ হয় নাই। বাপ মা যদি ভাল হন এবং ছেলেদিগকে ভাল উপদেশ দেন, তাহা হইলে ছেলেরাও যে ভাল হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই সাহেব দেখাইয়াছেন। ছেলে বেলা একটী কলে কাজ করিয়া তিনি কিছু কিছু পয়সা পাইতেন, তাহার দ্বারাই দুই একখানি করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যত্ন থাকিলে কি না হয়? লিভিংষ্টোন সাহেব দিনে কাজ কর্ম করিয়া রাত্রিতে একটী বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন—কারণ রাত্রিতে যে সকল বিদ্যালয় হয়, তাহা গরিবের ছেলের জন্য এবং তাহাতে বেতন লাগে না। এইরূপ নিজের পরিশ্রমের গুণে তিনি বেশ সুন্দররূপ লেখা পড়া শিখিলেন।



তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল দেশে দেশে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইবেন ; এই জন্য তিনি সেই ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ভাল করিয়া পড়িলেন, এবং ডাক্তারী শিখিয়া বিলাত হইতে বিদেশে যাত্রা করিলেন। যেখানে ইহার পূর্বে সাহেবেরা কেহ কখনও যান নাই লিভিংষ্টোন সাহেব সেই আফ্রিকার মধ্যদেশে গেলেন। দুই চারি বৎসর নয়, ক্রমাগত ষোল বৎসর কাল আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে বেড়াইলেন এবং লোকের নানারূপ উন্নতির সুবিধা তিনি সেই দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্মের কথা বলিয়া করিয়া দিলেন। এই ষোল বৎসর কাল তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই মহাত্মার প্রণীত "মিশনারী ট্রাভেল্স্" নামক সুন্দর পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন। এইরূপে ধর্ম শিক্ষা দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে লিভিংষ্টোন সাহেব একবার সিংহের হাতে পড়েন ; যদিও সিংহ তাঁহাকে একটু 'চেখে' দেখিয়াছিল এবং যদিও সেই 'চাখার' জন্য তাঁহার একটা হাতের হাড় একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সুখের বিষয় এই যে তিনি প্রাণে মরেন নাই। কেবল ইহাই নহে, একবার তিনি মহাদেবের মত ষাঁড়ে চড়িয়া কোথায় যাইতে ছিলেন কি কারণে জানি না, ষাঁড় ভয় পাইয়া ভয়ানক ছুটিল ; সাহেবের প্রাণ আর একটু হইলেই গিয়া ছিল, কিন্তু একটা গাছতলা দিয়া ষাঁড় যেমন যাইতেছিল, অমনি সাহেব গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন ; ষাঁড় মহাশয় সাহেবকে সেইরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়াই দৌড়! তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া দেখে তিনি ঝুলিয়া আছেন!!

এই রূপ কত বিপদাপদ সহ্য করিয়াও সাহেব ধর্ম প্রচারে ক্ষান্ত হন নাই,—কত নূতন স্থানে গেলেন, কত নূতন লোককে শিক্ষা দিলেন, কত নদীর উৎপত্তি স্থান বাহির করিলেন, নূতন নূতন হ্রদ বাহির করিয়া লোককে জানাইলেন। তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন—যেমন স্বামী, স্ত্রীও তেমনি। স্ত্রীটী একজন বড় ধর্ম-প্রচারকের মেয়ে; পিতার কাছে শিখিয়া ধর্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে বেশ জানিতেন, কাজেই স্বামীর সাহায্য করা ভিন্ন একদিনের জন্য ব্যাঘাত করেন নাই। আমাদের দেশের বালিকাদিগের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত।

অবশেষে একটী নূতন দেশে যাইতে, পথের কষ্টে তাঁহার প্রাণ গেল! আহা! ধর্মের জন্য, সৎকার্যের জন্য প্রাণ গেল! লিভিংষ্টোন সাহেব পূর্ব হইতেই জানিতেন অসভ্যদিগের দেশে বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া একাকী বেড়াইলে এক দিন তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু তবু তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে ছাড়েন নাই। কি সাহস! আমরা কবে সকলেই এইরূপ ভাল কাজ করিতে সাহসী হইব! এখন যে আমরা কোন একটা কাজকে ভাল জানিয়াও, পাছে কেউ নিন্দা করে, কি শাস্তি দেয়, এই ভয়ে সে কাজ করিতে সাহস পাই না, কবে আমাদের এ ভাব যাইবে। যে মহাত্মার ছবি আমরা দিলাম, তাঁহার মতন হইতে আমরা কবে চেষ্টা করিব!

১ : ১১ : নভেম্বর, ১৮৮৩, পৃ. ১৬৭-১৭০।

সতীশ এবং তাহার সঙ্গী

প্রমদাচরণ সেন



তীশ তাহার পিতার একমাত্র ছেলে, তাহাতে আবার সতীশের মা ছিলেন না। এইজন্য সতীশের পিতা সতীশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সতীশ যখন যাহা চাহিত তাহাই পাইত। কিন্তু 'আদুরে'-ছেলেরা সচরাচর যেমন খারাপ হইয়া যায়, সতীশ সেরূপ হয় নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিত, তাহাই পাইত বটে কিন্তু পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে কোন দ্রব্য লইত না। কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা হইলে সতীশ ছুটিয়া পিতার নিকট আসিত ও কহিত 'বাবা আমাকে ঐ দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া দিবে কি?' যদি পিতা বলিতেন 'হাঁ' তাহা হইলে সতীশের আহ্লাদের সীমা থাকিত না, কিন্তু তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে উহা ক্রয় করা উচিত নয়, তাহা হইলে বালক সতীশ মনে মনে বলিত 'আমার পিতা যখন ঐ দ্রব্যটী আমাকে দিতে চাহিতেছেন না, তখন আমি উটী লইব না, কেননা তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন।' সতীশের এই সুবুদ্ধিতেই সতীশ খারাপ হইয়া যায় নাই। সতীশের পিতা সমস্ত দিন তাঁহার কর্মের স্থানে থাকিতেন, সুতরাং সে সময় সতীশকে বাড়ীতে একাকী থাকিতে হইত। এই সমস্ত সময় সতীশ কি করিত তাহা বলিতেছি।

সতীশের একটী সুন্দর কুকুর ছিল। সতীশ যেখানে যাইত কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সহিত বেড়াইতে বা খেলা করিতে সতীশের পিতা সতীশকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কুকুরটীই সতীশের বন্ধু ও খেলার সঙ্গী ছিল। সতীশ যখন পোষাক পরিয়া চাকা হইয়া খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইত কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত এবং পরিশ্রম হইলে সতীশ যখন বাড়ীর সম্মুখে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিত, তাহার সঙ্গীও নিকটে আসিয়া বসিত। বস্তুতঃ 'ভুলো' সতীশকে যেমন

ভালবাসিত, দুটী ছোট ছেলে পরস্পরকে ওরূপ ভালবাসে কিনা সন্দেহ। কখন কখন সতীশ নিদ্রিত হইয়া পড়িত ;—তখন ভুলোই তাঁহার বালিশ। ঐ দেখ কুকুরের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া কেমন ঘুমাইয়া আছে!

এক দিন সতীশ এইরূপে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ শুনিতে পাইল সম্মুখের বনের অন্য দিক হইতে এক এক বার 'মিউ', 'মিউ' শব্দ হইতেছে, আবার তাহার পরেই ভয়ানক হাসির শব্দ আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বালকের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। প্রভুর উৎসাহ দেখিয়া ভুলো 'খেউ' 'খেউ' শব্দ করিতে করিতে অগ্রে ছুটিল। বনের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড দীঘি। সতীশ



এবং তাহার সঙ্গী দুজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল পাড়ার দু তিন জন দুষ্ট বালক একটী রোগা বিড়াল শাবককে জলে ফেলিয়া দিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিড়ালটী যত প্রাণের ভয়ে 'মিউ' 'মিউ' করিতেছে, ছেলেগুলি ততই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া প্রস্তর চালাইতেছে। সতীশের মনটী বড় ভাল—দেখিয়াই তাহার ক্লেশ হইল ; এমন দেখিলে কাহার না ক্লেশ হয়? দেখিবা মাত্র সতীশ ভুলোকে জলে যাইতে ইঙ্গিত করিল। ভুলো চক্ষের নিমেষে জলে পড়িয়া বিড়ালশাবককে তীরে আনিল, এবং সতীশের পায়ের নিকটে তাহাকে রাখিয়া মুখপানে চাহিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। সুবুদ্ধি বালক শীঘ্র বিড়ালটীকে তুলিয়া লইয়া গা মুছাইতে লাগিল এবং তাহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছিল। যে দু তিনটী বালকের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, তাহারা, এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই,—দেখিল সতীশ বিড়াল লইয়া বাড়ী যায়, তখন একজন সম্মুখে আসিয়া বলিল 'ওগো বাবু, বড় যে আমাদের বিড়ালের বাচ্চা লইয়া ঘরে যাইতেছ! সাহস কি?" যে বালক এই কথা বলিতেছিল, তাহার হাতে এক গাছা লাঠি এবং তাহার গায়ে

সতীশের অপেক্ষা বল অনেক অধিক। কিন্তু সতীশ তাহাতে ভয় পাইল না। সতীশ জানিত যাহারা অসৎ বালক তাহাদের গায়ে বল থাকিলেও সাহস থাকে না। এই জন্য সে সাহস করিয়া বলিল—"এটী তোমাদের বিড়াল নহে, তোমরা যখন উহাকে মারিতে গিয়াছিলে, তখন আর তোমাদের উহার সহিত কি সম্বন্ধ?" বালক লাঠি তুলিয়া রাগভরে বলিল "আমাদের বিড়াল আমরা মারি আর যাহাই করি, তাহাতে তোমার কি? এখন ও কথা থাক্, বিড়ালছানা রাখ, নতুবা এই লাঠির দ্বারা তোমার মাথা চিরিয়া দিব"। সতীশ আরও সাহসের সহিত বলিল "আমার মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও পাইবে না। তোমাদের গায়ে বেশী বল আছে বলিয়া কি মনে ভাব যে যতক্ষণ আমি অজ্ঞান হইয়া না পড়িতেছি, ততক্ষণ এই নির্দোষী বিড়ালছানাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে দিব?"—দুষ্ট বালকের হাতের লাঠি সতীশের মাথায় পড়িল। এক ঘা খাইয়াও সতীশ দণ্ডায়মান। কিন্তু সতীশকে আর এক ঘা মারিতে হইল না। ভুলো এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল তাহার প্রভুকে একটা বালক শাস্তি দিতেছে, তখন ভুলোর তাহা সহ্য হইল না। বাঘের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভুলো সেই দুর্বুদ্ধি বালকের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল এবং নখের আঘাতে তাহার হাত ও পা খানিকটা চিরিয়া দিল। অন্যান্য বালকগণ তাহাদের সঙ্গীর এই দুর্দশা দেখিয়া 'বাপরে! বাঘ! খেয়েছেরে!' এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সতীশ অতি কষ্টে ভুলোকে থামাইয়া গৃহে ফিরিল। সেই অবধি সেই দুরন্ত বালকেরা আর পশুর প্রতি অত্যাচার করিত না। বিড়ালশাবককে সঙ্গে লইয়া সতীশ ঘরে আসিল। আগুণে সেকিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ খাইতে দিয়া সতীশ বিড়ালছানাকে প্রাণে বাঁচাইল, এবং সেই দিন তাহার পিতা কর্ম-স্থান হইতে আসিলে, তাঁহাকে এই সকল ঘটনার কথা বলিল। তাহার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'বেশ কার্য করিয়াছ;—ইহাতেই সতীশ মাথার বেদনা ভুলিয়া গেল, এবং সমস্ত কষ্টের ফল লাভ করিল। সেই দিন অবধি সতীশের দুটী সঙ্গী হইল—'ভুলো' কুকুর এবং 'হারুমণি' বিড়াল।

১ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৫-৭।

বিলাতের পত্র

ক্রীস্টাল প্যালেস বা স্ফটিক প্রাসাদ-পরিদর্শন

কুমারী টিশিমেকার



ভাতকালের সুন্দর সূর্যকিরণে সিডেনহাম নামক পল্লীস্থ স্ফটিক-প্রাসাদ[১] পরিদর্শন করা বড়ই আনন্দকর। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বালিকা এই স্ফটিক প্রাসাদে আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়। ইংরাজী ১৮৫৪ সালে এই প্রাসাদটী প্রস্তুত করা হয়। প্রাসাদটী দেশবিদেশের নানারূপ দ্রব্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; চারিদিকে নানারূপ দেখিবার জিনিশ আছে। মধ্যস্থলে আজকাল নানারূপ খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি ও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাসাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গন অর্থাৎ উঠান; কোন কোন অঙ্গনে পূর্বকালের বাড়ীর মতন দ্রব্যাদি সাজান। প্রাচীনকালে ভূমিকম্প হইয়া ইটালীদেশে পম্পিয়াই নগর মাটীর মধ্যে

১. বাড়ীটা সম্পূর্ণরূপে কাচ এবং লৌহ-দ্বারা নির্মিত বলিয়া ইহার নাম, 'স্ফটিক-প্রাসাদ' হইয়াছে। স, স।

বসিয়া যায়; সম্প্রতি তাহার মধ্য হইতে একটী ভদ্রলোকের বাড়ী বাহির হইয়াছে, তাহার আকৃতি এবং দ্রব্যাদি যেরূপ, এই স্ফটিক-প্রাসাদের একটী অঙ্গন সেইরূপ সাজান। দেয়ালে নানারূপ সুন্দর বর্ণে ফুল, পক্ষী, ও কুঞ্জবন অঙ্কিত রহিয়াছে; কুঞ্জবনের মধ্য হইতে ছোট ছোট পরী উকি মারিতেছে। মধ্যস্থলে একটী সুন্দর শীতল জলের ফোয়ারা,—তাহার চারিদিকে ছোট ছোট ঘর; সেগুলি পূর্বকালের শয়নঘরের মত।

আর একটী অঙ্গনের নাম মিসর-অঙ্গন। এইখানকার দেয়ালে প্রাচীন মিসর-দেশের আশ্চর্য দেবতা সকল চিত্রিত রহিয়াছে; দেয়ালের এক পার্শ্বে প্রাচীন মিসরীদিগের চিত্র-লিপি (অর্থাৎ ছবির দ্বারা তাহারা যেরূপ লিখিত, সেইরূপ) অঙ্কিত। যদিও দেয়ালগুলি চূণ এবং বালির দ্বারা প্রস্তুত, তথাপি সেগুলিকে দেখিতে ঠিক প্রাচীনকালের প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় (প্রাচীনকালের প্রস্তরের নির্মিত দেয়ালের কিছু অংশ লণ্ডনের বড় যাদুঘরে আছে)। মিসর অঙ্গনে "স্ফিঙ্ক্স্" নামক বৃহৎ প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর নিনেভা-অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে চুণ এবং বালির দ্বারা নির্মিত, নানা বর্ণে চিত্রিত, ডানাযুক্ত দুটী বৃহৎ সিংহ। প্রাচীন নিনেভা-নামক নগরের[১] কোন মন্দিরের দ্বারে যেরূপ দুটী সিংহ থাকিত, ইহা তাহারই অনুকরণ। নিনেভা-অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরেই গ্রীক এবং রোমীয় অঙ্গন। এই দুটী অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীনকালের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তির ছাঁচ সকল রহিয়াছে। সেগুলি এত সুন্দর যে বর্তমান সময়ে ইংরাজী শিল্পীরাও ইহার ন্যায় সুন্দর, মনোরম কোন মূর্তি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

কয়েকটি অঙ্গনের নাম চিত্রশালিকা-অঙ্গন। এখানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নানারূপ পরম সুন্দর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের একটী সুন্দর ধর্মালয়ের দ্বার, মাইকেল এঞ্জেলো নামক বিখ্যাত শিল্পীর নির্মিত প্রাচীন কালের ধর্ম ঋষি মূষার মূর্তি, ফরাশীদেশের রাজধানী পারিস নগর ও ইটালী দেশের পরম সুন্দর ফ্লোরেন্স সহর হইতে আনীত নানারূপ অপূর্ব মূর্তি, এখানে এই সকল দ্রব্য দেখিলে মন মোহিত হয়। এতভিন্ন আরও এত রকমের জিনিশ রহিয়াছে যাহার বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

স্ফটিক-প্রাসাদের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর কাচনির্মিত ঝরণা আছে। সেই ঝরণার চারিদিকের জলে নানারূপ স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় মৎস্য খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং জলের চারিদিকে স্তরে স্তরে পরম মনোহর ফুল সকল সাজান রহিয়াছে। প্রাসাদের অপর পার্শ্বে আর একটী মারবেল পাথরের নির্মিত ফোয়ারা; কিন্তু সেটী কাচনির্মিত ঝরণাটীর ন্যায় সুন্দর নহে। এই ফোয়ারার সম্মুখে কতকগুলি বড় 'মজার' টেয়াপাখী বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা সুন্দর কথা কয়, এবং যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ এবং আদর না দেখাও, তাহা হইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। নিকটে পিঞ্জরে কতকগুলি বানর এবং অন্যান্য অনেকগুলি পশু দেখা যায়। একবার আগুন লাগিয়া এই ভাগের খানিকটা স্থান পুড়িয়া যাওয়াতে একটী বৃহৎ বানর এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য ও প্রাসাদের কিয়দংশ নষ্ট হয়। তদবধি প্রাসাদটী কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের নিকটবর্তী উদ্যানে গ্রীষ্মকালে পরম সুন্দর নানারূপ ফুল ফুটিয়া মন হরণ করে;

১. আরবদেশের উত্তরে এবং পারস্যদেশের পশ্চিমে এই নামে পূর্বে একটী সহর ছিল। আজকাল সে সহরের প্রায় কিছুই নাই। কেবল টাইগ্রিস নদীর তীরে মোসল নামক নগরের নিকটে কতকগুলি ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখা যায়। স. স।

মধ্যে মধ্যে চারিদিকে প্রস্তরনির্মিত মূর্তি সকল মাথা তুলিয়া আরও সৌন্দর্য বাড়ায়। চারিদিকে ফোয়ারা, জলপ্রপাত প্রভৃতি যখন জল ছড়াইতে থাকে, এবং তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া যখন রামধনুর শোভা দেখা যায়, তখনকার সে সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পূর্বকালে পৃথিবীতে যে সকল বড় জন্তু ছিল, তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ সেইরূপ আকারের জন্তু দেখা যায়। এই সকল জন্তু আজকালকার সকল জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ ; এমন কি হস্তীও তত বৃহৎ নহে। সে আকারের কোনও জন্তু আজকাল দেখা যায় না। এই ভাগটী নানারূপ গাছপালাতে সাজান ; মধ্যে মধ্যে বিদেশ হইতে আনীত সুন্দর সুন্দর চারাগাছও রোপিত হইয়াছে ; কিন্তু সেগুলি ইংলণ্ডের দারুণ শীতে সচরাচর বাঁচে না।

প্রাসাদের একটী প্রধান আকর্ষণের জিনিশ মনোহর বাদ্য। সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন এবং শীতকালের শনিবারে রমণীয় ঐক্যতান বাদ্য হয়। কেহ পিয়ানো বাজায়, কেহ গান গায়, এইরূপে খুব আনন্দে সময় কাটে।

প্রাসাদের মধ্যে কখন কখন পোষা পাখী দেখান হয়। তখন নানা স্থানের নানারূপ মোরগ মুরগী, এবং পায়রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় প্রাসাদের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত কেবল এই দৃশ্য ; বৃহৎ খাঁচায় দলে দলে পাখী,—পাখার ঝট্‌পটে এবং কোঁ কোঁ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার কুকুর প্রদর্শনী মেলা হয় ; তখন সুবৃহৎ (Mastiff) মাষ্টিফ্ কুকুর হইতে ইন্দুরের ন্যায় ছোট (Terrier) টেরিয়ার কুকুর পর্যন্ত সব রকমের কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। কখনওবা 'বিড়াল প্রদর্শনী' হয় ; তখন প্রাসাদের কোন কোন অঙ্গন বিড়ালে পূর্ণ হইয়া যায়।

স্ফটিক-প্রাসাদ লণ্ডন নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে স্থিত। ঘোড়ার গাড়ী বা রেলওয়ে, দুই উপায়েই তথায় যাওয়া যায়। রেলওয়েতে যাওয়া সুবিধা বলিয়া অনেকে রেলেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। উৎসব বা কোন মেলা উপলক্ষে দলে দলে যাত্রী লইয়া লণ্ডন হইতে রেলের গাড়ী সকল সিডেনহাম পল্লীতে আইসে, এবং এত লোকের জনতা হয় যে সন্ধ্যাকালে সহরে ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে স্থান পাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে। (অনুবাদিত)

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৮-৯।

বৃষ্টি

প্রমদাচরণ সেন



"তোমরা কি জান, বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?" শিক্ষকের এই কথা শুনিয়া ৭ বৎসরের বালক মণিমোহন বলিয়া উঠিল "আমি জানি। হাতীরা সমুদ্র হইতে শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া আকাশের উপর হইতে ছড়াইয়া দেয়, তাহাতেই বৃষ্টি হয়।"

শিক্ষক হাসিয়া বলিলেন "মণি! তোমাকে এ কথা কে শিখাইল? ভাল, হাতীগুলি কিরূপ বলিতে পার?"

মণি। মেঘের মত গায়ের রং—ঠাকুরমা বলিয়াছেন।

হরি, মতি, কেশব, সুরেন্দ্র সকলেই মণির কথায় হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, কেশব তুমি বল দেখি বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?"

কেশব বলিল, "মেঘ হইতে।"

শিক্ষক। মেঘ কি? মেঘই বা কোথা হইতে আইসে?

কেশব। জানি না।

সুরেন্দ্র। আমি জানি। সমুদ্র হইতে মেঘ উঠে।

শিক্ষক। তোমার অনেকটা ঠিক বলা হইয়াছে। আচ্ছা, আমি তোমদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ একটী বিষয় তোমরা বোধ হয় জান। বল দেখি সোলা জলে ভাসে কেন?

মতি। সোলা জলের অপেক্ষা হাল্‌কা, এই জন্য।

হরি। সে দিন ভৈরব ঢুলীদের বাড়ীর কাছে আমরা খেলা করিতে গিয়াছিলাম ; তখন দেখিলাম তাহাদের শিমুলগাছ হইতে ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতেছে। তাহার কতকটা নীচে পড়িয়া গেল, আর কতকটা সরু সরু হইয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মণি। আমি দেখিয়াছি। সেগুলি অতি সুন্দর।

হরি। তুলাগুলি যে বাতাসে ভাসিতেছিল সেও তাহা হইলে এই কারণে যে তুলার সরু সরু খণ্ডগুলি বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা।

শিক্ষক। হাঁ—অনেকটা তাই বটে। আচ্ছা এখন যাহা বলি মনোযোগ করিয়া শুন। ভয়ানক রৌদ্রের সময় পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়, তাহা জান। ভাল, এ জল কোথায় যায় জান?

সুরেন্দ্র। মাটীতে বসিয়া যায়।

শিক্ষক। খানিকটা মাটীতে বসিয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্তটা যায় না। বাকীটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

মণি। বাষ্প কি?

শিক্ষক। বাষ্প বাতাসেরই মত ; তবে বাষ্প কখন কখন দেখা যায়।

যেমন খুব ঠাণ্ডা করিলে অনেক জলের মত জিনিশ বরফ হইয়া যায়, তেমনি খুব গরম করিলে অনেক জিনিশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গ্রীষ্ম কালে যখন ভয়ানক রৌদ্র হয়, তখন সমুদ্র, নদী, পুকুর প্রভৃতি হইতে রৌদ্রের তেজে অনেক বাষ্প উঠে।

যদি এক খণ্ড সোলা লইয়া জলের তলায় ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে কি সোলার খণ্ডটা সেইখানেই থাকে?

মণি। না, না! লাফাইয়া উপরে উঠে।

শিক্ষক। বেশ, মণি! এই জন্যই রৌদ্রের ঝাজে যখনই সমুদ্র, প্রভৃতি হইতে বাষ্প উঠিল, অমনি হাল্‌কা বলিয়া বাষ্প লাফাইয়া বাতাসের উপরের দিকে চলিয়া গেল। এখন বুঝিয়াছ?

কেশব। আপনি বলিলেন বাষ্প প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু মেঘত দেখা যায়! তবেত বাষ্প আর মেঘ এক জিনিশ নয়।

শিক্ষক। বুঝাইয়া দিতেছি। জল হইতে গরমেতে যদি বাষ্প হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে অবশ্য জল হইবে।

সকলে। হাঁ।

শিক্ষক। তোমরা বোধ হয় জান পাহাড়ে দেশ বড় ঠাণ্ডা।

মতি। আমি জানি। বাবা দার্জিলিং-এ গিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এখানে যখন গরম, তখন সেখানে লেপ গায়ে দিতে হয়।

শিক্ষক। পাহাড়ে দেশ খুব উচ্চ বলিয়া তথায় শীত অধিক। উচ্চ যায়গা না হইলেই যে শীত হইবে না, তাহা বলিতেছি না ; তবে মোটা মুটি জানিয়া রাখিয়া দাও, যে উচ্চ যায়গায় শীত খুব বেশী। কেন উচ্চ যায়গায় শীত বেশী হয় তাহা জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। তবেই বুঝিতে পার, বাষ্প উপরে গিয়া খুব ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে।

সকলে। বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। এই ঠাণ্ডায় পড়িয়া বাষ্প জল হইয়া যায়, কিন্তু সেই জলবিন্দু এত ছোট ছোট যে অনায়াসে বাতাসের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। আমরা আকাশে যে মেঘ দেখিতে পাই, সে এই জলবিন্দু। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না ; মেঘ খুব গাঢ় না হইলে বৃষ্টি হইতে পারে না ; তাহার পর, বাতাসে মেঘকে তাড়াইয়া অন্য দেশে লইয়া যায়, তাহাও বৃষ্টি না হইবার কারণ। যাহা হউক, যখন এই ছোট ছোট জল বিন্দু বাতাসের তাড়ায় এক সঙ্গে মিশিয়া ভারী হয়, তখনই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বুঝিয়াছ।

আজ এই পর্যন্ত। অন্য একদিন এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে গল্প করা যাইবে। এখন বাড়ী যাও।

ছেলেরা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বৃষ্টির বিষয়ে গল্প শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইল। মনে মনে ভাবিল বাড়ীতে গিয়া এই বিষয়ে সকলকে গল্প করিব।

কেশব বলিল "মেঝকাকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিব।"

মণি বলিল "পুঁটীকে শিখাইয়া দিব।"

মতি বলিল "মার কাছে গিয়া এই গল্প বলিব।"

হরি বলিল "রামার কেবল খেলা! আচ্ছা, আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে।"

সুরেন্দ্র বলিল "বৃষ্টির দিনে এই সকল কথা সকলকে মনে করিয়া দিব।" এইরূপ বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, গোলমাল করিতে করিতে, মাষ্টার মহাশয়কে গুড্‌বাই সার, (Good by, Sir) বলিয়া নমস্কার করিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল।

১ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১৪-১৫।

আলোক-মঞ্চ

প্রমদাচরণ সেন

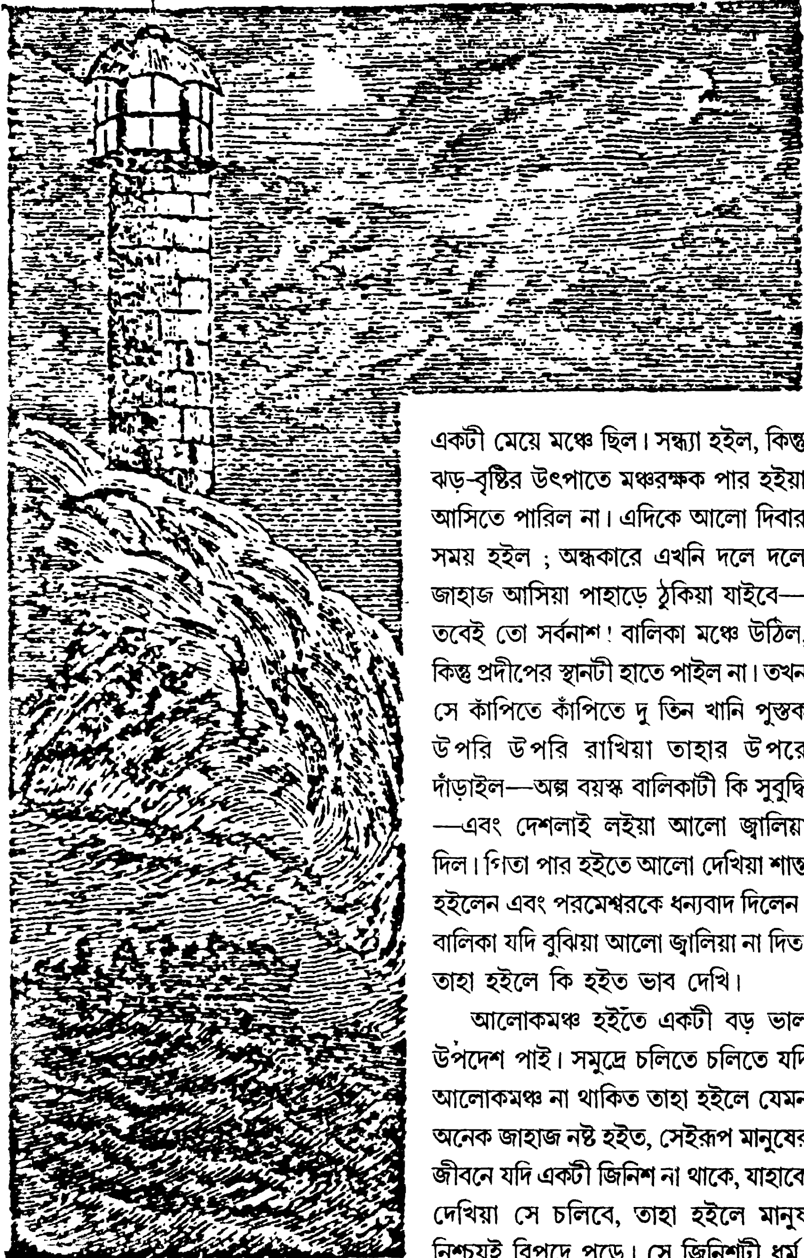

ল দেখি আলোকমঞ্চ কাহাকে বলে? যাঁহারা কখনও সমুদ্রে যান নাই, তাঁহারা জানেন না সমুদ্র কি ভয়ানক স্থান। একেতো প্রায় সর্বদাই ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে জলের নীচেতে পাহাড় সকল মাথা লুকাইয়া থাকে, ইহাতে জাহাজগুলিকে যে কত সময় কত বিপদে পড়িতে হয়, তাহার সীমা নাই। যদি রাত্রিতে এই সকল পাহাড়ের নিকটে কোনরূপ আলোকের বন্দোবস্ত

না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের কি ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। অন্ধকারে জাহাজ বেশ চলিয়া আসিতেছে, কোথাও কোন গোল নাই, হঠাৎ একটী পাহাড়ে লাগিয়া জাহাজখানি চুরমার হইয়া গেল, তখন কত লোকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা ভাব দেখি? এইরূপ ভয়ানক বিপদ যত দূর সম্ভব বারণ করিবার জন্য পৃথিবীর অনেক স্থানে পাহাড়ের উপরে আলোকমঞ্চ সকল নির্মাণ করা হইয়াছে। পরপৃষ্ঠায় যে চিত্র দেখিতেছ উটী এইরূপ একটী আলোকমঞ্চ।

সকল পাহাড়ই যে সমুদ্র-জলের নীচে লুকাইয়া থাকে তাহা নহে, দু-একটী উপরে মাথা তুলিয়াও থাকে, কিন্তু জোয়ারের জল আসিলে সেগুলিও খানিকটা ডুবিয়া যায়। মানুষেরা বুদ্ধি করিয়া এই সকল পাহাড়ের উপরে শক্ত করিয়া ঘর তুলিয়াছে, এবং তাহার উপরে আলো দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। মঞ্চের নিকটে এক জন মঞ্চরক্ষক সর্বদাই থাকে, তাহাকে পরিবারের সহিত এইখানে থাকিতে হয় ; সন্ধ্যা হইবামাত্র মঞ্চরক্ষক মঞ্চের উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেয়। এই আলোক অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় এবং দূরে যে সকল জাহাজ আসিতেছে, তাহারা এই আলোক দেখিয়াই সতর্ক হয়। কেবল যে লুকান পাহাড়ের উপরেই আলোক দিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহা নহে ; সমুদ্রে যাইতে যে সকল স্থানে কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা, সেইখানেই রাত্রিতে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের গঙ্গানদী যেখানে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিকটে এক স্থানে একটী আলোকমঞ্চ আছে, কিন্তু সেটী পাহাড়ের উপরে নহে। এইরূপ আলোকমঞ্চ তোমার আমার কাজে লাগে না, কেননা আমরা সমুদ্রে যাওয়া দূরে থাকুক, বাড়ি ছাড়িয়া তিন পা নড়িতে চাহি না ; কিন্তু যাহাদিগকে সর্বদা সমুদ্রে চলিতে ফিরিতে হয়, সেই সকল জাহাজের মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা এই আলোকমঞ্চ পাইয়া সুখী কিনা? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, যে তিনি মনুষ্যকে এমন সুবুদ্ধি দিয়াছেন ; এবং মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ হই যে আমাদিগের প্রাণ বাঁচাইবার এমন সুন্দর উপায় করা হইয়াছে।"

কিন্তু সমুদ্রের মধ্যস্থিত সকল পাহাড়ের উপরেই যে আলোকমঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে, তাহা নহে। অনেক পাহাড়ে নাই ; সে সকল স্থানে জাহাজ চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের অনেক উত্তরে এইরূপ একটী পাহাড়ময় স্থানে একজন বিধবা জেলেনী বাস করিতেন। মাছ ধরিয়া এবং অন্য ছোট ছোট দুএকটা কাজ করিয়া জেলেনীর দিন চলিত কিন্তু একটী ভাবনায় তাঁহার বড় ক্লেশ হইল। তিনি দেখিলেন রাত্রিতে অনেক জাহাজ পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে বড় বিপদ হয়, অথচ সেখানে একটীও আলোকমঞ্চ নাই। বিধবা জেলেনী মনে মনে ভাবিলেন যে 'যদি আমার জানালায় একটী আলো সমস্ত রাত্রি রাখা যায়, তাহা হইলেও তো কাজ চলে।' কিন্তু তেলের পয়সা কোথায় পাইবেন, এই নূতন ভাবনা তাঁহার উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিশ্রমে যে রোজগার হয়, তাহাতে তেলের পয়সা যোঠে না, সুতরাং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছু বেশী পরিশ্রম করিয়া তেলের পয়সা পুঁজি করিবেন। যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ ; ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানালায় আলোক দেখিয়া অনেক জাহাজ যে বাঁচিয়া গেল, এই আহ্লাদে বিধবার কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে হইত না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, এক দিনও জানালায় আলো দিতে ভুলেন নাই।

আমরা আলোকমঞ্চ সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। একবার এক আলোকমঞ্চের রক্ষক কোন কাজে সমুদ্রের পারে নগরে গিয়াছিল। তাহার অল্পবয়সের



একটী মেয়ে মঞ্চে ছিল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির উৎপাতে মঞ্চরক্ষক পার হইয়া আসিতে পারিল না। এদিকে আলো দিবার সময় হইল ; অন্ধকারে এখনি দলে দলে জাহাজ আসিয়া পাহাড়ে ঠুকিয়া যাইবে—তবেই তো সর্বনাশ! বালিকা মঞ্চে উঠিল, কিন্তু প্রদীপের স্থানটী হাতে পাইল না। তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে দু তিন খানি পুস্তক উপরি উপরি রাখিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইল—অল্প বয়স্ক বালিকাটী কি সুবুদ্ধি—এবং দেশলাই লইয়া আলো জ্বালিয়া দিল। পিতা পার হইতে আলো দেখিয়া শান্ত হইলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। বালিকা যদি বুঝিয়া আলো জ্বালিয়া না দিত, তাহা হইলে কি হইত ভাব দেখি।

আলোকমঞ্চ হইতে একটী বড় ভাল উপদেশ পাই। সমুদ্রে চলিতে চলিতে যদি আলোকমঞ্চ না থাকিত তাহা হইলে যেমন অনেক জাহাজ নষ্ট হইত, সেইরূপ মানুষের জীবনে যদি একটী জিনিশ না থাকে, যাহাকে দেখিয়া সে চলিবে, তাহা হইলে মানুষ নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে। সে জিনিশটী ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দিকে যদি মানুষ না চাহিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার বিপদ কে রাখে? আর যে ধর্ম্মকে

চিনিয়া, চরিত্রকে ভাল রাখিয়া চলে, তাহার বিপদ হয় না। যদি জাহাজের লোক আলোকমঞ্চের আলোক থাকা সত্ত্বেও বিপদে পড়ে তবে সে' দোষ জাহাজের লোকদিগের, আলোকের নহে ; তেমনি যদি ধর্ম্ম থাকিতে তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া মানুষ বিপদে পড়ে, তবে সে দোষ কাহার? বালক বালিকাগণ! সাবধান! বড় হইতেছ, সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের ন্যায় অনেক বিপদাপদ আসিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মকে দেখিয়া, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চল, তবে কিসের ভয়?

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১৮-১৯।

মাছি

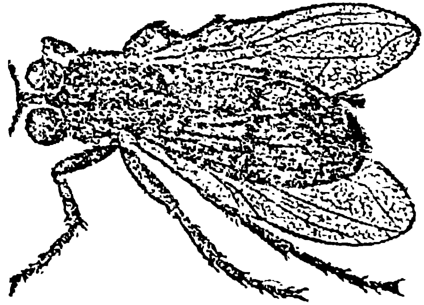
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



বিলেও বুঝিতে পার কি, এটী একটী মাছি? অনুবীক্ষণ নামে একরূপ যন্ত্র আছে তাহার তলায় ছোট জিনিষও খুব বড় দেখায় ; সেই যন্ত্রের তলায় মাছিকে যেরূপ দেখায় ছবিটি সেইরূপে আঁকা হইয়াছে। মাছির নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে মনে বলিতেছেন "মাছি তো মাছি ; দুর্গন্ধ ময়লা যায়গায় থাকে, দেখিলে ঘৃণা হয়। ভিন্ ভিন্ করিয়া আসিয়া গায়ে বসে, বার বার হাত যোড় করে, আর মুখ হইতে শুঁড়ের মত একটা কি বাহির করিয়া চাটিতে থাকে। ছি!"

মাছিগুলিকে কেহ দেখিতে পারে না ; সকলেই দূর দূর করে। যেখানে ময়লা যত বেশী সেখানে মাছি তত বেশী ; মাছিগুলি যেন পরিষ্কার যায়গায় থাকাটাকে পাপ মনে করে। কিন্তু এক একটা অপরিষ্কার ছেলে মাছির চেয়েও খারাপ। তবে ভাই, মাছিগুলিকে তোমরা এত ঘৃণা করিবে কেন? ঈশ্বরের আশ্চর্য ক্ষমতা মাছির মধ্যেও দেখিতে পাই।

ছবির দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিবে যে মাছির গায়ের দুই স্থান খুব সরু। শরীরটি তিন ভাগে রহিয়াছে। প্রথম ভাগে মাথা, তার পর বুক, পা, পাখা ইত্যাদি, শেষ উদর। বুকে পা ; কেমন তামাসা! তোমার আমার মুখ দাঁতে ভরা কিন্তু মাছির দাঁত নাই। দাঁতের আবশ্যকও নাই। যেখানে যেটুকু রস, তাহাই মাছির আহার, মাছি শক্ত জিনিশ খায় না। শক্ত কিছু খাইতে হইলে আগে তাহা মুখের লালা দিয়া গলাইয়া নেয়। মুখে শুঁড়ের মতন যাহা দেখিয়াছ তাহা রস টানিবার যন্ত্র। এক একটা মাছির যতগুলি চোখ হাজার জনের চোখ একত্র করিলে ততগুলি হয় না। আপাততঃ দুটী চোখ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী বহু বহু শত চক্ষু একত্র করিয়া হইয়াছে। অণুবীক্ষণে দেখিতে পারিলে মৌচাকের মত দেখিতে। আহার খুঁজিতে মাছিকে অনেক বার ধূলা বালির মধ্যে যাইতে হয় এজন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া চক্ষের উপর একখানি আবরণ দিয়া দিয়াছেন।



মাছির পায়ের অগ্রভাগে ছোট ছোট দুইটী আঙ্গুলের মত বাহির হইয়াছে, তাহার

প্রত্যেকটীর পাশ দিয়া একটী নখ। এই নখের চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলি পদার্থ আছে, দেখিতে লোমের ন্যায়। কত পণ্ডিত কত কথা বলিলেন কিন্তু মাছির পায়ের এই সমস্ত জিনিশ দিয়া কি হয় তাহা আজিও ঠিক হইল না। মাছিগুলি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারে, আমাদের মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় না। অনেকে বলেন মাছির পায়ের আঙ্গুল দুটি ইহার কারণ। মাছি যে জিনিশের উপর বসে, তাহার পায়ের আঙ্গুলগুলি তাহাতে জোঁকের মত চুমুক দিয়া লাগিয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন যে আঙ্গুল দু'টি ছোট ছোট দুটি থলে ; তাহার ভিতরে এক প্রকার আঠা আছে, তাহাতে মাছির পা সমস্ত জিনিশের উপর লাগিয়া থাকিতে পারে। আর এক দলের পণ্ডিতেরা ইহার কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে নখের চারিধারে লোমের মত যাহা আছে, তাহাই মাছির যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিবার কারণ। মাছির ঠ্যাঙ্গে অনেকগুলি লোম রহিয়াছে, তাহা দ্বারা গা আচড়াইয়া পরিষ্কার রাখে। অপরিষ্কার যায়গায় থাকে বলিয়া নিজে অপরিষ্কার নয়।

মাছির পাখা অতি হাল্‌কা, অথচ খুব শক্ত। এরূপ পদার্থ আর নাই বলিলেও অপরাধ হয় না। পাখার মধ্যে যে সকল শিরার মত রহিয়াছে, সেগুলি ফাপা। নিশ্বাস তুলিবার সময় তাহাদের মধ্যে বাতাস যায়। ফলতঃ পাখাগুলির দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। মাছি উড়িবার সময় যে শব্দ শুনা যায় সে তাহার পাখার। পাখাগুলি এক সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০ বার কাঁপে ; ইহাতে এই শব্দ হয়।

মাছির নিকট আমরা কি কি শিক্ষা করিতে পারি তাহার সম্বন্ধে এক সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা মাছির কথা শেষ করিব।

মাছি ক্ষুদ্র জীব তথাপি তাহার শরীরে যে সকল আর্শ্চয জিনিশ রহিয়াছে তোমার আমার শরীরে তাহা অপেক্ষা অধিক নাই।

না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছিগুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায় ; দুধের বাটীতে যত মাছি উড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার কয়টা উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছ?

এইটুকু অনিষ্টে দশজনের ক্ষতি হয়। মাছি দুধের বাটীতে পড়িয়া মরিল, ক্ষুধা তো তাহার গেলই না ; তুমিও দুধটুকু খাইতে পারিলে না।

সামান্য পাপেও মহা অনিষ্ট হয়। মাছি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিশ, কিন্তু একটী মাছি পড়িয়া মহামূল্য ঔষধ অকর্মণ্য হইয়া যায়।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ২৮-২৯।

বাবুগিরি ·

প্রমদাচরণ সেন


র্ণ বড় ভাল মেয়ে—আমাদের এক ক্লাসে পড়িত! সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না। সকলেই বলিত "স্বর্ণ বেশ মেয়েটী! বাবুগিরি কাহাকে বলে তাহা জানে না ; যা দাও তাই খায়, যা পায় তাই পরে—বেশ!" আর আমার কথা উঠিলেই পাড়ার গৃহিণীরা নাক মুখ সিট্‌কে বলিতেন "প্রতিভার সকলি আশ্চর্য—পরিষ্কার কাপড় নইলে পরা হয় না। কোনও যায়গায় বসিতে

বলিলে চারিদিকে মিট্ মিট্ করে তাকান হয়—বেছে বেছে জিনিশ খাওয়া হয়—ছিঃ!!" স্বর্ণকে সকলে ভাল বাসিতেন, তাহাতে আমার দুঃখ হইত না, কিন্তু কেন তাহাকে ভালবাসা হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। বাবুগিরি স্বর্ণের ছিল কিনা, তাহা আমি জানি না, তবে স্বর্ণকে কখনও পরিষ্কার কাপড় পরিতে দেখি নাই। বাড়ীতে, স্কুলে, নিমন্ত্রণের যায়গায়, সকল যায়গাতেই নোংরা কাপড় দেখিয়া স্বর্ণকে চিনিয়া লওয়া যাইত। আর গরিব প্রতিভার অপরাধের মধ্যে পরিষ্কার থাকিত, যাহা খাইলে অসুখ হইতে পারে, তাহা খাইত না, এই জন্য পাড়ার গৃহিণীরা ভারী বিরক্ত ছিলেন, এখনও বিরক্ত আছেন কি জানি না। পরিষ্কার থাকাই কি বাবুগিরি? নোংরা থাকাই কি ভাল মানুষের লক্ষণ? আমি সর্বদা পরিষ্কার কাপড় পরিতাম—কাপড় অপরিষ্কার হইলে নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া লইতাম—খারাব জিনিশ খাইলে অসুখ হইবে বলিয়া লোকের অনুরোধে উপরোধেও খারাব জিনিশ খাই নাই, এই অপরাধে আমাকে সকলে গালাগালি দিতেন, আর স্বর্ণ কুড়েমি করিয়া নিজের কাপড় নোংরা করিয়া রাখিত, আর পেটুকের মত কাঁচা কুল, কাঁচা কলাই, তেঁতুল, আর ছাইপাঁশ খাইয়া অসুখ করিয়া বসিত, তখন সকলে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দুঃখ করিতেন। "প্রতিভা বাবু, স্বর্ণ ভাল" এই কথা সকলেরই মুখে শুনা যাইত। স্বর্ণ অপরিষ্কার শরীর লইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া আজও সারা হইতেছে, আর আমার শরীর আজও বেশ সুস্থ। তবুও আমি লোকের নিকট বাবু, বড়লোক, জেঁকো এই সকল নাম পাইয়াছি। পরিষ্কার থাকিয়া শরীর ভাল রাখিলেই কি বাবুগিরি করা হয়? দোহাই পাঠক-পাঠিকাগণের! তোমরাই বিচার কর।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ২৯-৩০।

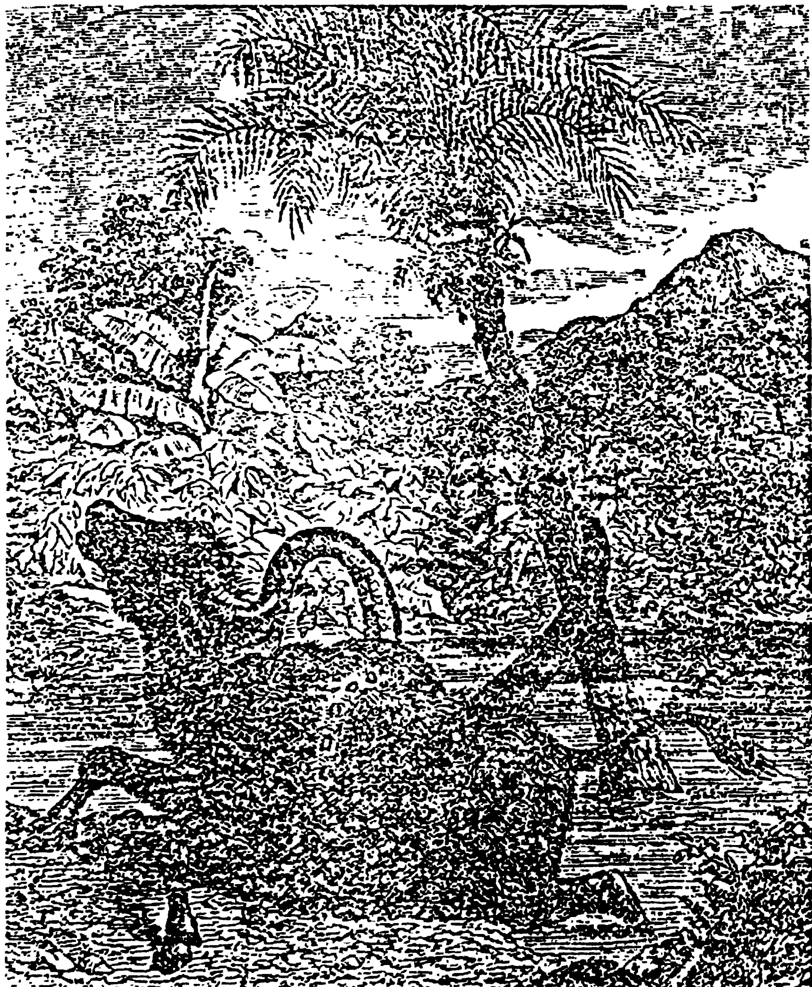
সর্প

প্রমদাচরণ সেন



পরে! কি ভয়ানক সাপ! মহিষ বেচোরার প্রাণ এবার আর বাঁচে না। এত বড় সাপ কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ? আমি বাল্যকালে এক দিন শুনিয়াছিলাম যে আমাদের পাশের বাটীতে সাপুড়িয়ারা সাপ খেলিতে আসিয়াছে; অমনি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা ঝাঁকা দুজনে বহিয়া লইয়া আসিতেছে। খানিকক্ষণ পরে ঝাঁকাটা খুলিয়া দিলে সর্প মহাশয় বাহির হইলেন। উঠানের চওড়ার দিকে তাঁহার শরীরটী প্রায় এপাশ ওপাশ হইয়া গেল। বোধ হয় সর্প মহাশয়ের শরীর ৫।৬ হাত হইবে। আর এক দিন পাড়ায় এক বাটীতে গণ্ডগোল হইতেছিল, শুনিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক। সেই বাড়ীর এক ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলি করিয়া পড়িয়াছিল; অস্পষ্ট আলোতে তাহাকে সাপ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে নাই। আমাদের সমবয়স্ক একটী বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সাপটীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারিল না; সে মনে করিল কাঁঠালের ভুতুড়ি (তখন কাঁঠালের সময়) পড়িয়া রহিয়াছে। বালক তাহা লইয়া আসিতে গেল, কিন্তু হাত দিবা মাত্র তেলপারা ঠেকিল, এবং সর্প বাবু নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পাড়াময় সম্বাদ ছড়াইয়া পড়িল, উত্তরের বাড়ীতে প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়াছে।'

কোথা হইতে আসিল, কেহই তাহা জানে না। যাহা হউক, সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সর্প নিদ্রা যাইবার অসুবিধা দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর প্রায় ৬ হাত হইবে। উদর পূর্ণ করিয়া পান খাইতে খাইতে ফলারে ব্রাহ্মণেরা যেমন বিকাল বেলা ধীরে ধীরে বাড়ী যায়, সাপটীও সেইরূপ ধীরে ধীরে আপনার স্থানে যাইতে লাগিল। কিন্তু সাপকে কে কোথায় দয়া করিয়া থাকে? সাবোল, লাঠি, বল্লম, যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া সকলে মার্ মার্ শব্দে সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 'মা মনসার প্রিয় ভৃত্য' এক বন হইতে অন্য বনে আশ্রয় লইয়াও কোন মতে প্রাণ বাঁচাইতে



পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ গেল ; আমরা মহা আহ্লাদে সর্পকে দাহন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। এই যে দুইবার দুটী প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়াছি, তাহার কোনটাই বোধ হয় আমাদের অদ্যকার চিত্রিত সর্পের ন্যায় বৃহৎ বা ভয়ানক হইবে না ; দেখিয়াছ, কি ভয়ানক

তেজ! এই জাতীয় সর্প পাহাড়ে ও জলাময় বৃহৎ জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের একটী অভ্যাস এই যে ইহারা রৌদ্র না পাইলে থাকিতে পারে না ; এই জন্য শীতপ্রধান দেশে অধিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না।

তোমরা বোধ হয় সকলে সাপ-খেলা দেখিয়াছ। কেমন করিয়া সাপ ধরে তাহা জান কি? সাপুড়িয়ারা যখন শুনিতে পায় অমুক স্থানে সাপ আছে, তখন তাহারা বাঁশী লইয়া সেইখানে যায়। সাপ বাদ্য শুনিতে বড় ভালবাসে, এই জন্য তুবড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে মাথা তুলিয়া সেই দিকে আইসে। চতুর সাপুড়িয়া সুযোগ বুঝিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরে, এবং বিষের থলি ছিঁড়িয়া ও বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার ঝাঁকায় পোরে। এইরূপে এত তেজীয়ান যে সাপ তাহাকেও লোভে পড়িয়া মরিতে হয়। অনেকে মনে করে সাপুড়িয়ারা মন্ত্রের দ্বারা সাপকে বশ করে, কিন্তু তাহা ভুল। সাপ খেলিবার সময় বাঁশী বাজায় দেখিয়াছ? যদি কিছু থাকে, তবে সেই এক মন্ত্র। তাহার পর, সাপ ফণা তুলিয়া বাঁশীর শব্দে নাচিতেছে, এমন সময় ধূলিপড়া দিলেই অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপ অমনি মাথা নামায়, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। মূর্খ লোকেরা বলে ইহা মন্ত্রের গুণ। তোমাদিগকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি, কিন্তু সাবধান কাহাকেও বলিয়া দিওনা! ধূলো খুব সুন্দর রকমে গুড়ো করিয়া বলিবে "হে সাপ, আমাদের চক্ষের উপরে যেমন চক্ষের পাতা আছে, ঈশ্বর তোমাকে সেরূপ দেন নাই ; আর আমাদের চক্ষু দুইটী যেমন দুই পাশে, তোমার চক্ষু দুটী সেরূপ না হইয়া প্রায় মাথার উপরে ভগবান দিয়াছেন, এজন্য ধূলি নিক্ষেপ করিলেই তাহা উড়িয়া তোমাকে কাণা করিয়া দিবে—এবং কাজেই তোমাকে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাটীর উপরে জড়শড় হইয়া পড়িতে হইবে। তোমার এইরূপ গঠন এবং ধূলি নিক্ষেপের এই ফল জানিয়া এই ধূলি নিক্ষেপ করিলাম—সহজবুদ্ধির দোহাই তুমি এখনই কাণা হইয়া যাও।"— এই বলিয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপের দুর্দশার সীমা থাকিবে না।

এইত গেল সাপ-খেলার কথা। তাহার পর সাপের স্বভাবের কথা কিছু বলা উচিত। সর্পজাতি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর। অকারণে অথবা সামান্য কারণে সকলকেই দংশন করে। সকল সাপের দংশনে মানুষ মরে না। যাহাদের বিষ নাই, তাহারা দংশন করিলে সামান্য জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হয় না, কিন্তু বিষাক্ত সাপের মত ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নাই ; বনে না গেলেই বাঘের হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নদীতে না গেলেই কুমীরের ভয় থাকে না, কিন্তু এমন স্থান কোথায় যেখানে সর্প যাইতে পারে না? এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কয়েকটী উপায় বলা যাইতে পারে।—যেখানে সাপের ভয়, সেই সকল স্থানে যাইতে হইলে একটা আলো লইতে পারিলে তো ভালই, অন্ততঃ একগাছা লাঠি লইয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে যাইবে। শীতের সাপে প্রায় কামড়ায় না। গ্রীষ্মের দিনে এই সতর্কতা অবলম্বন করিলে চলিতে পারে। যদি নিকটে সর্প থাকে, তাহা হইলে শব্দ শুনিয়া চলিয়া যায়। বাসগৃহের মধ্যে যদি ইঁদুর অধিক থাকে তাহা হইলে সর্প আসিতে পারে তাহা মনে রাখিও, কারণ সর্প ইঁদুরকে 'ফলার' করিতে বড় ভালবাসে। যাহাতে সর্প না আসিতে পারে তজ্জন্য একটী উপায় অবলম্বন করিতে একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছেন ; সে উপায়টী এই— আজকাল প্রায় প্রত্যেক পল্লিতেই ডাক্তারী ঔষধ পাওয়া যায় ; এইরূপ পল্লি হইতে কিছু কার্বলিক এ্যাসিড আনিবে। তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া কার্বলিক এ্যাসিডে

ভিজাইতে হইবে। অতঃপর যে সকল স্থান দিয়া সর্পের আসিবার সম্ভাবনা, অথবা যে সকল স্থানে সর্পের থাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ প্রত্যেক গর্তের মুখে ভিজান বস্ত্র এক এক খণ্ড রাখিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান হইবে যেন ভিজাইবার সময় কার্বলিক এ্যাসিড হাতে না লাগে, তাহা হইলে ফোস্কা হইতে পারে।

বালকবালিকাদিগের মধ্যে অনেককে এই সর্পের মত বলিয়া মনে হয়। অনেক বালক বালিকা সামান্য কারণে, মাতার প্রতি, ছোট ভাইভগিনীদিগের প্রতি, দাস দাসীর প্রতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া থাকেন। এই মন্দ অভ্যাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্তব্য যে পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া, ভালবাসা, প্রভৃতি মনের ভাব দিয়া সর্প অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দিয়াছেন। এখন, আমরা যদি সেই দয়া, সেই ভালবাসা সকলকে না দেখাই, এবং একটুতেই জ্বলিয়া উঠি, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে অবমান করা হয়। পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সাপের মত চরিত্র কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও থাকে, তিনি সত্বর আপন-স্বভাব ভাল করিয়া যথার্থ মানুষ হউন।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৩৪-৩৬।

ক্ষুদ্র জিনিশ

প্রমদাচরণ সেন



অনেকের অভ্যাস আছে ক্ষুদ্র জিনিশ দেখিলে আর তাহা গ্রাহ্য করিতে চান না। একটী পয়সা বাজে খরচ, একটী ঘণ্টা মিথ্যা গল্প করা, একটু অল্প স্বাস্থ্য নষ্ট করা, এ সকল বিষয়ে কাহারও কাহারও মনোযোগ একেবারেই নাই। 'এসব সামান্য বিষয়' এই বলিয়া অনেকে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে চান না। কোন খারাপ কাজের সম্বন্ধে যেমন, ভাল কাজের সম্বন্ধেও সেইরূপ,—'সামান্য কাজ, ওর জন্য আর কি?' এই কথাই অনেকে বলেন। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে বড় লোক হইয়াছেন, যদি একবার তাঁহাদের জীবনের কথা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, কোন জিনিশ সামান্য বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। এক জন বড় লোককে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কিরূপে এই সুনাম লাভ করিলেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আমি কোন জিনিশকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি নাই।"

যদি কেহ ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ একটী করিয়া পয়সা বাজে খরচ করে, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় হিসাব করিলে সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার প্রায় দুই শত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যে সময় কাজ কর্মের শক্তি থাকিবে না, সে সময় এতগুলি টাকা হাতে থাকিলে কত কাজ হইত। আট বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যহ এক এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলে শেষে দেখা যায় যে প্রায় দুই বৎসর সময় নষ্ট হইয়াছে। এইতো গেল অপব্যয়ের কথা। তাহার পর শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। অনেকে সামান্য সামান্য বিষয় হইতে কিছুই শিখিবার জিনিশ পান না, কিন্তু জ্ঞানী লোকদিগকে এই কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন "সে

কি? চোখ্ কাণ খোলা থাকিতেইতো চারিদিক হইতে শিক্ষা পাওয়া যায়!" চক্ষু কর্ণ সকলেরই আছে, কিন্তু এক জন তাহার ব্যবহার জানেন বলিয়া বড় লোক, আর তুমি আমি চোখ কাণ বোঝার মত বহিয়া লইয়া বেড়াইমাত্র, কাজে লাগাই না, এই জন্যই আমরা মূর্খ। ফল পাকিলেই গাছ হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, ইহাতো সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু নিউটন সাহেব বুঝিলেন, পৃথিবী ফলকে টানে, তাই ফল পড়ে। জল গরম করিবার সময় হাঁড়ির মুখে কাপড় চাপা দিলে, জলের ধূঁয়া অর্থাৎ বাষ্প কাপড়টাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহাতে কাপড়টা কাঁপে, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং জানি ; কিন্তু মহাত্মা জেম্‌শ্ ওয়াট্ তাহা দেখিয়া স্থির করেন বাষ্পের 'গায়ে' জোর আছে, তাহাতেই কাপড় নড়ে এবং এই হইতেই রেলের গাড়ী প্রভৃতি ধূম কলের সৃষ্টি হইল। তোমরা বোধ হয় জান বিলাতে টেমশ নদীর নীচে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুরঙ্গ-পথ আছে। ব্রুনেল নামে একজন সাহেব ১৮২৫ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত খাটিয়া অর্থাৎ ১৮ বৎসরে এই কাজটী শেষ করেন। কিসে তাঁহার এ কার্যের সুবিধা হইল, তাহা কি জান? তিনি এক দিন দেখিলেন একটী ছোট পোকা এক খণ্ড কাষ্ঠের মধ্য দিয়া গর্ত করিয়া যাইতেছে। পোকাটী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাষ্ঠের মধ্যে খিলান করিয়া এক প্রকার বার্ণিস লাগাইয়া যাইতে লাগিল, ব্রুনেল সাহেব তাহা বেশ করিয়া দেখিলেন, এবং এই 'সামান্য' বিষয়ই বড় করিয়া টেমশ নদীর সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত হইল !

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা নাই। কি অপব্যয় বিষয়ে, কি সদ্ব্যয় বিষয়ে, কি শিক্ষা বিষয়ে, কি উন্নতি বিষয়ে, সকল দিকেই 'সামান্য' জিনিশের মূল্য আছে। পরমেশ্বর যে হাতে খুব বড় জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হাতেই সামান্য জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কোন দ্রব্যকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না ; মনে রাখিও সেই বড় লোক হয় যে সামান্য বিষয়কে অগ্রাহ্য করে না।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৪১-৪২।

দেখ, বাবা! কেমন বাছুর!

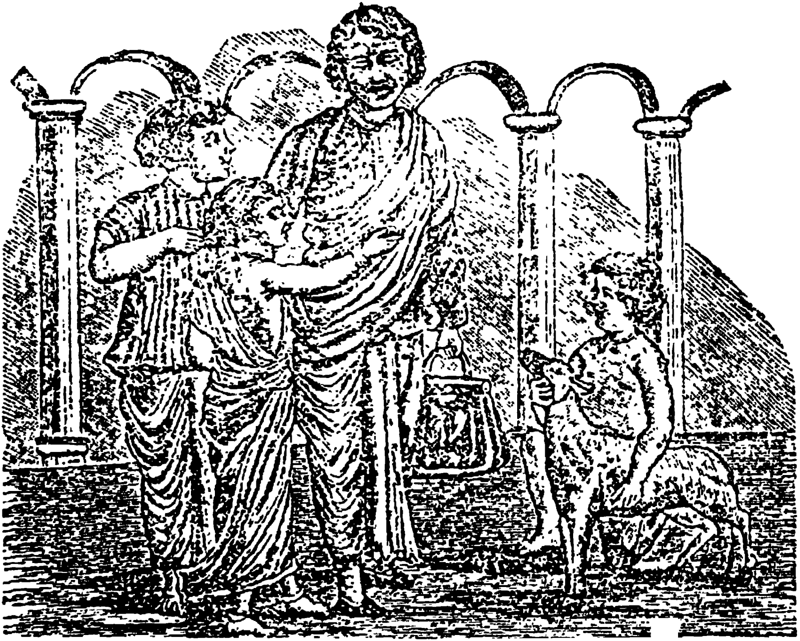
প্রমদাচরণ সেন



সন্ন বাবু একজন বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি অনেক কাল হইতে পশুর-প্রতি-অত্যাচার-নিবারণী সভার* সহিত যুক্ত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে পশুর প্রতি কখনও অত্যাচার হয় নাই ;—পিতা মাতার দেখাদেখি ছেলেগুলি পর্যন্ত বিড়াল, কুকুর, বাছুরদিগকে নিজেদের এক বাড়ীর লোকের মত ভালবাসে। ছেলেরা পশুদিগকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন প্রসন্নবাবু নিজের ঘরে বসিয়া কার্য করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, উঠানে সরলা (তাঁহার কন্যা) কাহার সহিত কথা বলিতেছে ; প্রসন্ন বাবুর বড় শুনিতে ইচ্ছা হইল, সরলা কাহাকে কি

এই সভার কার্য্যালয়, কলিকাতা রাধাবাজার, ১১১নং বাটীতে। সভা অনেক স্থানে আপনাদিগের এজেন্ট অর্থাৎ কার্য্যকারক নিযুক্ত করিয়াছেন ; ইহারা পশুর প্রতি কোন অত্যাচার দেখিলে অত্যাচারীর নামে আদালতে নালিশ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন।

বলিতেছে, এই জন্য উঠানের দিকে গলা বাড়াইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন উঠানের একপাশে মঙ্গলা গাই মহাসুখে সরলার হাতের খড় খাইতেছে, পাশে সরলা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। (বালিকার বয়স ৭ বৎসর মাত্র) প্রসন্ন বাবু আশ্চর্য বোধ করিয়া আরও একটু অগ্রে গেলেন। গিয়া শুনিতে পাইলেন, সরলা বলিতেছে, "মঙ্গলা! লক্ষ্মীটি! এই কটা খড় খেয়ে ফেল—না খেলে পেট ভরিবে কেন? (গাভী কোন কারণে মাথা নাড়িল) ও কি মাথা নাড় কেন? আর খাবে না? রাগ করিলে? তবে আমি যাই?" এই বলিয়া সরলা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গাভীটী অল্প ডাকিয়া তাহার মুখের দিকে স্নেহের চক্ষে তাকাইতে লাগিল। জগদীশ্বর বোবা করিয়াছেন, নতুবা বোধ হয় সে এই কথাই বলিতেছিল—"ওগো সুশীলে, আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? যদি এই পৃথিবীর সকল লোকই তোমার মত হইত, তাহা হইলে কি আমাদের কোন দুঃখ থাকিত! তুমি যাইও না তোমার মত বালক-বালিকা আমার কাছে আসিলে, আমি বড় সুখী হই ; ঈশ্বর করুন, সকলেই



তোমার মতন হউক।" গরুর ডাক শুনিয়া সরলা ফিরিল, এবং অবশিষ্ট খড়গুলি সম্মুখে রাখিয়া আঁচলের দ্বারা গরুর গায়ে বাতাস করিতে লাগিল। গরু যখন খাইতেছিল, তখন সরলার মুখে হাসি—সরলা বলিতেছিল "এই তো মা লক্ষ্মীটি! খাও, খাও! আবার সন্ধ্যা বেলা ভাত আনিয়া দিব এখন।" এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে প্রসন্ন বাবু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সরলার গালে হাত দিয়া বলিলেন "কি মা! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? উনি যদি তোমার মা হ'ন, তাহ'লে তো আমার মায়ের মা—দিদীমা—হলেন! বেশ মা! তোমার জন্য গরুর সঙ্গে আমার বেশ সম্পর্ক হ'ল।" "যাও বাবা! তুমি বড়—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলা সে স্থান হইতে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

এমন সাধের গরুর কিছুকাল পরে বাছুর হইবার সময় হইল। প্রসন্ন বাবু তখন কোন কার্যের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন—ছেলেরা পত্র লিখিয়া জানাইল মঙ্গলার শীঘ্রই বাছুর হইবে। অবশেষে এক দিন রাত্রিতে বাছুর হইল। প্রাতঃকালে ছেলেরা উঠিয়া দেখে সুন্দর বাছুর হইয়াছে, তখন তাহাদের আহ্লাদ দেখে কে? পাড়াময় ছুটিয়া গিয়া ছেলেরা খবর দিয়া আসিল বাছুর হইয়াছে। পাড়ার মেঝদাদা, সেঝঁ কাকা, দাদাবাবু, গোলাপ দিদী, কবিরাজ জেঠা মহাশয়, মামাবাবু, দিদিমণি, গৌরিমণি পিশী সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের গোলমালে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শুনিলেন বাছুর হইয়াছে। সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের সুখে সুখী, যেন প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে একটী নূতন ছেলে হইয়াছে! তবে ছেলেদের একমাত্র দুঃখ প্রসন্ন বাবু বাড়ীতে নাই। স্কুল হইতে আসিয়া বাছুরের খেলা দেখা ও বাছুরের সঙ্গে খেলা করা, ইহা ভিন্ন ছেলেদের অন্য খেলা নাই। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে প্রায় একমাস পরে প্রসন্ন বাবু বাটী আসিলেন। ছেলেরা যখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইল অমনি "বাবা বাছুর দেখিবে এসো" বলিয়া গরুর ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। দয়ালু প্রসন্ন বাবু—ছেলেদের সুখে সুখী ; তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বোবা পশুদিগকে এত যত্ন করে এবং ভালবাসে। ছেলেদের সহিত গরুর ঘরে গিয়া প্রসন্ন বাবু নূতন ছেলের ন্যায় নূতন বাছুর দেখিলেন ; ছেলেরা পিতাকে বাছুর দেখাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ছবিতে দেখ তাহারা কেমন বাছুর দেখাইতেছে !

ঈশ্বর করুন আমাদের সকল বালক বালিকাই এই প্রসন্ন বাবুর ছেলেগুলির মত পশুর প্রতি দয়া করিতে শিখুক। আহা! যাহারা কথা কহিয়া, মন খুলিয়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা কি উচিত?

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৪২-৪৩।

ধূমপান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রমদাচরণ সেন

কদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটী বাবু আসিয়া উপস্থিত। বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর হইবে, কিন্তু এত বড় ছেলের যত দূর ভদ্রতা জানা উচিত তাহার কিছু তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। পোষাক অতি পরিপাটী ; বাঁদর বাঁধিবার মত করিয়া বুকে পিঠে চাদর জড়ান ; কোঁকড়ান চুলে লম্বা সীথী ; চক্ষের চাউনিতে যেন অহঙ্কার পোরা ; জুতার শব্দ যাহাতে কিছু বেশী হয় সেই মত করিয়া চলা ; দেখিলেই বোধ হয় মা বাপ ইহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু অযত্ন করেন। আমি যে দোকানে গিয়াছিলাম ছেলে দুটী সেইখানেই আসিলেন, আমার একটু কৌতূহল হইল। জানিলাম তাঁহারা চুরট কিনিতে আসিয়াছেন। দোকানদার চুরট দেখাইল। চুরুট পসন্দ হইল না, একজন বলিলেন "এর চাইতে গুলি খাওয়া ভাল যে!"—আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। ছেলেমানুষ তামাক খায়! কি লজ্জার কথা!

যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বেড়াইতেও তোমাদিগকে পরামর্শ দিই না।

তাহারা কখনও ভাল ছেলে নয় ; তোমাদিগকে অনেক মন্দ বিষয় শিখাইয়া দিতে পারে, যাহার জন্য তোমরা বড় হইলে অনুতাপ করিবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে যাঁহারা তামাক খান তাঁহারা খারাপ লোক ; দুঃখের বিষয় অনেক ভাল ভাল লোকও তামাক খান। কিন্তু তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি তোমরা তামাক স্পর্শও করিও না ; তামাক বিষ। তামাক খাইয়াও যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কার রহিয়াছে, তাঁহারা যদি তামাক না খাইতেন তবে আরো কত ভাল থাকিতে পারিতেন। অন্যান্য অনেক দোষের মত তামাক খাওয়া কুসঙ্গের ফল ; যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিওনা।

তামাক খাওয়ার অনেক দোষ। প্রথম, নিজের ক্ষতি। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তামাকে মাথা গরম হয় এবং যাহারা তামাক খায় তাহাদের ঠোঁট প্রায়ই কাল হইয়া যায়।

তুমি বসিয়া রহিয়াছ, তামাকখোর তাঁহার যন্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর ভূড় ভূড় শব্দে রাশি রাশি ধূম তোমার নাকে মুখে দিতে লাগিলেন। তখন কি ইচ্ছা হয় না যে কাছে একটা লাঠি থাকিলে লোকটাকে কিছু ঔষধ দিয়া দাও?[১]

তৃতীয় দোষ, তামাক একবার যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়াও তাহারা ছাড়িতে চায় না। কাহারও নিকট গেলে সে যদি তামাক দিয়া অভ্যর্থনা না করিল তবে অনেক তামাকখোর তাহাকে অভদ্র মনে করে।

চতুর্থ দোষ, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তামাকখোরেরা প্রায়ই শেষকালে মদখোর হইয়া উঠেন, তবেইতো কি ভয়ানক সর্বনাশের পথ খোলা হইল ভাব দেখি?

পঞ্চম দোষ, কাপড়ে মুখে বিলক্ষণ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। তামাকখোর যে গেলাশে জল পান করিলেন, তোমার আমার সাধ্য নাই যে সেই গেলাশে জল পান করি। ভদ্র সমাজে যাওয়া কষ্ট—দুর্গন্ধে ভূত পালায়।

তামাকের নানারূপ আকার আছে,—নস্য, তামাক, এবং চুরোট। অনেকে শর্দি হইলে নস্য লইয়া থাকেন, এবং তাহাতে শর্দি আরাম হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি এইরূপে ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহারা নস্যের কেনা চাকর হইয়া পড়েন, আর তাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না ; আবার যে শর্দির জন্য এই ঔষধ, তাহাও যেন বার মাস তাঁহাদের শরীরে লাগিয়া থাকে। তামাদের দুই রকম ব্যবহার দেখা যায় ; এক ব্যবহার পানের সহিত চিবাইয়া খাওয়া, এবং অন্য ব্যবহার গুড় মাখিয়া আগুন দিয়া তাহার ধূম পান করা। বোধ হয় বলিতে হইবে না, আমরা ইহার কিছুই পসন্দ করি না। আর চুরোটের কথা কি বলিব? চুরোটের ফল যেরূপ খারাপ, মুখে শরীরে যেরূপ দুর্গন্ধ করিয়া দেয়, চুরোটটী কাহারও মুখে দেখিতেও সেইরূপ খারাপ। লেজের মত মুখে লাগিয়া আছে এবং তাহার এক পাশ হইতে যেন আগ্নেয়গিরির ধূমরাশি বাহির হইতেছে! ছি!

এ জঘন্য অভ্যাস শীঘ্রই সকলের পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের অনেকের অভিভাবক ধূম পান করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদিগকেও সেই পথে যাইতে হইবে, কে বলিল? যাঁহারা অভিভাবকদিগকে তামাক খাইতে দেখিয়া মনে করেন, বড় হইলে ভদ্র সমাজে তামাক খাওয়াই উচিত, তাঁহারা আপন আপন অভিভাবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন

১. এত শক্ত শাস্তি না দেওয়াই ভাল। যাহা হউক, লেখকের তামাকের প্রতি কত বিদ্বেষ, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে॥ স. স।

দেখি, নিজেরা তামাক খোর হইলেও তাঁহারা বালকদিগকে তামাক স্পর্শ করিতে পরামর্শ দেন কি না? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এরূপ পরামর্শ কখনই দিবেন না। নিজেরা কুৎসিৎ কার্য করেন বলিয়া যে ছোট ভাই, ভাইপো, অথবা ছেলেদিগকেও তাহা করিতে বলিবেন, ইহা সম্ভব নহে। আমার কোন অভিভাবক ভয়ানক তামাকখোর, অথচ আমি বাল্যকালে একদিন কুসঙ্গে থাকিয়া হুঁকা হাতে করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি আমাকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। 'সখা'র পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ধূমপায়ী থাকেন, আমাদের আশা, তাঁহারা শীঘ্রই এই কু-অভ্যাসের হাত ছাড়াইয়া পলাইবেন। স্কুলের শিক্ষকগণ যত্ন করিলে স্থানে স্থানে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সভা হইতে পারে।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৪৫-৪৭।

রেলের গাড়ী

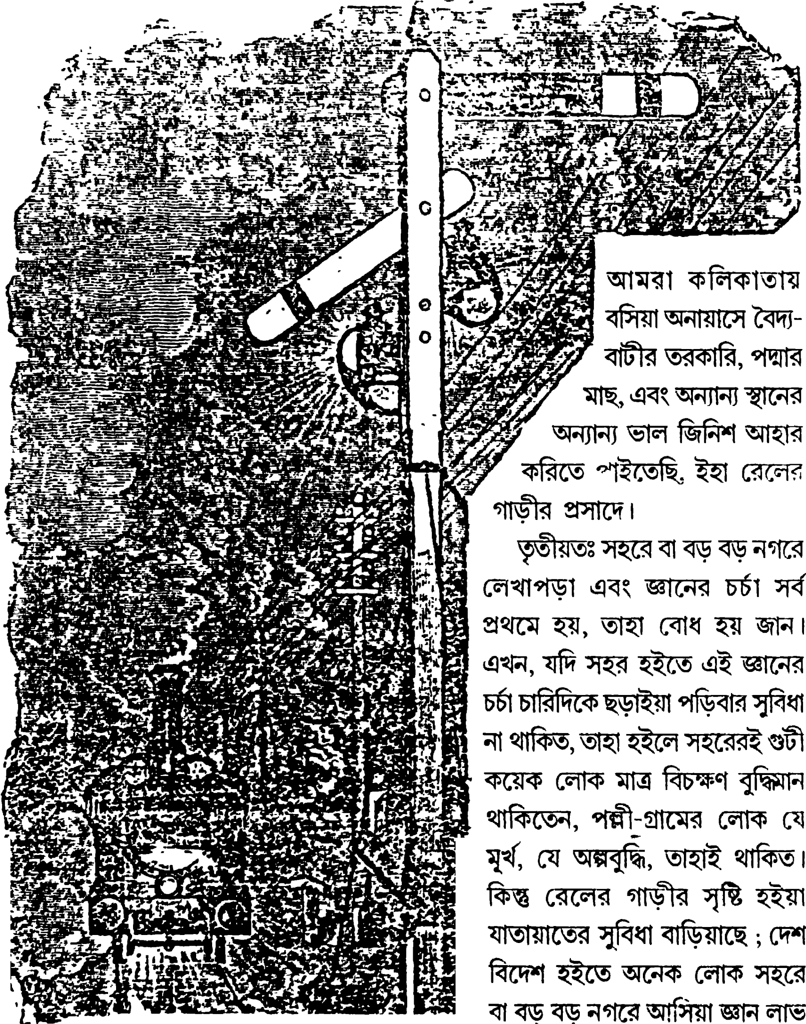
প্রমদাচরণ সেন


ল্যকালে আমার বিশ্বাস ছিল যে বাড়ীতে বা স্কুলে যেরূপ রেল থাকে, সেই রূপ রেলের উপর দিয়াই গাড়ী যায়, কিন্তু যখন সত্য সত্যই রেলের গাড়ী দেখিলাম, তখন জানিলাম সেরূপ নহে। মাটীর উপরে লোহার রেল শক্ত করিয়া বসান, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। দেখিয়া আগের ভুল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও একটা বিশ্বাস মনে রহিল—তাহা এই যে, যেখানে রেলের গাড়ী যাইবে, সেখানকার সমস্ত জিনিশ ভয়ানক দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে; পল্লীগ্রামের সমস্ত ভাল ভাল খাবার জিনিশগুলি কলিকাতায় বা অন্যান্য বড় সহরে আসিয়া পড়িবে—আর গরিব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা হাত তুলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে!!!

বোধ হয় এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে, এবং এই জন্য এমন কেহ কেহও বোধ হয় আছেন যাঁহারা মনের সহিত ভাবেন "কি কুক্ষণেই রেলের গাড়ী আমাদের দেশে আসিয়াছিল!" কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এটীকে প্রথমে যত অসুবিধা বোধ হয়, বাস্তবিক ইহাতে তত অসুবিধা নাই। রেলের গাড়ীতে কত সুবিধা ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, এ সামান্য অসুবিধা কিছুই নহে। প্রথমতঃ যখন রেলের গাড়ী দেশে ছিল না, তখন যাতায়াতের কত কষ্ট ছিল, ভাবিয়া দেখ। দূরদেশে যাইতে হইলে বাড়ীতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইত পাছে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়; রাস্তাঘাট—নানারূপ ভয়ে পূর্ণ ছিল; প্রাণটী হাতে করিয়া বাহির হইতে হইত। আর যখন রেলের গাড়ী হইল, তখন এই রূপ ভাবনা চলিয়া গেল—লোকে অনায়াসে নির্ভয়ে দেশে বিদেশে যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ—তোমরা, বোধ হয় জান বাণিজ্য অর্থাৎ কারবারের যত উন্নতি হয়, ততই দেশের উপকার হয়। রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হওয়াতে যে এই দিকে ভয়ানক উন্নতি হইয়াছে, তাহার কি আর সন্দেহ আছে? কারবারের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় জান? মনে কর, পাটনায় খুব ভাল ডাল হয়, কিন্তু এত বেশী হয় যে সেখানকার সমস্ত লোকের কুলাইয়া গিয়াও অতিরিক্ত থাকে; এ দিকে আমাদের দেশে এত চাল হয় যে আমাদের প্রয়োজনেরও বেশী

থাকে ; অথচ আমাদিগের ডালের প্রয়োজন এবং পাটনার লোকদিগের চালের প্রয়োজন, তাহা হইলে পাটনার লোকে আমাদিগের চাল লইবে, এবং আমরা পাটনার ডাল আনিব। এখন, মনে কর পাটনা ও আমাদিগের দেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা নাই ; তাহা হইলে এদেশ হইতে ও-দেশে দ্রব্যজাত লইতে যে খরচ হইবে, তাহাতেই দ্রব্যগুলি ভয়ানক দুর্মূল্য হইবে। যে পরিমাণে যাতায়াতের সুবিধা, সেই পরিমাণেই কারবার ভাল চলিবে। রেলের গাড়ী হওয়াতে এই যাতায়াতের সুবিধা কত বাড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন ; আজ যে আমরা কলিকাতায় বসিয়া অনায়াসে বৈদ্য-বাটীর তরকারি, পদ্মার মাছ, এবং অন্যান্য স্থানের অন্যান্য ভাল জিনিশ আহার করিতে পাইতেছি, ইহা রেলের গাড়ীর প্রসাদে।



তৃতীয়তঃ সহরে বা বড় বড় নগরে লেখাপড়া এবং জ্ঞানের চর্চা সর্ব প্রথমে হয়, তাহা বোধ হয় জান। এখন, যদি সহর হইতে এই জ্ঞানের চর্চা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা না থাকিত, তাহা হইলে সহরেরই গুটী কয়েক লোক মাত্র বিচক্ষণ বুদ্ধিমান থাকিতেন, পল্লী-গ্রামের লোক যে মূর্খ, যে অল্পবুদ্ধি, তাহাই থাকিত। কিন্তু রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হইয়া যাতায়াতের সুবিধা বাড়িয়াছে ; দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক সহরে বা বড় বড় নগরে আসিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া যাইতেছেন ; তাঁহাদের সহিত মিশিয়া, আলাপ করিয়া পল্লীগ্রামের লোকে অনেক নূতন কথা শিখিতেছে ; আবার সহর হইতেও অনেক সুশিক্ষিত লোক নানা স্থানে গিয়া নানা রূপ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে পারেন। কেবল যে

লোকের মুখের দ্বারাই এই শিক্ষা হয়, তাহা নহে। আজকাল দেশে নানা রূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ; রেলের গাড়ীর সাহায্যে সেই সকল পত্র দেশময় নানারূপ নূতন সংবাদ ছড়াইয়া দিতেছে। আজ কলিকাতায় লাটসাহেব ও তাঁহার মন্ত্রীরা যে আইন করিবার পরামর্শ করিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই হিমালয় হইতে লঙ্কা পর্যন্ত সে খবর পৌঁছিল ; লোকে সেই আইনের সম্বন্ধে চারিদিকে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, এবং এই রূপে তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল।



চতুর্থতঃ—যাঁহাদের সহরে কারবার বা চাকরী করিতে হয়, রেলের গাড়ী হইবার পূর্বে তাঁহাদিগকে অনেক সময় সহরেই কাটাইতে হইত, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সহরের মহা গোলমালে ঝালাপালা হইতে হইত ; কিন্তু এখন রেলের গাড়ী হইয়াছে বলিয়া অনেকেই নির্ভয় মনে সহরের ১০। ১৫ ক্রোশ দূরেও থাকিতে পারেন ; দরকার হইলেই কর্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদের পল্লীগ্রামের শীতল বাতাস লাভ করাও হয়, অথচ সহরের কার্যাদিরও কিছুই ব্যাঘাত হয় না।

রেলের গাড়ীর এতগুলি সুবিধা ; ইহা ভিন্ন আরও কত সুবিধা আছে, তাহা কত লিখিব? আর অসুবিধার মধ্যে পল্লীগ্রামের দুধ, ঘির মূল্য বাড়িয়া যায়, তাহা সত্য ; কিন্তু অন্যপক্ষে আবার সহরের জিনিষ পল্লীগ্রামে সহজে আমদানি হইয়া, তাহার মূল্য কমিয়া যায়। কাগজ, কলম, ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি পূর্বে যে মূল্যে পাওয়া যাইত, রেলের গাড়ী দেশ বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া, তাহার মূল্য অনেক স্থানে কমাইয়া ফেলিয়াছে। আরও যত রেলওয়ে হইবে, তত আরও সুবিধা বাড়িবে। তবে কত সুবিধা হইল দেখ।

রেলের গাড়ী আমাদিগের দেশের জিনিষ নহে। আমরা পূর্বকালের নানা রূপ রথের কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু রেলের গাড়ী আমাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের জানা ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ। জলের বাষ্প দেখিয়া জেম্‌শ ওয়াট নামক কোন সাহেব স্থির করেন যে বাষ্পের জোর আছে, একথা আমরা গতবারে পাঠক ও পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছি। তিনি বাল্যকাল হইতেই নানা রূপ 'কারীকুরী' কাজে পটু ছিলেন ; সম্প্রতি বাষ্পের এই গুণ আছে জানিতে পারিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা পাইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মোটামুটি রকমের একখানি 'এঞ্জিন' অর্থাৎ বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহাতে ভালরূপ কাজ চলিত না। অবশেষে মহাত্মা জর্জ ষ্টিফেন্‌শন অনেক বুদ্ধি করিয়া বাষ্পীয় শকটের এরূপ উন্নতি করেন, যাহাতে সমস্ত বাষ্পের জোরে শকট চলিতে লাগিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ

প্রায় ৫২ বৎসর পূর্বে লিভারপুল এবং মাঞ্চেষ্টার নামক ইংলণ্ডের পশ্চিমদিকের দুটী নগরের মধ্যে লোকজনের যাতায়াতের জন্য প্রথম রেলের গাড়ী খোলা হয়। সেই অবধি পৃথিবীর সমুদায় স্থানেই রেলের গাড়ী জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে আজ প্রায় ৩১।৩২ বৎসর হইল রেলের গাড়ী স্থাপিত হইয়াছে।[১] এখনও অনেক স্থানে রেলের গাড়ীর পথ প্রস্তুত হইতেছে। ছবিতে দেখ কেমন ধূঁয়া উড়াইয়া গাড়ী আসিতেছে! এক পাশে প্রকাণ্ড একটী থামের দুপাশে দুখণ্ড কাষ্ঠ লাগান রহিয়াছে দেখিতেছ? উহা গাড়ীর চিহ্ন বিশেষ। রাস্তায় বিপদাপদের সম্ভাবনা না থাকিলে আগে সংবাদ লইয়া, যে দিকে গাড়ী যাইবে সেই দিককার কাষ্ঠ খণ্ডটী নীচেকার শিকলির দ্বারা টানিয়া ফেলিয়া দেয় ; যে গাড়ী চালায় সে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে, পথ পরিষ্কার— তখন সে স্বচ্ছন্দ মনে গাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারে। রেলের পাশে পাশে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের তার বসান থাকে। ইহার দ্বারা কোন্ সময় কোন্ গাড়ী কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, সমুদায় স্থানে তাহার খবরাখবর যায় ; এরূপ না হইলে কার্যের বড় অসুবিধা হয়—দুখানি গাড়ী হয়ত পরস্পরের মুখে মুখে লাগিয়া ভয়ানক ক্ষতি হইল, কত লোকজন মারা গেল। আর পূর্বে যদি সকল বিষয় ঠিক জানা থাকে, তাহা হইলে কোন গোলই হইতে পারে না।

যতই মানুষের সভ্যতা এবং জ্ঞান বাড়িতেছে, ততই আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য নিত্য নূতন নূতন যন্ত্র সকল বাহির হইতেছে। এই উন্নতি এবং জ্ঞানের যে কোথায় শেষ হইবে, কে বলিতে পারে?

"শীঘ্রগতি চল চল পরে লও সাজ,
কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ;
কর ত্বরা! পড়ে থাক্-ছড়ি, ঘড়ি, তাজ!
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ।"

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৫৭-৫৯।

কেন্দ্রীয় ঊষা

প্রমদাচরণ সেন

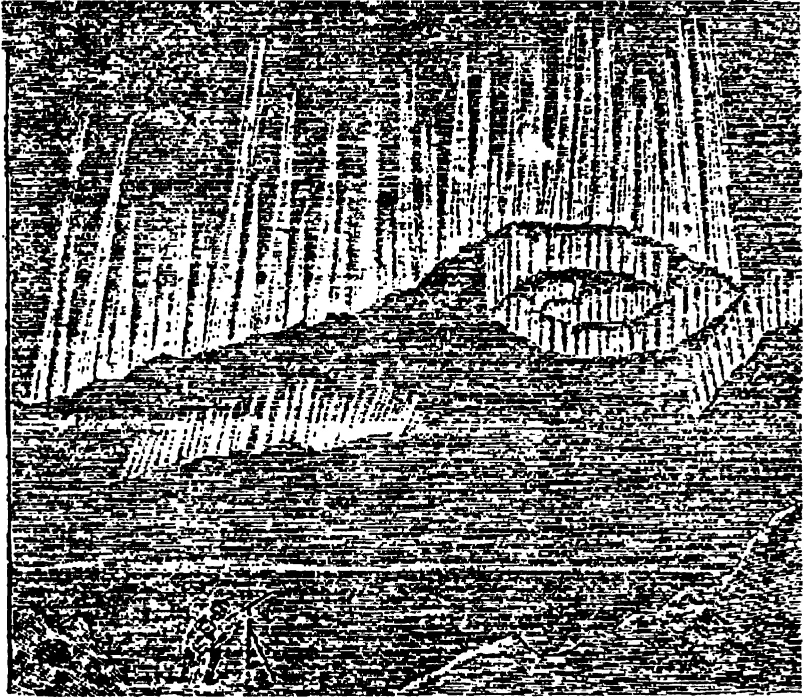


গদীশ্বর এই পৃথিবীর কত স্থানে যে কতরূপ সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইতেছেন তাহার সীমা নাই ; কেন্দ্রীয় ঊষা নামক দ্রব্যটী এই সকল আশ্চর্য সৃষ্টির মধ্যে একটী।

পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যদি চারিদিকে ঘুরাইয়া একটী রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে বিষুব রেখা বলে। এই বিষুব রেখার দুপাশে খানিক দূরে যে সকল দেশ, তাহাই সর্বাপেক্ষা গরম। এই সকল দেশ হইতে যতই উত্তরে এবং দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই শীত বেশী। পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ভয়ানক শীতে চিরকাল বরফ-ঢাকা হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের একটী নিয়ম এই যে তথায় দিন

১. এই সময় লর্ড ডালহৌসী আমাদিগের দেশের প্রধান শাসনকর্তা অর্থাৎ বড় লাট সাহেব ছিলেন। স. স.

ছোট, রাত বড় হইয়া যায় ; যে দেশে শীত যে পরিমাণে বেশী, সেই দেশে দিন যত ছোট এবং রাত তত বড়। এই হিসাবে ধরিয়া গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে যে সকল দেশ, সেখানে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। আমরা শুনিয়াছি সেই দেশে ছমাস দিন এবং ছমাস



রাত্রি হয়। কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি সেখানকার লোক রাত্রির ছমাস কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইয়া কাটায়? না, তাহা কেন? তাহারা আমাদেরই মত ৬।৭ ঘণ্টা ঘুমায়, এবং অন্য সময় আমাদেরই মত সংসারের কাজ কর্ম করে। কিন্তু অন্ধকারের সময় কাজ কর্মের কত অসুবিধা ভাবিয়া দেখ। এই জন্য দয়াময় জগদীশ্বর কেন্দ্রীয় উষা নামক একরূপ আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অদ্য তাহারই একটী চিত্র প্রদান করিলাম। সকল স্থলের কেন্দ্রীয় উষা দেখিতে একরূপ হয় না, কিন্তু কার্য সকলগুলিরই একরূপ। অন্ধকারের সময় আকাশে উঠিয়া উত্তম আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল করিয়া কেন্দ্রীয় উষা সেই দেশের লোকদিগের লম্বা রাত্রির কষ্ট দূর করিয়া দেয়। যদিও সূর্যের আলোকের মত উষার আলোক তত পরিষ্কার নহে, তথাপি এই আলোকে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়। ভোর বেলা আমাদের যেরূপ অস্পষ্ট আলো হয়, কেন্দ্রের এই আলোকমালারও সেই রূপ আলো, এই জন্যেই বোধ হয় ইহার নাম কেন্দ্রীয় উষা। এই আলোকটী কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই, এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিখিলেও অল্প-বয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের বুঝিতে একটু শক্ত হইবে সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার প্রয়োজন নাই।

জগদীশ্বর এইরূপ অনেক স্থানে অনেকরূপ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে অথবা তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৬১-৬২।

মাকড়সা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



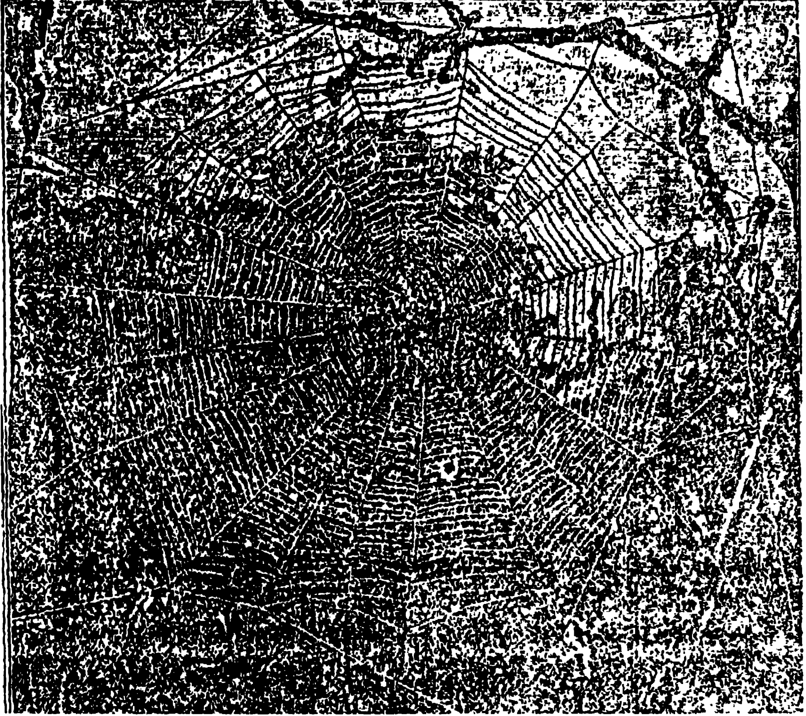
অনেকে মাকড়সা মারাকে অবশ্য কর্তব্য কর্ম মনে করেন। "মাকড়সা মেরোনা" বলিলে তাঁহারা হয় তো চমকিয়া উঠেন। মাকড়সার পূর্ব পুরুষ কেহ বড়লোক ছিল না, সুতরাং বেচারা আমাদের নিকট আদর পায় না।

মাকড়সা দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মত। পিপ্ড়ে প্রভৃতির সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। একটা গোল আঁক দিয়া তার চারিদিকে আটখানি পা বসাইয়া দিলেই মনে করিতে পার একটী কাঁকড়া হইল। কাঁকড়ার পেছনে আর একটী গোলাকার রেখা সংযুক্ত কর মাকড়সার কাছাকাছি যাইবে। মাকড়সার মাথায় বড় পাগ্ড়ী থাকিলে পিপ্ড়ে জাতীয় পোকার মত দেখা যাইত— তবে ঠ্যাং দুখানা বেশী হইত। মাকড়সার মুখে ভয়ানক দুটী অস্ত্র ; তার দু একটী "চিম্টী" খাইলে হয় তো বড় সুবিধা বোধ করিবেন না। এই দুইটীকে মাকড়সার সাঁড়াশী (দাঁত নয়) বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এবং শিকারের সময় এইগুলি কাজে আসে। মাথায় বড় বড় দুটি চোখ। তার 'আশপাশে' খুঁজিলে ছোট ছোট আরো ৪-৫টি দেখিতে পাইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর "এত চোখ কেন?" আমি বলিব "জানি না।"

মাকড়সার নাম লইলেই তাহার জালের কথা মনে পড়ে। জালে দুই কাজই চলে ; বাড়ী করিয়া থাকা হয়, শিকারেরও সাহায্য হয়। মাকড়সার পেটের উপর গরুর বাঁটের মত ছোট ছোট কয়েকটী বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়া এক প্রকার আঠা বাহির হয় তাহাই বাতাসে শক্ত হইয়া দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়া জাল তৈরি হয়। এর এক একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তুবও বড় বড় মাকড়সা তাহাতে ঝুলিয়া থাকে। কোন হতভাগ্য পোকা একবার যদি মাকড়সার জালে পড়িল তবে তাহার রক্ষার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। হুড়োহুড়ি যত বেশী করে ততই গোলমাল আরো বাড়িতে থাকে। শেষে নিরুপায় হইয়া পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ মধ্য হইতে শান্তভাবে চাহিয়াছিল। যেই দেখিল যোগাড়টা পাকাপাকি হইয়াছে অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিল। দড়ি সঙ্গেই আছে ; চারিদিক উত্তম রূপে দেখিয়া অম্লানবদনে হতভাগ্যকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে আহার। মাথা ছিঁড়িয়া শরীরের রস চুষিয়া লয়, আর কিছু খায় না। মাঝে মাঝে দুই একটা বোলতা আসিয়া জালে পড়ে। তখন আমাদের ইনি মনে করেন আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্ চড়্ করিয়া জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া পালায়। . .

জালের কোন অংশ ছিড়িয়া গেলে 'লোকটা' যত্ন পূর্বক তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া রাখে। এক জাল অকর্মণ্য হইয়া গেলে আর একটা করিয়া লয়। এই রূপে দড়ির পূজি ফুরাইয়া

যায়। তখন প্রতিবেশী কেহ থাকিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জাল দখল করে। অন্যের জাল নিকটে না থাকিলে কি করে? গোল্‌ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগিলেন। সে তাঁহার থাকিবার ঘরেই বাড়ী করিয়াছিল। তিনি



তাহার সমস্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে বার বার জাল গড়িতে লাগিল, সাহেবও ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিলেন না। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি থাকে! ভাল মানুষ নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা নিকটস্থ জাল দেখিতে গেল। জালের কর্তা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া প্রচণ্ড লড়াই করিলেন। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই জয় হইল। সাহেব ইহা দেখিয়া ঘরের সমস্ত জাল ছিঁড়িয়া দিলেন। এবার বেচারা বড় বিপদে পড়িল। কিন্তু ছোট জন্তু বলিয়া বুদ্ধি কম নয়। সাহেবের কাগজ-পত্রের মধ্যেই বাড়ী করিল। ক্ষুধা হইলে এক যায়গায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত, কোন পোকা কাছে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

মাকড়সা খায় কি এ কথার উত্তর আমি তত দিতে পারিতেছি না। আমি এ পর্যন্ত এমন কিছু দেখি নাই যাহা পাইলে সে খুসী না হয়। জালে যাহাই পড়ুক না, নড়িলে চড়িলেই হয়—কি পড়িয়াছে কে খোঁজ লয়? মশা মাছি হলে ত কথাই নাই, ক্ষুধার সময় স্বজাতীয় দুই একটি হইলেও চলে। কেহ কেহ ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খায়।

সকলের বড় যে মাকড়সা তাহার নাম 'টরাণ্টূলা' এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখী

ধরিয়া খায়। এক সাহেব একবার তিনটী টরাণ্টুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটীকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকিবার যোগ্যও বটে, এক একটা যে বড়!) রাখা হল। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাহারা কিছুই খাইল না। তার পর কয়েক খণ্ড মাংস খাইয়া যেন তাহাদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। তখন একটা আর দুইটাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। শেষটি আনিয়া সাহেব বিলাতের প্রাণীশালায় উপহার দিলেন। সেখানে তাহাকে ছোট ছোট ইঁদুর খাইতে দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটার কিছুই ফেলা হইত না, শেষটা যেন টরান্টুলা বুঝিতে পারিলেন যে ইঁদুরের অভাব হইবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটী খাইতে লাগিলেন।*

গায়ের কাপড় ময়লা হইলে আমরা ধোপার নিকট দিই। মাকড়সার ধোপা নাই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরাণ হইলে সেটাকে বদলাইয়া ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ



মরা মাকড়সাটা হাত পা কোঁকড়াইয়া জালে ঝুলিতেছে,—বাস্তবিক হয়তো সেটা মাকড়সার খোলস মাত্র। এক একটী খোলস এত পরিপাটী যে চিনিবার যো নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটী বাড়ীর বারান্দায় একটা মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল। বাতাস আসিলেই জালের নীচের দিকটা উঠিয়া আসিত; বেচারা বড় জ্বালাতন হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানা ছোট লাঠিটানাটানি করিযা লইয়া আসিল। বাতাস আসিবার সময় সেই লাঠিখানা জালে ঝুলাইয়া দিত; তাহাতে নঙ্গরের কাজ হইত।

মাকড়সার জালে বড় পোকা পড়িলে দড়ি কাটিয়া তাহার যাইবার সহায়তা করে।

এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া ঘর বাঁধে। ভিতরে সাটিনের মত মসৃণ। দেখিতে কাবুলী মেওয়া ওয়ালাদের টুপীর মত ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। একটী দরজাও আছে। দরজাটী মুখে এমন সুন্দর ভাবে লাগে যে ভিতর হইতে ঠেলিয়া না দিলে

* এই পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহারই। এত বড় মাকড়সা দেখিয়াছ কি? কোন কোনটা এর চাইতেও বড় হয়। স স।

খোলা যায় না। দরজার গায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহাতে নখ দিয়া ভিতর হইতে ধরিয়া রাখে। দরজার বাহিরের দিকে মাটী মাখাইয়া এমন করিয়া রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

মাকড়সার প্রস্তাব আমরা শেষ করিলাম। ভরসা করি তোমরা আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭২-৭৪।

ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাইও না (প্রাপ্ত)

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



মি ছেলে বেলায় বড় দুরন্ত ছিলাম। কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন মহিমা বলিতে পারি না, মাকে বড় ভাল বাসিতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম। তিনি ধমকাইতেন না তাই বলিয়া হউক, বা আর কোন স্বাভাবিক কারণ থাকাতেই হউক, কখনও তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহস হইত না। আমি যা ধরিতাম তা ছাড়িতাম না। তবে মা বারণ করিলে আর যেন তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

একদিন সন্ধ্যার সময় মা রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, ঘরটী আলোতে 'ফুট ফুটে' হইয়াছে, অন্ধকার চোরের মতন কোন্ কোণে লুকাইয়াছে। মা সেই ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছেন, আমি সেই সময় "খিদে পেয়েছে" "খিদে পেয়েছে" বলে তাঁর কাছে গেলাম; মা আমার কথার উত্তর দিলেন না, তাই তাড়াতাড়ি একটু রাগ করিয়া বলিলাম "আচ্ছা যেমন আমায় খাবার দিলে না, তেমনি তোমার কাজ পণ্ড করছি—আমি তোমার প্রদীপ নিবাইয়া দিই।" যেমন বলা; অমনি কাজ করা। আমি প্রদীপ নিবাইয়া দিলে মা বলিলেন "যা! প্রদীপটা নিবাইয়া ফেল্‌লি! দেখ দেখি কত কাজের ক্ষতি হইল। তা যা করেছিস্ তা করেছিস্, তা প্রদীপটা ফুঁদিয়া নিবাইস্‌নিত?" আমি বলিলাম "ফুঁ দিয়াই নিবাইয়াছি।" মা বলিলেন "হারে হাবা ছেলে, ফুঁদিয়া কি প্রদীপ নিবাইতে আছে?" আমি বলিলাম "কেন তাতে দোষ কি মা?" মা বলিলেন "তা তুমি জানিবে কি ক'রে? ওতে যে মুখে দুর্গন্ধ হয়। কথা কইতে গেলে মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরোয়। কেউ তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে না, যদিও বা কথা কয়, তাও নাকে মুখে কাপড় দিবে। তখন মনে কত কষ্ট পাবে, মনে ভেবে দেখ দেখি।" আমার মনে একটু দুঃখ হইল, মনে ভাবিলাম, কি কুকর্মই করিয়াছি! সে দিন হতে স্থির করিলাম এমন কাজ আর করিব না। আমি আর কোন উত্তর করিলাম না।

রাত্রিটা নিদ্রায় কাটিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, কালিকার রাত্রির কথাটা মনে পড়িয়া বড় ভয় হইল। তবে আজ আমার সঙ্গে কেহ কথা কহিতে আসিলে নাক মুখে কাপড় দিবে? দু বার তিন বার মুখের গন্ধ লইবার জন্য জোরে নিশ্বাস টানিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মাকে বলিলাম "মা দেখত আমার মুখ হতে গন্ধ বাহির হচ্ছে কিনা?" মা একটু হাসিয়া আমার মুখের ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "গন্ধ হয়নি, এক দিনে তত গন্ধ হয় না।" একটু সুস্থ হইলাম, প্রাণটা যেন বাঁচিল। সেই থেকে আর ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই না। ও কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আসল কথাটা বলি। মা যাহা বলিয়াছেন, যে ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাইও না,

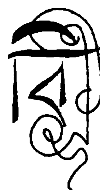
ইহা বড় সত্য। আজ কাল বিজ্ঞান তাহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা বলে। মাতো কেবল মুখের দুর্গন্ধের ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার চেয়ে শক্ত ভয় দেখায়। এখন জানিয়াছি, যে উহাতে কঠিন পীড়া, এমন কি প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিতে পারে। কেরোসিন তৈলের দীপ ফুঁদিয়া নিবাইতে গিয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে শুনিয়াছি।

সকলেই জানেন যে প্রদীপ নিবাইলে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থটা বড় ভয়ানক জিনিশ। ইংরাজিতে উহার নাম কার্বনিক এসিড। বাঙ্গালায় কেহ উহাকে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক কেহ বা কেবল অঙ্গারক বাষ্প বলেন। অনেক অঙ্গারক বাষ্প যেখানে থাকে সেখানে মানুষ বাস করিলে তাহার প্রাণ নষ্ট না হউক, শক্ত রোগ জন্মিতে পারে। যাত্রা শুনিতে গেলে গরম বোধ হয়—সর্দিগর্মি লাগে। তাহার কারণ ঐ অঙ্গারক বাষ্প। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি তাহাতে উহার ভাগ নাই বলিলেই চলে,—৫০০০ ভাগে ৩।৪ ভাগ থাকে মাত্র। উহাই বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। যখন বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ বেশী হয়, তখন তাহা নিশ্বাসে টানিয়া লইলে শরীরের মধ্যে যাইয়া রক্ত দূষিত করে। রক্ত দূষিত হইলে সকল পীড়াই জন্মিতে পারে। রোগ হইলে জীবনের কত অপকার একবার ভাবিয়া দেখ। যদি আমি প্রতিদিন ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই তাহা হইলে অঙ্গারক বাষ্প নিশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতরে যাইবে, রক্ত দূষিত করিবে, কত রোগ জন্মাইবে, কত কষ্ট দিবে। এক আধ দিনে যদিও জানিতে পারা না যাক্ কিন্তু রোজ রোজ এইরূপ করিলে একটু একটু করিয়া অঙ্গারক বাষ্প শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া একটু একটু করিয়া রক্ত দূষিত করিবে, কঠিন পীড়া জন্মাইয়া দিবে। দেখ এই একটা সামান্য কাজে কত অনিষ্ট করে। তাই বলি একাজটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা যদিও বিজ্ঞান জানেন না, কিন্তু তাঁহারা কেমন বৈজ্ঞানিক দেখ। যাহা মেয়েরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন না, তুমি কি তাহা উড়াইয়া দিবে? ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবান অভ্যাসটা বড় মন্দ সাবধান!

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৪-৭৫।

মণিরামের কাহিনী

প্রমদাচরণ সেন

নোদ বাবুর বাড়ীতে আজ সকলেই দুঃখিত। বিনোদ বাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ী আজ মুখভার করিয়া বসিয়া আছে; কর্তা এবং গৃহিণীরও দুঃখ হইয়াছে তাঁহারাও নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। বাড়ীর বাঘাকুকুর কি একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ছটফট করিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে চারিদিকে ঘুরিতেছে, মেনী বিড়ালটা পর্যন্ত দুঃখে পড়িয়া শুইয়া রহিয়াছে; চাকর বাকর সকলেই 'আহা বেশ ছিল!' এই বলিয়া দুঃখ করিতেছে; সকলেরই দুঃখ—মণিরাম মরিয়া গিয়াছে!

কিন্তু মণিরাম কে? কোন বালক? না বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন কেউ? না তবে মণিরাম কে? মণিরাম একটী সুন্দর কাকাতুয়া পাখী। সাদা ধব ধব করিতেছে, মাথায় হল্‌দে ঝুটি। পাখীটী অনেক কেলে, বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাহার কত গুণ। সে হাঁসের মত

ক্যাঁ ক্যাঁ করিত, শিশুর ন্যায় কাঁদিত, বিড়ালের ন্যায় ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিত, কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিত ; বালিকার ন্যায় হাসিত, বুড়োর ন্যায় কাশিত, "ওরে রামশশী এই গান এবং এই রকম আরও অনেক গান গাইত, ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ করিয়া নাক ঝাড়িত ভয়ানক হাঁচি দিত, রেলের বাঁশীর শব্দ করিত, এবং হিরণ্ময়ী ও কর্তা এবং গৃহিণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে লুকোচুরী খেলিত।

বাড়ীর সকলের মধ্যে হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই মণিরামের কিছু অধিক ভাব ছিল। হিরণ্ময়ীর বয়স ১৩/১৪ বৎসর। দুঃখ কাহাকে বলে সে তাহা জানে না ; এক গাল পান চিবাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া হিরণ সমস্ত দিনই বাড়ীময় আমোদ করিয়া ফিরিত। মণিরামকে খাবার দিবার ভার হিরণের উপর ছিল। সে পাখীকে খাবার দিত ; কখনও তাহার ধারাল ঠোঁটে চুমো খাইত, কখনও তাহার সহিত খেলা করিত এবং কখনও 'বাছা আমার' 'যাদু আমার' বলিয়া আদর করিত। এই সকল কারণে মণিরাম হিরণ্ময়ীর বড়ই বাধ্য ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া যে সে সকলেরই বাধ্য হইত তাহা নহে। যে একবার তাহাকে ত্যক্ত করিয়াছে মণিরাম কখনও তাহাকে ভালবাসে নাই। মণিরামের অন্য ক্ষমতা বেশী থাক না থাক নষ্ট করিবার ক্ষমতাটী বেশ ছিল। যেখানেই তাহাকে বসাইয়া রাখ সে কিছু না কিছু নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে পোষাপাখী বলিয়া মণিরামকে শিকলে বাঁধা হয় নাই, কিন্তু খোলা বেড়াইতে পাইয়া যখন সে বাড়ীঘরের ক্ষতি করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখা হইতে লাগিল।



বিকাল বেলা তাহাকে অল্প সময়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই আবার পায়ে শিকল পরিয়া, মণিরামকে সেই অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি রান্নাঘরে থাকিতে হইত। মণিরাম রান্নাঘরে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কাজেই যেই দেখিতেন সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, অমনি সুর চড়াইয়া, গলা কাঁপাইয়া বলিতেন "রান্নাঘরে কেও? —একাকিনী।"

বাড়ীতে যখন লোক জন আসিত তখন মণিরামের জাঁক দেখে কে! মণিরাম তখন মাথা উচু করিয়া ঝুটি বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল "হা! হা! কর্তাকে চাই?" যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই মণিরামকে আদর করিতেন—মণিরামও তাহাই চাহিত। যদি কখনও দেখিত যে অনেক লোক আসিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, তাহা হইলে

মণিরাম প্রথমে আস্তে, আস্তে, তার পরে একটু জোরে, তারপর আর একটু জোরে, তারপর ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিত, "আহা বেচারা! আহা বেচারা"; চীৎকার এত বেশী হইত যে এই জন্য মণিরামকে কখন কখন শাস্তি পাইতে হইয়াছে; কিন্তু অভ্যাস কোথায় যায়?

সে যাহা হউক দুই বৎসর পূর্বে মণিরাম হিরণদের একটা মস্ত উপকার করিয়াছিল। একদিন দুপুর বেলা কর্তা আফিসে গিয়াছেন, হিরণের মা কি একটু দরকারে পাড়ায় গিয়াছিলেন, হিরণ কোথায় কি তামাসা দেখিতে গিয়াছে, বাড়ীতে শুধু ঝি আর মণিরাম। এমন সময় এক চোর কিছু 'যোগাড়' দেখিবার আশায় চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকিয়া যায়; মণিরাম তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে বলিয়া উঠিল "রান্নাঘরে কেও? একাকিনী।" বেচারা চোর ভাবিল, বুঝি কেউ দেখিতে পাইয়াছে; তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল; পায়ের শব্দ শুনিয়া ঝি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল; তখন চোর ভায়া কি করেন? লজ্জার ভয়ে মার দৌড়! সেদিন মণিরামের আদর দেখে কে! সে দিন মণিরামের খাবারটা খুব ভালরকমেরই হইয়াছিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি মণিরাম খুব কাশিতে পারিত। এক দিন মণিরাম বাগানে বসিয়া আছে এমন সময়ে বাগানের মালী সেইখানে কাজ করিতে আসিল। বেচারা বুড়োমালীর কাশির ব্যারাম ছিল; তাহাকে কাজ করিতে করিতে অনেক বার থামিয়া কাশিতে হইত। মালীর দু-একবারের কাশির শব্দ শুনিয়াই মণিরামের মজা লাগিয়া গেল; মণিরামও তখন কাশিতে আরম্ভ করিল। মালী যত কাশে মণিরামও তত কাশে, মালী ভাবিল বুঝি কেহ ঠাট্টা, করিতেছে। কিন্তু যখন দেখিল যে সে মণিরাম, অমনি রাগিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "গা—ধা! যদি সত্যি সত্যি কাশি হ'ত তবে টের পেতে।"

এমন আমুদে পাখীকে কে না ভালবাসে? কিন্তু এই আমোদ আর অধিক দিন রহিল না। এক দিন খাঁচার মধ্যে মণিরামের মাথা ঢলিয়া পড়িল—মণিরামের ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। এই অসুখের মধ্যে হিরণের সাধের পাখী দুবার তিনবার "আহা বেচারা।" "আহা বেচারা!" বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল। কর্তা কতবার তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলেন, কত ঔষধ পত্র করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ৫৬ বৎসর বয়সে মণিরাম মরিয়া গেল। হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ্ ফুলাইয়া শেষে মুখ ভার করিয়া বসিল। কর্তা, গৃহিণী এবং বাড়ীর সকলেরই দুঃখ হইল। যাহাকে ভালবাসা যায় সে চলিয়া গেলে কাহার না মনে কষ্ট হয়।

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ ৮৫-৮৮।



ঠাকুরদাদার গল্প

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১



কদিন বিকালে নবীন বাবু তাঁহার ছোট ছোট দৌহিত্র, পৌত্রগুলিকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। গঙ্গার জল কেমন বায়ু বেগে নাচিতেছে, ছোট ছোট ঢেউগুলি কেমন কল কল করিয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সকলেই তথায় বসিয়া শোভা দেখিতে লাগিলেন। বালক বাবুদের তাহা ভাল লাগিল না। নলিন একটী প্রজাপতিকে ধরিতে ছুটিলেন, বিনয় জলে ঢিল ফেলিয়া মজা দেখিবেন বলিয়া ঢিলের সন্ধানে চলিলেন, কিশোরী ঠাকুরদার জুতা লইয়া দূরে পলায়ন করিল। নবীন বাবু বিনয়কে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বল দেখি গঙ্গায় এত জল কোথা হইতে আসিল?" বিনয় বসিল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল "কেন, চিরকালই ত আছে! আমি আর বছরে এসেও দেখেছি গঙ্গায় ত এত জলই ছিল।" কিশোরও গল্প শুনিতে আসিয়া জুতা রাখিয়া বসিল, ক্রমে নলিনও আসিয়া যুটিল—তাহারা গল্প বড় ভালবাসে।

কিশোরী।—"আচ্ছা জল ত ক্রমাগতই চলিতেছে, একবারও স্থির হয় না, তবে ফুরায় না কেন? এ কথাটি আজ আমাকে বুঝাইয়া দাও না।" নবীনবাবু।—"আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম, দেখি নলিন কি বলে।" নলিন বলিল "পিসী বলিয়াছেন গঙ্গা যে ঠাকুর, ঠাকুরের বুঝি আবার জল ফুরায়?" নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "তবে মন দিয়া শুন। নলিনের পিসীর বাড়ীতে গঙ্গা আছে তোমরা জান। সে এই গঙ্গা, সেবার সেই যে তোমরা নৌকায় করিয়া সেখানে গিয়াছিলে।"

সকলে।—মনে আছে।

নবীন বাবু।—এখন বুঝিলে যদি কেহ ক্রমাগত উত্তর দিকে নৌকা করিয়া যায়, তবে গঙ্গার দুধারে কত গ্রাম, কত সহর, কত বন, কত পুরাতন ভাঙ্গা মন্দির, কত কত সুন্দর বাগান, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে যায়। ক্রমিক এক গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে এই রূপে না থামিয়া যদি দিন রাত্রি চলে তথাপিও এই গঙ্গা, এই রূপ স্রোত দেখিতে পায়।

বিনয়।—তবে কি গঙ্গার শেষ নাই?

কিশোরী।—তাও কিও কি কখন হয়? অবশ্য শেষ আছে।

নবীন বাবু।—শেষ আছে, আমরা কিন্তু গোড়ার দিকে দেখিতেছি, গঙ্গার উৎপত্তি কোথা?

কিশোরী।—কেন?, হিমালয় পর্বতে, আমরা ত পড়িয়াছি?

নবীন বাবু।—ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু উহা যে কি রূপ পদার্থ তাহা বোধ হয় জাননা। এই রূপে অনবরত চলিতে চলিতে ক্রমে প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ দূরে হরিদ্বার নামে একটী স্থান আছে।

নলিন।—হাঁ হাঁ আমি জানি—মা বলেন 'হরিদ্বার গঙ্গাসাগর' তাই?

নবীন বাবু।—হাঁ। সেই হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা অতিশয় কম চওড়া। তারও পরে আরও সরু। তার পরে সেই হিমালয় পর্বতের গা বহিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া পড়ে, তাহার নাম প্রস্রবণ বা ঝরণা। এখন বুঝিলে যে সেই ঝরণার জল ক্রমে একত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছে। এ জন্য হরিদ্বার এত সরু। ক্রমে যত নীচে আসে, অন্য অন্য সব ঝরণার জলও সেই রূপে আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশে ; অন্য অন্য ছোট ছোট নদী আবার ইহাতে পড়ে, তাদের উপনদী বলে।

কিশোরী।—হাঁ, আমি জানি, যেমন যমুনা, শোণ, গণ্ডকী, বাঘমতী, কুশী। না দাদা?

নবীন বাবু।—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। এই সকল উপনদীর জলও সেই প্রকার ঝরণা হইতে আসে। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা যত নীচে আসিয়াছে ততই অনেক উপনদী আসিয়া ইহাতে মিলিয়াছে ও ততই অধিক চওড়া হইয়াছে। যে দিকটা বেশী নীচু জল সেই দিকেই চলে, এজন্য গঙ্গা ক্রমে পর্বত থেকে আসিতে আসিতে নীচে চলিয়াছে। যদি স্রোতের সঙ্গে বরাবর যাওয়া যায়, তবে শেষে এমন একটা স্থানে উপস্থিত হইব, যেখান হইতে কোন দিকেই কূল কিনারা দেখা যায় না, চারিদিকেই অকূল জল ধূ ধূ করিতেছে, বড় বড় ঢেউ সকল উঁচু হইয়া উঠিতেছে, জল মুখে দিবার যো নাই, বিকট লোণা।

কিশোরী।—সেই বুঝি সমুদ্র?

নবীন বাবু।—হাঁ তার নাম গঙ্গাসাগর। এইখানে গঙ্গা বঙ্গ উপসাগরে পড়িয়াছে। এইখানে গঙ্গাও সাগরে মিশিয়াছে বলিয়া ইহার নাম গঙ্গা সাগর। এই স্থানেই গঙ্গার যত জল সব হু হু শব্দে পড়িতেছে। চিরকালই গঙ্গার জল এই ৫০০ ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়া এখানে আসিয়া পড়ে। তুমি যদি আজ এখানে একটী বস্তু জলে ভাসাইয়া দাও, তবে উহা ভাসিতে ভাসিতে সেই গঙ্গাসাগরে গিয়া পড়িবে।

বিনয়।—দেখ দাদা, আমাদের খিড়কীর পুকুরের মোন দিয়া সেদিন বৃষ্টির পর যে জল চলেছিল তাতেও ঠিক এমনি মজা করেছিলাম। আমি একটা কচুরপাতা ছিঁড়িয়া দিলাম, পাতাটা ভাসিতে ভাসিতে পুকুরে পড়িল—সেখানে জল হুড় মুড় করিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তার পরদিন সকালে গিয়া আর খানায় জল দেখিতে পাইলাম না, বড় দুঃখ হল কিন্তু।

নবীন বাবু।—ঠিক এও সেইরূপ ; গঙ্গা মনে কর সেই রূপ একটা খুব বড় খানা, আর সাগর একটা প্রকাণ্ড পুকুর। গঙ্গার সব জলই সাগরে গিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি গঙ্গার জল ফুরায় না ; কেন বলিব? বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয়, সে সমস্ত জল কোথা যায়? তার কতক পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে, কতক বড় বড় খাল দিয়া গঙ্গায় পড়ে, কতক মাটীতে শুষিয়া যায়। এইরূপে বৃষ্টির জলের অধিকাংশ গঙ্গা ও পরে গিয়া সমুদ্রে পড়ে। এখন দেখিলে গঙ্গার জল কোথা কোথা হইতে আসে, সর্ব্ব প্রথমে হিমালয় পর্বতের ঝরণাগুলি হইতে, পরে উপনদী হইতে, ও বৃষ্টির জল হইতে।

নলিন।—ঝরণার জল কোথা থেকে আসে?

নবীন বাবু।—বলিতেছি শুন। ঐ পর্বত প্রায় ৫০০/৬০০ ক্রোশ পর্যন্ত আমাদের দেশের উত্তর দিক ব্যাপিয়া আছে। আর উহা পৃথিবীর অন্য সকল পর্বত অপেক্ষা উচ্চ—এমন কি প্রায় ১০০০টি নারিকেল গাছ উপরি উপরি রাখিলে যত উচ্চ হয় তত। আর একটী নিয়ম আছে জান যে যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। তবে মনে কর, পর্বতের উপরে কত শীতল। ভয়ানক শীত, এত শীত যে সেখানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এখন দেখ

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত বায়ু বহে, সেই বায়ু গিয়া হিমালয় পর্বতে ধাক্কা লাগে। আমাদের দেশের দক্ষিণ দিকে, ভারত মহাসাগর, এই মহাসমুদ্র হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে, ঐ সকল সূক্ষ্ম জল কণাকে মেঘ বলে, ঐ মেঘ বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা এজন্য উহা বায়ুতে ভাসিতে থাকে। সুতরাং যখন বায়ু স্থির ভাবে থাকে তখন মেঘও নিশ্চল হইয়া থাকে, আর যখন বায়ু কোন দিকে বহে, তখন বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে মেঘরাশিও সেই দিকে চলে ; বুঝিতে পারিতেছ না?

নলিন।—দাদা! মেঘেরা ত শালপাতা খাইবার জন্য চলে? কেশব বলেছিল।

কিশোরী।—না না, সে সকল কথা শুনিও না। কেন আমরা ত প্রথম সংখ্যার 'সখা'তে পড়িয়াছি "মেঘ সূক্ষ্ম জলকণা বৈ আর কিছুই নহে।"

নবীন বাবু।—সত্যই ত! তোমরা বুঝি 'সখা' মন দিয়া পড়না? এখন শোন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণসাগর হইতে রাশি রাশি মেঘ বায়ুবেগে উত্তরদিকে চালিত হইয়া অবশেষে ঐ হিমালয় পর্বতের গায়ে গিয়া ঠেকিয়া যায়, কেন না মেঘেরা অধিক উচ্চ দিয়া যায় না,—প্রায় আধ ক্রোশ, এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ উপর দিয়া যায়, কিন্তু হিমালয় প্রায় আড়াই ক্রোশ উচ্চ। সুতরাং ঐ সমস্ত মেঘ গিয়া ভয়ানক শীতল পর্বতশৃঙ্গে আটকায় ও প্রচণ্ড শীতে জমিয়া তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া যায়। এই কারণে অতি উচ্চ পর্বতের চূড়াগুলি সুন্দর শুভ্রবর্ণে শোভিত, চিরকালই ধপ্‌ধপ্ করে। ভাল ; এই বরফ-রাশি ক্রমেই স্তূপাকার হইয়া পর্বতের চূড়া ঢাকিয়া ফেলে। দিবাভাগে রৌদ্রে কতক গলিয়া যায়, কিন্তু সে এত অল্প যে তাহাতে ঐ স্তূপের কিছুই হ্রাস হয় না। আবার নূতন বরফ জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই বরফ অনেক অধিক গলে ও পর্বতের গা বহিয়া পড়ে—ইহাই নির্ঝর। আর এক প্রকারে নির্ঝরের উৎপত্তি হয়। যে সকল মেঘ কিছু নীচে গিয়া লাগে, সেখানে শীত কিছু অল্প, তাহারা তত জমিতে পায় না, বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এ বৃষ্টিও বড় কম নয়, খুব বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল অল্পে অল্পে পর্বতের গা বহিয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে ২।৫টি স্রোত একত্র হইয়া একটী নির্ঝর হয়। কিন্তু এ ঝরণাগুলি কেবল বর্ষাকালেই দেখা দেয়, তদ্ভিন্ন বরফজাত যেগুলি সেগুলি বার মাস থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয়।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, এই যে গঙ্গার জল হুড় হুড় কুল কুল করিয়া সতেজে চলিতেছে, কোথায়?—সমুদ্রে। আবার গ্রীষ্মকালে এই জলরাশি বাষ্পরূপে আকাশে উঠিবে, বায়ু অমনি পাল্কীবেহারা হইয়া ইহাদিগকে হিমালয় পর্বতে লইয়া যাইবে, ইহারা যাইয়া কতক বৃষ্টি হইয়া নূতন ঝরণা প্রস্তুত করিবে, কতক জমিয়া বরফ কণা হইবে, ও ধীরে ধীরে রৌদ্রতাপে গলিয়া গিয়া পর্বত বহিয়া নীচে নামিবে। সুতরাং নির্ঝর দুই প্রকার।—বর্ষাকালীন ও চিরস্থায়ী। প্রথমগুলি বৃষ্টির জলে জন্মে, দ্বিতীয়গুলি অনবরত বরফ গলিয়া জন্মে। এই দুই প্রকার নির্ঝরই নদীর জলের মূল। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল নদীর জল প্রথম প্রকার নির্ঝরের উপর নির্ভর করে তাহারা কেবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়।

কিশোরী।—দাদা আমি কাকার সঙ্গে পাটনা যাবার সময়ে রেলের নীচে সে বার কত নদী দেখেছিলাম ; তাতে জল নাই, কেবল সব বালি পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহারা গঙ্গার অপেক্ষা ছোট।

নবীন বাবু।—হাঁ সে সকল নদী প্রায়ই ছোট হয়। আর সে সকল নদীর জল দ্বিতীয় প্রকার

প্রস্রবণের উপর নির্ভর করে তাহাদের বার মাস জল থাকে, তবে বর্ষাকালে তাহাদের জল বাড়ে (যেমন গঙ্গার) আবার শীতকালে কমিয়া যায়। কেন না বর্ষাকালে অনেক অধিক বরফ গলে ও অনেক জল দেশগুলির উপর দিয়া আসিয়া নদীতে পড়ে। সুতরাং তখন জল বাড়ে। শীতকালে কেবল বরফের উপর নির্ভর, তাও আবার কম গলে ; সুতরাং জল কমিয়া যায় ; কিন্তু একেবারে শুষ্ক হয় না কেন না তখনও বরফ গলে এবং আর একটী কারণ আছে। সেটি এই। পূর্বেই বলিয়াছি বৃষ্টির যে জল মাটীতে পড়ে তাহার কিছু পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে জলটা কোথা যায়? তোমরা আশ্চর্য হইবে, সে সমস্ত জলই প্রায় আবার নদীতে আসিয়া পড়ে। জলের একটী গুণ এই যে তাহা নীচু দেখিলেই সেই দিকে ছোটে। সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলি মৃত্তিকার সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে অলস বালকের ন্যায় ঘুমায়না—ক্রমাগত নিজের কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত থাকে। নিকটে যদি কোন নদী থাকে তবে সত্বরেই তাহার গর্ভে প্রবেশ করে, নতুবা কিছু বিলম্বে ক্রমে ক্রমে আসিয়া অবশেষে পড়িবেই পড়িবে। কেন না মৃত্তিকার নিম্নে কিছু দূর খনন করিলে হয়ত এমন একটা স্থানে পৌছান যাইবে যে তাহার ভিতরে জল আর তেমন প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং সম্মুখে বাধা পাইয়া পার্শ্বদিকে গড়াইয়া যায় এবং অবশেষে নদীতে আসিয়া পড়ে। এই কারণে বৃষ্টিপতনের অনেককাল পরেও ঐ জলের কিয়দংশ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া নদীতে উপস্থিত হয় ; এই জন্যই গঙ্গাতে বর্ষার অনেক পরেও জল থাকে। কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই গঙ্গার জল দেখা যায় ; তবে পূর্বোক্ত কারণে বর্ষাকালে জল অধিক বৃদ্ধি পায়। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে গঙ্গার জল কোথা হইতে আসে ও অনবরত চলিয়াও ফুরায়না কেন?

নলিন।—হাঁ দাদা, বেশ বুঝিয়াছি, আর আমি পিসীমার মিছা কথায় ভুলিব না। এখন অবধি আমার যে সন্দেহ হবে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিনয়।—আজ বিকালে বেড়াইতে আসিয়া কেমন নূতন কথা সকল শিখিলাম, রোজ আসিব। আরও সকলকে ডাকিয়া আনিব।

কিশোরী।—সব বুঝিয়াছি, কিন্তু দাদা, তুমি যে বলিলে যত উপরে উঠা যায়, ততই শীত অধিক, এটী আমি বুঝিলাম না। উপরে আরও গ্রীষ্ম অধিক হওয়াই সম্ভব, কেননা সূর্যের যত নিকটে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ অধিক হওয়াই সম্ভব। তবে উপরে শীত এত অধিক কেন? এ বড় আশ্চর্য কথা, আমাকে বলিতে হইবে।

নবীন বাবু।—আজ বড় রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, আর এক দিন বলিয়া দিব। আজ চল বাড়ী যাই, আজ যে নূতন বিষয় শেখা হইল তাহার জন্য পরমেশ্বরকে সকলে ধন্যবাদ দাও।

সে দিন সকলে বাটী গেলেন।

২



অদ্য আবার ঠাকুরদাদা নবীন বাবু বায়ুসেবনে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় পৌত্র দৌহিত্রগণও উৎসুক মনে সঙ্গে আসিয়াছেন ও অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি বালককে লইয়া আসিয়াছেন। কেন না ভাল ভাল কথা সকল শুনিতে হইলে একাকী না শুনিয়া অনেককে সঙ্গে করিয়া লইলে এককালে অনেকেরই উন্নতি হয় ;—যেমন কোন ভাল সামগ্রী

একা না খাইয়া প্রিয় বন্ধুদিগকে দিয়া খাইলে বেশী মিষ্ট লাগে, সেইরূপ ভাল কথাও অনেকে একত্রে শুনিলে ভাল হয়।

কিশোরী।—সেদিনকার প্রশ্নটী পূনর্বার জিজ্ঞাসা করিল "যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক ইহার কারণ কি?" নবীন বাবু বলিলেন 'এ বিষয়টী তত সহজ নহে, তোমরা সকলে স্থির ভাবে বসিয়া মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এটী বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে আরো অনেকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, সেগুলি এখন সহজভাবে বলিয়া যাই, অন্য সময়ে সেগুলিও এক একটী করিয়া বুঝাইব। প্রথমতঃ—তোমরা জান পৃথিবীর যে উত্তাপ আমরা অনুভব করি, সে সমস্তই সূর্য হইতে পাই ;—সূর্যই আমাদের সমুদায় উত্তাপের মূল কারণ। আর এটীও জানিও যে সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ক্রোশ দূরে আছে।

সকলে।—উঃ! কি ভয়ানক দূরে!

নবীন বাবু।—এখন শোন। তোমরা যদি একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হাত দেও তাহা হইলে তোমাদের হাত পুড়িয়া যাইবে ; আর যদি সেই অগ্নির নিকট হাত রাখ তবে পুড়িবে না বটে কিন্তু ভয়ানক যাতনা হইবে এবং অধিকক্ষণ সে রূপে রাখিলেই হাতে ফোস্কা হইবে। কেমন? (সকলে:—হাঁ) নবী।—আবার যদি একটা লৌহের শিকের একটা দিক সেই আগুণে রাখিয়া কিছু পরে তাহার উপর দিকে হাত দাও তাহা হইলেও হাতে খুব আঘাত লাগে। (সকলে:—লাগে) বেশ কথা! এখন দেখিতেছি যে কোন একটী তেজোময় বস্তু হইতে উত্তাপ পাইবার এই তিনরকম উপায় আছে : —(১) ঐ বস্তুর "স্পর্শ" দ্বারা ; (২) উহার সহিত যোগ না থাকিলেও "উত্তাপের ব্যাপ্তিগুণ" দ্বারা ও (৩) উহার সহিত কোন ধাতু নির্মিত বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুর এক দিক যোগ রাখিয়া অপর দিকের স্পর্শ দ্বারা। এই স্থানটী তোমাদের একটু কঠিন বোধ হইবে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বেশ বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে কোন দ্রব্য হউক অগ্নিতে পড়িলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠ, বস্ত্র, কাগজ, যাহা ইচ্ছা একটু অগ্নি সংলগ্ন হইলেই জ্বলিয়া উঠে। এটী প্রথম উপায়ের দ্বারা। আবার কোন গৃহের একটী কোণে একটী অগ্নিপাত্র রাখিয়া দিলে সে গৃহটী শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়, আতষী নামে এক প্রকার পাথর আছে (কাচের ন্যায়) তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র টিকার উপর ফেলিলে ঐ টিকাতে আগুণ ধরে, অথচ টিকা ঐ পাথরে লাগে না, এগুলি দ্বিতীয় উপায়ের দ্বারা। তাপের আধার যে অগ্নি তাহা হইতে চারিদিকে ঐ তাপ ব্যাপ্ত হইতেছে সুতরাং অগ্নি স্পর্শ না করিলেও নিকটে থাকিলে তাহার উত্তাপ বেশ অনুভব করা যায়।

অমূল্য।—কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইলেত আর তাপ পাওয়া যায় না।

মন্মথ।—হ্যাঁ, দাদামশাই। মা যখন রাঁধেন, তখন দেখিছি, আমি ঐ উনানের যত নিকটে থাকিব তত মুখে তাপ লাগে, আর যত সরিয়া যাই ততই কম তাপ লাগে।

নবীন বাবু।—তাত হবেই। সব কাজেরইত সীমা আছে, তাপত আর অসীম দূর অবধি ছোটে না, যত দূরে যাইবে উত্তাপ ততই হ্রাস হইবে। আরও একটী কথা আছে। অগ্নি যদি ছোট হয় তাহা হইলে তাহার উত্তাপ তত অধিক দূর যায় না, অগ্নি বড় হইলে যত দূরে যায়। মনে কর একটী প্রদীপের খুব নিকটে গেলেও হয়ত কোন তাপ পাওয়া যায় না, একটী পাত্রে কতকগুলা গুল্ পোড়াইলে সে পাত্রের তত নিকটে আর যাওয়া যায় না, আবার কতকগুলা শুষ্ক বৃক্ষপত্র রাশীকৃত করিয়া অগ্নি দিলে তাহার অনেক দূর পর্যন্ত উত্তপ্ত করে;

তথাপি তাহারা নিকটে যত গরম, দূরে তত নহে ; ক্রমে ক্রমে কম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাৎ 'তাপব্যাপ্তি' দ্বারা পদার্থ সকল অগ্নিকে স্পর্শ না করিয়াও দূরে থাকিয়াও উত্তাপ পাইতে পারে,—যদি অগ্নি বেশ বড় হয়। তৃতীয় উপায়টীর নাম "তাপ পরিচালন"। ইহা দ্বারা দ্রব্যের এক ভাগে উত্তাপ লাগিলে ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া উহার অপরাপর ভাগকেও তপ্ত করিয়া তুলে, যেমন লৌহের শিক। এটী বড় মজার গুণ। যেমন কতকগুলি বালক থাকে তাহাদিগের এক জনকে একটী কোন কথা বলিলে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই শুনে, সেইরূপ লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের এমনি স্বভাব যে এক অংশে তাপ দিলে ক্রমে দূরস্থ অংশগুলিও তপ্ত হইয়া উঠে, এই উত্তাপ চালনের শক্তি আছে বলিয়া এই সকল বস্তুকে "পরিচালক" কহে। আবার কতকগুলি বালক আছে তাহারা অতি সৎ পরের কথা লইয়া নাড়া চাড়া কানাকানি করে না, তাহারা নিজ কার্যে রত থাকে, কোন কথা কাহাকেও বলে না। সেইরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে তাহারা উক্ত প্রকারে এক অংশ হইতে অন্যাংশে তাপ চালিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে "অপরিচালক" কহে, যথা কাচ, তুলা, পশম ইত্যাদি—।

চন্দ্র।—কাচের এক দিক তাতাইলে কি অপর দিক গরম হয় না? আচ্ছা আমি আজ বাড়ী গিয়া পরখ করিয়া দেখিব।

নবীন বাবু।—হাঁ! এইরূপে তোমরা যদি সকল বিষয় নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলে পরে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিবে। সে যাহা হউক, এখন বল দেখি, সূর্য যে একটী প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ আর আমাদের পৃথিবী যে ইহা হইতে উত্তাপ পায়—তাহা এই তিনটী উপায়ের কোন্‌টীর দ্বারা?

কিশোরী।—প্রথমটীর দ্বারাত নয়ই, কেন না সূর্যত পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া নাই। বোধ হয় দ্বিতীয়টীর দ্বারা, সূর্যের কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও এক দিকে পৃথিবীতেও আসে। কেমন, এই না?

অমূল্য।—কেন তৃতীয়টীও হয়ত। সূর্যের তাপে আকাশ তাতিয়া ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া আমাদের কাছে আসে?

নবীন বাবু।—না তা নহে, কিশোরীই ঠিক বলিয়াছে। সূর্যের তেজ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাই "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পৃথিবীও তপ্ত হয়। আর এত ভয়ানক দূরে থাকিয়াও যে সূর্যের তেজ এত পাওয়া যায় তাহার কারণ সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪ লক্ষ গুণে বড়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে অগ্নি যত বড় হইবে তেজ তত অধিক দূর অবধি ব্যাপ্ত হইবে। তাই এই দূরত্ব সত্ত্বেও সূর্যের প্রকাণ্ড আকার বলিয়া তাপের ব্যাঘাত হয় না। আর তৃতীয় উপায়টীত হইতেই পারে না, কারণ আকাশ কোন বস্তু নহে কেবল শূন্য মাত্র। পৃথিবী হইতে সূর্য পর্যন্ত এই যে বিস্তীর্ণ পথ ইহাতে কোন বস্তু নাই। সুতরাং আকাশকে পৃথিবীর অংশ বলা যায় না। বুঝিলেত? (সকলে :—"হাঁ"।)

নবীন বাবু।—এখন কেবল আর একটী কথা বুঝিলেই হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে উপর পর্যন্ত যে বায়ুরাশি দেখিতেছ, পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা ২৫ ক্রোশের উপরে আর দেখা যায় না, সেখানে বায়ু নাই, আর যত উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই পাতলা। সূর্যের তেজ পৃথিবীতে পঁহুছিবার পূর্বে এই বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিবে। সুতরাং সহজ

বুদ্ধিতে উপরের বায়ু অগ্রে ও ক্রমে নিম্নের বায়ু উত্তপ্ত হইবারই কথা কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। কেন?—শ্রবণ কর। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কঠিন দ্রব্যের মত বায়ু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা অতি সামান্যই হয়। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলেই বেশ দেখা গেল যে সূর্যের কিরণ এই বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার কালে ঐ বায়ুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। যেমন চিনির বলদ দোকান হইতে চিনির মোট বহিয়া আনে কিন্তু নিজে তাহার কোন স্বাদ পায় না, সেইরূপ বায়ু বোকা বেহারার ন্যায় সূর্যদেবের উত্তাপ ২৫ ক্রোশ পথ বহিয়া পৃথিবীকে আনিয়া দেয় অথচ নিজে তাহার একটুও তাপ পায় না, নিজে যেমন শীতল তেমনি থাকে। বুঝিলেত? (সকলে "হ্যাঁ বেশ বুঝিলাম?")

কিশোরী।—আচ্ছা তা যদি হইল, তবে দুই প্রহরের সময় বাতাস এত আগুণের মত হয় কেন?

নবীন বাবু।—তাহা বলিতেছি শোন। বায়ুত তেজ আনিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে দিল, ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল পৃথিবী ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; আবার বায়ু বহিতে বহিতে সেই তপ্ত মাটী, রাস্তা, বাড়ী প্রভৃতিতে ঠেকিয়া উত্তপ্ত হয়। এটী কিন্তু প্রথম উপায় দ্বারা তাহা যেন মনে থাকে; উষ্ণ পদার্থের "স্পর্শ"-এ বায়ু তাপ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পারে না। এজন্য দেখা যায়, যতক্ষণ মাটী না গরম হয় ততক্ষণ বায়ু তপ্ত হয় না কিন্তু বেলা ৯টার পর হইতে যতই মাটী, পথ, বাড়ী গরম হয় ততই বাতাস গরম হইতে থাকে। আর এক মজা দেখ, খুব রৌদ্রের সময় গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকায় বসিলে অনেকটা শীতল বায়ু ভোগ করা যায়। আবার পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নে রৌদ্রের যেরূপ তাপ কলিকাতায় তদপেক্ষা অনেক অধিক, তাহারও কারণ এই :—জল বা গাছপালা তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না, যত শীঘ্র রাস্তা বাড়ী পাথরের টালী প্রভৃতি হয়।

এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে বায়ুর উত্তাপ একেবারে সূর্যের উপর নির্ভর করে না, তবে কি? প্রথমে, বায়ু সূর্যের তেজ পৃথিবীকে আনিয়া দেয়, পরে তাহাতে পৃথিবী বেশ তপ্ত হইয়া উঠে। যেন বায়ু পৃথিবীর চাকর; চাকর একটী আম্র আনিয়া মনিবকে দিল, তিনি ইচ্ছামত খাইয়া পরে সেই উচ্ছিষ্ট আম্র একটু চাকরকে দিলেন। (বালকেরা হাসিয়া উঠিল।) সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বায়ু যদি "স্পর্শ" ভিন্ন উত্তাপ লাভ করিতে না পারে, এই ২৫ ক্রোশ উচ্চ বায়ুরাশির যে অংশ তপ্ত পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পায়, তাহাই গরম হয়; কাজেই নীচের বায়ুই কেবল গরম হইতে পায়। একারণ নীচে হইতে যত উপরে উঠা যায়, ক্রমে ততই বায়ুর শীতলতা বেশ বোধ হয়। অবশেষে অধিক উচ্চে এত শীত যে সেখানে গেলে আমরা মারা যাই। এমন কি ২/৩ ক্রোশ উপরেই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই জন্যই সিমলা, দার্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি স্থান ভয়ানক গ্রীষ্মকালেও খুব শীতল। কে কেমন বুঝিলে বল?

কিশোরী।—দাদা, সেদিন অবধি কত লোককে একথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ইহা এরূপ বুঝাইতে পারে নাই, এখন আমিই ১০০০ জন লোককে বুঝাইয়া দিতে পারি।

বিনয়।—আমাকে এক জন বলিয়াছেন যে উপরে সূর্যের তাপ বাঁকা হয়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু আমি তা বুঝিতে পারি নাই, আজ বেশ বুঝিলাম!

সকলে আনন্দ করিতে করিতে বাটী গেলেন। যাইবার সময় বিনয়কে মন্মথ বলিতেছে "দাদা দেখিলে তুমি যে সে দিন বল্‌ছিলে দাদামশাই হয়ত এবার বুঝাইতে পারিবেন না? ছি! ও রকম অশ্রদ্ধার কথা বলিও না।"

৩



অদ্য ঠাকুরদাদা নবীন বাবু প্রিয় বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষে বাগানটী সুশোভিত। চারিদিকে সুন্দর মেদী গাছের বেড়া। মধ্যে মধ্যে সবুজ কামিনী বৃক্ষের পাতাগুলি তিনি স্বহস্তে কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিয়াছেন, পাতাগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়া কেমন শোভাই ধারণ করিয়াছে, ঐ সবুজবর্ণ পত্রগুলির উপরে ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার শ্বেতকুসুম কি সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে! বাগানের মধ্যস্থলে একটী বিলাতী ঝাউগাছ কেমন সূক্ষ্ম চূড়া তুলিয়া যেন পাহারা দিতেছে। চারি দিকে মৌমাছি সকল ফুলের মধু আহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে। অপরাহ্নে উদ্যানের অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে—গাছগুলি সব যেন হাসিতেছে। কিশোরী, বিনয় ও অন্যান্য বালকগণের যত্নে গাছগুলির একটুও হানি হইতে পায় না। তাহারা সকলেই প্রিয়তম ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রত্যহ উদ্যানে আসিয়া গাছগুলিতে জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ঘাস তোলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে বাগানটীর যত্ন করে ও গাছগুলিকে যেন আপনাদের ভ্রাতার মত স্নেহ করে। এরূপ করাতে তাহাদের আরও একটী উপকার হয়। সমস্ত দিবসের লেখাপড়ার পরে এইরূপ শারীরিক শ্রম করাতে আনন্দে ও স্ফূর্তিতে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে ও রাত্রিতে আবার পাঠাভ্যাস করিতে বিশেষ ইচ্ছা জন্মে ও তৎপরে অতি সুনিদ্রা হইয়া আহারীয় সামগ্রী সকল উত্তমরূপে পরিপাক হয়। এই সকল উপকার পায় বলিয়া এক দিনও তাহারা বিকালে স্বকার্য বিস্মৃত হয় না।

আজিকার বাগানের কার্য শেষ হইলে নবীন বাবু সকলকে চারি দিকে লইয়া সুন্দর সবুজ মখমলের ন্যায় ঘাসের উপর বসিয়া গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়! আমরা যে বোধোদয়ে পড়িয়াছি 'পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ,' আমার তাহাতে একটু কথা আছে। আমি বলি পদার্থ দুই প্রকার বলিলেই ঠিক হইত। আমার বোধ হয় যাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা হইয়াছে তাহারাও চেতন পদার্থ। নয় কি?"

মন্মথ।—তা কিরূপে হইবে? বৃক্ষদের ত চেতনা নাই, তাহারা ত ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে না, তাহারা কথা কহিতেও পারে না। তাহাদের যেখানে পুতিয়া দেওয়া যায় সেখানেই থাকে।

অমূল্য।—তবে ত মাছেরাও চেতন পদার্থ নয়। তাহারাও ইচ্ছামত যথা তথা যাইতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, একটী পুকুরেই চিরকাল থাকে? তা ত নয়। আমারও বিবেচনায় বৃক্ষ সকল চেতন পদার্থ, মৎস্য যদি চেতন হয়, তবে বৃক্ষ লতাদিরাও চেতন নিশ্চিত। কিশোরীরও এই মত ছিল। মন্মথ ও বিনয় বলিল "তা কেন হইবে? মাছেরা ত সেই জলাশয়ের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, মাছেদের ডিম ও ছানা হয়, তাহারা ডাকিতেও পারে। মাছ ও বৃক্ষ লতার তুলনা হয় না।" নলিন বালক, কোন পক্ষে না যোগ দিয়া ঠাকুরদাদার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কিশোরী বলিল 'সেরূপ ত বৃক্ষদেরও শিকড় আছে—ঐ শিকড় মাটীর চারি দিকে ছড়াইয়া যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, আমি দেখিয়াছি হরিমোহনদের বাটীর সম্মুখের অশ্বত্থ গাছের শিকড় অনেক দূর অবধি গিয়াছে। আর আমি বলিতে পারি লতাদের জ্ঞান আছে, কেন না, আমাদের বাড়ীতে একটী লাউগাছ আছে তাহার আঁকড়াগুলি সব এক একটী কঞ্চিতে জড়াইয়া থাকে। আমি এক দিন একটা আঁকড়ার সম্মুখ হইতে সমস্ত কঞ্চি সরাইয়া এদিকে রাখিয়াছিলাম। তারপর দিন দেখি সে আঁকড়াটা মুখ ফিরাইয়া সেই পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছে ও একটা কঞ্চিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেই অবধি আমি যে কি আশ্চর্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আর সেই অবধি আমার বোধ হইয়াছে পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই বুদ্ধি দেন নাই, লতাগুলিকে পর্যন্ত শিখাইয়াছেন।"

এবারে আর মন্মথ ও বিনয় কোন কথা বলিতে না পারায় সন্দেহ মিটাইবার আশায় ঠাকুরদাদার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিশোরীর এত অল্প বয়সে এরূপ খোঁজ করিবার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার মন গলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। তিনি কিশোরীর মুখ চুম্বন করিয়া সকলকে আদর করিয়া বলিলেন : —"জ্ঞানী হইবার এইই উপায়। পুস্তকে যে কিছু লেখা থাকে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া পরে কি সত্য তাহা স্থির করিতে হয়, ইহাই নিয়ম ও তদ্রূপ করিলেই জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইতে ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।

কতকগুলি বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় এমন গুণগুলিকে জাতি বিভাগ করিবার জন্য লইতে হয় যাহার একটীও ভিন্ন জাতিতে পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভিন্ন জাতীয় ধাতু, কেন না এই উভয়ের বর্ণ, শব্দ, ভার প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ চেতন ও অচেতনে এত প্রভেদ কখন একটী অন্যটীতে ভুল হয় না, কিন্তু এই যে গোলযোগ তোমরা বাহির করিয়াছ এটী বড় সহজ নহে। কেন না কোন কোন জন্তু এমনি নিশ্চল ও জড়বৎ যে তাহাদিগকে চেতন বলা যায় না, বৃক্ষ লতাদি এমনি সতেজ ও জীবিত যে সহসা তাহাদিগকে চেতন বলিয়া বোধ হয়। মনে কর পুরুভূজ নামক বৃক্ষের একটী অঙ্গ ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন অংশ আবার একটী নূতন বৃক্ষ হইয়া উঠে। তোমরা এতক্ষণ লতার বুদ্ধি প্রভৃতির কথা বলিতেছ এ সকল দেখিলে হঠাৎ প্রাণী বোধ হয়। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত চেতন অচেতন ও উদ্ভিদের একটী সীমা রেখা দেখাইতে পারেন নাই। তবে যেগুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখা যায় তাহাদিগকেই জাতি বিভাগ করিয়া ছোট ছোট বালকদিগকে বুঝান বোধোদয়ের উদ্দেশ্য। নতুবা জন্তুদের যাহা যাহা আছে বৃক্ষলতাদিরও প্রায় তাহা সমস্ত আছে। জন্তুরা অনেকেই মুখ দ্বারা আহার করে, নানা প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী মুখ দিয়া শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে, পিপাসার সময়ে জল পান করে, মুখই জীবের প্রধান সহায়। ঐ সকল সামগ্রী পেটের মধ্যে গিয়া ক্রমে ক্রমে হজম হইতে থাকে; এইরূপে পরিপাক হইয়া সার অংশটুকু শরীরের পুষ্টি করিবার জন্য রক্ত হইয়া যায়, অসার ভাগগুলি মল মূত্রাদি ও ঘর্মাদি আকারে বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দিগেরও এইরূপ আহার-শক্তি আছে। তাহারাও শিকড় দিয়া আহার করে। শিকড়গুলির ভিতরে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া আহারীয় সামগ্রী সকল মৃত্তিকা হইতে টানিয়া লয় ও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করে। কাটিয়া ফেলিলেই গাছ মরিয়া যায়,—যেমন আহার না পাইলে আমরা বাঁচি না। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষ সকল যে স্থির হইয়া

দাঁড়াইয়া থাকে কোথাও যায় না, নড়ে না, তাহার কারণ, তাহাদের আবশ্যক নাই, তাহারা এক স্থানেই চিরকাল আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয় ও তথায় থাকে। কিন্তু একস্থানে চিরকাল থাকে বলিয়াই যে তাহারা 'চেতন' এই দলের বাহিরে তাহা বলা যায় না, কেন না প্রাণীদের মধ্যেও এমন অনেক আছে যাহারা কখন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

আবার দেখ, আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, বিশুদ্ধ বায়ু নাসিকাদ্বারা টানিয়া লই ও দূষিত বায়ু ফেলিয়া দিই, বৃক্ষেরাও তদ্রূপ করে, ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে। আমাদের একটী নাসিকা,—ইহাদের নাসিকা অনেক। প্রত্যেক পত্রই এক একটী নাসিকা। আমরা বায়ু হইতে 'অম্লজান' নামে এক প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ টানিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশটী দূষিত করিয়া ছাড়িয়া বায়ুতে দিই। বৃক্ষের সবুজ পত্রেরা রবিকিরণের সাহায্যে সেই দূষিত বায়ুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ দূষিত পদার্থের মধ্য হইতে "কার্বন" অর্থাৎ অঙ্গার ভাগ নিজেরা গ্রহণ করে ও অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। এই অঙ্গার তাহাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। সুতরাং দেখিলে বৃক্ষ সকল আমাদের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়া থাকে, তবে আমরা অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করি—অঙ্গার ছাড়িয়া দিই, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত করে—অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে জন্য ভিন্ন জাতি বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে না, কেননা অনেক প্রাণীও সেরূপ যাহার যে বস্তু আবশ্যক, বায়ু হইতে গ্রহণ করে—সকলে সমান লয়না।

তারপর দেখ, আমাদের শরীর চারি প্রকার সামগ্রীতে প্রধানতঃ গঠিত—অস্থি, মাংস, ত্বক (অর্থাৎ ছাল) ও রক্ত। অস্থি দেহের মূলাধার, মাংস রক্ত পরিচালনের ও অন্যান্য উপকারের জন্য, ত্বক্ সেই সকলকে আবরণ করিয়া রক্ষা করে ও রক্ত সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া জীবন বজায় রাখে। বৃক্ষদেরও এ সমস্ত আছে। উপরেই যেটী দেখা যায় সেটী ত্বক বা ছাল, ইহার দ্বারা বৃক্ষের ভিতরস্থ আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি নষ্ট হইতে পায় না, তাহার নীচেই কোমল এক প্রকার বস্তু তাহাকে বৃক্ষের মাংস বলা যায়। ইহারই ভিতর দিয়া পুষ্টিকর পদার্থ সকল বৃক্ষের সর্বাংশে সঞ্চালিত হয়। গাছের রস আছে জান?—তাহাই উহাদের রক্তের কার্য করে। ইহা মিথ্যা কথা নহে ; বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সকল দরকারী বস্তু আহার করিয়া এই রসটিই বৃক্ষের শিকড়েরা উপরে পাঠাইয়া দেয় ও ইহাই বৃক্ষের বাঁচিবার এক মাত্র কারণ। গাছেদের আমাদের মত অস্থি আছে তাহা বোধ হয় সকলেই জান। তাহাদের সারভাগ যেটী, যাহা শুকাইয়া কঠিন হয় ও স্থায়ী হয়, সেই কাষ্ঠের সারাংশটীই বৃক্ষের হাড়। কোন বৃক্ষের পাতা অনেক দিন জলে পড়িয়া থাকিলে পরে শুষ্ক হইলে দেখা যায়, মাংস ও ত্বক্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল সরু সরু কঠিন কতগুলি শির আছে, সেগুলি পত্রের হাড় ; সেইরূপ সকল বৃক্ষেরই অস্থি আছে। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষের রক্ত, মাংস, ত্বক্ ও অস্থি আমাদের ন্যায় সমস্তই আছে।

তবে আমাদের ন্যায় ইহাদের সকল ইন্দ্রিয় নাই। ইহারা দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, আস্বাদন পায় না, ঘ্রাণ পায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় ইহাদের আছে। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হয়। আবার আমেরিকায় এক প্রকার মাংসাশী বৃক্ষ আছে, তাহাদের পাতায় মাছি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী বসিলে অমনি পাতা কুঁকড়াইয়া গিয়া জন্তুটীকে ধরিয়া ফেলে ও ক্ষণেক পরে একেবারে খাইয়া ফেলে। উদ্ভিদেরা জন্তুদের মত

কথা কহিতে বা ডাকিতে পারে না। আর ইহাদের ডিম ও ছানা হয় না সত্য, কিন্তু ইহাদেরও দল বাড়াইবার প্রণালী অতি চমৎকার। আজি আর সময় নাই। রাত্রি হইয়াছে। চল বাড়ী যাই,—আর এক দিন বলিব। কিন্তু এ কথাটী যেন চিরকাল স্মরণ থাকে যে নিজেরা চেষ্টা করিয়া যাহা শিক্ষা করিবে, আপনারা পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিবে, তদপেক্ষা আর মূল্যবান জ্ঞান নাই। সর্বদা চিন্তা করিবে, মন দিয়া চতুর্দিকের পদার্থ সকলের গুণাগুণ ও কার্যপ্রণালী বেশ করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই শীঘ্র নানা মহামূল্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। বিশ্বপতির সৃষ্ট এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একটী তৃণকেও অগ্রাহ্য করিবে না। একটী সামান্য তৃণের মধ্যে যে তাঁহার কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত দয়া প্রকাশিত আছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি মহান্, তোমরা সর্বদা তাঁহাকে ভক্তি করিবে।

সকলে পরমেশ্বরের কার্যে আশ্চর্য হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সে দিন গৃহে গমন করিলেন।

৪



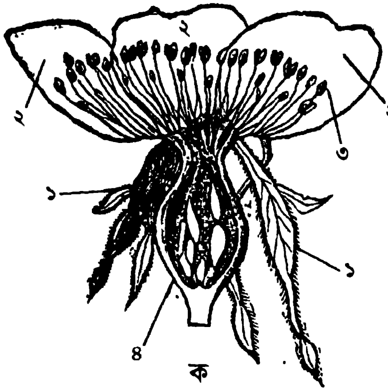
রদিন যখন সকলে নিয়মিত বাগানের কার্য শেষ করিয়া গল্প করিতে বসিলেন তখন নবীন বাবুই প্রথমে কথা তুলিলেন—“আজ উদ্ভিদ জাতির বংশবৃদ্ধির প্রণালী আমাদের বিবেচ্য। ভাল! তোমরা কে কি জান বল ত দেখি তার পরে আমি স্বয়ং বলিব। আগে মন্মথ বল।” মন্মথ তখন একটু আনন্দিত হইয়া বলিল ‘উদ্ভিদদিগের বংশবৃদ্ধি ত কেবল বীচিতেই হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই ত গাছ হয়।” নবীন বাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বীজ কোথা হইতে হয়?”

মন্মথ।—সেত মালীর ঘরেই থাকে? কিশোরী অমূল্য ও নবীন বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিশোরী।—তাই বুঝি শিখেছ? ওরে শিবু! (মালীর নাম শিবু) তুই বীচি কোথা হতে পাস? মালী।—কেন বাবু বীচিত সকল ফলের ভিতর থাকে? নবী:—দেখ দেখি মন্মথ! ভাই এসব তুচ্ছ বিষয় তোমরা জাননা? কি আশ্চর্য! ফল মাত্রেই বীজ থাকে, ও এই বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়. ঐ অঙ্কুর বড় হইয়া গাছ হয়। এই রূপেই বৃক্ষ লতাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বুঝিলে? এই রূপেই একটী বীজ পাইলে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ প্রস্তুত করা যায়।

নলিন এতক্ষণ চুপ করিয়া একবার এদিক একবার ওদিক চাহিতেছিল এখন বলিল, “দাদা মহাশয়! কি করে গাছ থেকে ফল হয়, ফল কে দিয়া যায়? কিরূপে ফল হইতে বীজ হয় ও বীজ হইতে আবার গাছ হয়? সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া বলনা। আমার বড় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।” নবী:—সে যে অনেক কথা। আচ্ছা তবে মন দিয়া শুন। আর,—একটী গোলাপের কুঁড়ি আন দেখি।”—নলিন আনিল।

নবীনবাবু আস্তে আস্তে কুঁড়িটী ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, এই উপরেই পাঁচটী সবুজ বর্ণের পাতার মত দেখিতেছ? (সকলে “হাঁ”) বেশ তার পরে ফুলের পাপড়ীগুলি কেমন সুন্দর ভাবে উপর্য্যুপরি লাগিয়া রহিয়াছে! যেন আলাদা করা কঠিন, এই দেখ একটা ছাড়িয়া গেল। ক্রমে এই সবগুলি খুলিলাম, ফুলটী এখন ফুটন্ত হইল। তার পরে দেখ কতকগুলি কি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। (ছুরি দিয়া সোজা দিকে ফুলটী চিরিয়া ফেলিলেন!)

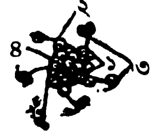
দেখ দেখ! ইহার মধ্যে আবার কি রূপ ব্যাপার দেখ। লেবুর কোষার মত অতি কচি কচি কি সব ঠেষাঠেষি করিয়া রহিয়াছে! আচ্ছা, আর একটা বড় ফুটন্ত ফুল আন (বিনয় আনিল ;— সেটীও তেমনি চিরিলেন।) ইহার ভিতরেও দেখ ঠিক সেই রকম। (ক চিহ্নিত চিত্র দেখ) আচ্ছা বল দেখি এ সব কি?" (সকলে— জানিনা) কিশোরী আশ্চর্য হইয়া বলিল— "কি চমৎকার দাদা মহাশয়—এমন কৌশলে ফুল থাকে! ছি ছি! আমরা রোজ ফুল-বাগানে কার্য করিতে আসি, কিন্তু এমন যে কৌশল এই ফুলগুলির মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে তাহা জানি নাই। দেখুন দাদা মহাশয়! আপনি আমাদিগকে সব সুন্দর বস্তু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন। এ ফুলের সব আমরা বুঝিয়া তবে ছাড়িব। কেমন?" কিশোরী বড় ভাল বালক, তাহার হৃদয় মন ফুলের কৌশল দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছে। নবী:—"এখনি কি হইয়াছে? যখন সমস্ত বুঝাইয়া দিব তখন দেখিবে যে ঈশ্বরের মহিমা যথার্থই অসীম।



"এই ফুলটী তাহা হইলে ঠিক চারি অংশে নির্মিত। ১ম—বাহিরের সবুজ পাতার মত অংশটী ; ২য়—পুষ্পের সুবর্ণ পাপড়ী ; ৩য়—এক একটী সরু কাটীর মাথায় মাকুর মত; ৪র্থ—লেবুর কোষার মত। যেমন এই চারিটী অংশ গোলাপে দেখিতেছ, সেইরূপ, সমস্ত পুষ্পেই আছে। যে ফুল ইচ্ছা লইয়া আইস, দেখিবে এই ৪টী অঙ্গ আছেই। তবে এক জাতীয় ফুল আছে তাহাদের হয় ১ম, না হয় ২য়, না হয় উভয় অঙ্গই নাই। আবার কতকগুলি ফুলের হয়ত তিন অঙ্গ নাই, কোন জাতীয়ের ৪র্থ অঙ্গ নাই,—যথা লাউ কুমড়া ফুল। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে পুষ্প মাত্রেরই এই ৪ প্রকার, অন্ততঃ ৩ প্রকার অঙ্গ আছে। (সকলে।— আমরা দেখিব।) লোকে ফুলের পাপড়ীগুলিরই সৌন্দর্য দেখে, সুগন্ধেই মুগ্ধ হয়, ফুলের দ্বারা যে কত মহা উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিতে পায় না, সকল ফুলেরই যে এই ৩।৪টী ভিন্ন জাতীয় অঙ্গ আছে তাহাও দেখে না।"

আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাগণ এখন হইতে মন দিয়া সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিবেন ও নিজ নিজ বিজ্ঞ বন্ধুদিগের নিকট হইতে এইরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন। নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন ;—"জগতে কত ফুল ফোটে কে তাহার সন্ধান লয়, কে তাহাদের উপকারিতা অন্বেষণ করে? আমরা সকলে অজ্ঞান ও স্বার্থপর। যাহাতে লাভ আছে তাহাই খুঁজি। তোমরা সকলেই আম্র খাইয়াছ, কিন্তু বৃক্ষ হইতে কি রূপে যে আম্র উৎপন্ন হইল, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাক? এখনত গাছে আম নাই, জৈষ্ঠ মাসে আম কোথা হইতে আইসে, বল দেখি? (সকলে।—বৌল হইতে।) বৌল হইতে আম্র কি রূপে কোন্ উপায়ে হয় তাহা কি দেখিয়াছ? ("না") এইবার যখন বৌল হইবে তখন দেখিও ; দেখিবে যে বৌল আমের ফুল বৈ আর কিছুই নহে। উহা ফুল। একটী ডালে অনেকগুলি ফুল দল বাঁধিয়া জন্মে। তাহাদের এক একটী ফুল বেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তাহারও এইরূপ

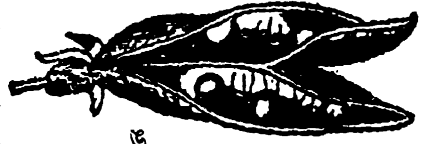
৪টী স্বতন্ত্র অঙ্গ আছে (খ চিত্র দেখ) কিন্তু অতি ছোট। ছোট ছোট ৫টী সবুজ "বহিরাবরণ", ছোট ছোট ৫টী "পাপড়ী" ছোট ছোট ৫টী "পরাগ কেশর" (তৃতীয় অঙ্গ), ও একটী ক্ষুদ্র "গর্ভকেশর" সকলের মধ্যস্থানে রহিয়াছে। তদ্রূপ বেল, আতা, পেয়ারা, চালতা, লেবু, লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি যত ফল আছে সকলেরই জন্ম ফুল হইতে। ফুলের ১ম ও ২য় অঙ্গ দুটী না থাকিলেও হানি হয় না কেবল ৩য় ও চতুর্থ অঙ্গ দুইটী ফলোৎপাদনের মূল; যেমন পান গাছ ও ঝাউ গাছে যে ফুল হয়, তাহাদের ১ম ও ২য় অঙ্গ নাই অথচ সে ফুল হইতে ফল জন্মে। তবেই দেখা গেল যে ১ম অঙ্গটী কেবল অন্য সকলগুলিকে ঢাকিয়া রাখে, নষ্ট হইতে দেয় না, ও ২য়-টী শোভাবর্ধনের জন্য যথার্থ বংশ বৃদ্ধির জন্য অপর ২য়-টী অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে পরাগকেশরগুলি অপেক্ষা আবার গর্ভকেশরের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ; কেন না ঐ গর্ভকেশরই পরিপক্ক হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়। পরাগকেশরের অগ্রভাগস্থ



খ


ঘ

মাকুর মত থলি এক প্রকার চূর্ণ (গুঁড়া) দ্বারা পূর্ণ। সময়ে ঐ থলি ফাটীয়া যায় ও চূর্ণগুলি বাহির হইয়া পড়ে। ঐ চূর্ণ গর্ভকেশরের অগ্রভাগে পড়িলেই গর্ভকেশর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ফলের আদিম অবস্থা। আম্রের বৌলে, লেবুর ফুলে ও অন্যান্য সকল ফুলেরই একটু পরিণত অবস্থায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট সবুজ বর্ণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কড়াই শুঁটীর একটী ফুল সোজা চিরিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই গর্ভকেশর ক্রমে বড় হইয়া "বীজকোষ" হইয়াছে, তাহা ঠিক কড়াই শুঁটীর মত আকার পাইয়াছে, এমন কি তাহার মধ্যে ছোট ছোট শুঁটীর দানাগুলি পর্যন্ত দেখা যায় (ঘ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। ইহার পর ফুলের পাপড়ী ও অন্যান্য অঙ্গগুলি ক্রমে শুকাইয়া যায়, কেবল এই পক্ক গর্ভকেশর অর্থাৎ "বীজকোষ" ক্রমে ক্রমে


ঙ

পরিণত ও বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে কিছুকাল পরে ইহাই ফল হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের শুঁটীগুলি তখন বেশ বড় বড় হইয়া উঠে, তখন উহাকে চিরিলে পাশের 'ঙ' চিহ্নিত ছবির মত দেখায়। সুতরাং দেখ কেমন আশ্চর্য কৌশল ও সুন্দর নিয়মে 'গ' চিহ্নিত কড়াই-এর ফুলটী হইতে কেমন ফলটী উৎপন্ন হইল। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ফলই ফুল হইতে সৃষ্ট হয়, ফুল না হইলে ফল জন্মিতে পারে না।"

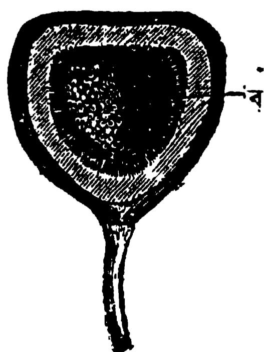

গ

কিশোরী।—"তবে ডুমুরের ত ফুল হয় না?"

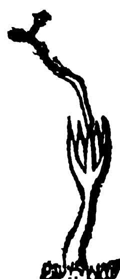
নবীন বাবু।—কে বলিল ডুমুরের ফুল হয় না? অবোধ স্ত্রীলোকেরা ও মূর্খ লোকেরাই ডুমুরের বড় বড় ও স্পষ্ট ফুল না দেখিয়া ঐরূপ কহে। কিন্তু বাস্তবিক ডুমুরের অসংখ্য ফুল হয়। বুঝাইয়া দি শুন। গাছে যে ফুল ধরে তাহা নানারূপে অবস্থিত হয়। গোলাপ, মল্লিকা,

জবা প্রভৃতি বৃক্ষে একটী বৃন্তে (বোঁটায়) একটীর অধিক ফুল হয় না। অনেক বৃক্ষেই কিন্তু ফুল সকল গুচ্ছ বাঁধিয়া এক বোঁটায় অনেক ফুল ধরে, যেমন আম, জাম, নারিকেল, তাল, শুপারি, কলা প্রভৃতি। একটী বৃন্তে অনেক ফুল গোছা বাঁধিয়া থাকে, তাহার আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। নারিকেল প্রভৃতির ফুল বোঁটাটীর গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে; আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের ফুলসকল আর এক রকমে ধরে;—সেইরূপ গাঁদা, রাধাপদ্ম প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ফুল আছে তাহারা সহসা দেখিতে একটী মাত্র ফুল বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে তাহারা একটী পুষ্প নহে। অসংখ্য ফুল সকলে গুচ্ছ। গাঁদার যাহাকে এক একটী পাপড়ী বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র পুষ্প, (চ চিহ্নিত চিত্র দেখ) একমাত্র বোঁটায় আবদ্ধ। বেশ মন দিয়া শুন। গাঁদা একটী ফুল নয় বুঝিলে, সেইরূপ অন্যান্য কয়েক জাতীয় পুষ্প আছে তাহাদের বৃন্তের অবস্থার এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে আদৌ ফুল বলিয়াই চিনা যায় না। গাঁদা ফুলের বোঁটা নীচে থাকে, খুব মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহার উপর হইতে সব ফুল বাহির হয়। অন্যান্য বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের নিয়ম ভিন্ন রূপ। যথা কদম্ব পুষ্পের বোঁটা খুব ফুলিয়া গোল ভাঁটার মত হয় ও তাহার চারিদিকে গোলাকারে ফুল ধরে। কাঁঠালের বোঁটা ফুলিয়া ও লম্বা হইয়া তাহার "ভোঁতাটা" হয়। ইহারই চারিদিকে ফুল ধরে। হয়ত তোমরা আশ্চর্য হইতেছ, কচি কাঁঠাল যাহাকে বল, তাহা ফুল!! তোমরা বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও, কচি কাঁঠাল হস্তে রগ্‌ড়িয়া কেমন সুন্দর গন্ধ দেখিতে পাইবে। সেইরূপ আর এক


চ



ছ

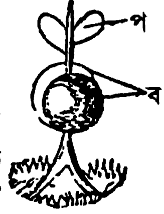

জ

জাতীয় আশ্চর্য জনক পুষ্পগুচ্ছ আছে তাহা বড় চমৎকার। ইহার বোঁটাটীর চারিদিকে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলগুলিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, এইরূপে গোল পানা বোঁটাটীর ভিতরে অসংখ্য ফুল থাকিয়া যায়, এই গোল বোঁটাটী বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ফলের মত। কিন্তু বাস্তবিক ইহা অগণ্য ফুলের সাধারণ বোঁটা!! কি চমৎকার! অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল এই জাতীয়; বাহিরে কিছুই নাই, ঠিক যেন একটী ফল। চিরিয়া দেখিলেই ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল দেখা যায়। এই সকল ফুলের পূর্বমত অঙ্গ সকলও আছে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যায় না (উপরে ছ ও জ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। এখন বুঝিলে ডুমুরের ফুল হয়

কি রূপে। পরমেশ্বরের যে কি প্রগাঢ় জ্ঞান, কি অশেষ কৌশল, কি অপূর্ব বিচিত্রতা, কি অপার মহিমা তাহার ঈয়ত্ত্বা নাই!!

এইরূপে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এই ফলই বৃক্ষাদির ডিম্বের তুল্য। ডিম্বের মধ্যে যেমন ভাবী জীবের বীজ অবস্থিতি করে, তেমনি ফলের ভিতরও ভাবী বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিদান স্বরূপ বীজ থাকে। ডিম্বের ভিতরে যেমন ঐ বীজের পোষণোপযোগী পদার্থ সকল থাকে, এই ফলের ভিতরস্থ সেই সূক্ষ্ম বীজটীর পোষণ ও বর্ধনের জন্যও উপযুক্ত সামগ্রী আছে। নারিকেলের ভিতর বীজটী অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু উহার পুষ্টিকর পদার্থ যে কত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে জল উহার মধ্যে থাকে তাহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে এবং উহার বীজ ঐ জলের সারভাগ গ্রহণ করে ও জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়, ক্রমে শাঁস বর্ধিত হয়, অবশেষে ঐ শাঁসও বীজের বর্ধনের জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে বীজটী ক্রমে বর্ধিত হইয়া নারিকেলের মধ্যস্থ শূন্য স্থানটী সমুদায় অধিকার করিতে থাকে, তাহাকে আমরা সচরাচর "ফোঁপল" বলিয়া থাকি। শেষে নারিকেলের বোঁটার দিক ফুঁড়িয়া বীজের অঙ্কুর বাহির হয়, ও একটী নূতন নারিকেল গাছ প্রস্তুত হয়!! সেই রূপে একটী ছোলা ভিজা মাটীতে ফেলিয়া রাখিলে উহার উপরিস্থ খোসা ফুঁড়িয়া অঙ্কুর বাহির হয়, ও আস্তে আস্তে বীজদল দুটী ভিন্ন করিলে তন্মধ্যে ঐ অঙ্কুরের পত্র প্রভৃতি দেখা যায় (ঝ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। সেই রূপ তেঁতুলের বীচি মাটীতে পড়িলে প্রথমে খোসা ফাটিয়া দুটী বীজদল (ঞ চিত্র দেখ) বাহির হয়," তৎপরে তাহাদের মধ্য দিয়া উহার পত্রাদি উপরে উঠে ও শিকড় নীচে চলিয়া যায়। অঙ্কুরটীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজদল দুটীও উচ্চে উঠে ও পরিষ্কার দেখা যায়। তাহার পরে ক্রমে নূতন হরিদ্বর্ণ পত্র বাহির হয়। এই রূপে অবশেষে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। তাহাতে আবার প্রতি বৎসর অগণিত ফুল হয়। ঐ ফুলে ফল জন্মে, এই ফলগুলির কতক মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ আহার করে ; তাহাদের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া আবার অগণিত বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। এই রূপে বৃক্ষ লতাদির বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য কৌশলে চিরকাল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।"


ঝ



ঞ

"এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে পরে বলিব। আজ রাত্রি হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।" এই বলিয়া নবীন বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বালকগণ অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

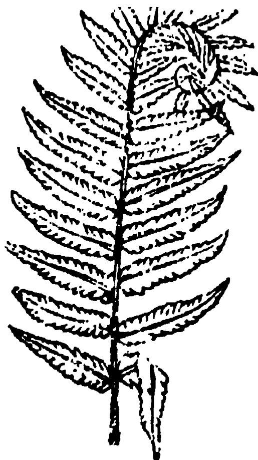
৫


একদিন সন্ধ্যাকালে কিশোরী অন্যান্য বালকগণকে লইয়া উদ্যানে নানা জাতীয় ফুল কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে নবীন বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের শিক্ষার আন্তরিক যত্ন দেখিয়া পরম আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিশোরীর প্রতি সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—"জ্ঞান লাভের এই-ই প্রকৃত পথ, সংসারে সুখী হইবার এই-ই প্রধান উপায়। প্রত্যেক বালক বালিকা যদি শুদ্ধ ক্লাশের পাঠ্য ২।১ খানি পুস্তক পাঠ হইলেই নিশ্চিন্ত না হইয়া এইরূপে প্রকৃতির শোভা

দর্শনে অশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে জানিত তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা আমোদে সময় নষ্ট বা জীবনে মূর্খ, অজ্ঞান ও অসুখী হইয়া কালাতিপাত করিত না। যে সময় তাহারা অনর্থক নষ্ট করে তাহার কিছু অংশও যদি সৎজ্ঞান ও সৎশিক্ষায় ব্যয় করিতে পারে তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়।"

কিশোরীর :—"দাদা মহাশয়! সকল বালকের দোষ নহে। তাহারা ত আর শিখাইবার লোক না পাইলে এ প্রকারে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্বে আমরাও ত সেইরূপ ছিলাম; এ প্রকার শিক্ষা করিতে যে কত আমোদ তাহা যে অবধি বুঝিয়াছি সেই অবধিই এই আমাদের খেলা, এই আমাদের সুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি সকল বালক একবার বুঝিতে পারে তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না।" আমরা সখার পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই কিশোরীর মত সুবোধ হইয়া বহুবিধ জ্ঞানলাভে সুশিক্ষিত হইবার জন্য কোন জ্ঞানী আত্মীয়ের সাহায্য লন।

অমূল্য :—"দাদা মহাশয়! সেদিন যে বলিয়াছিলেন উদ্ভিদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কি কথা বলুন না! সামান্য গাছ পালার মধ্যে যে এত কৌশল তাহা কখন জানিতাম না। আরও কি, সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবীন বাবু বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সে দিনকার কথাগুলি সকলে মন দিয়া শুনিয়াছ ও বুঝিয়াছ? (সকলেই 'হ্যাঁ উত্তম বুঝিয়াছি।') তাহা হইলে আর উদ্ভিদ যে কেবল অপদার্থ তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আরও বিশেষ কথা আছে। যে সকল উদ্ভিদের কথা সে দিন বলিয়াছি তাহাদের সকলেরই ফুল হয় ও ফল হয়। সচরাচর যে সমস্ত বৃক্ষ লতাদি "গাছ" বলিয়া পরিচিত তাহারা সকলেই প্রায় এই জাতীয়, ইহাদের পুষ্প হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'সপুষ্পক' উদ্ভিদ বলা যায়। আর কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে তাহাদের ফুল হয় না (অপুষ্পক)। ইহারা প্রায়ই নিতান্ত ছোট, কিন্তু এই জাতীয় উদ্ভিদই পৃথিবীর অধিকাংশ অধিকার করিয়া আছে। তোমরা ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, ঈশ্বরের অপার ক্ষমতা বুঝিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিবে।



ঐ যে দেয়ালের গায়ে কেমন সুন্দর একটী ছোট গাছ হইয়াছে উহা এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ। এই জাতীয় গাছেরা প্রায়ই শীতপ্রধান দেশে জন্মে, হিমালয় পর্বতের কোলে দার্জিলিঙে এই জাতীয় উদ্ভিদের অভাব নাই। ইহাদের প্রধান লক্ষণ পাতার অগ্রভাগ শুঁড়ের মত ঘোরান (চিত্র দেখ)। পুষ্করিণীর শুষুণীশাক এই জাতীয় উদ্ভিদ। ইহারা সচরাচর জলনির্গমনের নল বা নরদমার নিম্নে প্রচীরের গায়ে জন্মে। ইহাদের পাতার নীচের পিঠে কাল কাল বিন্দু বিন্দু এক রকম দাগ দেখা যায়, এইগুলির মধ্যে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ থাকে, তাহাই ইহাদের বীজের কার্য করে। পাতা শুকাইয়া গেলে এই গুঁড়া মাটীতে পড়ে ও বর্ষার জল পাইলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ জন্মায়।

তদ্ভিন্ন জলে যে অসংখ্য শৈবাল (শেওলা) জন্মে সে সমস্তই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ্।

তোমরা জান পৃথিবীর অর্ধেকেরও অনেক অধিক যায়গা জলে আবৃত, এই অপার সাগরের অতল জল এই শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখ আমরা যাহাকে বৃক্ষ বলি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ উদ্ভিদ্ জলে থাকে। আরও দেখ আম্র, জাম, কাঁঠাল, নীম প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৃক্ষেরই ছালের উপর এক প্রকার শাদা দাগ দেখা যায়। এখনি যাও দেখিবে গোল গোল দাগ আছে। সেই দাগগুলি বৃক্ষের ছালের অংশ নহে, তাহারা এক জাতীয় উদ্ভিদ্! ইহারাও অপুষ্পক। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে যে ইহাদিগকে কি চমৎকার দেখায় তাহা বলা যায় না। যেন অগণিত হীরক, চুণি, পান্না প্রভৃতি মহামূল্য মণি দিয়া গঠিত। এই এক একটী বৃক্ষে এমন কত শত সহস্র "লাইকেন্" আছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহাতে আবার জগতে কত বৃক্ষ আছে মনে কর। তাহা হইলে সর্বশুদ্ধ পৃথিবীতে কতই যে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহা কল্পনাতেও ধারণা হয় না!! আর ইহাদের এক একটীতে যে কি অপূর্ব কৌশল, তাহা যখন বড় হইবে তখন বুঝিবে।

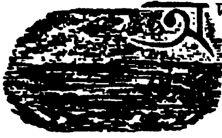
ঐ প্রাচীরের গায়ে যে সবুজ বর্ণের মখমলের মত কি সুন্দর ছোট ছোট, খুব ছোট গাছ রহিয়াছে, উহারাও অপুষ্পক জাতীয়। ইহাদেরই সংখ্যা নাই, বর্ষাকালে যেদিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়! ইষ্টকের উপরেই অধিক জন্মে, সর্বত্রই আছে। ইহাদের বংশবৃদ্ধি বড় চমৎকার। কিন্তু তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। তবে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে ইহারা যেখানে থাকে ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করে, ইহাদের শিকড় হইতেই নূতন নূতন গাছ জন্মে। শীতপ্রধান ও পার্বত্য দেশেই ইহাদের জন্মের বড় সুবিধা, ঐ ঐ স্থানে ইহারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে ও সহস্র সহস্র জাতিতে দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা বৃক্ষ লতাদির অপেক্ষা অনেক অধিক।



তৎপরে তোমরা সকলেই কোঁড়ক ও "বেঙের ছাতা" দেখিয়া থাকিবে। (ছবি দেখ) তাহাও এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ, বেঙের ছাতা নহে। গরিব ভেক ছাতা কোথা পাবে? (সকলে হাস্য করিল) কোঁড়ক উদ্ভিদ্, অন্য কিছুই নহে। তদ্রূপ আরও কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদিগকে চিনাই যায় না। আচ্ছা, চুনকাম করা দেয়াল এক বৎসরেই যে কাল দাগে ঢাকিয়া যায় তাহার কারণ কি জান? (সকলে "না") আর কিছুই নহে, বর্ষার জল লাগিয়া উহাতে এক প্রকার অপুষ্পক উদ্ভিদ্ জন্মে তাহাই পরে শুষ্ক হইয়া যায় ঐ রূপ কাল দাগে দেয়াল আচ্ছন্ন হয়—এই মাত্র। বর্ষাতে পথে ঘাটে যে "পেছল" হয়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। আর বড় বৃষ্টির পর উঠানে যে এক প্রকার বর্ণহীন জীয়ল আটার ন্যায় পেছল পদার্থ দেখা যায়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। এখন তোমরা অবাক হইতেছ,—দুগ্ধ দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বাসি হইলে তাহাদের উপর শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের যে ছাতা ধরে, তাহাও উদ্ভিজ্জ। জামা, কাপড় প্রভৃতি অনেক দিন অবধি ঘর্মাক্ত হইলে তাহাতে যে তিলের মত "ম'সে" ধরে তাহাও এক জাতীয় উদ্ভিজ্জ বৈ আর কিছু নহে।

পৃথিবীর এমন স্থান আর নাই যেখানে কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায় না। এমন কি শীতের আবাস ভূমি বরফের অঙ্গেও উদ্ভিদ্ জন্মে। উদ্ভিদ পৃথিবীর কত যে উপকারী তাহার সীমা নাই। যাবতীয় পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী সকলেই উদ্ভিদের উপরে বা উদ্ভিদ্ভোজী জন্তুর উপরে নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদেরা পৃথিবীর অলঙ্কার ও জীবের জীবন ধারণের উপায়। ইহারা পরম কৌশলী পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য ও অপার বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। তাই বলি সামান্য তৃণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" অতঃপর সকলে বাটী গেলেন।

৬



অদ্য বালকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে দাদা মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিবে।—কতকগুলি বস্তু বেশ শক্ত আর কতকগুলি পাৎলা কেন? নবীন বাবু আসিবামাত্র সকলে প্রণাম করিয়া এক বাক্যে ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ক্রমে তোমরা কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তা ভাল ; আমিও বুঝাইয়া দিব, কেবল তোমরা খুব মনোযোগ দাও, যেখানে না বুঝিবে অমনি বলিবে। এক মনে শুন। পৃথিবীতে যতগুলি বস্তু আছে সমস্তকেই তিনটী ভাগ করা যায়,—যথা, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। ধাতু, কাষ্ঠ, পাথর, কাচ, কাগজ, জন্তুদিগের হাড়, প্রভৃতি যে সকল শক্ত জিনিষ দেখা যায় তাহারা 'কঠিন'। দুগ্ধ, জল, তৈল, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যকে আমরা পাৎলা বলি তাহারাই 'তরল'। এবং বায়ু, জলীয় বাষ্প, ধূম প্রভৃতি পদার্থগুলিকে 'বাষ্পীয়' কহে। এই তিন জাতীয় বস্তুর মধ্যে কঠিন দ্রব্য সকলের নির্ধারিত আকৃতি আছে, যেখানেই রাখ ইহাদের সে আকার বদ্লিয়া যায় না। কিন্তু পাৎলা জিনিষের কোন রকম নির্দিষ্ট আকার নাই, যে পাত্রে তাহারা থাকে সেই পাত্রেরই আকার অবলম্বন করে, বুঝিলে? (সকলে "হাঁ")। বাষ্পীয় পদার্থের বিশেষ গুণ এই যে উহারা কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে বা স্থানে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, কেবল উড়িয়া উড়িয়া ছড়াইয়া বেড়ায়। একটী বাটীতে এক বাটী জল রাখিলে তাহা তেমনি থাকে, কিন্তু এক বাটী ধূম রাখিলে সেরূপ থাকে না ; অমনি উড়িতে আরম্ভ করে ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাটী বায়ুতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধূম অদৃশ্য হয়, না? (সকলে "তা জানি")। কঠিন বস্তুকে ভিন্ন আকারের করিতে হইলে, কি বিভাগ করিতে হইলে অনেক বল আবশ্যক ; তরল বস্তুকে বিভাগ করা খুব সহজ, অতি সামান্য বলেই জলীয় পদার্থ সকল ভিন্ন হইয়া পড়ে ; বায়বীয় পদার্থকে বিভাগ করিতে একটুও বল লাগে না, তাহারা আপনারাই সর্ব্বক্ষণ বিভিন্ন হইতে চেষ্টা করিতেছে, বরং তাহাদিগকে একত্র রাখিতেই বলের আবশ্যক। সোডা ওয়াটারের বোতলের ভিতর যে বাষ্প থাকে তাহাকে উহার মধ্যে রাখিবার জন্য একটা খুব মজবুত ছিপি শক্ত তার দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যাই ঐ তার খোলা যায় অমনি দম্ করিয়া ছিপিটী ছিট্‌কিয়া যায় এবং ঐ গ্যাস বাহির হইতে থাকে, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা জলও বাহির হয়। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, কতকটা জলীয় পদার্থ একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেই ঠিক থাকে ; কিন্তু বাষ্পীয় কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে কোন পাত্রে রাখিলে কিছুতেই সেরূপ থাকে না, কেবল বলপূর্ব্বক তাহাকে সেইরূপে রাখিতে হয়। কেমন? (সকলে "সত্যি? তাতো জানিতাম না"।) কোন টেবিলের উপর একটী কঠিন দোয়াত ঠিক বসাইয়া রাখা যায়, কিন্তু

তাহা হইতে খানিকটা কালি ঢালিলে ঐ কালি কখন উঁচু হইয়া দোয়াতের মত থাকে না, উহা গড়াইয়া যাইবে, কিন্তু বাষ্পীয় পদার্থের মত উড়িয়া যাইবে না। কোন কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া তাহা আর যোড়া যায় না, ভাঙ্গা হাঁড়ী যোড়া লাগে না। কিন্তু কোন তরল বস্তুকে যেমন সহজে বিভাগ করা যায় তেমনি সহজেই আবার একত্র করিলেই মিশিয়া যায়। বাষ্পীয় পদার্থ স্বাধীন, স্বেচ্ছামত আপনা আপনিই বিভক্ত হইতেছে, আবার মিশিতেছে, যেখানে ইচ্ছা যাইতেছে, মানুষের কথা শুনে না"। (সকলের হাস্য)।

কিশোরী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও সব জানি। কেন এরূপ হয়, তাহাই বুঝাইয়া দিন না?" নবীন বাবু বলিলেন "তাই বলিব শ্রবণ কর। কোন জিনিষকে ভাগ করিতে করিতে ক্রমে খুব ছোট হইয়া যায়, আরও ভাগ কর, ১০০, ২০০, ২০০০, ২০০০০ ভাগ, আরও আরও এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে একটী এমন ছোট বিন্দুবৎ কণা পাওয়া যাইবে যাহা আর ভাগ করা যায় না। (তত ছোট বস্তু দেখাই যায় না, ভাগ করিব কিরূপে?) তবু মনে কর যদি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সর্বশেষে এ প্রকার বিভাগ করা অসম্ভব এমন একটী কণা পাওয়া যাইত—এইটীর নাম "পরমাণু"। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর দ্বারা প্রস্তুত। কি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পীয়, কি স্বর্ণ, কি লৌহ, কি মৃত্তিকা, কি রক্ত, কি বৃক্ষলতাদি, সমস্ত বস্তুই এ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কোটী কোটী পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী বালুকাকণা নির্মিত হইয়াছে। কোটী কোটী পরমাণু লইয়া এক একটী জলীয় বাষ্পের কণা হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু লইয়াই এ বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি।"

মন্মথ।—যদি একই পরমাণু দ্বারা সমুদায় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইহার কারণ কি?"

অমূল্য।—তবে একটী বা শক্ত কেন, আর একটী নরম কেন?

নবীন বাবু।—এই পরমাণুগুলির একটী প্রধান গুণ এই যে ইহারা পরস্পরকে আপনার দিকে টানে। প্রত্যেক পরমাণু অপর সকলগুলিকেই নিজের দিকে টানে, তবে স্থান ও অবস্থাভেদে সকল পরমাণুর টানের জোর সমান নহে। কিন্তু এমন একটীও নাই যে এই "আকর্ষণের" অধীন নয়। চারিদিকে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সে সমস্ত এই "আকর্ষণ"-এর বলেই বর্তমান আছে। যে দ্রব্য কেন হউক না, এ আকর্ষণ না থাকিলে থাকিত না। ক্রমে যখন বড় হইবে এই আকর্ষণ শক্তির যে কত ক্ষমতা, ইহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত কার্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইবে। একটা ঢিল উপরে ছুড়িয়া দিলে, ছুড়িবার বল যতক্ষণ রহিল, উহা ততক্ষণ ঊর্ধ্বে উঠিল, তৎপরেই মাটীতে পড়িবে কেন? (সকলে : "মাটী বুঝি উহাকে টানে?") ঠিক বলিয়াছ। এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড, ইহাতে অসংখ্য পরমাণু আছে, সুতরাং পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা পৃথিবীর নিজের আকর্ষণ শক্তি বেশী। মনে কর তোমার দলে ১০ জন লোক, আমার দলে ১০০ জন, কিশোরীর দলে হাজার জন। তাহলে কার বেশী জোর হবে? (সকলে :—"কিশোরীরই"। তেমনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পরমাণু আছে বলিয়া অন্য সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা ইহার টানিবার ক্ষমতা বেশী। এই জন্যই সব জিনিষ পৃথিবীতে আছে, এজন্যই ফলগুলি পাকিলে মাটীতে পড়িয়া যায়। এজন্যই লৌহের দ্রব্য ভারী বোধ হয়, কেন না তাহাকে হাতে লইলেই পৃথিবী টানিতে থাকে, সেই টান ভার বলিয়া বোধ হয়। বুঝিলে?

কিশোরী—যেমন একটা জিনিষের একদিকে আমি আর একদিকে আর কেহ টানিলে আমার হাতে জোর লাগে, ঠিক তেমনি, আমি ধরিয়া আছি পৃথিবী নীচে হইতে টানিতেছে এজন্য ভারী হয়, এই ত?

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ, তাই বটে। শুধু লৌহের দ্রব্য কেন, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সমস্তই এই আকর্ষণের বশ। ইহাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কহে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর নিজের পরমাণুগুলির যে পরস্পর আকর্ষণ আছে তাহার কাজ ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র রাখিবার চেষ্টা করা। এই আকর্ষণকে আণবিক আকর্ষণ বলে। এটী থাকাতেই আমরা প্রত্যেক বস্তুর আকার দেখিতে পাই, নতুবা কেবল রাশি রাশি পরমাণু পৃথিবীময় ছড়ান দেখিতাম। সুন্দর বৃক্ষলতা, চমৎকার সুবর্ণালঙ্কার, পরম শোভাময় কাচের বাসন, বৃহৎ অট্টালিকা, প্রকাণ্ড পর্বত, কোন বস্তুই থাকিত না। ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মাধ্যাকর্ষণের নাই, ইহা বরং উহাদিগকে টানিয়া আলাদা করিতে চায়, কঠিন বস্তুর আণবিক আকর্ষণ অধিক বলিয়াই পারে না। এখন বেশ বুঝিলে প্রত্যেক পরমাণুর উপর দুইটী শক্তি কার্য করিতেছে ; একটী তাহার নিকটবর্তী পরমাণুগুলির সঙ্গে তাহাকে মিশাইতে চায়, আর একটী তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ভিন্ন করিয়া পৃথিবীর দিকে ফেলিয়া দিতে চায়। এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে, যে শক্তিটী অধিক বলবান হইবে তাহারই দিকে সেই পরমাণুটী যাইবে। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বল আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক না হয় তাহা হইলে পৃথিবী আর তাহাকে ভিন্ন করিতে পারিল না ; কেমন? (সকলে "হাঁ তা ত হবেই") সুতরাং তাহার যেমন আকার তেমনি থাকিয়া গেল। এইরূপ পদার্থকেই 'কঠিন' বলে। আবার যে বস্তুতে আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অধিক, সে বস্তুর পরমাণুদিগকে পৃথিবী টানিয়া আলাদা করিয়া ফেলে, সব পরমাণু গড়াইয়া, আল্‌গা হইয়া, মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদিগকেই 'তরল' বা পাৎলা বলে। ইহাদের নিজেদের ভিতরে তেমন আঁট্ নাই, অথচ শত্রু পৃথিবী সর্বদাই ইহাদিগকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কাজেই ইহারা আর ঠিক থাকিতে পারে না। এইরূপে আমরা বেশ বুঝিলাম, কি প্রকার বস্তু কঠিন ও কি প্রকার দ্রব্য তরল। যাহার আণবিক আকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অপেক্ষা অধিক বলবান তাহার পরমাণুরা পৃথিবীকে যেন বলে 'তুমি টান না, তোমার চেয়ে আমাদের মিল বেশী, আমরা কখন আলাদা হব না।' এই সকল দ্রব্যই 'কঠিন' হয়। তাহাদের মধ্যে এমনি 'ভাব' যে পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড জিনিষও তাহাদের মধ্যে 'আড়ী' করাইতে পারে না। (সকলে হাসিল ও বলিল "বেশ বুঝিয়াছি।") আর যে সকল জিনিষের পরমাণুদের আকর্ষণ অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি বেশী, পৃথিবী তাহাদিগকে বলে—'কেমন জব্দ, এখন আয়, সব ছাড়িয়া পড়্।' ইহারাই পাৎলা ইহাদের এইরূপ অসহায় অবস্থা বলিয়াই আমরা ঘটী, বাটী, হাঁড়ী, খোরা প্রভৃতি পাত্রে ইহাদিগকে রাখি, তাহা হইলে আর ইহারা ছড়াইতে পারে না, কঠিন পদার্থের মত ইহাদিগকে রেকাবীতে কিম্বা টেবিলে রাখিবার যো নাই।

"কঠিন ও তরল দুই প্রকার দ্রব্য কি রূপে হয় তাহা বুঝিলে ; এই বার বাষ্পীয় দ্রব্যের কারণ বলিব শ্রবণ কর। বাষ্পীয় পদার্থেরও পরমাণুকে পৃথিবী আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহাদের আর একটী গুণ আছে, তাহাদের পরমাণুগুলিতে আর একটী শক্তি কার্য করিতেছে, সে শক্তিটী বড় প্রবল। উহার বল এত অধিক যে আণবিক ও পৃথিবীর আকর্ষণ দুটী শক্তিও

তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। পৃথিবী সমস্ত বলে ইহাকে টানিতেছে তথাপি উহা মাটীতে কঠিন ও তরল দ্রব্যের মত পড়িয়া থাকে না। এই তৃতীয় শক্তির নাম—'আণবিক বিয়োজন'। ইহার কার্য কেবল প্রত্যেক পরমাণুকে অন্য সকল পরমাণু হইতে দূরে ব্যাপ্ত করা। ইহা যেন পরমাণুদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্যই আছে। যাহাতে এক একটী অণু অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হয়, ইহাই এই বিয়োজন শক্তির উদ্দেশ্য। এই জন্যই, কি আণবিক আকর্ষণ, কি মাধ্যাকর্ষণ, ইহার কাছে কাহারও বল খাটে না। এজন্যই বায়ু, বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ সকল স্বাধীনভাবে আকাশে বেড়ায়, কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। বিস্তীর্ণ আকাশই ইহাদের গৃহ। পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে জল বাষ্প হইয়া এই নিমিত্তই আকাশে উঠে এবং সেখানে মেঘরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

"এখন বোধ করি বুঝিলে কি প্রকারে পরমাণুগুলির অবস্থাভেদে পদার্থ সকল কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় তিন প্রকারে বিভক্ত। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এই তিন অবস্থার একটী না একটীতে দেখা যায়। হয় কঠিন, না হয় পাৎলা, নয়ত বাষ্পীয়। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আজ বাড়ী যাইব। কঠিন দ্রব্যও তরল করা যায় ও বাষ্পীয় করা যাইতে পারে। তরল বা বাষ্পীয় দ্রব্যকেও কঠিন করা যায়।" অমূল্য।—"কেন যাবে না? বাতী, গালা প্রভৃতি কত কঠিন পদার্থ আগুণে দিলেই গলিয়া পাৎলা হয়। আবার দুধ, মালাই, লেবুর রস প্রভৃতি সব ঠাণ্ডা করিয়া কুল্পী তৈয়ার করে, তখন ঐ পাৎলা জিনিষগুলি ত জমিয়া কঠিন হয়।"

বিনয়।—আর বরফ? বরফ ত জল জমিয়াই হয়।

নবীন বাবু বড় সুখী হইয়া বলিলেন "ঠিক। উত্তাপদ্বারা কঠিন দ্রব্য তরল হয়, এবং তরল দ্রব্য বাষ্পীয় হয়। তোমরা সকলে জান স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আগুণে দিলেই গলিয়া যায়। আরও জান রৌদ্রে জল গরম হইয়া বাষ্প হয়, ও কড়ায় দুধ জ্বাল দিবার সময়ে কড়া হইতে বাষ্প উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উত্তাপ তরল বস্তুকে বাষ্পীয় করে ও কঠিন দ্রব্যকে তরল করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে—উত্তাপের একটী বিশেষ গুণ—উহা দ্রব্য মাত্রেরই আণবিক আকর্ষণ হ্রাস করিতে থাকে, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই কঠিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদার্থ উত্তপ্ত হইলে প্রথমে কোমল ও পরে তরল হয়। আরও উত্তাপ দিলে অবশেষে উহাদের আণবিক আকর্ষণ একবারে বিনষ্ট হয়, এবং বিয়োজন বর্ধিত হইয়া তাহাদিগকে বাষ্প করিয়া দেয়। উত্তপ্ত হইলে এইরূপ যেমন পরমাণুর আকর্ষণ হ্রাস হয়, শীতল হইলে তদ্রূপ উহা বর্ধিত হয়, এবং তজ্জন্য শীতে বাষ্প ঘন হইয়া তরল হয় এবং আরও শৈত্য পাইলেই তরল পদার্থ সকল জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। এই কারণেই জলের বাষ্প জমিয়া জল হয়, এইজন্য শ্লেটে হাই দিলে মুখের জলীয় বাষ্প সকল প্রশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া শীতল শ্লেটে লাগিয়া জমিয়া যায় ও জল কণারূপে দেখা যায়। এই জন্যই একটা গ্লাসে বরফ রাখিলে, ঐ ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া বায়ুর অদৃশ্য জলীয় বাষ্প সকল জমিয়া যায় ও গ্লাস ঘামে বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই আবার দুধ, মালাই, লেবুরস, আনারসের জল প্রভৃতি তরল পদার্থ সকল বরফের মধ্যে রাখিয়া জমাইয়া বরফ করে ও কুল্পী করিয়া ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করে। এই জন্যই বৃষ্টির ফোঁটা জমিয়া গিয়া শিলাবৃষ্টি হয়। এই জন্য শীত-প্রধান দেশে জল জমিয়া বরফাকারে কঠিন হয়।"

কিশোরী।—শক্ত নরম জিনিষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আজ আমরা কত নূতন কথা

শিখিলাম। পরমাণু, আণবিক আকর্ষণ, আণবিক বিয়োজন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ—কত শিখিলাম। দেখ ভাই, যখন 'সখা'তে এ বিষয় লেখা হবে তখন এই সকল কথা আবার অনেক বার পড়িব, না হইলে মনে থাকিবে না, আর এ শিক্ষার কোন ফলই হইবে না," তৎপরে হৃষ্টমনে সকলে বাড়ী গেলেন।

৭



দ্য নবীন বাবু তাঁহার বালক সেনা সঙ্গে করিয়া মাঠে বেড়াইতে চলিয়াছেন ; কিশোরী মন্মথ, অমূল্য, চন্দ্রনাথ, বিনয়, নগেন, দেবেন্দ্র, নলিন প্রভৃতি বালকগণ মহা আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া হাতধরাধরি করিয়া যাইতেছে। দেখিতে কত সুন্দর। সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা কাহারও বনাতের ডবল্‌ব্রেষ্ট্‌ কোট, কেহ বা কোট র‍্যাপার গায়, কাহারও শালের রুমাল, সকলে হৃষ্ট পুষ্ট ও সুশ্রী। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ ও শ্রম করিয়া এবং সৎ বিষয়ের আলোচনাতে ও সৎসঙ্গে সকলেই সৎচরিত্র ও সুস্থ শরীর লইয়া কেমন এক অপূর্ব সৌন্দর্যে যেন পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। এতগুলি ছোট বালক তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে, ও তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতেছে, ইহা ভাবিয়া আজ নবীন বাবুর বড়ই আনন্দ হইতেছে ; সেই আহ্লাদ তাঁহার চক্ষু ও মুখে যেন মাখান রহিয়াছে। তিনি যতবার তাহাদের দিকে দেখিতেছেন, যতবার তাহাদের সরল ভাব ও সুহাস্য বদন, উৎসাহের চলন ও উৎসুক কথোপকথনের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছেন. ততই আনন্দে তাঁহার বক্ষঃস্থল যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ কোন্‌ বিষয়ে কথা বার্তা হইবে তাই লইয়া বড় তর্ক হইতেছে ; কেহ বলিতেছেন "আজ মাধ্যাকর্ষণটা ভাল করিয়া বুঝিব।" কেহ বা আজ গঙ্গার-কথা তুলিবে বলিতেছে, কেহ ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে বলিতেছে। এইরূপে সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত দিতেছে শেষে স্থির হইল—"দাদা মশাই যা ভাল বিবেচনা করেন তাই হবে।" নলিন বাবু চিরকালই সমান চঞ্চল। হঠাৎ পথে একটা দড়ি দেখিয়া সেটা লইলেন ও তথায় বসিয়া তাহার একদিকে একটী ইষ্টক খণ্ড (ঢিল) বাঁধিলেন। আর সকলে অনেক দূর গেল, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল,—

মহা কাজে ব্যস্ত, ভ্রূক্ষেপই নাই। পরে যখন মনের মত হইল, তখন "হু উ—উ—উ" করিয়া একটা শব্দ করিতে করিতে দড়ির অপর দিকে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে একছুট। দড়িটা "বোঁ বোঁ" শব্দে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে সকলে মাঠে পঁহুছিলেন। একটী উচ্চ স্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া সকলে নবীন বাবুকে ঘেরিয়া বসিলেন। নলিনের ইচ্ছা যে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ঢিলটী ঘোরায়। তাহা দেখিয়া নবীন বাবু বলিলেন "ভাল নলিন তুমি যে ওটা ঘোরাচ্ছ, বল দেখি ঢিলটী অমন ঘুরিতেছে কেন?" নলু বাবু মহা খুসী "ঘুরছে কেন বল্‌ব? আচ্ছা, এই দেখ। এই,—এই একদিকে ধর্‌লাম, আর এই জোর দিলাম, আর, অমনি ঘুর্‌তে লাগল। এ আর আশ্চর্য কি?" নলিন আবার ঘুরাইতে লাগিল।

তখন নবীন বাবু আর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "নলিন ত পারিবেই না, তোমরা কে পার বল দেখি?" বিনয় বলিল "পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া"; মন্মথ বলিল "তা নয়, দড়িতে বাঁধা আছে বলিয়া।" কিশোরী বলিল।—"দুইই ঠিক, পৃথিবীও টানিতেছে,

দড়িতেও বাঁধা আছে, দুদিক হইতেই টান পড়িতেছে এই জন্য ঘুরিতেছে।" নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বেশ বলিয়াছ ; কেবল দড়িতে ওরূপে ঘুরিত না, আবার কেবল ঢিলটীও ঘুরিত না, ছুঁড়িয়া দিলে চলিয়া যাইত ; দুটী কারণেই বটে। কিন্তু আর একটু স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। মনোযোগ দাও। আজ এই বিষয়েই কথা বলিব।"

"সেদিন বলিয়াছি সমস্ত জগৎ, সমস্ত বিশ্ব-সংসার, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি। এই পরমাণুপুঞ্জকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে কে? (সকলে "আণবিক আকর্ষণ") বেশ। আকর্ষণ কি? এক প্রকার শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে পৃথিবী, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু, আকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই থাকিত না। কেবল বিন্দু বিন্দু পরমাণু অসীম আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া ছড়াইয়া থাকিত। বুঝিলে আকর্ষণ কত প্রয়োজনীয়? এই শক্তি যে কেবল পদার্থ সকলকে নির্দিষ্ট আকারে রাখে, এমন নহে ; এমন স্থান নাই, এমন জীব নাই, যাহা এই মহতী শক্তির অভাবে শূন্য হইয়া না যাইত। আমি যে কথা কহিতেছি, নড়িতেছি, ঐ যে ফড়িংটী উড়িতেছে, সব এই শক্তির গুণে। ক্রমে বুঝিতে পারিবে, এখন প্রথমতঃ একটী কথা কখনও ভুলিও না, যে পরমাণু নির্জীব অচেতন পদার্থ মাত্র। তাহার উপর এই শক্তি যতক্ষণ না কার্য করিবে ততক্ষণ তাহার সাধ্য নাই যে স্থান পরিবর্তন করে। এই যে যুতা রাখিয়াছি যতক্ষণ উহাকে না নাড়িব ততক্ষণ উহা নড়িবে না। এই যে চাদর রহিল, না তুলিলে কখন উহা উঠিবে না।" চন্দ্রনাথ বলিল, "কেন বাতাস এলেই ত উড়ে যাবে?" নবীন বাবু :—"সেও ত বায়ুর শক্তিতে যাবে, আমার হাতের শক্তিতে যাইত, না হইয়া বায়ুর শক্তিতে উড়িল, তথাপি নিজে ত পারিল না। জড় পদার্থের সে ক্ষমতা নাই।" কিশোরী :—"আচ্ছা তবে আমার হাতও ত পরমাণুতে প্রস্তুত, তবে উহা নড়ে কেন?" নবীন বাবু :—"হাত জড় পদার্থ বটে কিন্তু উহার শিরার মধ্যে যে রক্ত আছে তাহা দ্বারা এমন একটা কার্য হইতেছে যে তন্মধ্যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তজ্জন্য আমরা ও অন্যান্য জন্তুরা এবং উদ্ভিদেরা জীবিত থাকি। জীবন আর কিছুই নহে কেবল রক্তের এই কার্য করিবার শক্তিটুকু মাত্র ; গলা কাটিলে রক্ত বাহির হইয়া যায় ;আমার এই হাত আর তখন কর্মক্ষম থাকিবে না।

অমূল্য।—রক্তের যে শক্তি আছে, উহা লৌহ বা প্রস্তরের নাই কেন? নবীন বাবু :— ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থের কোন্‌টিতে কোন্ গুণ দিয়াছেন তাহাই যখন আমরা জানিনা, কেন দিয়াছেন বা কেন দেন নাই তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? লৌহ প্রস্তরাদি বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণে শক্তি দিয়াছেন যেন তাহারা জমাট হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনরূপ চেতনা শক্তি দেন নাই, অগ্নিতে কেমন এক নূতন বিধ শক্তি দিয়াছেন তাহা যাহাতে লাগে তাহাই ভস্ম হইয়া যায়। সেইরূপ বৃক্ষাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ধন শক্তি দিয়া, জন্তুগণকে চলিবার শক্তি দিয়াছেন, এবং সর্বোপরি মানবকে জড় শক্তি ও তদ্ভিন্ন বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দিয়া সৃষ্ট পদার্থের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা ; তাঁহার সীমা অপার, ইচ্ছা ও কৌশল অসীম, তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা হয় না। তিনি অনন্ত, তাঁহার সৃষ্টির যেটুকু জানিতে পারা যায়, তাই জানিতে চেষ্টা করি এস।

শক্তি বিনা পরমাণুর সমষ্টি হয়না, শক্তি বিনা পরমাণু সমষ্টির গতিও হয়না। জড়মাত্রেরই সর্বপ্রধান গুণ নিশ্চলতা বা জড়ত্ব। শক্তি ব্যতীত আর কিছুরই সাধ্য নাই যে জড় পদার্থকে নাড়িতে পারে। মনে করিয়া রাখ এইটী জড় বস্তু মাত্রেরই প্রথম গুণ। উহার তদ্রূপ আর

একটী বড় দরকারী গুণ আছে সেটী এই : —কোন বস্তুকে একবার এক দিকে যেই চালাইয়া দিবে, অমনি সেই বস্তু সেই দিকে চলিতে থাকিবে, আর কখনই থামিবেনা, যদি তাহাতে আর কোন শক্তি কার্য না করে। বুঝিতে চেষ্টা কর। এটী একটু কঠিন। কোন পর্বতের উপর একটী পাথরের ঢিল রহিয়াছে, যদি কিছুতে তাহাকে স্থানচ্যুত না করে, তবে চিরকাল সেই-খানে রহিবে, নড়িবেনা (প্রথম গুণ)। কিন্তু একবাব তাহাকে নীচের দিকে ফেলিয়া দাও, তখন পড়িবে ও তাহার গতি আর বন্ধ হইবে না, সে পৃথিবীর আকর্ষণে পড়িতেছে, ক্রমিক পড়িবে, যতক্ষণ না কিছুতে তাহার বেগ বন্ধ করিবে, ততক্ষণ থামিবে না (দ্বিতীয় গুণ)। যেই মাটীতে পড়িবে, অমনি আঘাত পাইয়া থামিয়া যাইবে। বুঝিলে? দেবেন্দ্র : —"আপনি বলিলেন জড় বস্তুকে যেদিকে চালাইবে সেই দিকে চিরকালই চলিবে, তা কৈ হয়? উপরে ঢিল ছুড়িয়া দিলে একটু পরে পড়িয়া যায় কেন?

কিশোরী।—বা বোকা! এই বুঝি শুনিলে : সেই দিকে চিরকাল চলিবে—যদি আর কোন শক্তি না থাকে। তা ওখানে তুমি তাকে উপর দিকে ছুড়িলে আর পৃথিবী যে তাকে নীচে হইতে টানিতেছে, তবেই ত হইল ; তোমার ছোঁড়ার জোর যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ উপর দিকে গিয়া, আবার পৃথিবীর টানে মাটীতে পড়িয়া গেল। না দাদা?

নবীন বাবু।—বাস্তবিক তুমিই বেশ বুঝিতে পার, আর কেহ বোধ হয় তত মন দেয় না। নগেন বলিল "হাঁ তা বৈ কি? আর উনি যে আমাদের চেয়ে কত বড়? তা বুঝি হবে না? তবু আমি কেমন বুঝিতে পারিতেছি।" সকলেই হাসিলেন। নবীন বাবু : —তবেই দেখ, জড় পদার্থের দুটী গুণ, এক আপনা হইতে চলিতে পাবেনা, আর চালাইয়া দিলে না থামাইলে থামে না।—এই কথা বলিতে বলিতে মাঠের অন্য দিকে একটা ভয়ানক গোল উঠিল, বালকগণ এবং নিজে ঠাকুরদাদা সকলেই সেই দিকে ছুটিলেন, কাজেই এইখানে কথা থামিল।

৮


লমালের কারণ আর কিছুই নহে, একটী বেল পড়িয়া একটী ছেলের মাথা ফাঠিয়া গিয়াছে, তাহারই বাপ মা কাঁদিতেছে। বালকেরা সেখানে একটুকু দাঁড়াইয়া নিজের যায়গায় ফিরিয়া আসিল। তখন নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "বোধ হয় তখনকার কথা এর মধ্যেই ভুলে যাও নাই ; জড় বস্তুর যদি দুইটী গুণ অর্থাৎ নিজে চলিতে পারে না এবং একবার চলিলে নিজে থামিতে পারে না, যদি এই দুটী গুণ না থাকিত, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা মনেও ধারণা করা যায় না। এখন একটা তীর খুব জোরে ছুড়িয়া দিলেও পৃথিবীর আকর্ষণে ও বায়ুর বাধা লাগিয়া শীঘ্র উহা থামিয়া মাটীতে পড়ে। সকল বিষয়েই ঐরূপ নিয়ম। এখন বুঝিতে পারিবে নলিনের দড়ি বাঁধা ঢিল ঘুরিতেছে কেন? ঢিলটিকে পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে, নলিন কিন্তু উহা ছুড়িয়া ফেলিল, দড়ি না থাকিলে এক দিকে ছুটিয়া গিয়া মাটীতে পড়িত, তা হইল না, দড়ি উহাকে যাইতে দিল না, নলিনের হাতের দিকেই টানিয়া রাখিল ; ঢিলটিও কিন্তু ফি বার বাহিরের দিকে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে দড়িও যাইতে দিবে না;—কাজেই বেচারা মহা বিপদে পড়িয়া ঘুরিতেছে। যেমন একটা ঘোড়াকে দড়িতে বাঁধিয়া চাবুক মারিলে সে পালাইতে চায় কিন্তু না পারিয়া কেবল চারি দিকে গোল হইয়া ঘোরে এও সেইরূপ। কেমন, সকলে বুঝিয়াছ কি? (সকলে "হাঁ")

"এইবার এই সহজ কথাটী হইতে আজ একটী বড় কথা বুঝাইয়া দিব। আচ্ছা আগে বল দেখি পৃথিবী যে রহিয়াছে, কিসের উপর?" নলু বাবু।—"আমি জানি। এই, বাসুকী এক হাজার ফণা দিয়ে মাথায় করিয়া আছেন।" সকলে।—"হাঁ, আমরাও তাই জানি" বিনয়।—"আমার কিন্তু সে সব বিশ্বাস হয় না।" কিশোরী।—"আমারও হয় না। আমি এক-দিন আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।" নবীনবাবু হাসিয়া বলিলেন।— "এই সহজ কথাটী বুঝিতে পারিলে না? ভাল বাসুকী যদি এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী মাথায় করিয়া আছে তবে সে বাসুকীর খুব ক্ষমতা সন্দেহ নাই। বেশ, কিন্তু তাহাকে কে মাথায় কোরে আছে? সে কোথায় আছে, কিসের উপর?" সকলেই মুখ দেখাদেখি করিয়া লজ্জিত হইল। বিনয় ও কিশোরী হাসিতে লাগিল। নলিন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা আমি অতো জানি না, ছোট পিসী আমায় যেমন বলিয়া দিয়াছেন তাই মনে আছে।" নবীন বাবু।— "ওসব ভুল কথা শুনিও না। পৃথিবী যে গোল, ইহার কি আবার পাতাল আছে না বাসুকী আছে ? ইহা শূন্যময় আকাশে ঝুলিতেছে। যেমন একটা সূতাতে একটা গোল ভাঁটা ঝোলে, সেইরূপ সূর্যের আকর্ষণে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। দেখ আকর্ষণ কেমন দরকারী, ইহা না থাকিলে কি হইত? তোমরা জান সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণে বড়, সুতরাং যে বড় তারই আকর্ষণ বেশী ; এজন্য উহার টানে পৃথিবী ঝুলিতেছে। যেমন এক খণ্ড চুম্বকের টানে একটা লোহার বাঁটুল আমার বড় ঘরে ঝোলান আছে, এও ঠিক সেইরূপ।"

"কেবল তাহা নহে ; পৃথিবী ঐ ঢিলটির মত কেবলই এক দিক পানে চলিয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সূর্য তাহাকে সে দিকে যাইতে দিবে না, জোরে টানিয়া আছে। সুতরাং নলিনের ঢিলের মত ক্রমাগত পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে সূর্যের চারিদিকে গোল হইয়া ঘুরিতেছে, ইহাকেই পৃথিবীর 'বার্ষিক গতি' বলে। ৩৬৫ দিনে পৃথিবী একবার সূর্যের চারিদিক এইরূপে ঘুরিয়া আসে। ইহাও ঠিক ঐ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন ঐ ঢিলটি আর সূর্যের আকর্ষণ যেন ঐ দড়িটি।" সকলে আশ্চর্য ও আনন্দে অবাক্ হইয়া রহিল ; কেহ কেহ বলিল : —"এমন, তা জানি না। আমরা ভূগোলে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সে যে এই জন্য তা জানিতাম না ; পণ্ডিত মহাশয়ও কিছু বলেন নাই। এই বার স্কুলে গিয়া সকলকে বলিব। নবীন বাবু আরও বলিলেন :— "আরও দেখ চন্দ্র ঠিক্ এইরূপে আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, এই চন্দ্রকে লইয়াই পৃথিবী সূর্যকে বেষ্টন করিতেছে, যেমন ঢিলটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নলিন আমার চারিধারে ছুটিতেছিল। চন্দ্র প্রায় এক মাসে পৃথিবীকে ঘোরে ; এজন্য এক মাস অন্তর পূর্ণিমা হয়। সে যাহা হউক, পৃথিবী যে কত জোরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ—প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী প্রায় এক হাজার ক্রোশ পথ চলিতেছে!! নলিন যেমন একটুখানি বালক, উহার ঢিল তেমনি একটুখানি, তাহার বেগও তেমনি অল্প। সূর্য যেমন প্রকাণ্ড পদার্থ, উহার পৃথিবীও তদুপযুক্ত, ইহার বেগও তেমনি ভয়ানক! তথাপি পৃথিবী যেমন একটী তেমনি আরও কত শতটি 'গ্রহ' সূর্যের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহার কি ভয়ানক আকর্ষণ শক্তি!

বিনয়।—"পৃথিবীর আহ্নিক গতিটা কিরূপ?"

নবীন বাবু।—"সে ত অতি সহজ। যেমন, একটা গোলা মনে কর আর একটা গোলার চারিদিক বেষ্টন করিতেছে, সে নিজে দুরকমে চলিতে পারে। এক মাটীতে ঘসিয়া ঘসিয়া,

তাহাতে গোলাটির কেবল এক দিকই মাটীতে ঠেকিয়া রহিবে। আর এক, গড়াইয়া গড়াইয়া গাড়ীর চাকার মত, তাহাতে সব দিক একবার করিয়া উপরে একবার নিচে আসিবে। বুঝিলে? পৃথিবী দ্বিতীয় প্রকারে চলে। একটা মাটীর গোলার ভিতর দিয়া সরু একটী কাটি চালাইয়া দাও, পরে সেই কাটিটিতে পাক দিলে তার সঙ্গে গোলাটিও ঘোরে, এইরূপ ঘোরাকে "আপন মেরুদণ্ডে ঘোরা" বলে, ঐ কাটির নাম মেরুদণ্ড। পৃথিবীরও উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত যদি একটী ঐরূপ প্রকাণ্ড কাটি আছে মনে করা যায় সেইটীর নাম উহার মেরুদণ্ড, এই মেরুদণ্ডে যেন কেহ পাক দিতেছে তাই ২৪ ঘন্টার মধ্যে পৃথিবী একবার গড়াইতেছে, এজন্য সূর্য ও নক্ষত্রগণকে পূর্ব দিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যায়। গাড়ীর চাকা যেমন গড়াইতে গড়াইতে অনেক দূর যায়, পৃথিবীও তদ্রূপ আপনা আপনি গড়াইতে গড়াইতে সেই সঙ্গে সূর্যের চারিদিক বেষ্টন করিতেছে।"

কিশোরী।—"সবই বুঝিয়াছি, কিন্তু আমার একটী সন্দেহ আছে। যখন রেল গাড়ীতে যাই, তখন যদি জানালা দিয়া মুখ বাড়াই, তাহা হইলে বাতাসের জোরে যেন পড়িয়া যাইব ভয় হয়, আর তখন যদি কেহ ছাতে গিয়া দাঁড়ায় তবে সে নিশ্চিত পড়িয়া যাইবে। কিন্তু যখন পৃথিবী ফি সেকেণ্ডে ১০০০ ক্রোশ পথ ছুটিতেছে, রেলের চেয়ে কত হাজার হাজার গুণ জোরে, তখন আমরা ছুড়িয়া পড়ি না কেন? আর বাতাসই বা সে রকম তেজে গায়ে লাগে না কেন?"

নবীন বাবু।—"বেশ বলিয়াছ, এ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক, তুমি ত বালক, বড় বড় পণ্ডিতেরাই একথা তলাইয়া বুঝেন না। ভাল, রেলের গাড়ীর ভিতরে যখন বসিয়া থাক তখন ছুড়িয়া পড় না কেন? তখনই বা বাতাসের অত তেজ হয় না কেন?" (কিশোরী:—'বলিতে পারি না') এইটী বুঝিতে পারিলেই ঠিক হইবে। গাড়ীর ভিতরে বসিলে বায়ুর গতি অনুভব করা যায় না তাহার কারণ এই যে গাড়ীর ভিতরে যে বাতাস আছে তাহা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলে, ছাতের উপর ত তাহা নহে, সেখানকার বাতাস গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলে না কাজেই তাহাদের তেজে পড়িয়া যাইতে হয়। পৃথিবী আমাদিগকে যেমন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, গাছ, বাড়ী, পুকুরে, নদীতে ও সমুদ্রে জল রাখিয়াছে, সেইরূপ বাতাসকেও ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। কদম ফুলের গায়ে পাপ্‌ড়ীগুলি যেরূপ থাকে, আমাদের মাথায় চুল যেরূপ থাকে, মণ্ডলাকার পৃথিবীর গায়ে ৫০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুরাশিও ঠিক সেইরূপ আছে। ইহাও পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিতেছে সেই জন্য আমরা বায়ুর জোর টের পাই না, আর পৃথিবী আমাদিগকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা পড়িয়া যাই না। বুঝিলেত? আরও অনেক কথা আছে, বড় হইয়া যখন পড়িবে তখন জানিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই, বড় হিম পড়িতেছে।" নলিন—"আমাকে তোমরা খাবার দাও, ভাগ্যিস্ আমি ঢিল ঘুরাইতেছিলাম তাই ত এত নূতন কথা শিখিলে?" সকলে হাসিলেন।

অমূল্য।—"নলিন, ছোট পিসীকে আজ গিয়া জিজ্ঞাসা করিও, বাসুকী কিসের উপর থাকে?"

বিনয়।—"তা তিনি বলিবেন 'দেবতা যে বাসুকী'।"

সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

মন্মথ।—"দাদা মহাশয়, এবার হিম পড়ে কেন, আমি শুনিব, জানিনা। আরবারে তাই বলিবেন কি?"

৯


জ আবার নবীন বাবু সব বালকদিগকে লইয়া মাঠে গেলেন। এখন গ্রীষ্মকাল হিম পড়ে না, এ জন্য মন্মথ সেদিনকার প্রশ্নটী ভুলিয়া গেল। খেলা টেলা হইয়া গেলে সকলে এক সঙ্গে বসিলেন, গল্প আরম্ভ হইবে। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মাঠের ও পারে কোন্ গ্রাম জান? কিশোরী বলিল 'কৈখালি'। তার পরে কোন গ্রাম?" আর কেহ বলিতে পারিল না। তখন মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কি গ্রাম আছে? গ্রাম কত গো?" নবীব বাবু বলিতে লাগিলেন "বাস্তবিক, তোমরা কিছুই জান না, পৃথিবীতে যে কত গ্রাম আছে তাহা গোনা যায় না। ধর, এই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী দেশ, ইহাতে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, রাজপুতানা, নিজামরাজ্য, বিরার, প্রভৃতি কতগুলি প্রদেশ আছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আমাদের বাস। এই বাঙ্গালার মধ্যে আবার কতগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে আবার কতগুলি করিয়া জেলা, ঐ জেলায় জেলায় আবার অনেকগুলি গ্রাম, নগর, সহর প্রভৃতি আছে। এক বাঙ্গালাতেই কত শত সহস্র গ্রাম আছে, তা হলে দেখ সমস্ত ভারতবর্ষে কত গ্রাম!"

নগেন।—"আচ্ছা, আমাদের একটা গ্রামই ত এত বড়, তবে ত এই সমস্ত দেশটা কত মস্তো? তা ম্যাপে ত তা লেখেনি, ম্যাপে ছোট করিয়া যে লেখা আছে?" কিশোরী হাসিয়া বলিল তা তো হবেই, ম্যাপে কি অত বড় দেশ সমস্ত লিখিতে পারে? ছোট ছোট গ্রাম সহরগুলো মোটেই লেখে না, কেবল প্রদেশ ও বড় বড় সহরগুলির নাম দেওয়া থাকে।"

চন্দ্র বলিল।—"এ গ্রামটী এত বড়, তা এমন কত হাজার হাজার গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ, তাই যদি ম্যাপে, তত্তটুকু দেখায় তা হলে সমস্ত পৃথিবীর ম্যাপ যে কত ছোট দেখায়, তা পৃথিবী ত খুব প্রকাণ্ড? নবীন বাবু বলিলেন "তা হবে না? পৃথিবীকে কি তোমরা ছোট মনে কর বুঝি? যদি আজ এখান থেকে ট্রেনে পশ্চিম দিকে যাও, ফি মিনিটে যদি এক ক্রোশ পথও চল, তা হলেও পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ৮ আট দিন লাগে। তোমরা ত জান পৃথিবী গোল। ইহার গোল দিক বেড়িয়া যদি একটা কাচি ধরা যায়, তা হলে প্রায় হাজার ক্রোশ লম্বা। মনে কর দেখি পৃথিবীটা কত বড়। একটা বড় গাছ দেখেই তোমরা অবাক্ হও, একটা বড়-বাড়ী দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক, পাহাড় কখন দেখনি, দেখিলে আশ্চর্য্য হয়ে থাকিতে, কি ভয়ানক বড়! কিন্তু সকলের চেয়ে বড় যে পর্বত তাও পৃথিবীর কাছে যেন ছোট একটী ঢিবির মতন। তোমাদের গ্রামে বোধ হয় ৫০০ জন লোক থাকে, আর ভারতবর্ষে প্রায় এর ৫০০ হাজার গুণ লোক বাস করে, তা এখন মনে কর সমস্ত পৃথিবী ভারতবর্ষের চেয়ে কত গুণে বড়। ভয়ানক, ভয়ানক! তোমরা এর পর যখন দেশে দেশে বেড়াইবে, তখন বুঝিবে, যে পৃথিবী কত বড়।"

মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল—"কি পড়িলে এ সকল কথা জানা যায়, আমাকে বলিয়া দাও না?" কিশোরী বলিল "ভূগোল পড়িলে ও ম্যাপ দেখিলে জানা যায়।" নবীনবাবুও তাহাই বলিলেন। তখন সকলেই বলিল, আমরা সকলে ভাল করিয়া ভূগোল পড়িব ও ম্যাপ দেখিব।

তারপর নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই ত গেল পৃথিবীর কথা, তা এখন আরও কতকগুলি কথা বলিব, মন দিয়া শুন দেখি। গতবারে বলিয়াছি পৃথিবী একটী গ্রহ, সূর্য্যের

আকর্ষণে আকাশে ঝুলিয়া আছে এবং নলিন বাবুর সেই ঢিলের মত সূর্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিতেছে। (সকলে।—'মনে আছে') যেমন পৃথিবী, তেমনি আরও অনেকগুলি গ্রহও ঐরূপে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যা হলে তন্মধ্যে বৃহস্পতি প্রভৃতি কয়েকটা দেখাইয়া দিব। ইহারা অনেকেই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, ও অনেক দূরে আছে। সূর্য এই সকলের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক গ্রহের প্রায় একটী দুটী কি বেশী উপগ্রহ থাকে, তাহারা আবার ঐ গ্রহের চারিদিকে ঘোরে। যেমন চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির রাজা যেন সূর্য। উহা অতি প্রকাণ্ড—একশ, দুশ, তিনশ ;—এমন তর দশ শতে হাজার হয়। তার আবার এক হাজার, দু হাজার এ রকম দশ হাজার, কুড়ি হাজার এমন একশ হাজার হলে এক লক্ষ হয় ; তার আবার এক লক্ষ, দুলক্ষ,—এমন চোদ্দ লক্ষটা পৃথিবী এক যায়গায় জমা করিলে যত বড় হয়—তত বড় সূর্যটা!!

উঃ! কি ভয়ানক!! একটা পৃথিবীই কত বড় তার ঠিক করিতে পারি না, আর তার মত ১৪ লক্ষটা!!! বাপরে, মনে মনে ধারণা কর্তেও পারিনা। আচ্ছা, এখন এই গ্রহ উপগ্রহ, প্রভৃতি সবশুদ্ধ সূর্যটাকে মনে কর, কি ভয়ানক, কি বড়, কি প্রকাণ্ড!! মনেও যায়গা হয় না। মাথা ঘুরে যায়।—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটির নাম "সৌরজগৎ"।

আরও একটী কথা আজ বলিব, স্থির হইয়া শুন। "আকাশে ঐ যে সব নক্ষত্র একটী একটী করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, উহারা কি বল দেখি?" নলিন বলিল "ওরা সব মরা মানুষ। ঐ আমার কাকা, ঐ কায়েৎদের শামবুড়ো, ঐ ন্যায়লঙ্কার মশাই!" সকলে হাসিয়া উঠিল। অমূল্য বলিল "না দাদা। ওরা সব শুনিছি এক একটা বড় বড় সূর্য, এই না?"—নবীন বাবু বলিলেন "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। যেমন একটা সূর্য ও তাহার গ্রহ উপগ্রহগণ লইয়া একটী সৌরজগৎ হয়, তেমনি ঐ নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটা সূর্য, উহাদেরও আবার এমনি গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ওরা পৃথিবী থেকে যে কতদূরে থাকে তার কিছুই ঠিক হয়নি। তবে দুটো চাবিটার দূরত্ব ঠিক করা গেছে ;—তা তারা প্রায় এতো দূরে যে অসংখ্য ক্রোশ বলা যায়। কেন না সূর্য এখান থেকে প্রায় ৫ পাঁচ কোটি ক্রোশ তফাতে আছে। তা এইটীকে যদি এক হাতে ধরা যায়, তা হলে নক্ষত্রগুলির মধ্যে এক একটা প্রায় ১০,০০০ দশ হাজার ক্রোশ দূরে!!!! সূর্য এখান থেকে যতদূরে তার প্রায় ৫ কোটী গুণ দূরে একটী নক্ষত্র থাকে, অর্থাৎ উহার দূরত্ব ২৫,০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ!!!! আরও শোন, এই নক্ষত্রটী আবার ঐ অগুন্তি নক্ষত্রগুলির মধ্যে খুব কাছে। আর আর সব নক্ষত্রগুলো যে কতদূর, তার কিছুই ঠিকানা হয়নি!! ওঃ ! কি ভয়ানক! আর আমি বল্‌তে পারি না। আর বল্‌তে পারি না। আমার মাথা ঘুরছে। তা এখন দেখ নক্ষত্র কত? ঐ সব নক্ষত্রগুলির দূরতা জানা যায়নি, উহারা লক্ষ লক্ষ গুণে সূর্যের চেয়ে প্রকাণ্ড, উহাদেরও আবার গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ঐ সমস্ত একত্র করিলে যাহা হয় তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। এখন বল দেখি ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!!"

সকলে নিজ্‌ঝুম্ হইয়া গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল। বলা শেষ হইলে "ফোঁস্, ফোঁস্" করিয়া এক একটা আশ্চর্যের চিহ্ন বড় বড় নিশ্বাস ছাড়িয়া, স্থির হইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। সকলেরই দৃষ্টি আকাশের গায়ে তারার দিকে।

১০



দ্য অপরাহ্নে বাগানের কার্য শেষ হইয়া গেলে নবীন বাবু সব ছেলেদের লইয়া তাঁহার বাঁধা ঘাটে বসিলেন। নলিনচন্দ্র মহারাজার এবার বড় আনন্দ, এবার তাঁহার একটী সম বয়স্ক বন্ধু আসিয়াছেন ; নলিন ও মাখনে বড়ই ভাব। তাহারা গলা ধরাধরি করিয়া ফুল তুলিয়া পরস্পরকে সাজাইতেছে। নলিন ফুল লইয়া মাখনের কাণে, মাথায় দিতেছে। মাখন একটু সূতা পাইয়া একছড়া মালা গাঁথিয়া নলিন বাবুকে পরাইতেছে। বড় সুন্দর! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

গল্প আরম্ভ হবে শুনিয়া দুজনে ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া দাদার কোলের গোড়ায় বসিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক হইল যে আজ বাতাসের কথা বলা হবে। তখন "হু হু" করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল। তাই কিশোরী প্রথম প্রশ্ন তুলিল যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে ও শীতকালে উত্তর দিক হইতে বাতাস বয় কেন? সকলে ঐ কথায় সায় দেওয়াতে নবীব বাবু বলিতে লাগিলেন।—"এ বিষয়টী বড় কঠিন, এটী বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিতে হইবে। স্থির মনে ধীর ভাবে সকলে শুন। সে দিন বলিয়াছি, মনে আছে, যে উত্তাপ পাইলে কঠিন তরল হয়, আর পাৎলা জিনিষ বাষ্প হয়, আবার বাষ্পীয় পদার্থ আরও হাল্‌কী হইয়া যায়? (সকলেঃ—"মনে আছে") তাহা হইলে বেশ কথা। এখন গ্রীষ্ম কাল, সূর্য দুফুর বেলা মাথা ছাড়িয়ে খানিকটে উত্তর দিকে যায় ; আর শীতকালে সূর্য প্রায় দক্ষিণ ধার দিয়া যায়, মাথার উপরই উঠে না। কেমন? (সকলে।—"ঠিক কথা।" কিশোরী।—"হাঁ দাদা, আমি ও কথাটা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।") ওটী একটু বেশী শক্ত, এখন বুঝিতে পারিবেনা ; কিন্তু মনে রাখিও গ্রীষ্মকালে সূর্য মাথা ছাড়িয়া উত্তবে যায়, তাহাকে "উত্তরায়ন" অর্থাৎ উত্তরে যাওয়া বলে ; আর শীতকালে মাথা ছাড়িয়া দক্ষিণে যায় তাহাকে "দক্ষিণায়ন" বলে। আর এই উত্তর ও দক্ষিণ সীমার ঠিক মাঝখানে যে রেখা পৃথিবীর উপর দিয়া যায় তাহার নাম "বিযুবরেখা"।

আর একটী কথা বড় দরকারী, বুঝিতে হইবে। মনে কর একটা প্রদীপ, তাহার ঠিক সুমুকে যত তাপ পার্শ্বে তত নয়। এটা যদিও ঠিক উপমা হল না, তবু মনে বুঝে দেখ, একটী নিয়ম আছে, কোন তপ্ত জিনিষের তাপ যখন ঠিক সোজা পড়ে তখন যত গরম লাগে, বাঁকা হইয়া পড়িলে তত গরম লাগে না। মনে কর রোজ যখন সূর্য মাথার উপরে উঠে তার তেজটা পৃথিবীতে ঠিক সোজা ভাবে পড়ে, তখনই বা গরম এত লাগে কেন, আর যখন সকালে বিকালে সূর্যের তাপ বাঁকা হইয়া পড়ে তখন মোটেই গরম বোধ হয়না কেন? ঐ কারণ। বু'ঝলে ত? (সকলে।—"হাঁ") এর পর এ কথা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। এই নিয়মটী থাকার জন্যই শীতকালের রৌদ্র গরম্ বোধ হয় না, বরং আরাম বোধ হয়। আর গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে বেলা ৯টার সময়েই দাঁড়ান যায় না। এই জন্যই দুফুর বেলায় আবার সকাল বিকালের চেয়ে বেশী তাপ থাকে।

বেশ কথা। এখন অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে উত্তরায়ণের সীমা হইতে বিষুবরেখার উপর দিয়া দক্ষিণায়নের সীমা পর্যন্ত যে ভূভাগ তাহাই সব স্থান অপেক্ষা অধিক উষ্ণ ;—না? কেননা ঐ স্থানটিতেই সূর্যের তেজ সোজা পড়ে। সমস্ত বছরের মধ্যে সূর্য একবার উত্তর

হইতে বিষুবরেখা দিয়া দক্ষিণ, ও পরে দক্ষিণ হইতে বিষুবরেখা হইয়া আবার উত্তর, এই পথটুকু চলে। কেন চলে, সে কথা এখন বুঝিতে পারিবেনা, কিন্তু চলে। পৃথিবীর মধ্যে এই সীমা দুটীর বাহিরে অন্য কোন স্থান সূর্যকে আর মাথার উপর পায় না। বুঝিলে? এসব বড় শক্ত কথা, একটা বড় গোলক হলে বেশ বোঝা যায়। বাড়ী গিয়ে সকলে গোলক দেখিবে। যা হোক, এটুকু বেশ বুঝিয়াছ যে বিষুবরেখাতে ও তাহার নিকটস্থ স্থান সকলে সূর্যের তেজ বড় অধিক। আরও বুঝিলে যে গ্রীষ্মকালে "উত্তরায়ণ" হয় বলিয়া উত্তর সীমা দক্ষিণ সীমা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তপ্ত হয়। আর শীতকালে "দক্ষিণায়ন" বলিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণভাগ উত্তর ভাগ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। কেমন? (সকলে।—"এটুকু বেশই পরিষ্কার হইয়াছে।")

বেশ কথা। এখন ম্যাপে দেখিও বিষুবরেখা ভারতবর্ষের কিছু দক্ষিণে আছে। (কিশো।—"আমি জানি।") হাঁ বাড়ী গিয়া ম্যাপে দেখিলেই টের পাবে। যে সোজা একটা লাইনের গায়ে "০" শূন্য লেখা আছে সেইটারই নাম বিষুবরেখা। সেটা আমাদের দেশের কিছু নীচে দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। ওদিকে সূর্যের উত্তরায়ণের সময় হিন্দুস্থানের উত্তরভাগ এবং তার ওপারের তিব্বৎ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশ সকলের উচ্চ উচ্চ মরুভূমির মত স্থান সব খুব উত্তপ্ত হয়। আমরা ভারতবর্ষের উত্তরভাগের লোক, সুতরাং এ কথা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। গ্রীষ্মকালে যে আমাদের দেশ কিরূপ ভয়ানক গরম হয় তাহা ত সকলেই জান। আবার দক্ষিণ দিকে সূর্য না থাকায় দক্ষিণ দিকের ভারত মহাসাগর ও তাহার চারিদিকের স্থান সকল আমাদের দেশ অপেক্ষা শীতল থাকে। দেখ এটী না বুঝিলে আর কিছুই হবে না। আমি আবার বলি—গ্রীষ্মকালে উত্তরায়ণ হয় অর্থাৎ সূর্য বিষুবরেখার উত্তর দিকে চলিয়া আসে। তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ ও তিব্বৎ, তাতার প্রভৃতি দেশের শুষ্ক স্থান সকল ভয়ানক গরম হইয়া উঠে। কিন্তু সূর্যের সোজা কিরণ না পাওয়াতে দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগর ও তাহার চারিদিকের জলরাশি ঐ সব জায়গার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে। বুঝিলে ত? অ্যাঁ? (সকলে।—"বেশ বুঝিয়াছি দাদা মহাশয়")।

নলিন।—"আমিও বুঝিতেছি, দাদা।"

মাখন।—"হ্যাঁ দাদা! আমিও!"

কিশোরী।—"হ্যাঁ মাখন, বুঝিয়াছিস্? আচ্ছা বল্ দেখি বিষুবরেখা কাকে বলে?"

মাখন।—"হ্যাঁ তা বুঝি আমি জানি? অতো আমি ত বল্‌তে পারি না। আমি যদি অতো বুঝ্‌তুম তা হলে তোমায় দাদা বোল্‌বো কেন? হ্যাঁ দাদা? আমি কি অতো বলিতে পারি?"

গোলযোগ মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়া নবীন বাবু আবার আরম্ভ করিলেন—"তোমরা সকলেই জান, যাহা প্রথমেই বলিয়াছি যে তাপ পাইলেই বস্তুসকল আরও পাৎলা হয়, আর কাজে কাজেই পাৎলা হইলেই হাল্‌কী হয়। এ নিয়ম কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থেই খাটে। এখন যদি দুই স্থানে দুটী পাত্র বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাপ দেওয়া যায় তবে যেটাতে বেশী তাপ দিবে সেইটা বেশী ফুলিয়া উঠিবে। আর যেটা বেশী ফুলিবে, তাহার ভিতরের বায়ু অন্যটার চেয়ে হাল্‌কী হবে; তেমনি যে দেশেব বায়ু যত গরম হবে সে দেশের বায়ু তত হাল্‌কী হবে। আর যেখানকার [illegible] যত শীতল হবে সেখানকার বায়ু তত ভারী হবে। এ অতি সহজ কথা। কেননা গরম [illegible] ফোলে অর্থাৎ তাহার পরমাণু সকল ফাঁক্ ফাঁক্ হইয়া যায়, কাজেই হাল্‌কী হইয়া যায়। আচ্ছা! এখন দেখি কোথায় এসেছ? ভারতবর্ষের উত্তরভাগ

ও তিব্বত, তাতার প্রভৃতি দেশের বায়ু গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম হয়, কাজেই উহা হাল্‌কী হয়। তার পরে কি? হাল্‌কী হলেই চারিদিকের ভারী বাতাসের উপরে উঠিবে। যেমন একটা আগুণের কুণ্ড করিলে তাহার উপরের বাতাসটা গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ধূলা, পাতা নাতা পর্যন্তও উঠিতে থাকে, তেমনি এখানেও ঐ সকল গরম বাতাস উপরের দিকে চলিয়া যায়, নীচেটা খালি হইয়া যায়। কিন্তু পাৎলা জিনিষের দস্তুরই হোচ্ছে যে খানিকটা তুলে নিলে চারিধার থেকে আসিয়া সে স্থানটা পূরিয়া ফেলে। এক ঘটি জল পুকুর থেকে তুলিয়া লইলে তাহার যে গর্ত মতন হয়, সেটা তখনই চারিদিকের জলে আবার পূরিয়া যায়। তেমনি যেই সেই গরম হাল্‌কী বাতাস উপরে উঠে, অমনি চারিদিকের যেখানে ঠাণ্ডা ভারী বাতাস থাকে তা এসে সেই খালি যায়গা পূরে ফেলে। বুঝলে ত? (সকলে।—"হাঁ, বেশ বুঝেছি") ভাল। এখন বল দেখি কোন্ দিক থেকে হাওয়া কোন্ দিকে যাবে? (সকলে।—"কেন ভারী ঠাণ্ডা বাতাস দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগরে আছে, তাই যাবে উত্তর দিকে ; না?") ঠিক। দক্ষিণে যে শীতল ভারী বায়ু আছে তাহাই "হু হু" করিয়া বহিয়া গিয়া উত্তর দিকের সেই ফাঁক বুজাইয়া দিবে। এখন ভাবিয়া দেখ কতোখানি যায়গা এই রকম ফাঁক হইয়াছিল—? এমন কি, অনেক হাজার বর্গমাইল ভূমি একেবারে বায়ুশূন্য হইত, যদি এই বায়ুর প্রবাহ দক্ষিণ দিকের সাগর হইতে না আসিত। এই জন্যই সমস্ত দিন এত জোরে দক্ষিণে হাওয়া হয়। রাত্রিতে উত্তর দিকের ঐ সকল স্থানে সূর্য না থাকাতে উহাদের বায়ু শীতল হয়, তখন আর উহা উপরে উঠে না, এজন্য রাত্রে আর তত জোরে বায়ু দক্ষিণ দিক হইতে বহে না। কোন কোন রাত্রে মোটেই হাওয়া থাকে না তাহারও কারণ এই। যে দিন যত অধিক রৌদ্র হয়, সে দিন প্রায় তত অধিক তেজের সঙ্গে দক্ষিণে-হাওয়া হইতে দেখা যায়। আর সমুদ্রের উপর হইতে আসে বলিয়া ঐ হাওয়া বেশ শীতল হয়, সমস্ত দিনের অসহ্য গ্রীষ্ম, তার পরে সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণে হাওয়া কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি হৃদয় শীতল-কর! সকলে এখন দক্ষিণে-হাওয়ার কারণ বুঝিলে? এ বিষয়টা একটু গোলমেলে, তবু বার দুই তিন মন দিয়া "সখা" পড়িলেই মনে থাকিয়া যাইবে।"

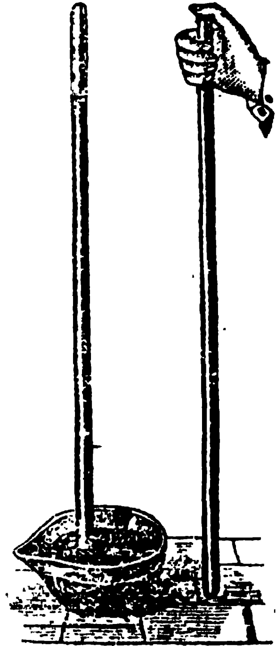
কিশোরী বলিল "আচ্ছা দাদা মশাই! শুনুন দেখি এখন আমি বলিতে পারি কি না শীতকালে উত্তর দিক হইতে বায়ু বহে কেন?—শীতকালে দক্ষিণায়ন, এজন্য সূর্য দক্ষিণ দিকে থাকে, কাজেই দক্ষিণ দিকের সাগরের জলটল খুব গরম হয়, উত্তর দিক তখন শীতল থাকে। এখন দক্ষিণের গরম বায়ু উপরে উঠিয়া যায় ও তাহার বহানে উত্তর হইতে শীতল ও ভারী বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়।"



১১

জ আবার নবীন বাবু সকলকে লইয়া তাঁহার বড় দীঘিতে একখানা ছোট জালিবোটে করিয়া বেড়াইতেছেন ; বড় ছেলেরা সব দাঁড় বাহিতেছে, ছোটরা মজা করিয়া বসিয়া আছে, বুড়ো মানুষ হাল ধরিয়া চালাইতেছেন। বোটে বেড়াইতে যাইবার নাম শুনিয়া আজ অনেকগুলি ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে। ও পাড়ার চারু, চাটুর্যেদের যদু ইত্যাদি কত যে আসিয়াছে তার ঠিক নাই, প্রায় দশ পনেরো জন। বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, কেউ গান করিতে পার?" সকলে বলিল চারু পারে। তখন সকলে পরম সুখে মনের আনন্দে সূর্য অস্ত যাবার সময় সূর্যের রাঙ্গা ছবিখানির দিকে চাহিয়া সেই বিষয়ে চারুর একটী সুন্দর গান শুনিতে শুনিতে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সে যে কি আনন্দ তা আর বলা যায় না।

বেড়ান হয়ে গেলে গল্প আরম্ভ হবে, সকলে বসিলেন। কিশোরী বলিল "দাদা! সেদিনকার কথাটা সব বুঝেছি, একটুখানি গোল আছে। ঐ যে বলেছিলে হাল্‌কী আর ভারী বাতাস,—সেখানটা আমি ভালো বুঝি নাই। বাতাস ত সকলের চেয়ে হাল্‌কী, এর আবার হাল্‌কী ভারী কি হবে? বাতাস কি ওজন করা যায়?" সেদিন স্থির হল সেই বিষয়েই বলা হবে। তখন নবীন বাবু বলিলেন, একথা ত এখানে ভাল হবে না, বাড়ী চল আমার ঘরে যন্ত্র টন্ত্র আছে, তাহাতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। অমনি সকলে হৈ হৈ শব্দে খেলার আমোদে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।



বাড়ীতে নবীন বাবুর (Experiment room) পরীক্ষা-গৃহে সকলে প্রবেশ করিয়া একটা গোল টেবিলেব চারিদিকে এক একখানা চেয়ারে বসিল। নবীন বাবু বসিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।—"সেদিনই বলিয়াছি যাহার পরমাণু আছে তাহারই ভার আছে। বায়ুর পরমাণু আছে সুতরাং বায়ুরও ভার থাকিবে। এত খুব সোজা কথা, কিন্তু এ কথা সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। তোমরা মন দিয়া শুন, বেশ্ বুঝিতে পারিবে। বাতাস যে ভারী বটে, এ আর কি প্রমাণ দিব ; যদি দেখাইতে পারি একদিকে বাতাস, আর একদিকে অন্য একটা ভারী জিনিষ—দুই ওজন করিলে সমান হয়, তাহ'লে হয়; কিন্তু তা কেমন কোরে হবে। আচ্ছা, এক কর্ম করা যাক। এই যে বড় বোতলটা, এটার মধ্যে বায়ু আছে ত? 'এটাকে ওজন করি। (করিলেন)। দেখ ঠিক আধসের হ'ল। আচ্ছা, এইবার 'বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র' দ্বারা এর ভিতরের বাতাস খানিকটা বাহির করিয়া লই—বলিয়া একটা যন্ত্রের ছেঁদায় বোতলের মুখ দিয়া একটা হাতল নাড়িতে লাগিলেন। খানিক বাদে বোতলের মুখের কাছে একটা "ষ্টপর্কক্" বা স্ক্রু দেওয়া ছিপি আঁটিয়া দিলেন ; সেটা আগেও ছিল, কিন্তু খোলা ছিল। তার পর যন্ত্র থেকে খুলিয়া লইয়া আবার ওজন করিলেন।—ঐ যাঃ!! হাল্‌কী হয়ে গেছে। তারপর দাদা বাবু বলিলেন "দেখিলে, বায়ু বাহির করিয়া লইয়াছি,

আর হাল্‌কী হয়ে গেল ; যদিও খুব কম, তবু হাল্‌কী ত হল বটে? তবেই দেখ, বাতাসের ভার আছে। আবার যদি ঐ "কন্‌ডেন্সার" যন্ত্র (condenser) দিয়া উহার ভিতর খুব বাতাস পুরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার বেশী ভারী হবে। বুঝিলে?" সকলে বলিল "হাঁ একটু একটু"। চারু জিজ্ঞাসা করিল, বায়ুর ভার মাপিবার জন্য না "ব্যারমিটার" নামে কি যন্ত্র আছে? সেইটার বিষয় বুঝাইয়া দিবেন কি?"

নবীন বাবু বলিলেন "আমি আজ সেই কথা বলিব বলিয়াই মনে করিয়াছি। আমি যাহা যাহা বলি, কর দেখি। দুহাত লম্বা একটা কাচের নল লইয়া এস, (চারু আনিল) ; ঐটা জলে পূর্ণ কর, তারপর উপুড় করিয়া টেবিলের উপর ধর। ঐ! সব জল যে পড়িয়া গেল?" কিশোরী—"তা ত যাবেই, জল যে গড়িয়ে পড়িবে। নলটার একটা মুখ যে বন্ধ আর একটা মুখ যে খোলা, তাই সব জল পড়ে গেল।" নবীন বাবু।—"বেশ্, আবার সোজা ক'রে জলে পূর্ণ কর, তারপর এই জলের বাটীতে উপুড় কর, দেখিও মুখটায় আঙ্গুল দিয়ে জলের মধ্যে রেখে তারপর ছেড়ে দিও। (কিশোরী তাই করিল) কৈ! এবার ত জল পড়িল না?"—সকলে অবাক্! কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। তখন নবীন বাবু আবার ঐ নলটা পারদে পূর্ণ করিতে বলিলেন। (পারা চক্‌চকে, খুব ভারী, পাৎলা এক রকম ধাতু)। তার পর একটা পারদের বাটীতে উপুড় করিয়া ধরিতে বলিয়া, বলিলেন—"দেখিও যেন উপুড় করিবার সময় পড়িয়া না যায়, মুখে আঙুল দিয়া ধর। আর নলটাও খুব ভারী হইয়াছে, জোরে ধরিও। ভাল, দেখ দেখি যেই আঙ্গুলটী টানিয়া লইয়া নলের মুখ খুলিয়া দিলে, অমনি হড়াৎ ক'রে খানিকটা পারা বাটীতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সবটা না। ঐ দেখ একটু নামিয়াছে, (পূর্বপৃষ্ঠায় ছবি দেখ) পারদ কিন্তু এখনও নলের মধ্যে প্রায় ২৯।৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হইয়া খাড়া আছে। এর কারণ কি জান?" সকলে আরও অবাক্! কেহই উত্তর দিতে পারিল না।

তখন একটু হাসিয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "তোমাদের দোষ নাই, কতকাল কত চেষ্টা করিয়াও বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেন 'কোন যায়গা একেবারে খালি থাকা স্বভাবের বিরুদ্ধ' তাই ঐ জল যে পড়িয়া যাইবে তাহার স্থান কে অধিকার করে? খালি থাকিতেও পারে না, এ জন্যই জল পড়িতে পারে না, এই রকম কত লোকে কত রকম কথা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেহই ঠিক কথাটী বলিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৬৪৩ যোল শ তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে ইটালি দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত 'টরিচেলী' এই মহা গোলমেলে বিষয়টী মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি অমনি একদিক বন্ধ একটী নল পারদে পূর্ণ করিয়া আঙ্গুল দিয়া তাহার খোলা মুখটা চাপিয়া ধরিলেন ও পরে তাহাকে পারদের একটা বাটীতে উলটিয়া ধরিলেন। ধরিবামাত্র খানিকটা বাটীতে পড়িয়া গেল; প্রায় ৩০ ইঞ্চি পারদ উচ্চ হইয়া নলের ভিতর রহিল, আর তাহার উপরটা খালি রহিয়া গেল। (চিত্রের বাম দিকের নল দেখ) তখন তিনি ভাবিলেন এ কি রকম কথা? যদি 'স্থান খালি থাকা স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ' হয়, তবে ৩০ ইঞ্চির উপরে কি সে নিয়ম খাটে না? নহিলে উপরে ঐ যে খালি উহা রহিল কেন? এই রূপে চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন তাঁহার আগেকার পণ্ডিতদের কথা নিশ্চয়ই ভুল। এর জন্য কোন কারণ অবশ্য থাকিবে। কি সেই কারণ? তাঁহার মতে স্থির হইল ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বায়ুর চাপ। পৃথিবীর উপরের বায়ুরাশি ঐ বাটীর পারদের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তাই সেই চাপের জন্যই ঐ

নলের ভিতরের পারদ নামিতে পারে নাই। ইহাই ঠিক কথা। তার পরে কত শত উপায়ে 'টরিচেলী' সাহেব এই কথাটী সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।"

"এখন মনে কর, পৃথিবীর উপরে আকাশে আর সমস্ত বায়ু নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি মোটামুটি প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত বায়ু আছে বলা যায়। এই সমস্ত বাতাসটার ভার পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। এমন কি পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ও আমরাও দেখাইতে পারি যে এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া স্থানটুকুর উপর প্রায় ৭১/২ সাড়ে সাত সের বায়ুর চাপ আছে; (সকলে।—"ও বাবা! তবে আমরা বাঁচি কি ক'রে, চাপে মরে যাই না কেন?") তা হলে হিসাব করে দেখ আমাদের হাতে, পায়, গায়ে কত মন ভার চেপে রয়েছে। তবু আমরা টের পাই না। মিছামিছি এত ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি অথচ টের পাই না, এত বড় মজা। কিন্তু টের যে পাই না তার কারণ আছে, প্রথমতঃ চিরকাল ধরিয়া এ অভ্যাস, এখানেই জন্ম, এখানেই বৃদ্ধি, এখানেই মৃত্যু, কাজেই সেটা বুঝিতে পারি না ;আর দ্বিতীয়তঃ যেমন উপরে ঐ বাতাস, তেমনি নীচেও বাতাস, ভিতরেও বাতাস, চারিদিকে বায়ু থাকাতেই কোন দিক থেকেই চাপ লাগে না। এ সব কথা এর পর আরও ভাল করে বুঝিতে পারিবে। এখন এইটুকু মনে রেখে দাও যে আমাদের মাথার উপর যে বায়ুর রাশি রহিয়াছে তাহার ভার আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। আমাদিগকে যেমন সহ্য করিতে হইতেছে তেমনি পুকুরের জিনিষকেও সেই রকম ভার বহিতে হয়। আচ্ছা! এখন মনে কর একটা বাটীতে জল রেখে তার উপর ঠিক তার মুখের মতন একখানা ছোট রেকাবীর মাঝখানে একটা ফুটো করে, সেইটা চাপিয়া ধরা যায়—তাহা হইলে কি হইবে?—(সকলে।—ঐ ফুটো দিয়ে হু হু ক'রে জল উঠিবে) বেশ্ কথা। এইবার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে। এখন মনে কর ঐ ফুটোটাতে যদি একটা কাচের নল বসান যায়, আর তার পর ঐ রকম চাপ দেওয়া যায় তা হলে ঐ নলের ভিতর জলটা উঠিবে। কেমন? ঐ রেকাবীটাকে যত চাপিবে, নলের ভিতরকার জলও তত উঠিবে, আর উহাকে যত আল্‌গা দিবে, জলও তত নামিবে।"

"এখানেও ঠিক সেই রকম হয়। ঐ বাটীতে পাৎলা পারা রহিয়াছে। উহার উপর সেই রেকাবীটার মতন হয়ে উপরের বাতাস চাপা দিতেছে কাজেই পারা আর ত বাটীতে থাকিতে পারিবে না, উপরে উঠিবে। তাই ঐ নলের মধ্যে পারদ খাড়া থাকে, সমস্ত নামিয়া পড়ে না। একটা নরম কাদাতে কাচ দিয়া চাপ দিলে ত সমান হয়, উঁচু নীচু হয় না ; কেন?—না সব যায়গায় চাপ পায়। আর যদি সেই কাচের মাঝখানে ফুটো থাকে তবেই না সেখান দিয়ে কাদা বেরোয়? এও ঠিক সেই রকম। পারাটার সব যায়গায় সাড়ে সাত সের করিয়া প্রতি "বর্গ ইঞ্চি" স্থানে চাপ হবে, তবে ত সেটা সমান থাকবে? (সকলে হ্যাঁ।) বেশ্, এখন মনে কর একটা নল বায়ু শূন্য করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া ধরিলাম। কি হবে? সে নলের মুখটা যেখানে সে যায়গা থেকে নলের মাথা অবধি বাতাস নাই, ফাঁক খালি। কাজেই বাহিরে যে রকম ৭১/২ সের বাতাসের ভার পাচ্ছে সেখানটায় তা পাচ্ছে না, সুতরাং সেইখান দিয়ে পাৎলা পারা উঠিতে থাকিবে,—যতক্ষণ সেখানেও বায়ুর বদলে পারার ভার ফি বর্গ ইঞ্চিতে ৭১/২ সের ক'রে হয়ে না দাঁড়ায়। বুঝিলে? (এবিষয়টা বড় কঠিন পাঠকগণ ২।৩ বার পড়িবেন)। এখন আমি যদি খালি বায়ুশূন্য নল না লইয়া, পারদ-পূর্ণ নল উহাতে ডুবাইয়া ধরি, তখন কি হয়? না ঐ পারদের মধ্যে যতটুকুর দরকার ততটুকু থাকিয়া যায়, অর্থাৎ ফি

বর্গইঞ্চে ৭½ সের যতটুকু পারা সেইটুকু নলের ভিতর উঁচু হইয়া থাকে, বাকীটা বাটীতে পড়িয়া যায়। সকলেই জানে যে প্রায় ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও এক বর্গইঞ্চি মুখ এমন একটা নলের মধ্যে যতটা পারা ধরে তাহার ওজন ৭½ সের। কাজেই বুঝিতে পারিতেছ যে কেন ঐ বড় নলটার ৩০ ইঞ্চি বৈ আর সব ফাঁকা থাকে।”

অমূল্য।—“আচ্ছা ওখানে কি কিছু নাই?”

নবীন বাবু।—“আছে, ওখানে পারদের বাষ্প আছে। সে যা হউক, কাজের কথাটা বুঝেছ ত? না হয় আর একবার ভাল করে বলি, মন দিয়ে শুনে মনে রাখ। ঐ যে ছবি উহার নীচের বাটীটাতে পারদ আছে, আর ঐ নলেও পারদ আছে। বাটীর পারদের সকল স্থানেই বায়ুর ভার পাইতেছে, কেবল যেখানে নলটী বসান সেখানে নয়। কিন্তু তেমন সেখানে ঐ ৩০ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভার বায়ুর ভারের কার্য করিতেছে। বুঝিলে? এখন বায়ুর ভার যদি অধিক হয় তাহা হইলে ঐ পারদের উচ্চতা বাড়িবে, কেননা বাহিরে জোরে চাপ পাইলে কাজেই নলের ভিতরে পারা উঠিবে। আর বায়ুর ভার কমিয়া গেলে পারাও নামিবে। এই উঠা নামা দ্বারা ; সুতরাং বেশ্ সুন্দর রূপে বায়ুর ভার মাপা যায়। এই উদ্দেশে ঐ নলের গায় ১, ২, ৩···এমনি সব ইঞ্চির দাগ দেওয়া আছে, প্রত্যেক ইঞ্চির দাগ আবার ১০০ ভাগে বিভক্ত হইয়া, তাহাও দাগ দেওয়া আছে। কাজেই, যদি এক ইঞ্চির ১০০ এক শত ভাগের এক ভাগও পারা নামে বা উঠে তাহাও বেশ পড়িয়া বুঝা যায় যে বায়ুর ভার কমিল না বাড়িল। এই যন্ত্রের নাম “ব্যারমিটার” বা বায়ুর ভারমান যন্ত্র!”

চারু।—মহাশয়! আমি একটু জিজ্ঞাসা করিব—এই ব্যারমিটারের যখন এরূপ নিয়ম, বায়ুর ভারের জন্যই যদি পারদ উঠে নামে, তাহা হইলে উচ্চ পর্বতে ইহা লইয়া গেলে ত ইহার পারদ নামিয়া যাইবে, কেননা সেখানে এখান অপেক্ষা বায়ুর ভার কম।”

মন্মথ।—“কেন সেখানে কম হবে?”

কিশোরী।—“তা হবে না? বা! শুনলে মোটে ৫০ মাইল পথ উচ্চ বায়ু আছে, তাহার মধ্যে থেকে পর্বতের উচ্চতাটা বাদ দাও, তবেই সমস্ত ৭½ সের থেকে এই নীচের বাতাসের ভারটা কমিয়া যাবে কি না।”

মন্মথ।—“হাঁ হাঁ বুঝেছি। ঠিক বটে।”

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন “চারু তুমি যা বল্লে তাই ঠিক কথা। যখন বায়ুর ভারই পারদের দাঁড়াইবার কারণ আর তাহাই যখন কম, তখন পর্বতের উপরে ব্যারমিটারের পারদ নীচু হবে না ত কি? আর যথার্থই পর্বতে না বেলুনে উঠে দেখা হয়েছে যে পারা নামিয়া পড়ে।

এখন বোধ হয় তোমরা সকলেই বেশ্ বুঝিলে যে বায়ুর ভার মাপা যায়, ও যে যন্ত্র দ্বারা মাপা যায় তাহাকে ব্যারমিটার বলে। আর এও বুঝিলে যে কিরূপে উহা দ্বারা এমন চমৎকার কাজ করা হয়।”

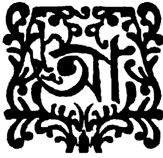
নলিন।—“দাদা, তুমি বড় শক্ত শক্ত কথা আজ কা'ল বল, একটু সহজ না হ'লে আমি বুঝিতে পারি না।”

কিশোরী।—“বা! তাহলে আমরা কি করি? আমরা যেমন ক্রমে বড় হচ্ছি তেমনি বড় বড় বিষয় শিখিতে ইচ্ছা যায় না?

নবীন বাবু।—‘আচ্ছা দুদলেরই মতন করে এবার গল্প ক'রব। আজ রাত্রি হয়েছে বাড়ী যাও।—

১২

মেঘ কি?

জ সকালে নবীন বাবু ছেলেদের লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন; কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ, দেবেন, নগেন, চারু, নলিন ও মাখন সকলেই সঙ্গে আছে। বড় শীত, সকলেরই গায়ে গরম কাপড়। কিন্তু খানিক চলিতে চলিতে শীত চলিয়া গেল, বেশ্ গরম হইয়া উঠিল। পরিশ্রম করিলে কি শীত থাকে? যে সব ছেলেরা শীত বলিয়া প্রাতঃকালে বেড়াইতে যায় না তাহারা কুড়ে। জানে না প্রাতে বেড়াইলে শরীর কত ভাল হয়। আর সকালে বাহিরের বায়ু যেমন পরিষ্কার ও পবিত্র বাড়ীর ভিতর ঘরের বায়ু তেমনি অপরিষ্কার ও রোগজনক। তা ছাড়া প্রাতঃকালে স্বভাবের অতি চমৎকার শোভা হয়, তাহা দেখিলে মন বড় পবিত্র হয় ও অনেক ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা করা যায়। তাই বালকগণ ঠাকুর দাদার সঙ্গে বা আলাদা আলাদা প্রত্যহই প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হয়। আজ সকলে একত্রে বাহির হইয়াছে, কিছু শিখিতে হবে এই অভিপ্রায়।

নানা প্রকার কথাবার্তা হইতে হইতে ক্রমে গঙ্গার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও সূর্য উঠে নাই। গঙ্গার জল হইতে ধূমের মত বাষ্প উঠিতেছে, শিশিরে ঘাস, পাতা, সব ভিজিয়া গিয়াছে, কাকেরা একটা গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে আর উচ্চৈঃস্বরে “কা” “কা” “কা” করিয়া চীৎকার করিতেছে। ঘাটে বসিবার যো নাই, ভিজা সুতরাং সকলে ফিরিলেন। আসিবার সময় কিশোরী বলিল “দাদা মশাই! ঐ যে ধোঁয়ার মত কি জল থেকে উঠ্ছে ঐ কি বাষ্প?”—নবীন বাবু বলিলেন “হাঁ”। কিশোরী।—“তবে যে আপনি বলেন বাষ্প দেখা যায় না? এই ত বে্শ দেখা যাচ্ছে? এই কথাটা আর মেঘের কথাটা ভাল করে বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝাইয়া দিবেন?” নবীন বাবু বলিলেন “চল বলিতে বলিতে যাই। কেমন নলিন? একথা কি তোমার পক্ষে বড় শক্ত হবে? (নলিন।—“না”) তবে মন দিয়া শুন। তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ, প্রথম ভাগ “সখা”তে ১৪ পৃষ্ঠায় একথা একটু লেখা আছে, তা বরং খুলে দেখিও। এখন তোমরা একটু বড় হইয়াছ তার চেয়ে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

তাপ পেলেই যে সব জিনিষ পাৎলা হয় তা এক দিন বলিয়াছি। পাৎলা জিনিষ তাপ পেলে বাষ্প হয় তাও তোমরা জান। বাষ্প সবই অদৃশ্য নয়, অনেক রকমের বাষ্প আছে তাদের লাল, নীল কত প্রকার বর্ণ থাকে। কিন্তু জল উত্তপ্ত হইয়া যে বাষ্প হয় তাহার নাম জলীয় বাষ্প, উহার কোন প্রকার রঙ্ নাই।”

মন্মথ।—“তবে এই যে আমি হাই তুলি আর ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হয়, ওর ত রঙ্ আছে?”

নবীন বাবু।—“ছিঃ! ব্যস্ত হও কেন? চিরকালই কি ছেলে মানুষ থাক্‌বে? বল্‌ছি শুন না। মুখ দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয় বা জল হইতে যাহা উঠে তাহা কেবল শীতকালেই দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে মোটেই দেখা যায় না। (সকলে।—“ঠিক কথা। কেন দাদা বাবু?”) তাহার কারণ আছে। গ্রীষ্মকালে কি বাষ্প উঠে না? তা নয়। বরং গ্রীষ্ম কালে সূর্যের তেজ বেশী ব'লে বেশী বাষ্প উঠে, কিন্তু দেখা যায় না কেন না সে সময়ে বায়ু গরম থাকে বলিয়া উহা

বাষ্প অবস্থাতেই থাকিয়া যায় কাজেই অদৃশ্য থাকে। আর শীতকালে চারিদিকের বায়ু খুব ঠাণ্ডা, এজন্য যেই বাষ্প মশাই জল থেকে উঠেন, অমনি ঠাণ্ডা বাতাস লেগে জমাট্ বাঁধিয়া অতি সূক্ষ্ম জল কণা হইয়া যান। সেই সব জলের কণারা ঐ ধোঁয়ার মত দেখা যায়।"

কিশোরী।—"দেখ অমূল্য? সে দিন তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে সেই বরফ খানার গা দিয়ে ধোঁয়া উড়ছিল কেন, তার কারণ আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। আচ্ছা, দাদা বাবু, বরফের গা দিয়ে গ্রীষ্মকালেও ধোঁয়া উঠে এই জন্যে নয় যে—আগে বরফের গায়ে লেগে চারিদিকের বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হয়, তার পর যখন ঐ বরফ থেকে বাষ্প উঠে, তখনি অমনি ঐ ঠাণ্ডা বাতাসে লাগিয়া জমিয়া এই রকম সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া যায়, তাই দেখা যায়। না?"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ঠিক বলিয়াছ। তোমরা সকলেই এখন বেস্ বুঝিয়াছ বোধ হয় যে ঐ যেটা ধোঁয়ার মত দেখা যায় ওটা বাষ্প নয়, অতি সূক্ষ্ম জলকণা। (সকলে।— "বেশ, উত্তম।") আচ্ছা! আর একটী কথা আছে। দিন রাত, সদা সর্বক্ষণই জল থেকে বাষ্প উঠ্‌ছে। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুকুর, খানা, ডোবা, ভিজে মাটী, ভিজে কাপড়, গাছ ও প্রাণীদের শরীর, সব স্থান থেকেই জলীয় বাষ্প সর্বদা বায়ুতে যাচ্ছে। বেশ্! এটা উপরে উঠে কেন?— না বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা ব'লে। উপরের বাতাস কিন্তু নীচের বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, কেন না যত উপরে যাওয়া যাবে ততই বাতাস কম, তা তোমরা জান, পূর্বেই বলিয়াছি তবেই বুঝতে পার যে এই বাষ্পরাশি উঠিতে উঠিতে এমন এক স্থানেতে পৌঁছিবে যেখানে বাতাস এর চাইতে আর ভারী নয়। যেখানকার বাতাসের ভার, ইহার নিজের ভারের সমান। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি। যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর ভার কম ; কাজেই নীচের বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা বাষ্পগুলো উঠ্‌তে উঠ্‌তে এমন যায়গায় পৌঁছাবেই পৌঁছাবে যেখানে বায়ুর অপেক্ষা আর সে হাল্‌কা নয়। সেখানে কি হবে? (সকলে।—"ভেসে থাক্‌বে।") ঠিক্। সেইখানে গিয়া ঐ বাষ্প ভাস্‌বে।" নলিন বলিয়া উঠিল "তাই বুঝি মেঘ?" মন্মথ বলিল "সে কি রকম হবে? মেঘ ত দেখা যায়, বাষ্প কি দেখা যায়? আ বোকা! এই বুঝি শুন্‌ছ?" নলিন।—"হাঁ হাঁ হাঁ! ঠিক বটে। আচ্ছা দাদা বল, তার পর? মেঘ কি করে হয়?"

নবীন বাবু।—"এদিকে পূর্বে (সখা ১ম ভাগ, ১১১ পৃষ্ঠা দেখ) শুনিয়াছ, যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। (সকলে।—"হাঁ মনে আছে।") এখন ঐ বাষ্প উপরে উঠিবার সময় ক্রমেই ঠাণ্ডা যায়গায় পৌঁছাতে লাগিল, আর অমনি সেই জন্য—? (সকলে।— "জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া গেল। কেমন?") হাঁ ঠিক। যত উপরে উঠে বাষ্প ততই শীতল স্থানে গিয়া শীতল বায়ুতে লাগিয়া জমিয়া যায়। এইটী শীতের শেষে বেশ্ সুন্দর দেখা যায়। মাঘ ফাল্গুণ মাসে সমস্ত দিন যে বাষ্প উঠে, তাহারা উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু সে সময় বাতাস খুব ঠাণ্ডা কিনা?—তাই বেশী দূর উঠিবার পূর্বেই জমিয়া যায় আর সকাল বেলা পর্যন্ত অন্ধকার করিয়া "কুয়াশা" হইয়া থাকে। (সকলে।—"বটে ? তা জানতাম না। কি চমৎকার! কুয়াশা কি ক'রে হয় শিখে গেলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।") আচ্ছা! আমারও বড় আহ্লাদ হচ্ছে। তোমরা নূতন নূতন বিষয় শিখিলে আমিও বড় খুসী হই। এখন আরও শুন। এই কুয়াশাটা যখন নীচে হয় তখনই দেখা যায়, আর যখন উপরে হয়, তখন আর কুয়াশার মত দেখা যায় না তখন উহাকে "মেঘ" বলে। যেমন বড় বড় কলের চিম্‌নী দিয়ে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা খুব উপরে উঠিয়া ভাসিয়া থাকিলে ঠিক মেঘের মত দেখায় তেমনি এই

কুয়াশাই উপরে ভাসিলে মেঘ হয়। বাস্তবিক দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি উঁচু পাহাড়ের দেশে ঘরের জানালা দরজা খোলা থাকিলে এক এক খান মেঘ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাপড়, মশারি সব ভিজাইয়া দেয়। সেখান থেকে বেশই বোঝা যায় যে, মেঘ কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়।"

কিশোরী।—"ভাল, একটা কথা। কুয়াশা ত বেশীক্ষণ থাকে না, একটু বেলা হ'লেই যায়, কিন্তু মেঘ যে সমস্ত দিন থাকে, আর অত উপরে যে জলের কণা থাকে, তা প'ড়ে যায় না কেন? বাষ্পই যেন বাতাসের চেয়ে হালকা, জলকণা ত আর বাতাসের চেয়ে ভারী বৈ হালকা নয়? এটা কি রকম?"

নবীন বাবু বলিলেন "ঐ কথা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। আগে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে বাষ্প যখন জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হয়, তখন তার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বায়ুর কণাও মিলিত থাকিত। আরও ভাল করিয়া বলি। মনে কর জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন জমিবার সময় জলের ছোট ছোট কণার সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বাতাসও থাকিয়া যায়। তা একটা বরফের চাঁই মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। তাতে সূতার মত সরু সরু বাতাস থাকিবার পথ আছে দেখিতে পাইবে। এই জন্য বরফ জলের চেয়ে হালকা হয় ও ভাসে, ঠিক তেমনি বাষ্পের এক একটী কণার সঙ্গে বাতাস মিশান ছিল কিনা? ঐ বাষ্প জমিবার সময় ঐ বাতাসটুকুও তার সঙ্গে জমিয়া যায় ; ঠিক সাবানের ফেণার মত, তবে খুব ছোট। কাজেই জল ভারী হলেও বাতাস মিশান থাকে বলিয়া উপরের বায়ুতে ভাসে। এই ছিল আগেকার পণ্ডিতদের মত। আজ কাল 'হক্সলী' 'টিণ্ডেল্' প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদের মতে সেটা ঠিক নয়। ইহাঁরা বলেন যে জলের কণাগুলি এত ছোট, এত সূক্ষ্ম যে তাহাদের বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার কোন বাধা হয় না। মনে কর লোহা ত জলের চেয়ে ৭.৮৪ গুণে ভারী, কিন্তু কামারদের দোকান থেকে খুব গুঁড়ো লোহা আনিয়া যদি জলে ফেলিয়া দাও দেখিবে ডুবিয়া যাবে না, দিব্যি ভাস্‌বে। তার মানে কি?—না, ভারী হলেও খুব সূক্ষ্ম কণা ব'লে ভাসিল। এও তেমনি, জল বায়ুর চেয়ে ভারী হ'লেও, কণাগুলি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে স্বচ্ছন্দে বাতাসের উপর ভাসিয়া থাকে। আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, বাতাস নাকি অনবরতই চলে বেড়ায় একটুও স্থির থাকে না, সে জন্যেও জলের কণাগুলি নামিতে পায় না। মনে কর একটা বড় জালায় এক জালা ঘোলা জল পূরিয়া যদি একদিন রাখা যায় তবে সে সব ময়লা থিতিয়া জল পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ ঐ সব ধূলি-কণা জলের চেয়ে ভারী ব'লে নীচে পড়িয়া যায় কিন্তু যদি ঐ জালাটা নিয়তই নাড়া যায়, তবে ধুলা কখন থিতিতে পায় না, জল ঘোলাই থাকে। এখানেও তেমনি হয়। বুঝেছ? মেঘ যে জলকণা হ'লেও ভাসে কেন, তার আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, মেঘেরা যেমন দেখায় তেমন কিন্তু নিশ্চল নয়। ভাল ক'রে দেখিলেই টের পাবে যে একখানা মেঘের ক্রমিক চেহারা বদ্‌লায়। কম্‌ছে, বাড়ছে, ঘুর্‌ছে, ফির্‌ছে, পাৎলা হচ্ছে, ঘন হচ্ছে—ইত্যাদি। তার মানে কি?—না, একখানা মেঘ হইয়া আর উপরে থাক্‌তে না পেরে নামিয়া আসিয়া ভারী হয়ে পৃথিবীতে পড়িতে চায়। কিন্তু যেই নীচের দিকে আসে, অমনি নীচের উষ্ণতর বায়ুর গায়ে লাগিয়া আবার বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে মেঘ উপরেই খেলা করিয়া বেড়ায়, নামিতে পায় না। বড় মানুষের ছেলের মত উপরেই খেলা, উপরেই বাস। নীচু লোকেদের কাছে আসে না। অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে গা ফুলিয়ে উড়িতে থাকে।"

চারু।—"আঃ। আজ কেমন সুন্দর কথা শিখিতে পারিলাম। এ বিষয়টী আরও অনেক বার ভাবিতে হইবে এবং "সখায়" যখন লেখা হবে তখন অনেক বার পড়িব। তাহলে বেশ মনে থাক্‌বে। এস্‌ ভাই! আজ সকলে ভক্তির সহিত দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই। বেলা হইলে পড়া তৈয়ার করা হবে না।" তখন সকলে গৃহে গেলেন।

১৩

মেঘে কি হয়?



লকগণ সেদিনকার কথা শুনিয়া এত উপকার বোধ করিয়াছিল যে আজ আরও অনেককে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে নবীন বাবুর সঙ্গে বাহিরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কার না আনন্দ হয়? নবীন বাবু পরম আনন্দে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে চলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন কি বিষয়ে গল্প হইবে; সেদিন সকলে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে মেঘ হইতে আরও কি হয় জানিতে হইবে। সেই কথাই হওয়া স্থির হইল। তখন নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন—

"সেদিন তোমরা জানিতে পারিয়াছ যে মেঘ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণার কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়। এই সব জলকণা আবার ক্রমাগতই বদ্‌লাইয়া কখন বাষ্প হইতেছে আবার শীতল হইয়া জলে পরিণত হইতেছে। ক্রমে যখন কোন কারণে এই মেঘ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে এমন স্থানে আসে, যেখানে শীত বেশী, তখন ইহার অধিকাংশ জলকণা আরও শীতল হইয়া ভারী হয় আর বড় হয়। তখনই বৃষ্টি হইয়া মাটীতে পড়ে। এটুকু তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। (নলিন।—"না দাদা! আমি ভাল জানি না, বল।") কেন? এত খুব সহজ কথা? জল গরম হইলে বাষ্প হয় আবার ঐ বাষ্প শীতল হইলে জমিয়া জল হয়। এও তাই। গরম বাতাসের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বাষ্প হইয়াই থাকে আর যখন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে চালিত হইয়া কোন শীতল দেশে বা স্থানে পৌছায় তখন ঐ বাষ্প সকল খুব ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া জল হয়। এই জল আগে ছোট ছোট কণা হইয়া কুয়াশার মত হয়। তার পর আরও শীতল হইতে থাকিলে ক্রমে বৃষ্টির আকার ধারণ করে। কিন্তু তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা থাকে। পরে যত নীচে নামিতে থাকে তত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় হয়। কোন পর্বতের উপরে উঠিয়া এইরূপ কুয়াশা হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এই বিষয় বেশ বুঝা যায়। একেবারে মেঘ হইতেই বৃষ্টির মত বড় বড় ফোঁটা পড়ে না। নীচে নামিতে নামিতে অনেকগুলি কণা মিলিয়া গিয়া তবে বড় বড় ফোঁটা হয়। বুঝিলে?" (সকলে।—হাঁ, বেশ বুঝেছি।)

"তার পরে আরও ২।৪-টী কথা বলিয়া বৃষ্টির কথা শেষ করিব। শীতল হইলেই ত বৃষ্টি হয় বুঝিলে। শীতল কত উপায়ে হইতে পারে ? এ সহজ কথা। মনে কর যদি এক স্থানে বায়ু রাশি রাশি বাষ্প লইয়া চলিয়াছে, ক্রমাগত দেশের পর দেশ পার হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে এমন একটা পর্বতের গায়ে আসিয়া ঠেকিল যে আর যাইতে পারে না। তখন কি হবে? পর্বতের গা ঢালু কি না (বুরুজ বা পুকুরের পাড়ের মত ক্রমে ক্রমে উচ্চ), এজন্য ঐ বায়ু তখনই গা বহিয়া চূড়ার দিকে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। আর তোমরা জান যে যত উপর তত শীতল। কাজেই ঐ বায়ু ও বাষ্প সব শীতল হইতে আরম্ভ করে। শীতল

যে হওয়া, আর অমনি বাষ্প মশাই গলে একেবারে জল। কেমন? (সকলে হাঁ।) আর কি? হু হু করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। এই রকম করিয়া আমাদের দেশের মলবার উপকূলে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। আরব সাগর হইতে গ্রীষ্মকালে বায়ু বহে, তাহাকে দক্ষিণা (বা দক্ষিণ পশ্চিমের) বায়ু বলে। এই বায়ু বিস্তর বাষ্প লইয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিতে থাকে, কিন্তু পথিমধ্যে পশ্চিমঘাট গিরির গায়ে ঠেকিয়া আসিতে পারে না, উপরে উঠিয়া পড়ে কাজেই উহার প্রায় সমস্ত বাষ্পই বৃষ্টি হইয়া পর্বতের গা ভাসাইয়া দেয়। আর তারপর ঐ বায়ু যখন পর্বত পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আসে তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এইরূপ ভারতমহাসাগরের সমস্ত মেঘই উত্তর দিকে আসিতে থাকে শেষে গিয়া—? (সকলে।—"হিমালয় পর্বতে ঠেকিয়া যায়।") ঠিক! আর সেই সব বৃষ্টি হইয়া পড়ে, ঐ বৃষ্টির জলে আর্যাবর্তের এত নদ নদীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু আবার ওদিকে ঐ বায়ু যখন হিমালয় পার হইয়া তিব্বত দেশে উপস্থিত হয় তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না, এই জন্য ঐ দেশের অবস্থা এত হীন ; ওখানে প্রায় সবই মরুভূমির মত।"

কিশোরী।—"তবে ত হিমালয় পর্বত থাকাতে আমাদের দেশের খুব উপকার হইয়াছে। না হইলে ত এত নদী, এত বৃষ্টি কিছুই হইত না, আর আমাদের দেশ মরুভূমির মত হইয়া যাইত। ধান চাল কিছুই জন্মিত না?"

নবীন বাবু।—"ঠিকই বুঝিয়াছ। এই জন্যই আমাদের দেশ এত উর্বরা। আমাদের দেশের পক্ষে হিমালয় আরও কত যে উপকারী তাহা এর পর আরও জানিতে পারিবে। এখন বৃষ্টির কথা আবার বলি। যদি এইটী একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে যেদেশে পর্বত নাই সেখানে বৃষ্টি হইত না।"

মাখন।—"হাঁ দাদা বাবু ! আমি ঐ কথাটাই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম। আমাদের দেশেতে পর্বত নাই তবে এখানে এত বৃষ্টি হয় কেন?"

নবীনবাবু।—"মন দিয়া শুন। যেটী বলিলাম সেটী একটী কারণ, বৃষ্টি হইবার আরও কারণ আছে, মনে কর দুদিক হইতে দুটী বায়ুর স্রোত আসিয়া মধ্যে এক স্থানে ঠেকা ঠেকী হইল। তখনই অমনি যেমন কলের গাড়ীর "কলিসন" হলে হয়, দুটাতে খুব ধাক্কা লাগিল। কিন্তু বাতাস ত আর গাড়ীর মত ভারী নয় যে মাটীতে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। উহা হাল্‌কা কাজেই দুটা বাতাস উপর দিকে উঠিতে থাকে। কাজেই উপরে উপরে উঠিয়া শীতল হয় আর ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টিও হইয়া পড়ে। আরও নানা প্রকার কারণে বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে কোন কারণে মেঘ আরও শীতল হয় অমনি এক পশলা বৃষ্টি হইবেই হইবে।"

অমূল্য।—"আচ্ছা কোন্ কোন্ স্থানে সকলের চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়?"

নবীন বাবু।—"প্রায়ই যে যে স্থান সমুদ্রের ধারে, বা যেখানে বায়ুর পথের মধ্যে পর্বত আছে, সেই সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আর সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই (tropical countries) অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের একটা স্থান আছে, বাঙ্গালার উত্তর আসামের পূর্বদিকে খসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে যত অধিক বৃষ্টি হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এত বৃষ্টি হয় না।"

মন্মথ।—"আর এমন দেশ আছে, সেখানে একটুও বৃষ্টি হয় না?"

নবীন বাবু।—"আছে বৈকি? আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য ভাগে এবং মিশর দেশের অধিকাংশ

স্থলেই বৃষ্টি হয় না। আরব ও পারস্য দেশের অনেক অংশেও বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। আসিয়ার বিস্তীর্ণ গোবী মরুভূমি ও হিমালয়ের উত্তর পূর্ব ভাগস্থ প্রদেশ, এবং তদ্ভিন্ন আমেরিকার কোন কোন অংশে বৃষ্টি হয় না। এই সমস্ত স্থানই জলহীন ভীষণ মরুভূমি হইয়া আছে।"

চারু।—"দাদা মশাই! মেঘও আমাদের খুব উপকার করে বলতে হবে?"

নবীন বাবু।—"সে কথা আর একবার? মেঘ হইতে জল পড়িয়া পৃথিবী শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে এক এক দিন কেমন ভয়ানক গুমট হয় দেখিয়াছ ত? প্রাণ যায়। ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়, তখন এক পশলা বৃষ্টি হইলে তবে জীব জন্তুর প্রাণ বাঁচে। কেমন? আরও বৃষ্টি দ্বারাই ভূমি উর্বরা হয়। ধান্য, গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি শত শত প্রকার শস্য ও ফল মূল, বৃক্ষ লতা যাহা কিছু মানুষ ও অন্য জীব জন্তুর প্রাণ ধারণের জন্য পৃথিবীতে জন্মিতেছে তাহার কিছুই হইত না। সকলেই অনাহারে মারা যাইত। জলই আমাদের জীবনের একটা সর্ব প্রধান দরকারী জিনিষ। তৃষ্ণার সময়ে জল না পেলে কেমন হয়? সে বৎসর তোমাদের খিড়কীর পুকুরের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। মনে আছে ত কেমন হা হা রব পড়ে গিয়াছিল? আর এই বৎসর বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ভাল জল হয় নাই, তাই একেবারে সব মাঠ জ্বলিয়া গিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়াছে জানত? আহা! কত যে লোক না খেতে পেয়ে মরে গেল তা আর কি বলিব? আর কত লোকের যে কি ভয়ানক ক্লেশ হল তা ত সবই তোমাদের সেদিন কাগজ পড়িয়া শুনাইয়াছি। জল না হইলে পৃথিবী একদিন চলে না। জলকে সেই জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষেরা "জীবন" নাম দিয়াছেন। আর সেই জন্যই মেঘের মধ্যে ইন্দ্র আছেন। তিনিই আমাদের জল দেন ইহা মনে করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে দেবরাজ অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য করিয়া পূজা করিতেন। তোমরাও আজ যে সকল কথা শুনিলে তাহাতে বেশ বুঝিয়াছ যে, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তবে এস এই গঙ্গাতীরে বসিয়া সেই দয়াময় দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই।"

১৪

তুষার পাত (Snow)



বীন বাবুর ছাত্র সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁর আনন্দ হইতে লাগিল। পাড়ার সমস্ত বালকগণই ক্রমে তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের ভাল ভাল গল্পে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিবার লোভে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। তিনিও খুব আহ্লাদের সহিত সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায়ই সকলকে সঙ্গে লইয়া এদিক ওদিক সর্বত্র বেড়াইয়া বেড়ান আর নূতন বিষয় সকল শিক্ষা দেন। এইরূপ এক দিন একদল বালক সেনা সঙ্গে লইয়া মাঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গণেন্দ্র নামক একটী বালক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আমরা পুস্তকে যে "স্নো"র (Snow) কথা পড়িয়াছি তাহার কথা কিছু বিশেষ করিয়া বলিবেন কি? তাহা হইলে ভাল বুঝিতে পারি। Snow 'স্নো' কি, তাহা বুঝি নাই।"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ বেড়াইতে আসিবার পূর্বে এই বিষয়েই গল্প করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে বেশ্ই হইয়াছে। এ বড় চমৎকার কথা, কিন্তু "স্নো" অর্থাৎ তুষার আমাদের দেশে পড়ে না, তাই হয়ত তোমরা সহজে বুঝিতে

পারিবে না ; মন দিয়া শুনিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে; শিল পড়ার সময় মাথায় ছাতা দিয়া বড় বড় শিল কুড়াইয়া খাওয়া তোমাদেরও একটা খুব বড় আমোদ। না? (সকলে।—"হা।") কিন্তু শিল যে কিরূপে হয় তাহার এ পর্যন্ত কিছুই স্থিরতা হয় নাই ; নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কেহই স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তবে তুষারের উৎপত্তি খুব সহজেই বুঝা যায়। যে সকল দেশে শীত বড় অধিক, যে সকল দেশের বায়ুর উত্তাপ ৩২° ডিগ্রীর অপেক্ষা অধিক নয়, সেই সব দেশে বায়ুর উপরে ভাসমান বাষ্প ঘন হইয়া জলকণা ও তৎপরে বেশী শীত বলিয়া একেবারে বরফ হইয়া যায়। যেমন ক্ষুদ্র কণা তেমনি ক্ষুদ্র বরফ-কণাও হয়। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ-কণাকে তুষার (Snow) বলে। তুষার জমাট কুয়াশা বৈ আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম অধিক, এজন্য এরূপ ঘটনা কখনই হয় না। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে হিমালয় পর্বতের উপর যে সকল স্থানের তাপপরিমাণ ৩২° ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক নয়, সে সকল স্থানে তুষারপাত হইতে দেখা যায়। আর ইংলণ্ড, সুইজর্লাণ্ড্ প্রভৃতি দেশে খুব তুষারপাত হইয়া থাকে। তাহা তোমরা 'সখা'য় "জীবনরক্ষক কুকুরে"র গল্পে পড়িয়াছ। ঐ সকল দেশে শীতকালে বড় ভয়ানক তুষারপাত হয়। এমন কি—পথ, ঘাট, মাঠ সব সাদা সাদা তুলার কুচির মত তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সূর্যকে অনেক সময় দেখাই যায় না ; কেবলই স্তূপাকার তুষাররাশি পড়িতেছে, বাতাসে আবার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া যাইতেছে, কত কি রকমে মহা আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে ! সুইজর্লাণ্ড্ দেশে যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা ত পড়িয়াছ? রাশি রাশি বরফকণার মধ্যে কত মানুষ ডুবিয়া পুতিয়া থাকে, প্রাণ হারায়, তাহার ঠিকানা নাই। অনেক স্থলে রাত্রির মধ্যে অনেক ছোট ছোট কটিরের দ্বার পর্যন্ত তুষার স্তূপের মধ্যে বুজিয়া থাকে, কত কষ্টে—তবে সে সব সরাইয়া দ্বার খুলিতে হয়!

অল্প অল্প তুষারপাতের সময়ে সাহেবদের ছেলেরা মহা আনন্দে তাহাতে খেলা করিতে যায়। তাহারা নূনের গাদার মত, কি সাদা সাদা খুব হাল্‌কী বালির গাদার মত তুষারের কাঁড়ির উপর লম্ফ ঝম্ফ করিয়া মহা আমোদে উন্মত্ত হয়, সে সময় তাহাদের খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে না। কত যায়গায় ছেলেরা আবার মুটো করিয়া তুষার জমাট বাঁধায়, আর তাই একত্র করে খুব মস্তো একটা মানুষের মত তৈয়ার করে। দূর হতে সেই মানুষটার গায় "স্নো"র ডেলা মারিতে থাকে আর কত যে আমোদ করে তাহার সীমা নাই। 'স্নো' খুব হাল্‌কী, একটু বাতাস হ'লেই অমনি উড়িতে আরম্ভ করে। আর যখন নাচিতে নাচিতে উড়িতে উড়িতে ধীরে ধীরে বায়ুর মধ্য দিয়া পড়িতে থাকে তখন বড় সুন্দর দেখায়। এ বৎসর তোমাদের হিমালয়ে যে যে যাইতে চাও আমি লইয়া যাইব। অমনি কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, নগেন প্রভৃতি সকলে মহা গোল করিয়া বলিল "আমি যাব দাদা বাবু। আমাকে নে যাবে না দাদা? আমি কি যাবনা?" ইত্যাদি।

সকলকে থামাইয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন—"তুষারকণার আকার খুব বড় নয়, আমাদের দেশে বর্ষাকালে বাদলের দিনে যে গুঁড়নী বৃষ্টি হয়, কুয়াশার চেয়ে একটু বড় বড় বিন্দুগুলি ঝির ঝির ক'রে পড়িতে থাকে, তুষার তত বড় ; তবে জল অপেক্ষা বরফের আয়তন নাকি একটু বড় তাই বেশ্ স্পষ্ট দেখা যায়, নাড়া চাড়া যায়। কিন্তু একটা কথা—যখন খুব শীত হয়, যত শীতে জল জমিয়া যায় তার চেয়ে যদি খুব ঠাণ্ডা হয়, তবে তুষার বেশী পড়ে

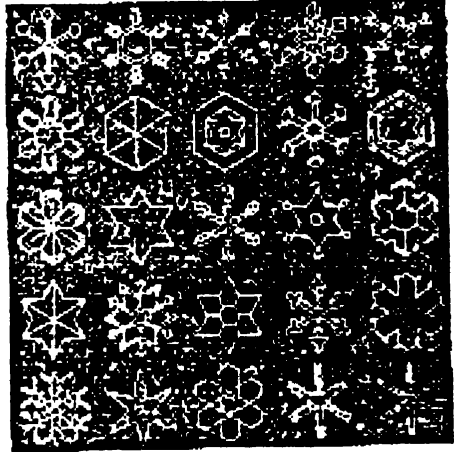
না, কিম্বা যদি বা পড়ে তবে সে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি। কেন না বাতাস যত গরম থাকে তাতে জলীয় বাষ্প তত অধিক থাকে, আর যত ঠাণ্ডা হয় তাতে বাষ্পের অংশ তত কম থাকে। কাজেই ঐ রকম খুব শীতের সময়, ইংরাজীতে যাহাকে frost বলে, সে সময়ে বড় তুষারপাত হয় না। তাহার পূর্বে খুব তুষার পড়ে, আর পরে যখন বাতাস আর একটু গরম হয় তখন পড়ে ; মাঝখানে কম পড়ে, বা পড়েই না। ঐ রকম জমাট শীতের সময়ে (frost) তুষারে দেশের বড় উপকার করে। বরফ তাপ পরিচালক নহে, এজন্য যে সব চারা গাছ, শস্য প্রভৃতি ঐ তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে না পারায় তত ভয়ানক শীতেও তাহারা মারা যায় না।"

কিশোরী।—"সে কি? বরফে ঢাকা থেকে তারা গরম থাকে?"

নবীন বাবু।—"হাঁ। এমনি আশ্চর্য নিয়ম ঈশ্বরের। শীতে একেবারে গাছগুলি মারা যেত ; কিন্তু তিনি বরফ দিয়া আবৃত করিয়াই তাহাদের উত্তাপ রক্ষা করিয়া সেগুলিকে সজীব রাখিয়া থাকেন! স্পষ্টই দেখা যায় যে সকল স্থান হইতে বায়ুতে তুষারের ঢাকনি উড়াইয়া লইয়া যায়, সে সব স্থান শীতে একেবারে শুষ্ক হইয়া উচ্ছন্ন যায়।"

অমূল্য।—"কি চমৎকার! এ সকল জানিলে কত আশ্চর্য হইতে হয় ; পরমেশ্বরের কেমন মহিমা টের পাওয়া যায়!"

নবীন বাবু।—"এখনও বাকী আছে। তোমরা মনে করিতেছ—তুষার ত তুষার। রাশি রাশি বরফের কুচি। তা নয়। তাহার প্রত্যেক কণার যে কি সৌন্দর্য, কি আশ্চর্য গঠন-প্রণালী তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কাপ্তেন স্কোর্স্‌বী (Captain Scoresby) উত্তর মহাসাগরীয় স্থানে লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রায় এক হাজারের চেয়েও বেশী রকম গঠনের তুষার কণা দেখা যায়। তাহাদের আকার যে কি সুন্দর তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে এই এক হাজারের মধ্যে যে কয়েকটীর ছবি দেওয়া গেল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে তুষার কণা যথার্থই কি চমৎকার শোভার জিনিস। এত রকম আলাদা বটে, কিন্তু সকলেই দেখিতে পাবে যে তাদের মধ্যে সবই একটা সুন্দর নিয়মের অধীন। সকলগুলিরই একটা সাধারণ আকার আছে, তাহা কি?—না সকলেই ছয়টী কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দেখিতে। তবে ওরই মধ্যে সব চেহারা আলাদা। ছটা কাঁটা কিন্তু সবারই আছে, মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে।"



গণেন্দ্র।—"আচ্ছা এ রকম হয় কেন?"

নবীনবাবু।—"এই প্রকার আকার ধারণের নাম "দানা বাঁধা" ইংরাজীতে বলে crystallisation, এই দানাগুলির নাম crystals। আমরা বলি জল জড় পদার্থ। কিন্তু ঐ জড় পদার্থের

মধ্যে লুকাইয়া যে এক জন মহা শিল্পী কাজ করিতেছেন তাহা ত দেখি না! কোন কোন বস্তুর এমন গুণ আছে যে জলে মিশ্রিত থাকিবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু যখন ঐ জল আস্তে আস্তে উড়াইয়া বাষ্প করিয়া দেওয়া যায়, তখন সেই সামগ্রী (যাহা এতক্ষণ জলে গুলিয়া ছিল) আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে ; কিন্তু যে-সে আকারে দেখা দেয় না, এক বিশেষ নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধিয়া দেখা যায়। যেমন তোমরাই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—লবণ বা সোরা জলে গুলিয়া, তাপ দিতে দিতে যেমন জল শুকাইয়া আসে অমনি ঐ সকল লবণ বা সোরার কণাগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। পরিষ্কার চিনির রস কুঁদার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলেই পরে রস মরিয়া মিছরী হয়, তার দানা ত সকলেই দেখিয়াছ, ভাল গুড়ও কখন কখন দানা বাঁধে। এও ঠিক তেমনি ; জল জমিবার সময় ছোট ছোট কণা-গুলি ঐরূপ দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। কি তুষার, কি শিল, এমন কি বরফে পর্যন্তও এই রকম ছয়টা কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দানার গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। কি সুন্দর! কি চমৎকার! ধন্য সেই শিল্পকার, যিনি এইরূপে জগতময় আপনার কারিকুরি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন! আমরাও ধন্য যে তাঁহার মহিমার কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে পারি!"

১৫

শিশির



য়েক দিন পরে বালকগণ আবার একত্র হইয়া ঠাকুরদাদার নিকট উপস্থিত হইল; —ইচ্ছা বেড়াইতে গিয়া কোন বিষয়ে কিছু নূতন শিক্ষা করিবে। নবীন বাবুও প্রস্তুত ; সন্তুষ্ট মনে সকলকে সঙ্গে লইয়া মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আজ কি বিষয়ে কথা হইবে? নবীন বাবু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বায়ুতে যে সব জলকণা সাগর, হ্রদ, নদ, নদী, প্রভৃতি জলাশয় হইতে উঠিয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে কি কি বলা হইয়াছে? কোন্ কোন্ আকারে তাহাদিগকে দেখা যায়, মনে আছে কি?" সকলেই উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "হাঁ আছে বৈ কি? কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার এই কয়েকটীর কথা বলা হইয়াছে।" তখন নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ্। তোমরা সব কথা মনে রাখিয়াছ ত? (সকলে 'হাঁ') তবে এখন বল দেখি আর কিসের কথা বলা বাকী আছে? সকলে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। মোহিতকৃষ্ণ চুপি চুপি গণেন্দ্রকে বলিল "কেন? শিশিরের কথা ত বলা হয় নি?" চারু ও কিশোরী হাস্য করিয়া বলিল, "ছি মোহিত! তুমি দাদা বাবুকে লজ্জা কর? তাহ'লে শিখিতে পারিবে কেন? যাঁহার কাছে শিক্ষা করিব, তাঁহাকে কি লজ্জা করিলে হয়? তুমি ত বড় নির্বোধ!" নবীন বাবু সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন "লজ্জা ও বিনীত ভাব একটু থাকা ভাল বটে, তবে কোনও বিষয়েই অধিক হওয়া উচিত নহে। সে যাহা হউক, অদ্য শিশিরের কথাই বলিব। হিম রাত্রে পড়ে, পাতা, ঘাস এই সকলেতেই বেশী পড়ে, গোলমাল করে না, ঝড় বহে না, তাই সকলে তাহাকে চিনে না, জানে না, মনে রাখে না। শিশির প্রতি দিন পৃথিবীর গাছের পাতা সকলকে কেমন স্নান করাইয়া দেয়, কেমন সুন্দররূপে ফুলের পাপড়ীর গায়ে অমৃতের ফোঁটার মত দুলিতে থাকে, যেন ছোট শিশুর পবিত্র সুকোমল সোণার নাকে রূপার নলক দুলিতেছে! আহা! তাহা দেখিলে কে না আশ্চর্য হয়! মোহিত হয়! একেবারে পরমেশ্বরের খেলা দেখিয়া ও প্রকৃতির

শোভা দেখিয়া প্রাণ মন পাগল হইয়া উঠে! যথার্থ, যখন শীতকালে মাঠের সবুজবর্ণের ঘাসগুলি শিশিরে ভিজিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মধ্যে মাকড়সার জালগুলা যেন রূপার সূতায় প্রস্তুত মনে হয়;—এমন সময়ে পূর্বদিক রক্তবর্ণ করিয়া সিন্দুর মাখাইয়া যখন সূর্য উঠিতে থাকেন, আর সেই রক্তিম আভা যখন ঐ শিশিরের গায়ে পড়ে—তখন, আহা! তখন যে কি এক চমৎকার শোভা হয়, তাহা বলা যায় না, কেবল দেখিলেই জানা যায়। তবে যে-সে চক্ষে তাহা বুঝা যায় না, হাস্‌তে খেল্‌তে ছড়ি হাতে করে বাবু-আনা কর্‌তে কর্‌তে, হতভাগা ছেলেদের মত বেড়ালে সেই অপরূপ শোভা দেখা যায় না। শান্ত ও ভক্তিপূর্ণভাবে, নম্রতা ও বিনয়ের সহিত, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতির দিকে চাহিলে,—চাহিয়া আশ্চর্যের সহিত নমস্কার করিলে, তবে প্রকৃতি তার সেই গুপ্ত সুন্দর মনোহর রূপ দেখান। তা সে সকল এখন থাক্‌। শিশিরের শোভার কথা মনে এসে আমায় ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি ঐ সকল দেখিতে বাস্তবিকই পাগল হইয়া যাই। আহা! আহা!" আর কথা বাহির হইল না। নবীন বাবুর দুটী চক্ষে দু'ফোঁটা জল দেখা দিল। অল্পক্ষণ সকলেই গম্ভীরভাবে পূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর নবীন বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

"বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অনেক জলীয় বাষ্প কমিয়া গেলেও বায়ুতে সর্বদাই কিছু পরিমাণে বাষ্প থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রায় কখনই এমন সময় আসে না যখন বায়ুতে একটুও বাষ্প থাকে না। হাজার বৃষ্টি হউক, ঝড় হউক, শিল পড়ুক, খানিকটা বাষ্প বাকী থাকিবেই থাকিবে। ঐ সময়টা খুব কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে বাষ্পহীন কখনই হয় না।" অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল "যখন খুব গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক আগুনের হল্‌কার মত বাতাস বহে তখনও কি উহাতে জলীয় বাষ্প থাকে?"—নবীন বাবু উত্তর করিলেন—"তখনই আরও অন্য সময় অপেক্ষা বেশী থাকে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু যত শীতল হইবে ততই উহার বাষ্প জল হইয়া পড়িবে, আর যত অধিক গরম হইবে, ততই উহার মধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্প ধরিবে। সে কথা তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সেই জন্যই গ্রীষ্মকালে বায়ুতে বেশী বাষ্প মিশিয়া থাকে।"

মন্মথ।—"সে কি রকম হবে? তাহ'লে ত ঠাণ্ডা লাগিত?"

নবীন বাবু।—"না, তা হবে কেন? জল হলেই কি ঠাণ্ডা হয়? গরম জল কি ঠাণ্ডা? তা যদি না হয় তবে গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হবে কেন? বায়ু যখন গরম হয়, তখন তাহার বাষ্পও গরম হয়, কাজেই ঠাণ্ডা লাগে না। বুঝিলে? (সকলে।—"হাঁ"।) আবার আর একটা কথা বলিয়া রাখি ; তোমরা যে মনে কর শীতকালে বায়ুতে খুব বেশী বাষ্প থাকে, তা ঠিক নয়, বড় ভুল। বরং শীতকালেই বায়ু সর্বাপেক্ষা বাষ্পহীন হয়। সে সময়ে বায়ু উত্তর দিক হইতে আসে। সে দিকে সাগর নাই কাজেই বাষ্প আসিবার সম্ভাবনা নাই। আর শীতকালে বাতাস শীতল, এজন্য উহার বাষ্প সবই প্রায় জমিয়া জল হইয়া যায়, কাজেই সে সময়ে বায়ুতে বেশী বাষ্প দাঁড়াইতে পায় না। আর কখন মনে করিও না যে শীতল হইলেই বাষ্প অধিক থাকে। বরং ঠিক তাহারই বিপরীত। গরম বাতাসে বাষ্প বেশী থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশী বাষ্প থাকিতে পারে না, জল হইয়া যায়।"

কিশোরী।—"কি আশ্চর্য! আমরা কি ভুলই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম! আজ বেশ শিক্ষা হইল। আরও চাই বলুন দাদা বাবু! শিশির তবে শীতকালেই বেশী পড়ে কেন? বাষ্পই যদি

শীতকালের বায়ুতে কম রহিল আর গ্রীষ্মকালে বেশী রহিল, তবে গ্রীষ্মকালে শিশিরের নামগন্ধও নাই আর শীতকালেই বা এত শিশির কোথা হইতে পড়ে? এ ভারী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন না?"

মন্মথ, অমূল্য, গণেন্দ্র, চারু, নগেন, চন্দ্র, দেবন—সকলে একেবারে গোল করিয়া বলিয়া উঠিল।—"আমরাও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কিশোরী আমাদের সকলেরই কথা বলিয়াছে। এখন বলুন, শুনি।"

ছেলেদের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও এরূপ উৎসাহ দেখিয়া নবীনবাবু মহা খুসী হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আর সব কথাই সহজ। বৃষ্টিরও যে নিয়ম, শিশিরেরও তাই। বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া আছে, দেখা যাইতেছে না, হঠাৎ যে কোন কারণে যেই শীতল হইল, অমনি জল হইয়া দেখা দিল। এখন দেখ শীতকালেও বায়ুতে কিছু বাষ্প থাকে, তার উপর আবার দিনের বেলায় সূর্য যে উত্তাপ দিতে থাকেন, তদ্দারা জলাশয় সমূহ হইতে অনেক বাষ্প উঠে। এইরূপে সন্ধ্যার সময়ে বা কিছু পূর্বে বায়ুতে অনেক পরিমাণে বাষ্প জমা হয়। অন্য সময় হইলে উহা বাষ্প হইয়াই থাকিয়া যাইত, কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। কারণ বায়ু শীঘ্রই খুব শীতল হইয়া যায় আর ঐ বাষ্প প্রায় সবই জল হইয়া পড়ে। সূর্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সকল বস্তুই গরম হয়, জলও গরম হয়, হইয়া বাষ্প হইয়া উপরে উঠে, বায়ুতে মিশে যায়। এই বায়ু যখন আবার শীতল হয়, তখন আর বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইহা জল হইয়া যায়। এই জলকে শিশির পড়া বলে।

"এই সময়ে গরম হওয়া সম্বন্ধে দু একটা নূতন কথা বলিয়া দিই মন দিয়া শুনিবে। বড় শক্ত কথা এগুলি, খুব মন দাও। যত বস্তু আছে সকলেরই "তাপ-গ্রাহিতা" শক্তি আছে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই তাপ দিলে উত্তপ্ত হয়, তার মধ্যে খানিকটা গরম প্রবেশ করে। তাপ যে কি, তাহা এখন বলিব না, তবে মোটামুটী এই জানিয়া রাখ যে সব জিনিষ তাপ দিলে গরম হয়। কোন বস্তু অনেক তাপ দিলে তবে গরম হয়, আবার অন্য কোন বস্তু তাপ দিলেই শীঘ্র গরম হয়। মনে কর যেমন লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি শীঘ্র তাতিয়া উঠে, জল তত শীঘ্র গরম হয় না। এখন বেশ বুঝিলে? সব জিনিযের তাপ-গ্রাহিতা শক্তি সমান নয়। এই গেল একটা কথা। আর একটা কথা এই যে সকল জিনিষেরই তাপ ছড়াইবার শক্তি আছে, অর্থাৎ কোন জিনিষ যদি গরম হয় তবে সেই তাপ সে সর্বদাই চারিদিকে ছড়াইতে থাকে ; নিয়ত, একটুও থামে না। ইহার নাম "বিকীরণ" শক্তি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সূর্য হইতে উত্তাপ পাই, অগ্নি হইতে গরম পাই এবং গরম বস্তু হইতে গরম পাই। আর বাস্তবিকই এই শক্তি আগে তারপর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। কেননা বিকীরণ না হইলে তাপ পাইব কোথায় যে গ্রহণ করিব? বুঝিতেই পারিতেছ? (সকলে।—"বেশ্।") এই বিকীরণ অর্থাৎ তাপ ছড়াইবার শক্তি প্রত্যেক বস্তুরই আছে। তবে এখন আর একটা কথা বলি সেটা এই যে যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যে পরিমাণে অধিক তাহার বিকীরণ শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ যে বস্তু যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সে বস্তু তত শীঘ্র আবার শীতলও হইয়া পড়ে। লৌহ যেমন শীঘ্র গরম হয়, আবার তেমনি শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। একথা তোমরা অনেকেই জান। কড়াতে দুধ জ্বাল দেওয়া হইলে দেখিতে পার ; ঐ দুধটা আর একটা পাত্রে ঢালিয়া কড়াটা খালি করিয়া রাখ, শীঘ্রই দেখিবে কড়া শীতল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুধটা তখনও যেন আগুন। আবার গরম

হবার সময়ে কড়ার আংটা দুটীতে যখন হাত দেওয়া যায় না এমনি গরম, দুধ গরম হইবার তখনও অনেক বিলম্ব। এ তোমরা আজই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও। অর্থাৎ লোহার কড়া যত শীঘ্র গরম হয় তত শীঘ্র আবার শীতলও হয়, তাপ ছড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কিন্তু দুধ কম তাপ-গ্রাহিতা শক্তির জন্য গরম হইতে দেরী লাগে, আবার তেমনি জুড়াইতেও বিলম্ব হয় ; এই তিনটী কথা মনে রাখিবে। আর একটী কথা আছে— যখনই তাপ গ্রহণ করে সেই সময়েই আবার তাপ বিকীরণও করে। অর্থাৎ সকল বস্তু সকল সময়েই তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ করিতেছে। তবে যার বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ বেশী হয় সে জিনিষটা গরম হয়, আর যার গ্রহণ অপেক্ষা বিকীরণ বেশী সেটা ঠাণ্ডা হয়। ঐ কড়ার দৃষ্টান্তই ধর। উহা যতক্ষণ আগুনের কাছে থেকে তাপ গ্রহণ করিতেছিল, ততক্ষণ কি কেবল গ্রহণ করিতেছিল, বিকীরণ কার্য কি তখন বন্ধ ছিল? তা নয়, বিকীরণও করিতেছিল। তা না হলে তাহার নিকটে হাত লইয়া গেলে গরম ঠেকিত না। (সকলে।—"ঠিক") বেশ, দুটী কাজ এক সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ অধিক করিতেছিল এজন্য তখন কড়া গরম বোধ হইল। আবার যখন নামাইয়া হাওয়ায় রাখা গেল, তখন কি কেবল বিকীরণ হইতেছিল, তাপ গ্রহণ করিতেছিল না? তা নয়। তবে তখন বিকীরণই প্রবল, এজন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বুঝিলে? আচ্ছা বল দেখি মোহিত! চারিটা কথা কি?"

মোহিত।—"১ম, সব জিনিষের তাপ গ্রহণ করিয়া গরম হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। ২য়, সব জিনিষেরই আবার তাপ ছড়াইয়া শীতল হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-বিকীরণ শক্তি। ৩য়, যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যত প্রবল, অর্থাৎ যাহা শীঘ্র গরম হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও তত প্রবল অর্থাৎ শীঘ্র আবার শীতলও হয়। ঠিক রাগের মত। কতকগুলা লোক শীঘ্র ঝাঁ ক'রে রেগে যায়, আবার ঝাঁ ক'রে রাগ প'ড়েও যায় ; কিন্তু যাদের রাগ শীঘ্র হয় না, তাদের যদি রাগ হয় ত আর শীঘ্র পড়ে না। তেমনি যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি কম, গরম হইতে দেরী হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও কম, উহা শীতল হইতেও দেরী হয়। ৪র্থ, প্রত্যেক বস্তুই এক সময়ে তাপ গ্রহণ এবং বিকীরণ দুইই করে, তবে যাহা অধিক হয় তাহাই প্রকাশ পায় ; যদি বিকীরণ অপেক্ষা তাপ গ্রহণ করে বেশী তবে উহা গরম হয়, নহিলে যদি গ্রহণের চেয়ে বিকীরণ বেশী হয় তবে শীতল বোধ হয়। অর্থাৎ ৫০ ভাগ তাপ গ্রহণ করিয়া যদি কোন বস্তু ১০ ভাগ মাত্র বিকীরণ করে তবে উহাতে ৪০ ভাগ তাপ থাকে তাই গরম দেখি কিন্তু তলে তলে যে দশ ভাগ বিকীর্ণ হইয়া গেল তাহা আর বুঝিতে পারি না এই রকম। নয় কি?"

নবীন বাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন।—"মোহিত বেশ্ সুন্দর বুঝাইয়া দিল ত? তোমরা বলিতেছিলে মোহিত লাজুক। এই দেখ সে তোমাদের চেয়ে ভাল ছেলে। কেমন মন দিয়া শুনিয়াছে, কেমন দৃষ্টান্ত দুটী দিয়া বুঝাইয়া দিল। বেশ্ মোহিত! সে যাক্। এখন তোমরা সকলেই এই কয়েকটী কথা যদি মনে না রাখিতে পার তাহা হইলে আর শিশির পতনের কথা বুঝিতে পারিবে না, বেশ্ মন দিয়া কথা কয়টী 'সখা'তে পড়িবে, আরও ভাবিবে, লোকের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলাপ করিবে ও কথা বার্তা কহিবে ; তার পর বুঝিতে পারিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবে। আজ এই পর্যন্ত থাকুক। আর এক দিন বাকী সমস্ত কথা বলিব। শিশিরের কথা এক দিনে শেষ হইবে না। আজ রাত্রি হইল বাড়ী যাই চল।"

সকলে আশ্চর্য ও নূতন কথা শিখিলেন বলিয়া আনন্দ করিতে করিতে ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন।

১৬

শিশির (দুই)



একদিন প্রাতঃকালে সকলে বাগানে বেড়াইতে গিয়া স্থির করিলেন যে সেদিনকার শিশিরের কথার বাকীটুকু আজ শেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। নবীন বাবুও উপস্থিত ছিলেন, সকলকে চারিদিকে বসাইয়া শিশিরের গল্প বলিতে লাগিলেন। প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিনকার কথা সকলের মনে আছে কি না? সে কথা সকলেরই স্মরণ ছিল। সুতরাং নূতন কথা আরম্ভ হইল।

মন্মথ বলিল।—"আজ বলিয়া দিন, দাদা বাবু, শীতকালে বেশী শীতল বলিয়া বায়ুতে বাষ্প কম থাকিলেও শিশির বেশী পড়ে কেন? এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে।"

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি পূর্বে বলিয়াছি যে বায়ু কখনই একেবারে বাষ্পহীন হয় না। একটু না একটু জলীয় বাষ্প তাহাতে থাকেই থাকে। শীতকালেও সূর্যের উত্তাপ থাকে, ঐ উত্তাপে নদী, হ্রদ, সাগরাদি হইতে জল বাষ্প হইয়া উঠে। আরও একটা নিয়ম আছে যে বায়ু যত শুষ্ক অর্থাৎ বাষ্পহীন হয়, ততই উহার বাষ্প লইবার শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উপর দিয়া যদি একটী অধিক বাষ্প-বিশিষ্ট বায়ু-প্রবাহ চলিয়া যায় তাহা হইলে উহা ঐ জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে, শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে। এ অতি সোজা কথা। কাজেই ঐ দুটী কারণে শীতকালের দিনের বেলায় বায়ুতে অনেকটা বাষ্প জমা হয়। এবং ঐ বায়ু সকালে ও রাত্রের অপেক্ষা কিছু গরম বলিয়া উহার বাষ্পটা জমিয়া তখন জল হইতে পারে না। কিন্তু যেই সূর্য অস্ত যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরের সমস্ত জিনিষ তাপগ্রহণ অপেক্ষা তাপ বিকীরণ বেশী করিতে থাকে, অমনি ঐ বায়ু তাহাদের গায়ে ঠেকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। যেমন ঠাণ্ডা হয় অমনি ক্রমে ক্রমে দিনের বেলায় সঞ্চিত বাষ্পগুলা সব জল হইয়া যায়। ঐ জল খুব ছোট ছোট কণার আকারে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায় ও নিকটস্থ পদার্থ সকলে লাগিতে থাকে। ইহারই নাম হিম। শীতকালের রাত্রে সমস্ত বাতাসটাই এই হিম পূর্ণ হইয়া যায়, সে সময়ে বাহিরে এলে গা বরফের মত কন্ কন্ করিতে থাকে। বুঝিতে পারিয়াছ?"

নলিন বলিয়া উঠিল "না দাদা বাবু! আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমাকে যতক্ষণ না ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ততক্ষণ আমি আর বেশী বলিতে দিব না।"

নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কেন? এর ভিতর ত আর কোন শক্ত কথা নাই। শক্ত কথা যা কিছু সে দিনই বলিয়া দিয়াছি। তুমি ত সেদিন শুনিয়াছ যে, সকল দ্রব্যেরই "তাপ-গ্রাহিতা শক্তি" আছে, কোন গরম জিনিষের নিকট এলেই গরম হবে। আবার তেমনি সকল জিনিযেরই "তাপ-বিকীরণ শক্তি" আছে, উহা থাকাতে গরম জিনিষ মাত্রই নিজের গরম চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। (নলিন,—"হাঁ শুনিয়াছি।") তবে আর কি? যতক্ষণ সূর্য মাথার উপর ছিল, পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থ সব সামগ্রী গরম হইতেছিল বা তাপ গ্রহণ

করিতেছিল। তখনই আবার তাপ বিকীরণও করিতেছিল, কিন্তু খরচ অপেক্ষা জমা বেশী ব'লে অর্থাৎ বিকীরণ অপেক্ষা সূর্যের নিকট হইতে অধিক তাপ গ্রহণ করিতেছিল বলিয়া, দিনের বেলা সব জিনিষ গরম হইয়াছিল। এখন গরম পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া বাতাসও একটু গরম হইয়াছিল। সেই গরম বাতাসে উঠিয়া জলাশয় সকলের জল সূর্যের তেজে বাষ্প হইয়া ভাসিতেছিল। এই সব গেল দিনের বেলায়। সন্ধ্যা হইল, সূর্য অস্ত গেল, পৃথিবীর গা ঠাণ্ডা হইল, তাহার উপরের জিনিশও সব ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। এই সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাষ্প-শুদ্ধ ঐ গরম বাতাস যেই লাগিতে লাগিল, অমনি উহার বাষ্প জল হইয়া ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে শিশির হইয়া পড়িল। এইরূপে শীতল হইতে হইতে যখন পৃথিবীর নিকটের সমস্ত বাষ্পটাই একেবারে শীতল হইয়া গেল, তখন সমস্ত বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ছিল তার অনেকটাই শীতল হিম হইয়া পড়িল। এবং ঐ হিমময় বায়ু যেখানে লাগিল অমনি খানিকটা হিম তাহার গায়ে রাখিয়া যাইতে লাগিল। এই রকমেই ঘাসে, পাতায়, জানালার কাচে, শ্লেটে, সব স্থানে সকালে উঠিয়া শিশির ফোঁটা ফোঁটা দেখা যায়। প্রথমে যখন শিশির জমিতে থাকে তখন কিন্তু একেবারে ঐ রকম ফোঁটা ফোঁটা হয় না। প্রথমে একটু সাদা দাগের মত পড়ে। ঠিক ভাল চাকু ছুরীর ফলাতে মুখ হইতে হাই দিলে যেমন সাদা হইয়া যায়, তেমনি প্রথমে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বাষ্প জমিতে আরম্ভ হয়, তারপর ক্রমে যত বেশী জমে তত কতকগুলা একত্র হইয়া শেষে বড় ফোঁটা হইয়া পড়ে। তা বোধ হয় তোমরাই কত দিন দেখিয়াছ, পাতার গায়ে সাদা দাগের মত সব শিশির কণা স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেই তুমি নাড়িলে অমনি একটার পর আর একটা একত্র মিলিয়া বড় বড় ফোঁটা হইয়া পড়িল। না?—(সকলে।—ঠিক্ ঠিক্।) এইরূপে শীতকালের রাত্রে শিশির পতন হয়। যথার্থ ধরিলে কিন্তু শিশির পড়ে না, বৃষ্টির মত ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া কখন পড়ে না। শিশির হয় বা জমে বলিলেই ঠিক বলা হয়। কেন না, বৃষ্টি যখন পড়ে, তখন কেবলই পড়ে, কোন দিকে চায় না, বাতাস ঠাণ্ডা হ'ল কি না, পৃথিবীর উপরকার জিনিষগুলা এখনও গরম আছে কি না, এ সব কিছুই দেখে না। উপরের বাতাস শীতল হইল, বাষ্প সব জমিয়া গেল, জলবিন্দু হইয়া ভারী হইল, আর অমনি হু হু করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। শিশির ত সে রকম নয়। শিশির উপরের বায়ুতে নয়, পৃথিবীর নিকটেরই বায়ুতে বাষ্প হইয়া এতক্ষণ ছিল, যেই দেখিল ক্রমে সুবিধা হইতেছে, সব জিনিষ ঠাণ্ডা হইতেছে, অমনি তাহাদেরই গায়ে লাগিয়া তাহাদেরই গায়ে জলবিন্দু হইয়া শিশির হয়। কাজেই তাহাকে আর শিশির পড়া বলা যায় না। শিশির বরং ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাতাস থেকে জমে বা হয় বলিলেই উচিত কথা বলা হয়।"

নলিন।—"হাঁ দাদা বাবু! এইবার আমি বেশ বুঝেছি। আর আমি যখন বুঝেছি, তখন আর কেহ বুঝিতে বাকী নাই।"

অমূল্য।—"আচ্ছা! শীতকালে যেদিন মেঘ করে সেদিন রাত্রে কিছু শিশির হয় না কেন? আমার ঠোঁট ফেটে গিয়েছিল, মা বল্লেন যে শিশির দিলে ভাল হবে। আমি ভোরে উঠিয়া শিশির খুঁজিবার জন্য কত পাতা, ঘাস, ফুলগাছ ঘুরিলাম কোথাও দেখিতে পেলাম না। তখন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'মেঘ হইলে শিশির পড়ে না।' আমি তখনই আপনাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মনে ছিল না, হঠাৎ আজ মনে পড়িল ; বলিয়া দিন্ না?"

কিশোরী বলিল "তাই ত? ঠিক কথা ; শীতকালে যে দিন মেঘ করে সেদিন হিম পড়ে না বটে।" আর আর সকলেই এই কথায় সায় দিল। ঠাকুর দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যে দিন মেঘ হয় সে দিন যথার্থই কিছু শিশির জমিতে পায় না, কেন—বলিতেছি। বলিবার পূর্বে আর একটা কথা বুঝান আবশ্যক। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব কালেই যেদিন মেঘ হয় সেদিন বড় গরম হয়, তা বোধ হয় সকলেই জান। এক এক দিন এমনি গুমোট হয় যে প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে, মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। আবার যখন সন্ধ্যার সময় একটু বায়ু বহিয়া মেঘগুলাকে সরাইয়া দেয়, কিম্বা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া মেঘ কাটিয়া যায়, তখন প্রাণ বাঁচে, ঠাণ্ডা হয়। কেমন? (সকলে।—এ কে না জানে?) বেশ, কেন হয় বল দেখি? নিশ্চয়ই জান না। আমি বলিতেছি শুন। পূর্বেই বলিয়াছি যে সব জিনিষ একই সময়ে তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ উভয়ই করে। মনে আছে। পৃথিবী ও সূর্যের নিকট হইতে দিনের বেলা তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, আবার তখনই খানিক খানিক তাপ বিকীরণও করিতে থাকে। কেমন করিয়া জানিতে পারি? আচ্ছা, মনে কর এই গ্রহণ হইতে বিকীরণের তাপ বাদ দিলে যা বাকী থাকে দিনের বেলা আমরা সেইটুকুই অনুভব করিতে পাই ; যে টুকু চলিয়া যায় সেটুকুও অনুভব করি না, আর যে তাপটা সূর্য হইতে আসে তারও সবটা পাই না। বিকীর্ণ হইয়া যেটা বাকী থাকে তাহাই আমরা পাই। বেশ, এখন কোন কারণে যদি ঐ বিকীরণ বন্ধ করা যায়, তবেই সূর্য হইতে প্রাপ্ত সমুদায় তাপই অনুভব করা যাইবে। এখানেও ঠিক তাই হয়। রোজ আমরা দেখিতে পাই সূর্য হইতে গৃহীত তাপের খানিকটা বিকীর্ণ হইয়া আকাশে ছড়াইয়া যায়, পৃথিবী থেকে উড়ে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়, তাই গরম কম বোধ হয়। মেঘ হইলে ঐ বিকীরণ হওয়ার পক্ষে বাধা পড়ে, উপরে ছাতের মত মেঘের স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে তা ভেদ করিয়া পৃথিবীর বিকীর্ণ তেজ আকাশে পলাইয়া যাইতে পায়না, এজন্য সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হইয়া অর্থাৎ ঠিক্‌রিয়া পৃথিবীর দিকে আসে, কাজেই পৃথিবীর নিকটের বায়ু খুব গরম বোধ হয়। বুঝিলে? এই জন্য দুইটী কারণে মেঘ হইলে বায়ু গরম থাকে।—১মতঃ, বিকীরণ ভাল করিয়া হইতে পায় না, ২য়তঃ, মেঘের দিকে যে উত্তাপটা উঠিয়াছিল সেটা আবার প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়া আসে। এই দুইটী কারণে মেঘলা রাত্রে পৃথিবী শীতল হইতে পায় না। কাজেই তাহার নিকেটের বায়ুও শীতল হয় না, কোন জিনিযও শীতল হয় না। এই জন্য ঐ বায়ুর বাষ্প বাষ্পই থাকিয়া যায়, শিশির হইতে পায় না, ঐ জন্য গাছের তলায় বা ঘরের ছায়ার মধ্যেও শিশির হয় না। বুঝিলে? (সকলেই।—হাঁ)।

ঐরূপে যেদিন জোরে হাওয়া হয় সে দিনও শিশির ভাল জমে না। নানা স্থানের গরম বায়ু আসিয়া পড়াতে বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হইতে পায় না। আর বায়ুর চলাচল হওয়ার জন্যও উহা শীতল হয় না। কাজেই ভাল রকম শিশির জমে না, যাও একটুক আধটুক জমে তাও উড়িয়া যায়।

শিশির জমিবার নিয়ম এখন বেশ্ শিখিলে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য বাড়ী যাইব। *তোমরা দেখিয়াছ যে ঘাস, পাতা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষে শিশির অন্য কতকগুলি জিনিষের* চেয়ে বেশী জমে, এর কারণ কি?—না, পূর্বে বলিয়াছি বিকীরণ শক্তি সকলের সমান নয়। যে সকল বস্তু শীঘ্র তাপ বাহির করিয়া শীতল হইতে পারে তাহারাই বেশী শিশির পায়।

ঘাস, পাতা, কাচ, তুলা, পশম (যেমন চুল, কম্বল ইত্যাদি), লোহার বার প্রভৃতি সামগ্রী রাত্রে বাহিরে থাকিলে উহাদিগের গায় যত শিশির জমে, অন্য জিনিষের গায় তত জমে না। মোট নিয়মই এই যে, যে দ্রব্য যত শীঘ্র শীঘ্র গরম তাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে তাহাতে তত পরিমাণে শিশির জমে।"

সকলে—"খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম দাদাবাবু।" নবীন বাবু বলিলেন "এই কথা বলিতে বলিতে একটা ভাল কথা মনে পড়িল। শিশির যেমন নিঃশব্দে স্বর্গ থেকে পড়ে, মানুষের উপরে তেমনি জ্ঞান ও ধর্ম স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর নিঃশব্দে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শিশির যেমন গরম না তাড়াইলে জমে না, মানুষও তেমনি যত দিন নিজের অহঙ্কার রূপ তাপকে তাড়াইয়া দিয়া বিনয়ী, শান্ত ও নম্র না হয়, ততদিন জ্ঞান ও ধর্মের শিশির তার প্রাণে দাঁড়াইতে পারে না। এই উপদেশ সর্বদা মনে করিয়া অহঙ্কারের তেজ কমাইবে আর নম্র হইয়া বিনয়ী হইয়া কেবল শিখিতে চেষ্টা করিবে। তবে জ্ঞানী ও ধার্মিক হইয়া জগতের উপকার করিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই।"

১৭

আগ্নেয়গিরি



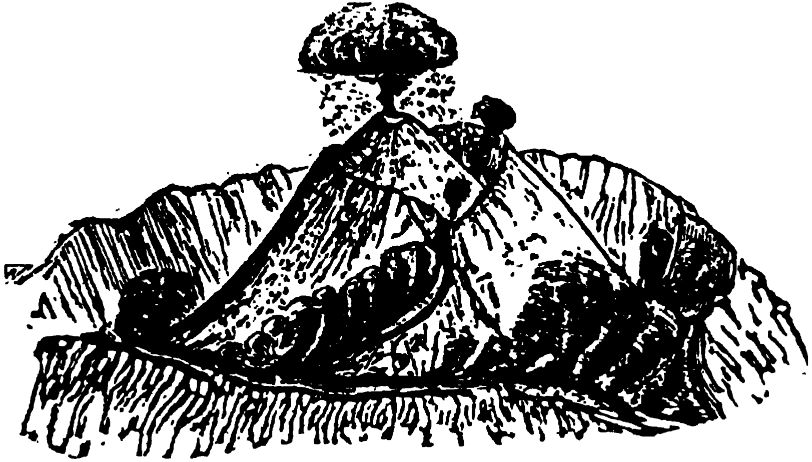
সখানেক পরে একদিন নবীন বাবু ও তাঁহার বালকগণ আবার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তথায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়ে একজন লোক কতকগুলি তুবড়ী-বাজী লইয়া উপস্থিত হইল ও বলিল "বাবু! খুব ভাল তুবড়ী নেবেন্? আট পয়সা ক'রে একটা।" নলিন চন্দ্র ক্ষেপে দাঁড়ালেন— চারিটা চাই। তুবড়ী চারিটা কেনা হইল। ফেরীওয়ালা চলিয়া গেলে নবীন বাবু বলিলেন "এই তুবড়ীতে যখন আগুণ দেওয়া হয় তখন কি রকম হয় বল দেখি, নলিন?" নলিন অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা তুবড়ী লইয়া মাটীতে রাখিল, হাতে একটা বড় গোছের কঞ্চি লইয়া যেরূপ ভাব ভঙ্গী করিয়া আগুণ দিবার মত করিল, দেখিয়া সকলের মহা হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে নলিন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই—যখন—এই রকম করে—আগুণ দেব,— তখন অমনি ফুর ফুর ক'রে সব বেরবে, আর কেমন মজা হবে!!" সকলে নলিনের আনন্দ দেখে খুসী হইলেন। নবীন বাবু তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পার বল দেখি, প্রকৃতির স্বাভাবিক তুবড়ী-বাজী কোথায় হয়?" কিশোরী বলিল "আমরা বইতে পড়িয়াছি আগ্নেয়গিরিতে হয়।" নলিন বলিয়া উঠিল "তবে আমি সে আগ্নেয়গিরি কিন্‌বো?"—এই সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠিলেন।—তখন সে চারিদিক চেয়ে ঠাকুরদাদার হাত ধ'রে বলিল "না দাদা! তবে সে কি রকম আমায় বুঝায়ে দিতে হবে।"

নবীন বাবু আরম্ভ করিলেন। "বহু দিন হইল আমি তোমাদের পর্বতের কথা বলিয়াছিলাম। আগ্নেয়গিরি এক রকম পর্বত, তবে পর্বত অপেক্ষা ছোট, তাহাকে বরং পাহাড় বলা যায়। অনেক রকমের আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, পর্বতের গায়ে, বা আলাদা, দ্বীপে বা সমুদ্রের জলের ভিতর। সাধারণতঃ তাহারা প্রায়ই অধিক উচ্চ হয় না। কাস্পিয়ান সাগরের চারিদিকে যে সকল আগ্নেয়গিরি দেখা যায় তাহারা দেখিতে অতি ছোট, এমন কি সামান্য উচ্চ ঢিবি করা কাদা মনে হয়। আবার ওদিকে আণ্ডিস্ পর্বতের মধ্যে কটোপাক্সী নামক গিরি ১৮,৮৮৭ ফুট

অর্থাৎ ৩½ সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী উচ্চ। ইহাদের আকার প্রায়ই গোল হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক তুবড়ীরই মতন (ছবি দেখ)। তাহার চূড়ার উপরে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর থাকে, এবং ঐ গহ্বরের তলা হইতে পৃথিবীর গর্ভ পর্যন্ত একটী ভয়ানক নল থাকে।"

গণেন্দ্র।—"হাঁ, আমরা পড়িয়াছি ঐ গহ্বরের নাম crater (ক্রেটার) আর ঐ নলের নাম shaft (সাফ্‌ট্)। নয়?"

নবীন বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা। নলের ভিতর হইতে জ্বলন্ত রক্তবর্ণের আভা বাহির হয়; ঐ আলো প্রায় সর্বদাই আগ্নেয় পর্বতের চূড়ার উপর দেখা যায়। আর ঐ নল দিয়া সর্বক্ষণ



এঞ্জিনের মত ধূঁয়া বাহির হইতে দেখা যায়। কাজেই, ভিতরে যার এমন ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দিন রা'ত গম্ গম্ কর্‌ছে, তার উপর দিয়া ধুম বা আলো যে বাহির হবে এ আশ্চর্য কি?"

মন্মথ।—"ওঃ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! আচ্ছা, দাদাবাবু! সেখানে কেও যেতে পারে?"

নবীন বাবু।—"পারে বৈ কি? আমার এক বন্ধু তিনবার বিখ্যাত ভিসুভিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরি দেখিতে যান। তিনি বলেন প্রথমতঃ পাহাড়ের তলায় বেশ্ সুন্দর সুন্দর গাছ ও দ্রাক্ষালতার ঝোপ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট কুটীর সকল অতিশয় শোভা করিয়া থাকে। তাহার উপর ক্রমে ছোট ছোট গাছপালা; ক্রমে আর গাছ নাই, কেবলই পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। ক্রমে একটু একটু গরম টের পাওয়া যায়। শেষে যত শিখর দেশের নিকট উঠা যায় ততই ভয়ানক। সেখানে মাঝে মাঝে একটা একটা ফাটল আছে; ঐ ফাটলের ভিতর দিয়া ভিতরের জ্বলন্ত গলা পাথর প্রভৃতি দেখা যায়, দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। আর গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তারপর চূড়াতে পঁহুছিলে যে মনে কি হয়, সে আর কি বলা যায়? তিনি বলিতেন—'সেখানকার দৃশ্য আর কি বলিব? উপরে অন্ধকার করিয়া রাশি রাশি ধূম উঠিতেছে আর সেই অত্যুচ্চ শিখরে আমি বসিয়া যখন মুখ হেঁট করিয়া গহ্বরের দিকে চাহিলাম, দেখি সে বর্ণনা করা অসম্ভব,—ভীষণ অগ্নিময় সমুদ্র যেন গর্জন করিতেছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। বুঝি বা পায়ের নীচের ছাত ভাঙ্গিয়া যায়। তাহা হইলেই সর্বনাশ! সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইতে

হইবে। ভয়ে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দৃশ্যটী এমনি গম্ভীর ও মনোহর যে সে চমৎকার স্থান ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা হয় না।' আরও কত কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তা সব বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যাইবে।"

কিশোরী।—"কে তিনি দাদা?"

নবীন বাবু।—"তোমরা জান না।"

নলিন।—"আমি যখন বড় হব, আমি সেই স্থানটা দেখ্‌তে যাব।"

নবীন বাবু।—"হাঁ এই ত চাই। নিজে নিজে দেখে শিখ্‌বে। আমরা বুড় হয়েছি আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা খুব লেখা পড়া শিখে নানা দেশ বেড়াবে, কত কি শিক্ষা করিবে ও জ্ঞান বাড়াইয়া বড় লোক হইবে। এখন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখের বর্ণনা কেবল শুনিয়া রাখ।"

আগ্নেয়গিরি যত পুরাতন হয়, আর যত বার তাহার অগ্ন্যুদ্গাম হয় ততই তাহার আকার নূতন হইতে থাকে। ভিসুভিয়স্‌ পর্বতের ঠিক এই রূপ হইয়াছে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী চূড়া, তাহার চারিদিকে আর একটী পুরাতন চূড়ার ভাঙা খানিকটা দেখা যায়, তাহার চারিদিকে আবার একটা আরও পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা অংশ দেখা যায়। এরূপ হওয়ার কারণ. তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। যেমন বেশী তেজ হইলে এক একটা তুব্‌ড়ী ফাটিয়া যায়, তেমনি ভিতরে আগুনের তেজ বেশী হইয়া প্রতি অগ্ন্যুদ্গামের সময়ে পুরাতন চূড়া উড়িয়া যায় ও তাহার উপর আবার গলা পাথর প্রভৃতি পড়িয়া নূতন একটা চূড়া প্রস্তুত হয়।"

অমূল্য।—"আগ্নেয় পর্বত ত এক রকম বুঝিলাম ; উহার অগ্ন্যুদ্গাম কিরূপে হয়, দাদা বাবু?"

নবীন বাবু।—"ওঃ! সে বড় ভয়ানক ব্যাপার! না দেখিলে তার কিছুই জ্ঞান হয় না. কিছুই ধারণা করা যায় না। দেখাও সহজ নয়। তবে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াও জ্ঞান লাভের জন্য এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে সুবিধা পান, তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইতে পারিবে। কোথাও কিছু নাই,—হঠাৎ হয়ত এক দিন দূরে মেঘ গর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শোনা যায়. আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হইতে থাকে। তখনি লোকে বুঝিয়া লয় যে একটা ভয়ানক ব্যাপার শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। কাজেই যে যেখানে পায় সব ধন কড়ি, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ঐ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং পর্বতের চূড়া হইতেও ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। শেষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের মত রাশি রাশি বাষ্প উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলে। ভলকে ভলকে তেজের সহিত বাষ্প সকল খুব দূর পর্যন্ত উপরে উঠিতে থাকে। তাহাতে কখন কখন অবিরল বৃষ্টি পতিত হইতেও দেখা যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আকারের প্রস্তর খণ্ড সমূহ প্রচণ্ড বেগে আকাশে উঠিতে থাকে। শুনা যায় যে পূর্বোক্ত কটোপাক্সী পর্বত হইতে ৫,৪০০ মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই (শুনিলে অবাক্‌ হইবে) ৯ নয় মাইল অর্থাৎ ৪৷৷০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল!! তোমরা পাঁচ সের গোলা একটা তুলিয়া দশ হাত দূরে ছুড়িয়া দিতে পার না, আর ৫,৪০০ পাঁচ হাজার চারি শত মণ ভারী একটা পাথর কি না. সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে ছুড়িয়া দিল! (সকলেই খুব আশ্চর্য হইয়া শিহরিয়া উঠিল।)

"এই সময়ে এত ভস্মরাশি গহ্বরের মুখ দিয়া আকাশে উঠিতে থাকে যে একেবারে

সূর্যকে ঢাকিয়া দশদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। এমন কি ৭।৮ ক্রোশ দূর পর্যন্ত চারিদিকে অমাবশ্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া ঐ সকল আগ্নেয় ধূলি রাশি (ইংরাজিতে volcanic dust বা sand বলে) আকাশকে ছাইয়া ফেলে এবং কখন কখন ১০০।১৫০ ক্রোশ দূরে পর্যন্ত গিয়া অবিরল বৃষ্টিপাতের ন্যায় পতিত হইতে দেখা যায়। ইহা কিন্তু ধূলি বা ভস্ম কিছুই নয়। ভিতরে যে দ্রব (অর্থাৎ গলা) প্রস্তর ও ধাতু সকল রহিয়াছিল, তাহাই বেগে উপর দিকে উঠিয়া বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ি গুঁড়ি ছাইয়ের কণার মত পড়ে, এই জন্য ইহাকে কখন ভস্ম কখন বা আগ্নেয় ধূলি বলা হয়। ইহা দ্বারা ভয়ানক অনিষ্ট হয়। সমুদ্রের ধারেই প্রায় আগ্নেয়গিরিরা থাকে ; কাজেই ঐ ধূলি সব সমুদ্রে পড়িয়া এত জমা হয় যে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

"আর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান নেপল্‌স্‌ দেশীয় হার্কিউলেনীয়াম্‌, পম্পীয়াই ও ষ্টারী নামক তিনটী নগর এই আগ্নেয় ধূলিরাশির মধ্যে একেবারে পুতিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।"

কিশোরী।—"আমি পড়িয়াছি।"

মন্মথ।—"আমি শুনিয়াছি।"

নলিন।—"আমি ত জানি না?"

নবীন বাবু।—"প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ভিসুভিয়স্‌ পর্বত এখনকার মত ছিল না, তখন উহা শান্তভাবে ছিল, কোনও উৎপাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। হঠাৎ ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভূমিকম্প দেখা দিল, ও তার পর ১৬ বছর ক্রমাগত মাঝে মাঝে ঐ রকম ভূমিকম্পই হইত। শেষে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ বছর গত হইল) ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়। সেই ঘটনার সময়ে এত ভস্ম বাহির হইয়াছিল যে পর্বতের চারিদিকের দেশ সমূহে প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইয়া উহা চাপা দিয়াছিল। এই ভয়ানক ভস্ম পাতেই পূর্বোক্ত তিনটী নগর একেবারে চাপা পড়িয়া বহুকালের মত পুতিয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ১৬০০ যোল শত বছর এই ভস্মস্তূপের ভিতরে লুকাইয়া ছিল। সেদিন তাহাদের কোন কোন স্থানের খানিক খানিক অংশ উপরের চাপ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

"তাছাড়া আরও ভয়ানক কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। হঠাৎ হয়ত সমুদ্রের জল খুব খানিক দূর সরিয়া গেল, তারই পরে আবার ভীষণ বেগে পর্বতের মত উচ্চ হইয়া দেশ নগর, ঘর বাড়ী,—সব ডুবাইয়া বন্যা করিয়া ফেলিল। এইরূপে নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত হইয়া থাকে।"

গণেন্দ্র।—"ওঃ! আমার গা কাঁপছে, বোধ হচ্ছে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত, আর সব সৃষ্টি যেন ধ্বংস হতে বসেছে!"

নবীন বাবু।—"ঠিক্‌ সেই রকমই বটে। আমি তোমাদের কি বা বলিলাম? বড় হয়ে যখন এ বিষয়ের ভাল বর্ণনা পড়িবে তখন ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিবে এ কি কাণ্ড!! যথার্থই যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। জগতে এমন ভয়ানক ব্যাপার আর কিছুই নাই। পৃথিবীর যেন স্নেহ মমতা কিছুই নাই, ঘোর নিষ্ঠুর, ঘোর উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য! কত যত্নে যে সব গাছ লতাগুলিকে রস দিয়ে এতদিন বাঁচাইতে ছিল ও বড় করিতে ছিল, তাদের কোথায় যে কে গেল তার সন্ধান নাই! এক একটা দুরন্ত ছেলে যেমন রাগ করে ঘর দোর, ঘটি, বাটী, শ্লেট, বই, ছবি গহনা, যা সুমুখে পায় ভেঙ্গে চূরে লণ্ড ভণ্ড করে, আর চীৎকারে

বাড়ী ফাটাইতে থাকে, এ সময়ে পৃথিবী যেন সেই রকম করে। ওঃ! কি ভয়ানক! এদিকে ভূমিকম্প হচ্ছে, তাহাতে আবার বজ্রাঘাতের মত শব্দে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে, সমুদ্র উথলে উঠছে, ওদিকে আকাশে ঘোর অন্ধকার, ভস্মে একেবারে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই গুলা হুড় মূড় ক'রে এখানে ওখানে পড়্‌ছে, ক্রমে ভস্মরাশি ঘর বাড়ী, গাছপালা, পথ ঘাট, জল স্থল, দেশ নগর—সব ছেয়ে ফেল্‌ছে, পাহাড় কোথাও পৃথিবী কাঁপাইয়া ফেটে যাচ্ছে, কোথাও ভিতরের তেজে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে!! পশু পক্ষী কে কোথায় পড়িয়া মরিতেছে তাহার ত সন্ধান নাই, থাকিতে পারেই না—মানুষই যে কে কোথায় পলাইল, কোথায় মরিল, কি কাণ্ড কিছুরই ঠিক নাই! কেবলই অন্ধকার আর বজ্রধ্বনি আর ধ্বংস!—এইত প্রলয়!

১৮

আগ্নেয়গিরি (দুই)



ন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এ সকল যে বর্ণনা করিলাম,—ভূমিকম্প, ধূম, অগ্নিশিখা, ধূলি ও প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি যাহার কথা পূর্বে বলিলাম, সে সকল উৎপাত আগে দেখা যায়। কিন্তু এ সব অপেক্ষাও ভয়ানক একটা আছে। যেন আগে জন কতক ফৌজ পাঠাইয়া কিছু গোলযোগ করিয়া তারপর সেনাপতি নিজে এসে হাজির হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া চারিদিকের গ্রাম সহর সমস্ত বিনষ্ট করিয়া, ঘর দ্বার সব ভাঙ্গিয়া দিয়া, জীবজন্তু ধ্বংস করিয়া এবার যেন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। সব লণ্ডভণ্ড করিয়া এবার আবার নূতন মাটি দিয়া গড়িতে হইবে।

তুবড়ী ছোড়া শেষ হইয়া গেলে যখন সেটা আনিতে যাও, তখন তার গায়ে কি লাগিয়া থাকে?"

চন্দ্র।—"হাঁ, আমি দেখেছি তার মুখের বিঁদ থেকে কি যেন গলা গলা সব বাহির হ'য়ে তুবড়ীটার গায়ে লাগে আর গড়িয়ে মাটিতেও গিয়া পড়ে, সে গুলা কি গা?"

দেবেন্দ্র।—"হাঁ, আমিও দেখিতে পাই বটে।"

নবীন বাবু।—"সত্য কথা, সকলেই প্রায় দেখে যে ছোড়া হয়ে গেলে তুবড়ীর গায় তার ভিতরের গন্ধক ও অন্য অন্য নানা জিনিষ গলিয়া লাগিয়া যায়। প্রকৃতির তুবড়ীর বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। আগ্নেয় পর্বতের যখন অগ্ন্যুৎপাত হয় তখনও ঐরূপ কাণ্ড সকল প্রথমে হইয়া থাকে,—এদিকে তাহার ভিতরে পৃথিবীর গর্ভে যে সব ধাতু, মাটি, পাথর, গন্ধক প্রভৃতি সামগ্রী আছে, সে সমস্ত গলিয়া এক রকম আগুণের সমুদ্রের মত হইয়া তেজে উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। তেজ অল্প হইলে শুধু ভূমিকম্প হইয়াই থামিয়া যায়, আর একটু বেশী হইলে ধোঁয়া বাহির হয়, আর ঐ দ্রব (গলা) পদার্থ রাশির কিছু কিছু তেজে ঐ ধূমের সহিত পর্বতের চূড়া দিয়া আকাশে বাহির হইয়া পড়ে। অনেক উপরে উঠে বলিয়া ঐ দ্রব পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি বা বালির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আসিবার সময়ে পথে যে সকল পাথরের চাঁই দেখিতে পায়, তাহারা উহার ভয়ানক তেজ থামান দূরে থাকুক, সেই তেজে উহারই সঙ্গে পর্বত হইতে আকাশে উঠিয়া কত দূরে গিয়া পড়িতে থাকে. তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তখনও সেই ভিতরকার সমুদ্রের দুই একটা ঢেউ দেখিতে পাওয়া

যায় মাত্র। সমুদ্রকে তখনও দেখা যায় নাই। অবশেষে ওসকল উৎপাত কম হইয়া আইসে, আর পর্বতের উপরিস্থ সেই কড়ার মত গহ্বরটী ভিতরের গলা পাথরাদিতে পরিপূর্ণ হয়। দ্রব পদার্থের সাগরে আর ঢেউ নাই, সাগর এখন স্বয়ং উথলিয়া উঠিয়াছে ! পর্বতের শিখর দেশের গহ্বর হইতে পৃথিবীর ভিতর পর্যন্ত যে নল আছে বলিয়াছি, ঐ নল দিয়া ক্রমে ক্রমে চূড়া পর্যন্ত দ্রব ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতির সেই সমুদ্র উথলিয়া উঠে ও ঐ গহ্বরটী পরিপূর্ণ করে। সেটী কিন্তু বেশী বড় নয়, কাজেই তার মধ্যে কতক্ষণ সেই সাগরে গলা সামগ্রীর স্থান হ'বে বল? কাজেই উহার যে দিক নীচু, সেই দিক দিয়া গড়াইয়া অগ্নি-সমুদ্রের তরল পাথর পর্বতের গা বহিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহারই নাম (Lava) "লাভা"। প্রায়ই আগ্নেয়গিরির গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর থাকে, সেই ছোট ছোট গহ্বরগুলি দিয়াও দ্রব পদার্থের স্রোত বহিতে দেখা যায়। কখন কখন পর্বতের গা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া থাকে। কখন বা নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেখানে নূতন আগ্নেয় পর্বত উৎপন্ন করিতেও দেখা যায়। এই দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। ইহাই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের মূল কারণ, এবং ইহাদ্বারাই আগ্নেয় পর্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদ্বারা সমুদ্রের কত শত দ্বীপও নির্মিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন নামক একজন বিখ্যাত সাহেব আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ড সম ভিসুভিয়স্ পর্বতের নিকট নেপলস্ দেশে ৩০ ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন। তিনি ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকবার উহার ভয়ানক উৎপাত স্বচক্ষে দেখিয়া যেরূপ সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আগ্নেয়গিরির বিষয়ে বেশ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার, তা না দেখিলে কিছুই অনুভব করা অসম্ভব। তথাপি তোমাদের জন্য আমার না-দেখা কথা অপেক্ষা তাঁহার এক বারের বর্ণনা হইতে কতকটা বলি শুন।

"১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পর্বতে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলি : '১৫ই জুন রবিবার রাত্রি দশটার সময়ে হঠাৎ একটা ভূমিকম্প হইল, বাহিরে গিয়া দেখি পর্বতের চূড়ার উপর ও চারিদিকের ছোট চূড়ার (গতবারের ভিসুভিয়সের চূড়ার ছবি দেখ) উপর দিয়া ভয়ানক অগ্নিশিখা ও কাল ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইরূপ ভলকে ভলকে এমন কি ১৫টা স্থান দিয়া অগ্নি ও ধূম বাহির হইতে দেখিলাম। বজ্রের মত ভীষণ গর্জনে কাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তার পর বোধ হইল যে দ্রব পদার্থের প্রবাহ সকল পর্বতের চূড়া ও গায়ের নানা স্থান দিয়া বাহির হইয়া গা বহিয়া নীচে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

'এদিকে ক্রমাগত যেন ঝড়ের সময় সমুদ্রের ড়াকের মত হু হু শব্দ অনবরত হইতেছে, ওদিকে যেন শত সহস্র হাউই এক সঙ্গে ছুড়িলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, তেমনি ভয়ানক শব্দে হাজার হাজার পাথরের চাঁই, আকাশে মহাতেজে শাঁশাঁ করিয়া ছুটিতেছে ও কতকদূরে গিয়া পড়িয়া গৃহদ্বার জানালা চূরমার করিয়া দিতেছে ; আবার তার মধ্যে ঘনঘন লক্ষ লক্ষ কামান একত্রে আওয়াজ করিলে যেমন শব্দ হয় বা শত শত বজ্রাঘাত উপরি উপরি হইলে যেরূপ হয়, তেমনি শব্দে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছে ; আকাশ যেন ফাটিয়া যাইবে। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইবে! পর্বত যেন চূর্ণ হইবে!! সে দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনার দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব।

'পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে পর্বতের গা বহিয়া দ্রব পদার্থের স্রোত নীচে আসিয়াছে এবং পর্বতের নিম্নের "টরিডেল্ গ্রেকো" (Torredel Greco) নামক নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার অধিকাংশ স্থল দগ্ধ ও উচ্ছন্ন করিয়া শেষে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। যেখানে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে তথায় ৮০০ হস্ত চওড়া, ৮ আট হাত জলের ভিতর ও ৮ আট হাত উচ্চ সর্বশুদ্ধ ১৬ যোল হস্ত পুরু একটী নূতন অন্তরীপ প্রস্তুত হইয়া গেল। জলের মধ্যেও প্রায় ৪২০ চারিশত কুড়ি হস্ত লম্বা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ দ্রব-স্রোত যে কি ভয়ানক গরম তাহার কল্পনাই হয় না। এত পথ চলিয়াও যখন জলে পড়িয়াছে, দেখিলাম যে সে স্থলের জলরাশি টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। এমন কি আমি প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত দূরে ছিলাম আমার নিকটের জলেও প্রচুর ধূম উঠিতেছিল, ও উহাতে হাত দিবা মাত্র আমার হাত বাস্তবিকই পুড়িয়া গেল। আমাদের নৌকার তলায় যে পীচ দেওয়া ছিল মাঝি দেখিল তাহা ঐ উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে ও নৌকায় জল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই আমরা তাড়াতাড়ী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম।' এইরূপ কত ভয়ানক কথা এর পর শিখিবে, এখন সে সমস্ত কথা বলা অসম্ভব।"

অমূল্য।—"দাদা বাবু! দ্রব-প্রবাহ কি রকম—ভাল করিয়া বলুন না, কতকটা বুঝিয়াছি বটে কিন্তু ওবিষয়ে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

নবীন বাবু।—"যথার্থ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে কিরূপে এমন কঠিন বিষয় তোমরা বেশ্ মনে ধারণা করিতে পারিবে। এ নিজে না দেখিলে তেমন উত্তমরূপে বুঝা কঠিন। তবু এস দেখি যতটুকু পার শুন। যখন ঐ স্রোত বহিতে থাকে তখন তাহার চেহারা বড় ভয়ানক। তোমরা মনে কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারিবে প্রায় এক মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ৮।১০।১২ হাত উচ্চ একটা গলা পাথরের নদী চলিয়াছে। তাহার উত্তাপে নিকটে যায় কার সাধ্য? জ্বলন্ত রক্তবর্ণ, উপরটা ধোঁয়ায় ঢাকা, ভিতরে যেন হাপর! তোমরা কখন লৌহ গলাইবার হাপর দেখ নাই তাহা হইলে বেশ্ বুঝিতে পারিতে। যাহা হউক এই অগ্নিময় পাথরের নদী চলিয়াছে, সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, অল্পক্ষণ মধ্যেই ইহার ভয়ানক গরমে পুড়িয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় মন্দির, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে, সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে ধ্বংস করিতে করিতে কতদূরই চলে তাহার ঠিক নাই। কখন কখন পর্বত হইতে অল্প দূর গিয়াই থামিয়া যায়, কখন বা সাগরে গিয়া মিশে, কখন বা অনেক ক্রোশ পথ পর্যন্ত চলিয়া যায়। আইস্‌লণ্ড দ্বীপের "স্ক্যাপ্‌টার যোকুল" নামক আগ্নেয় পর্বতের দ্রব--প্রবাহ বড় ভয়ানক। তথাকার ১৭৮৩ সালের অগ্নিকাণ্ড ১১ই জুন আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। পর্বতের দুই পাশ দিয়া দুটী প্রবাহ বাহির হইয়া একটী ৫০ পঞ্চাশ মাইল, অপরটী ৪০ চল্লিশ মাইল পথ গিয়াছিল। প্রথমটীর বিস্তার ১২ হইতে ১৫ মাইল ; অপরটীর প্রায় ৭ মাইল। চলিতে চলিতে ২০টী গ্রাম উচ্ছন্ন দেয় এবং ৯,০০০ নয় হাজারেরও অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ করে। তদ্ভিন্ন পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যে কত নষ্ট হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। এমন কি সে ক্ষতি আইস্‌লণ্ড বাসীরা আজও পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই ; "স্ক্যাপটা" নামক ১৩৫ হাত চওড়া, ৪০০ হাত গভীর একটী পার্বতীয় নদী ঐ দ্বীপে ছিল। দ্রব পদার্থের স্রোত চলিতে চলিতে ঐ নদীতে গিয়া পড়ে এবং বহু দূর পর্যন্ত ঐ নদীর গর্ভ পূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ যে কত

দ্রব পদার্থই বাহির হইযাছিল !!

"ক্রমে যত পুরাতন হয় এই প্রবাহের উপরিভাগের পাথরের চাঁইগুলি তত জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয় ; এমনকি তখন দেখিলে বোধ হয় যেন রাশি রাশি পাথর এক সঙ্গে জমাট করিয়া কোন দৈত্য সেই চাঁই পিছন থেকে ঠেলিয়া দিতেছে। উপরে কঠিন পাথর, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। আর বাস্তবিকও কত লোক প্রথম দিন পলাইতে না পারিয়া কোন উচ্চ স্থানে লুকাইয়া থাকে, পরে শুকাইয়া গেলে ঐ কঠিন পাথরের উপর দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। উপরেব ঐ কঠিন আবরণের ভিতরে কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড তা বুঝিতেই পারিতেছ। সে আগুণ অনেক দিন পর্যন্ত নিবে না। ১০। ১৫ দশ পনের বৎসর পর্যন্তও তাহার উপরের ফাটল দিয়া ভিতরের গরম ভাব উঠিতে দেখা যায় ; তাহাতে হাত নিশ্চয় পুড়িয়া যাইবে।

সাগরের গর্ভেও আগ্নেয়গিরি থাকে। তাহাদের যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন প্রায় ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে ; অনেক স্থলে নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নূতন গহ্বর থাকে তাহা হইতে আবার উৎপাত হয়। এইরূপেই সিসিলী দ্বীপে এটনা, আইস্‌লাণ্ডের হেক্লা, কেনেরী পুঞ্জের টেনেরীফ্ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।"

অনেক রাত্রি হওয়ায় আজ এইখানেই গল্প শেষ হইল। সকলে আশ্চর্য হইয়া বাড়ী গেলেন!

১৯

নবীন বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু এত দিন কার্য উপলক্ষে পশ্চিম গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পৌত্র ও দৌহিত্রগণ তাঁহাদের গল্প শুনিবার বিষয়ে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। অন্য অন্য বিষয়ে অন্য লোকের নিকট অনেক গল্প শুনিতে পাইতেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ না পাওয়াতে অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ, মাখন, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, নলিন, পুলিন প্রভৃতি ছোট ছোট বালকগুলির মনে বড় কষ্ট হইত। তাঁহারা কেবল দিন গণিতেছিলেন, দাদা বাবু কবে বাড়ী আসিবেন। এখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে নবীন বাবু আসিতেছেন। অমনি সকলে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিযা গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরদাদাকে গাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহাদের দেখাদেখি গ্রামস্থ আরও প্রায় ১০।১২টী বালক বালিকা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। অমূল্য বাবু সকলের নেতা হইয়া সকলকে সারবন্দী দাঁড় করাইয়া রাখিতেছেন। কি করিয়া দাদা বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তিনি আসিবামাত্র কে কে তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিবে, অন্য কাহার উপর কি ভার থাকিবে, তাহার সব ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতেছেন। ছেলেগুলির উৎসাহ ও আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। কলরবে ষ্টেশনগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

এমন সময় গাড়ী নিকটের ষ্টেশন হইতে ছাড়িল, ঘণ্টা-ধ্বনি হইল, ইঙ্গিতের পাখা পড়িল, বালকসেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া আছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট কাটিতেছে—বালকদের তাহা বড়ই বিলম্ব বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ধূঁয়া দেখা গেল, বাঁশীর শব্দ হইল, গাড়ী থামিল। দরজা খোলা হইবামাত্র নবীন বাবুও নামিলেন। বালকগণ সকলে মিলিয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও সকলের হাত ধরিয়া আদর করিলেন। কাহাকেও কোলে লইলেন, কাহারও মুখচুম্বন করিলেন। সকলে নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া

তাঁহার জিনিষ পত্র লইয়া গাড়ীতে রাখিলেন। নবীন বাবু সকলকে কয়েকখানি গাড়ীতে একে একে বসাইয়া আপনি একখানি গাড়ীতে বসিলেন। গাড়ী সব ক্রমে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। সকলে পরম আনন্দে বাড়ী আসিলেন। গ্রামে আজ যেন মহা উৎসব।

সকলে নবীন বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। মধু চাকর গুড়গুড়ীতে তামাকু দিয়া গেল। প্রাচীন ঠাকুরদাদা মহাশয় ধূমপান করিতে করিতে বালকগণের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:

"কেমন ভাই! আমি যতদিন ছিলাম না, তোমরা পড়া শুনা বেশ করিতে ত?"

অমূল্য।—"আজ্ঞা হাঁ, দাদা মহাশয়,—আমরা পড়া শুনা ভালই করিতাম। আর তা ছাড়া আমাদের পুস্তকে বিজ্ঞানের কথাও অনেক শিখিয়াছি। কিন্তু আপনি না থাকাতে তেমন সব উপদেশপূর্ণ গল্প শুনিতে পাই নাই। এখন হইবে। আপনি গেলে পর আমাদের বড় মন কেমন করিত।"

নলিন।—"দাদাবাবু! অমূল্য দাদা আমাদের লইয়া অনেক ভাল ভাল গল্প ও উপদেশ শুনাইতেন; আমরা রোজ সন্ধ্যাবেলা একত্রে বেড়াইতে যাইতাম ও সব রকম বইয়ের কথা শুনিতাম। দাদাও আপনার মতন সহজ সহজ কথায় বিজ্ঞানের গল্প বুঝাইয়া দিতেন। আমিও এবারে অনেক গল্প আপনাকে শুনাইব।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। দাদা মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই, বড় বড় বিজ্ঞানের কথাও অনেক শিখিয়াছ। আমি বুড়া মানুষ, একটা সামান্য কথা বুঝাইয়া দাও ত দেখি।— এই যে তামাক খাইতেছি, নল তো মুখে টানিতেছি, কলকেতে তামাক ও আগুন রহিয়াছে; ধূঁয়া মুখে কি করিয়া আসিতেছে?"

এবার নলিন বাবু বড় গোলে পড়িলেন। বিজ্ঞান ত চন্দ্রে, সূর্য্যে, নদীতে ও বায়ুতে। তামাক খাওয়ার গুড়গুড়ীতেও যে বিজ্ঞানের শিক্ষা আছে, তাহা বেচাবীর বুদ্ধিতে আসিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল :—

"কৈ অমূল্য দাদা ত তাহা শিখাইয়া দেন নাই?" তখন সকলেই গুড়গুড়ীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কাহারও মুখে আর কথাটী নাই। নবীন বাবু বেশ নির্ব্বিঘ্নে গড়্‌গড়্ গড়্‌গড়্ করিয়া ঘন ঘন নলে টান দিতে লাগিলেন ও ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিল। কেহ কেহ এক একটা উত্তর দিতেও লাগিল। কিন্তু কতক দূর যাইয়া আটকাইয়া যায়। নিঃসন্দেহ স্থিরমীমাংসা কিছুতেই হইল না। অনেক চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া সকলেই বলিল, "ইহা কঠিন কথা। দাদা মহাশয় না বুঝাইয়া দিলে হইবে না।"

তখন মাখন বলিল,—"না, সময় লইয়া ভাবিয়া দেখা যাক। আর দাদা বাবুও আজ ক্লান্ত হইয়াছেন, বিশ্রাম করুন, যদি আমরা ঠিক করিতে না পারি, কাল তখন বলিয়া দিবেন।"*

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বালকগণ নিজ নিজ স্থানে গেল। নবীন বাবু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

*যদি সখার কোন পাঠক-পাঠিকা এই বালকদিগকে বড় অল্পবুদ্ধি মনে করেন তবে তিনি এই বিষয়ে মীমাংসা করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে, আমরা নবীন বাবুর শিষ্যদিগকে বলিব যে, ইহা তাঁহাদেরও জানা উচিত। লেখক সেই সঙ্গে আপনার বয়স ও কোথায় কোন শ্রেণীতে পড়েন, তাহাও লিখিয়া দিবেন। ইহার উত্তর পাইলে বাস্তবিক আমরা সুখী হইব।

২০

কয়েকদিন পরে আজ নবীন বাবু আপনার পাঠাগারে বসিয়া আছেন এমন সময় তাঁহার বালক শিষ্যগণ আসিয়া সে দিনকার গুড়গুড়ির প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। তিনি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বেশ হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এই ঘরেই সুবিধা হইবে। কথাটি কিন্তু কঠিন, খুব মন দিয়া শুনিলে তবে বুঝিতে পারিবে।"

এই বলিয়া তিনি টেবিলের চারিদিকে বালকদিগকে বসাইলেন। পরে একটী কাচের গেলাসে সরবৎ ঢালিয়া তাহাতে একটী কাচের নল রাখিলেন। "এখন এই সরবৎ কেমন করিয়া পান করিবে?" সকলেই বলিয়া উঠিল—"কেন নল দিয়া টানিলেই মুখে সরবৎ আসিবে।" নলিন বাবু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সেই নলটীতে মুখ লাগাইয়া টানিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—"এই দেখ সরবৎ মুখে আসিতেছে।" এই রূপে আরও দুই একটী ছেলে নল দিয়া সরবৎ পান করিল। তখন নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেহ বুঝিতে পারিতেছ যে নলে টান দিলে গেলাসের সরবৎ কেন মুখে আসিতেছে? নলের ভিতর ত বায়ু আছে। টানে ঐ বায়ু মুখে যাইতেছে। কিন্তু নীচের জল কেন নলের মধ্যে উঠিতেছে কেহই উত্তর দিতে পারিল না।



তখন নবীন বাবু বুঝাইতে লাগিলেন,—

"তোমরা জান যে বায়ুর ভার আছে। সাধারণতঃ এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুর ভার ৭॥ সের।"

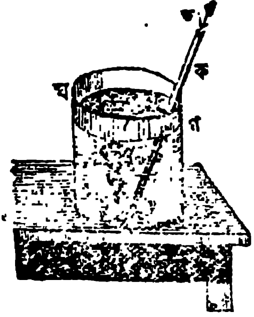
অমূল্য।—আজ্ঞা হাঁ, ইহা আমরা অনেকদিন শিখিয়াছি।

নবীন বাবু।—তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে জল তরল পদার্থ। এ কারণে কোন পাত্রে রাখিলে ইহার উপরিভাগ সমান দেখা যায়—যেন একখানি কাচ পড়িয়া আছে।

মাখন।—কিন্তু দাদা মহাশয়, বাতাস লাগিলে তখন সমান থাকে না। হাওয়াতে নদীতে ঢেউ হয় দেখিয়াছি।

নবীন বাবু।—"ঠিক বলিয়াছ। জল তরল পদার্থ বলিয়াই তাহার উপরে চাপের কম বেশী হইলে তাহার উপরিভাগ আর সেই রূপ সমতল থাকে না। যেখানে বেশী চাপ পড়ে, সেই খানটা নিচু হইয়া যায়। এই দেখ সরবতের গেলাসের নলটী দিয়া ফুঁদিয়া দেখ গেলাসের ভিতরের জল আর সমান থাকিবে না। যেখানে ফুঁ দিবে, সেখানে জল নীচু হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া (গ) গেলাস জলে পূর্ণ করিয়া (ক) কাচের নলটী তাহাতে রাখিলেন। তখন সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ নলের ভিতরেও (খ) পর্যন্ত জল রহিয়াছে; অর্থাৎ গেলাসের ভিতরের জল ও নলের ভিতরের জল—দুইয়েরই উপরিভাগ সমতল ঐ এক

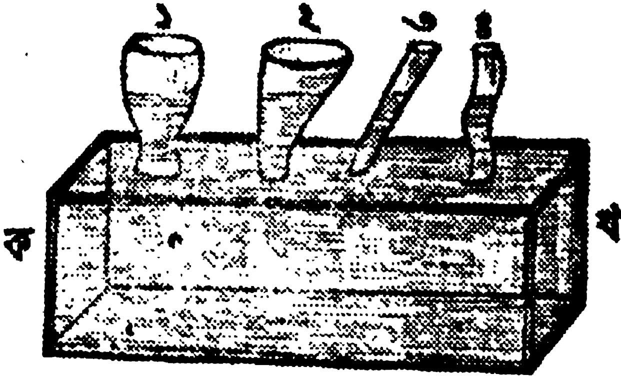
(খ ঘ) রেখাতে। কারণ, নলের ভিতরের জলে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ, বাহিরে গেলাসের জলের উপরিভাগেও ঠিক সেই পরিমাণ বায়ুর চাপ। কোন প্রভেদ নাই ; অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ৭॥ সের।



কিন্তু তারপর যখন নলে ফুঁ দিতে লাগিলাম তখন (ত) তীর চিহ্নিত পথে বায়ুর গতি হওয়াতে ; নলের ভিতরকার (খ) চিহ্নিত স্থানের জল বেশী চাপ পাইয়া ক্রমে নীচু হইতে লাগিল এবং অবশেষে (ঙ) অর্থাৎ নলের মুখ পর্যন্ত পহুঁছিল। তখন কাজেই নলের মুখ দিয়া বায়ু বাহির হইয়া গেলাসের জলে প্রবেশ করিল ও বুড়্ বুড়্ বুড়্ বুড়্ করিয়া জলের উপর উঠিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলে?

মন্মথ।—আজ্ঞা হাঁ—বেশ বুঝিয়াছি। এতদিন জানিতাম না যে পুকুরের জল অমন সমান কাচের মত থাকে কেন। লোকে কথায় বলে—জল উঁচু নীচু নয়। খোসামুদে মোসাহেবরাই বলে, "জল উচুঁ জল নীচু।" কিন্তু বাস্তবিক তাহার কারণ যে বায়ুর চাপ, তাহা পূর্বে জানিতাম না।

নবীন বাবু।—এখন বেশ বুঝিতে পারিবে যে বায়ুর চাপ সমান বলিয়া জলের উপরিভাগ সমান দেখায়। এ যে কেবল পুকুর বা বাল্‌টী গেলাসেই হয় এমন নহে। যে ভাবেই থাকুক না কেন, এক অবিভক্ত জলরাশির যে যে অংশ বায়ুর সমান চাপ পাইবে, সে সব স্থানই



সমতল হইবে। এই দেখ (ক খ) একটী কাচের খালি বাক্স, তাহার উপরের ঢাকনীতে ১, ২, ৩, ৪ চারিটী ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাচের নল লাগান আছে। এখন আমি ১নং নল দিয়া জল ছাড়িতেছি।

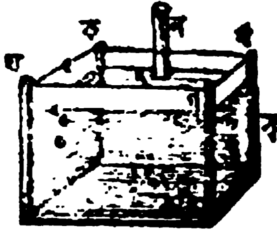
এই দেখ ক্রমে (ক খ) বাক্স পূর্ণ হইল। আরও চলিতেছি, ক্রমে জল নল চারিটাতে উঠিতেছে। কিন্তু দেখ চারিটী নলের মধ্যেই জলের উচ্চতা ঠিক সমান। ইহার কারণ কি?

দেবেন।—"আমি বলিতে পারি, দাদা বাবু।—নল চারিটী যতই কেন মোটা বা সরু বা ভিন্ন ভিন্ন আকারের হউক না, উহাদের উপরের মুখ খোলা থাকাতে তাহাদের ভিতর বাহিরের বায়ু আছে। এবং সেই জন্য তাহাদের ভিতরের জলের উপর ফি ইঞ্চে ৭॥ সেরের

হিসাবে বায়ুর ভার রহিয়াছে। কাযেই সকলগুলির মধ্যে ঐ চাপ সমপরিমাণে থাকাতে তাহাদের ভিতরের জলের উচ্চতাও ঠিক সমান হইবে।"

নবীন বাবু।—বাঃ! ঠিক বলিয়াছ। আমি আজ বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা বেশ যত্ন করিয়া শুনিতেছ। আমারও তাই খুব বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আচ্ছা! এ পর্যন্ত তোমরা দুটী কথা শিখিলে। (১ম) বায়ুর চাপ (Atmospheric pressure) সমপরিমাণ হইলে, জলও সমভাবে অবস্থিতি করে। (২য়) বায়ুর চাপ কোন স্থানে বেশী হইলে সেখানকার জল নীচু হইয়া পড়ে।

"এই বার তোমাদের আর একটী কথা বুঝিতে হইবে।" এই বলিয়া নবীন বাবু (ব) চিহ্নিত একটী কাচের চৌকোণা বাক্সে জল পুরিলেন ও (ক খ গ ঘ) চারিকোণা একখানি কাচ ঐ জলের উপরিভাগে রাখিলেন। ঐ কাচখানির মধ্যস্থলে একটী ছোট ছিদ্র (ছ) আছে। তাহাতে একটী নল (ন) লাগান।



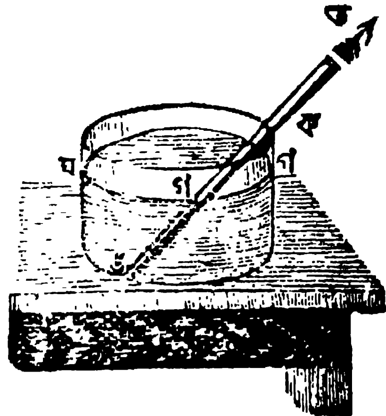
নবীন বাবু।—এই দেখ কাচখানি জলে কেমন ভাসিতেছে। কিন্তু যেমন উহাতে হাতের ঝোঁক দিয়া চাপিলাম, অমনি দেখ এই ছিদ্রটী দিয়া কেমন বেগে জল (ন) নলের মধ্যে উঠিতেছে। যেন ফোয়ারা ইহার কারণ কি বলিতে পার?

মাখন।—বোধ হয় পারি। ঐ ছিদ্রের জলে সাধারণ বায়ুর চাপই ছিল, কিন্তু কাচখানির উপর জোরে ভর দেওয়াতে তাহার নিম্নস্থিত জলের উপর কাচখানির চাপ সাধারণ বায়ুভার (air-presure) অধিক হইল। সুতরাং একই জলভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাপের কম বেশী হওয়াতে জল স্থির থাকিতে পারিল না। চারিদিকে কাচের চাপের আধিক্যবশতঃ ঐ অল্প চাপের পথ ছিদ্র দিয়া জল নলের ভিতর উঠিতে লাগিল।

নবীন বাবু।—বেশ মাখন। ঠিক বুঝিয়াছ। আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ।

সকলে।—হাঁ পারিয়াছি।

নবীন বাবু।—আচ্ছা এখন তোমরা সকলেই বুঝিতে পারিবে—নলে মুখ দিয়া টানিলে গেলাসের সরবৎ কেন মুখে আসে। যখন সরবতের গেলাসে নলটী রাখিলাম। দেখ নলের ভিতরেও (গ) পর্যন্ত সরবৎ রহিয়াছে। অর্থাৎ গেলাস ও নল উভয়ের মধ্যস্থ তরল পদার্থ সরবৎ একই সমতল রেখা (গ ঘ) অবস্থিত রহিয়াছে। বল দেখি, চন্দ্রনাথ, কেন?



চন্দ্র।—কারণ এখন গেলাসের জলে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ রহিয়াছে, নলের ভিতরেও সেই বায়ু অতএব তাহার ভিতরের জলেতেও সেই পরিমাণ চাপ।

নবীন বাবু।—হাঁ ঠিক বলিয়াছ, এতক্ষণ পর্যন্ত চাপের কাছে কিছু মাত্র তারতম্য হয় নাই।

আচ্ছা এখন যাহা বলিতেছি শুন। তারপর যখন জলে মুখ দিয়া টানিতে আরম্ভ করিলাম, তখন নলের মধ্যে (গ) পর্যন্ত যে বায়ু ছিল, তাহা টানের জন্য (ত) চিহ্নিত তীর-রেখার দিকে উঠিয়া আসিল। সুতরাং ঐ নলের মধ্যে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ ছিল, তাহা কমিয়া গেল। কিন্তু নলের বাহিরে গেলাসের সরবতের উপরিভাগে বায়ুর সাধারণ চাপই রহিয়াছে। এখন দেখ, গেলাসের সরবতের অবস্থা কি হইল?—না উহার উপরিভাগে সর্বত্র ঠিক ৭॥ সেরের হিসাবে চাপ রহিয়াছে, কেবল, একটী মাত্র স্থানে অর্থাৎ নলটীর মধ্যে চাপ তদপেক্ষা কম সুতরাং অবিকল উপরিউক্ত ফোয়ারার মত ঘটিল। চারিদিকের চাপের আধিক্যবশতঃ সরবৎ তরল বলিয়া ঐ নলের মধ্যে উঠিতে লাগিল, এবং ক্রমে মুখে গিয়া পহুঁছিল। তখন যতই চান, ততই যায়। আরও টান আরও যাইবে। অবশেষে গেলাস খালি হইয়া যাইবে ও পেট ভরিয়া যাইবে।

দেবেন।—দাদাবাবু, আমাদের সরবৎ খাওয়ার কথা ত বুঝিলাম। আপনার তামাক খাওয়ার কথা ত বুঝিলাম না।

নবীন বাবু।—আজ এই পর্যন্ত থাকুক, বেশ মন দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। আর এক দিন গুড়গুড়ির কথা বুঝাইয়া দিব। আজ মোটামুটী এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিও যে—

(১) চাপের তারতম্য না হইলে, জল সমতল থাকে।

(২) চাপ কোন স্থানে বেশী হইলে জল নীচু হয়।

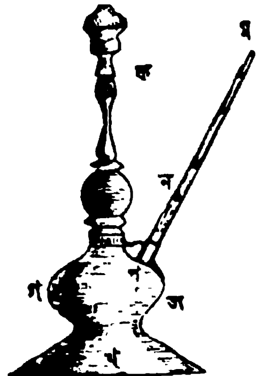
(৩) চাপ কোন স্থানে কম হইলে, জল উঠে।

এখন গুড়গুড়ির কথা হয়ত আপনারাই বলিতে পারিবে।

২১

[*ভ্রম সংশোধন* : —গতবারের সংখ্যায় ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৯শ পংক্তিতে "বায়ু ভার (air Pressure)" স্থলে বায়ুভার "air-presure অপেক্ষা" পড়িতে হইবে।]


য়েক দিন অবধি অতিশয় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রৌদ্রের তেজে সারাদিন পৃথিবী যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আজ সন্ধ্যা বেলা নবীন বাবু ছাতে বসিয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত। সকলে প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে! এখন কেহ কি বলিতে পার আমরা তামাক খাই কেমন ক'রে? কল্‌কের তামাক, গুড়গুড়ীর জল ফুঁড়িয়া তাহার ধূঁয়া মুখে আসে কেন বলিতে পার?"



মাখন।—আজ্ঞা হাঁ, আমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বলিয়া যাই, আপনি দেখুন ঠিক হয় কি না?—(এই বলিয়া পার্শ্বস্থ ছবিটির মত আঁকিল)। মনে করুন (গ) গুড়গুড়ী; তাহাতে (জ) পর্যন্ত জল আছে। (ক) হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়গুড়ীর খোলের ভিতরেও (খ) পর্যন্ত নলচে আছে। ইহার উপরিভাগে (ক) কলিকে ও নিম্নের মুখ (খ) জলে কিছু দূর অবধি ডুবিয়া আছে। গুড়গুড়ীর

(প) ছিদ্রে (ন) নল লাগান আছে। তাহার অগ্রভাগে (ম) মুখ দিয়া টানিতে হয়।

আচ্ছা, এখন এই কলটির অবস্থা কিরূপ আগে দেখা যা'ক। (খ) মুখ খোলা থাকাতে (ন) নলের মধ্যে (প) পর্যন্ত সাধারণ বায়ুতে পূর্ণ। গুড়গুড়ীর ভিতরেও (জ) পর্যন্ত সাধারণ বায়ু রহিয়াছে। আবার (ক খ) নলিচাটিও সাধারণ বায়ুতে পরিপূর্ণ। কেবল উহার নীচের যতটুকু অংশ (জ) পর্যন্ত জলে ডুবিয়া আছে, ততটুকু অবধি জল আছে। অর্থাৎ (খ) হইতে (জ) রেখা পর্যন্ত নলচের ভিতর জল আছে।

নবীন বাবু।—ঠিক বলিয়াছ বল দেখি অমূল্য কেন নলিচার (খ জ) অংশের ভিতরটাও জলে পূর্ণ থাকিবে?

অমূল্য।—সেদিন ইহার কারণ শিখিয়াছি। সমস্ত (জ) রেখার উপর সাধারণ বায়ুর ভার থাকাতে এবং নলচের ভিতরেও সাধারণ বায়ু আছে বলিয়া, উহার ভিতরকার জলের উচ্চতাও ঐ (জ) রেখা পর্যন্ত হইবে। অর্থাৎ—

(১) নলিচার ভিতরে বায়ুর চাপ = সাধারণ বায়ুভার—প্রতি ইঞ্চি ৭॥ সের

(২) নলিচার বাহিরে (জ) রেখাস্থ জলের উপর বায়ুর চাপ = ঐ ঐ

সুতরাং নলিচার ভিতরেও জলের উচ্চতা (জ) রেখা পর্যন্ত। কারণ চাপের সমতা থাকিলে জলও সমান উচ্চ হয়।

মাখন।—ঠিক ঠিক! এইটুকু বুঝিলেই সব বুঝা যাইবেক। এইটুকু ইহার আসল কথা। আচ্ছা তারপর যখন (ন) নলের (ম)-তে মুখ দিয়া টানা যায়, তখন নলের ভিতরের বায়ু আকৃষ্ট হইয়া মুখে যায়। সুতরাং (ম) হইতে (জ) অবধি যে বায়ুভাগ, তাহা লঘু হইয়া যাওযাতে (জ) রেখাস্থিত জলের উপর তাহার ভার হ্রাস হইয়া যায়।

কিন্তু অপর দিকে (ক খ) নল্‌চের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুভারের সমানই আছে। অতএব কি হইল?

—না—

(১) নলিচার ভিতরের বায়ুর চাপ = সাধারণ বায়ুভার—প্রতি ইঞ্চি ৭॥ সের।

(২) নলিচার বাহিরে (জ) রেখাস্থ জলের উপর বায়ুর ভার = সাধারণ বায়ুভার অপেক্ষা কম।

অতএব নলিচার ভিতরে বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে তন্মধ্যে যে জলটুকু ছিল তাহা নীচু হইয়া নামিয়া আসিল। যেন ঐ নলিচার ভিতরের ভারী বায়ু ঐ জলটুকুকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিতে লাগিল। যেই নলিচার মুখ (খ) পার হইল অমনি নলিচার ভিতরের কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু গুড়গুড়ীর জলের মধ্যে প্রবেশ করিল ও বুড়্ বুড়্ বুড়্ বুড়্ করিয়া (জ) রেখার উপরে উঠিয়া আসিয়া তথাকার বায়ুতে মিশিয়া গেল। আবার নলের টান থামিবামাত্র (প জ) স্থানের বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুভারের (Atmospheric pressure) সমান হইয়া যায় এবং গুড়গুড়ীর ও নলিচার বায়ু ও জলের অবস্থা আবার পূর্ববৎ হয়।

নবীন বাবু।—ওরে মধু! তামাক দে যা।

মাখন।—এইরূপে প্রতি টানেই হইতে থাকে। প্রতিটানেই গুড়গুড়ীর ভিতরের (প জ) স্থানের বায়ু নল দিয়া আকৃষ্ট হইয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া আইসে ও তৎপরিমাণ বায়ু নলিচার

মধ্য হইতে জলটুকুকে তাড়া করিয়া গুড়গুড়ীর জল ভেদ করিয়া নলের ভিতর আসে।

এমন সময় মধু চাকর বাবুর গুড়গুড়ীতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। নবীন বাবু দুটি চক্ষু মুদিয়া নল টানিতে লাগিলেন। মাখনকে বলিলেন,—"এত হ'ল, তবে ধুঁয়া আসে কি রূপে?"

মন্মথ।—এ আর আশর্য কি দাদা বাবু!—মাখন দাদা যেরূপ বলিলেন ঐরূপে ক্রমে নলিচার ভিতরের বায়ু নল দিয়া মুখে আসিতে থাকে। কিন্তু নলিচার মুখে কলিকা ও তাহার ভিতর তামাক ও তদুপরি আগুন থাকাতে ; নলিচার ভিতর যে বায়ু যাইতেছে, তাহা কলিকার মধ্যস্থ তামাকের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঐ তামাকের উপর আগুন থাকায় উহার তেজে তামাকের রস ধুঁয়া হইতেছে ও সেই ধুঁয়া বায়ুর আকারে নলিচা হইতে জলের ভিতর দিয়া নলে ও তথা হইতে মুখে পহুঁছিতেছে।

নলিন।—এ বিষয়টা ত বেশ শিখিলাম। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দাদা বাবু বলিয়া দিন-না!

নবীন বাবু।—কি কথা?

নলিন।—আমার জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তামাক খাওয়ার উপকার কি? লোকে কি জন্য তামাক খায়? আমার ত তামাকের গন্ধ সহ্য হয় না, কাশি আসে, গা বমি বমি করে। আমি বুঝিতে পারি না কেন লোকে তামাক খায়।

নবীন বাবু।—এ কথা যদি জিজ্ঞাসা কর ত আমাকে লজ্জা পাইতে হইবে। কেন না, তামাক একটা নেশা বই আর কিছু নয়। তামাকের উপকার কিছু নেই বলিলেও হয়। অপকারিতা বিস্তর। তামাকে "নিকোটিন" নামে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, তাহাতে শরীরের অনিষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন তামাক খাইতে নানা আড়ম্বর, বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তামাকের কারণে নানাবিধ রোগেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। তামাক ভাল জিনিস নহে।

চন্দ্রনাথ।—তবে, দাদা বাবু, আপনি কেন তামাক খান? ইহার "নিকোটিন" বিষে ত আপনারও শরীর খারাপ করতে পারে?

নবীন বাবু।—আমরা বুড়া মানুষ, অনেক দিন অবধি অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট বা পরিশ্রমের পর এক ছিলিম তামাক খাইলে অনেকটা আরাম বোধ হয় এই মাত্র।

নগেন।—না দাদা মশাই তা হবে না। যা মন্দ তা আপনি কেন করবেন! তামাক খেলে যদি শরীর খারাপ হয়, ইহাতে যদি এত দোষ, তাহলে কেবল একটু আরাম বোধ হয়—কেবল অনেকদিনের অভ্যাস—বলিয়া আপনি খাইবেন, তাহা হইতে পারে না, আপনাকে তামাক খাওয়া ছাড়িতে হইবে।

সকলের অনুরোধে শেষে নবীন বাবু পরাস্ত হইলেন। এই নায্য অনুরোধ তাঁকে শুনিতে হইল। সেইদিন অবধি তিনি তামাকু সেবন করা পরিত্যাগ করিলেন। বালকগণ পরমাহ্লাদিত হইয়া দাদা বাবুর প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ী গেল।



২২



জ শনিবার। সন্ধ্যাকালে নবীন বাবু বালকগণকে সঙ্গে লইয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন, পথে নানাবিধ গল্প ও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সূর্য অস্তগত-প্রায়, পশ্চিমদিকের আকাশ সুন্দর রক্তিমাবর্ণে কেমন শোভা পাইতেছে, গো মেষ মহিষ ও ছাগদল গোষ্ঠ-বিহার করিয়া মনের আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে গৃহে চলিয়াছে নবীন বাবু ও তাহার বালকবৃন্দ প্রফুল্ল অন্তঃকরণে মৃদু মন্দ গতিতে গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।

অনতিদূরে কিসের গোলমাল শুনা গেল। চাহিয়া দেখেন পূর্ব দিকেও যেন সূর্যাস্ত হইতেছে এমনি প্রকাণ্ড উজ্জ্বল আলোক। মাঝে মাঝে ঐ দূরতা ভেদ করিয়া যেন আগুনের হলকা আকাশে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সকলে দ্রুত গতিতে যে দিক হইতে অগ্নি দেখা দিতেছিল সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অল্প দূরে গিয়াই বুঝিলেন যে রামসুন্দর বাবুর বাগানের কুঠিতে আগুন লাগিয়াছে।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে অগ্নি খুব প্রজ্বলিত। কেরোসিন তৈলের টীনে আগুন লাগিয়া তাহাতেই এ গৃহ জ্বলিয়াছে। দেখিলেন চারিদিক হইতে বিস্তর লোক কলসী ও ঘড়া করিয়া জল দিতেছে এবং নিকটস্থ থানা হইতে দমকলও আনান হইয়াছে—সম্মুখের পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া গৃহের জ্বলন্ত দরজা জানলাতে দেওয়া হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই অগ্নির প্রকোপ কমিয়া আসিল পম্পের সাহায্যে অধিক ক্ষতি হইতে পারিল না। শুধু কলসী করিয়া জল দিয়া এ অগ্নি নিবান যাইত না। পম্পের দ্বারা দূর হইতে সজোরে জ্বলন্ত স্থানে জল নিক্ষেপ করিয়া অতি সহজেই আগুন নিবা'ন হইল। গৃহসামগ্রীও অধিক নষ্ট হইতে পাইল না।

যতক্ষণ নবীন বাবু গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার সঙ্গের বালকগণ ততক্ষণ কেবল পম্পের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জল তোলা দেখিতেছিল। এক চিত্তে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল কেমন করিয়া জল উঠে। কিন্তু ভিতরের কল কিরূপ জানিতে না পারায় তাহার কৌশল কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাটী যাইবার সময় নলিনী দাদা বাবুকে বলিল :—"ঐ কলটাতে কিরূপে জল উঠিতেছে জানিতে পারিলাম না। ইহার কৌশলটা শিক্ষিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

নবীন বাবু।—বাঃ! যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত! আমার বন্ধুর ঘর পুড়িয়া গেল, তোমরা বুঝি তাহাতেও আপনাদের শিক্ষার ফিকিরে আছ? ভাল ভাল। এইরূপ যত্ন না হইলে কোন কাযই হয় না। চল, এখন বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বাড়ী গিয়া বুঝাইয়া দিব।

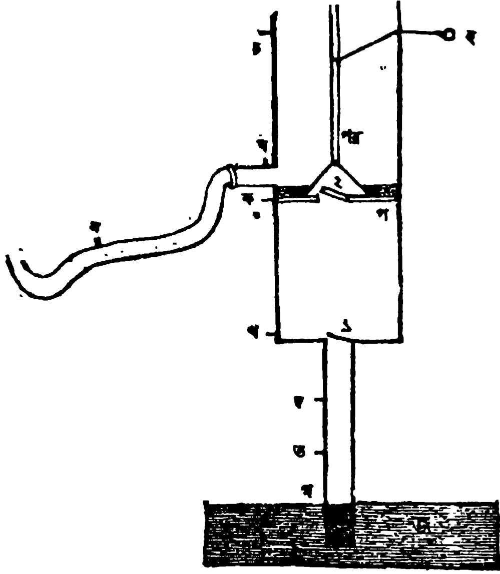
অমূল্য।—দাদাবাবু আমার কিন্তু বোধ হইতেছে এ বিষয়টী আমাদের পক্ষে বেশী কঠিন হইবে। কলকারখানা বুঝিতে পারা এঞ্জিনীয়ার না হইলে হয় না। এখনও আমরা এত বেশী শিখি নাই যে এ কলের ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। তাই আমি ভাবিতেছিলাম যে এখন আপনাকে কষ্ট দিব না।

নবীন বাবু।—অবশ্য এ সব কলকারখানার নিগূঢ়তত্ত্ব যে তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে, তাহা অসম্ভব। তবে যেমন মোটামুটি রূপে গুড়গুড়ীর কল ও ধূঁয়া মুখে আসিবার কারণ

বুঝিতে পারিয়াছ, তেমনি মোটামুটি ভাবে, দমকলে কেন জল উঠে তাহাও বুঝিতে পারিবে। পরে যখন কলেজে বড় বৈ পড়িবে, তখন স্পষ্টরূপে এ তত্ত্ব অবগত হইবে।

তখন সকলে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ভয়ানক ব্যাপার সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে বাড়ীতে আসিয়া পহুঁছিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ঠাকুরদাদা মহাশয় পাঠাগারে বসিয়া দমকলের মর্ম বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন বাবু।—নীচের ছবিটিতে (জ) জল। তাহার মধ্যে দমকলের নিম্নের নল (খ গ) গিয়াছে। উপরের নলটী (চ খ) কিছু বেশি মোটা। এই দুই নলের মাঝখানে একখানি ছোট কব্জাদার কপাট লাগান (১)। উহা এমনভাবে লাগান যে উপর দিকে উঠে, নীচের দিকে নামে না। ইহাকে "ভালভ্" (valve) বলে। ইহা অতি লঘু। সুতরাং নীচের দিক হইতে অল্প বল প্রয়োগ করিলেই উপরে উঠিয়া যায়। কিন্তু উপরিভাগ হইতে যত বল প্রয়োগ করা



যায়, ততই আরো শক্ত হইয়া বন্ধ হয়। আর খুলে না। (প) একটী 'পিষ্টন"* ইহা-- (প র) "পিষ্টন-রডে' সংলগ্ন হইয়া উপরের নলে (ক) হইতে (খ) পর্যন্ত একবার নামে ও আবার উঠে। (হ) হাতল দ্বারা এই পিষ্টন নামান ও উঠান হয়। এই পিষ্টনের মধ্যস্থলে (২) নম্বর একটী কব্জা লাগান দ্বার বা "ভালভ্' আছে। আজও (১) নম্বর ভালভের ন্যায় নীচে হইতে উপরে খোলে, উপরে বল প্রয়োগ করিলে কসিয়া বন্ধ হইয়া যায়। (খ) জল বাহির হইবার পথ। যখন বার বার (২) হাতল দ্বারা (প) পিষ্টনটীকে (ক) হইতে (খ) পর্যন্ত ভিতরে

* পিচকারির ভিতরে জল উঠিবার ও সজোরে ঐ জল ছুড়িয়া দিবার কৌশল সকলেই জান। গোড়ার দিকে একটী হাতল থাকে, তাহাতে একটী লোহার কাঠী লাগান থাকে। ঐ কাঠীতে পিচকারির নলের ভিতর একখানি টীনেব চাক্তি লাগান থাকে। এই টীনেব চাক্তির দ্বারাই জল ঠেলিয়া দেওযা হয এবং ইহা টানিলেই জল উঠে। এই চাক্তিখানি পিষ্টন ও কাঠীর নাম পিষ্টন-বড (Piston-rod)-এ দৃষ্টান্তে সহজে বুঝিতে পাবিবে।

দিয়া ক্রমে ক্রমে (ঘ) পর্যন্ত উঠাইয়া পরে নামান ও উঠান যায়, তখন নিম্নস্থ জল নলের বাহিরে আসে। তখন (ন) চামড়ার নলে করিয়া যত দূরে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়।

দমকলের মোটামুটী কল কৌশল এই। জল উঠিবার নিয়ম ও কারণ এই :—সর্বপ্রথমে মনে কর (প) পিষ্টনটী (খ)-তে আছে। তখন (জ) জলের উপরিভাগে সাধারণ বায়ুভার ; (খ গ) নলের মধ্যেও জলের উচ্চতা বাহিরের জলের সহিত সমান ; অর্থাৎ (গ) রেখাতে, আচ্ছা, এখন (প) পিষ্টনটী হাতলের দ্বারা উঠাও। যেন (ক) পর্যন্ত উঠিল। উঠিবার সময়ে (২) নম্বর দ্বারা উপরের চাপে বন্ধই থাকে কিন্তু নীচে কি হয় দেখা যাউক। (প) পিষ্টন উপরে উঠিবার সময়ে (ক খ) স্থানের বায়ু লঘু হইয়া যায় এবং উহার চাপ খুব কম হয়। এদিকে (খ গ) স্থানে নলের ভিতর সাধারণ বায়ু আছে বলিয়া তথাকার বায়ুর চাপ (ক খ) স্থানের অপেক্ষা বেশি। সুতরাং (১) নম্বর দ্বার নীচের বায়ুর জোরে উপরের দিকে একটু খুলিয়া যায় ও তন্মধ্যে দিয়া (খ গ) স্থানের বায়ু (ক খ) স্থানে প্রবেশ করে।

তাহার ফলে এই হয় যে, (খ গ) অংশের বায়ুর লঘু হওয়াতে তাহার চাপ হ্রাস হইয়া যায়। আবার জলাশয়ের উপরিস্থ বায়ু সাধারণ চাপ অপেক্ষা (খ গ) অংশের বায়ুর চাপ কম হওয়াতে (গ) স্থানের জল (গ খ) নলের উপর কিছু দূর উঠিয়া গেল। মনে কর যেন (৩) রেখা অবধি উঠিল।

তারপর হাতল ধরিয়া পিষ্টনটা নামাও। (ক) হইতে ক্রমে (খ) অবধি নামিয়া আসিবার সময় কি হয় দেখা যাউক। ১ম :—(ক খ) স্থানের বায়ুর চাপে (১) নম্বর দ্বার পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাইবে ও (খ ত) স্থানের বায়ুর চাপ সমভাবে থাকাতে (খ গ) নলে (ত) পর্যন্ত জল পূর্ববৎ থাকিবে। ২য় :—পিষ্টন যত নামে, স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতে (ক খ) স্থানের বায়ু ঘনীভূত হইয়া উহার চাপ বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই (২) নম্বর দ্বার নীচের চাপে উপর দিকে একটু খুলিয়া যায় ও তাহার ভিতর দিয়া ঐ বায়ু বাহির হইয়া যায়। অবশেষে পিষ্টন (প) নীচে নামিয়া আসিয়া (খ) রেখাতে মিলিত হয়।

সুতরাং তোমরা দেখিতেছ যে পিষ্টন (খ) হইতে উঠিবার সময়ে (খ ক) স্থানের বায়ু উপরে তাড়াইয়া দিয়া (খ গ) স্থলের বায়ু (১) নম্বর দ্বার দিয়া উপরে আকর্ষণ করিয়া লইল ও তাহার ফলে জলাশয় হইতে (৩) অবধি জল উঠিল।

আবার পিষ্টন নামিবার সময়ে (ক খ) অংশের বায়ুকে (২) নম্বর দ্বার দিয়া উপরে গড়াইয়া দিয়া পুনরায় (খ)-তে আসিয়া পহুঁছিল। (৩) স্থানের জল (১) নম্বর দ্বার বন্ধ থাকাতে নামিতে পারিল না।

এইরূপে হাতল ধরিয়া আবার পিষ্টনটাকে (ক) পর্যন্ত উপরে উঠাইয়া দাও। তাহাতে এই হইবে যে পূর্বের মত (৩) স্থানের জল (দ) পর্যন্ত উঠিবে আবার পিষ্টন নামিবার সময়ে (১) নম্বর দ্বার বন্ধ হইবে ও জল ঐ (দ) পর্যন্ত থাকিয়া যাইবে। পিষ্টন আবার উঠাও আবার নামাও! এইরূপ করিতে করিতে যখন জল (১) নম্বর দ্বারে পহুঁছিবে তখন উহা খুলিয়া যাইয়া জল তাহার উপরে (খ ক) নলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এবার যখন পিষ্টন নামিয়া (খ)-তে পহুঁছিবে তখন (২) নম্বর দ্বার দিয়া (ক খ) নলের মধ্যস্থ জল (প) পিষ্টনের উপরে উঠিয়া পড়িবে।

তৎপরে যখন পিষ্টন আবার (ক) পর্যন্ত উঠে, তখন কাযেই ঐ জল (ঘ) মুখ দিয়া

দমকলের বাহির হয়। তখন চামড়ার নল (ন) দিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতে পার। রাস্তায় জল ছাড়াও, ঘরে আগুন লাগিলে তাহা নিবাও, যেরূপ চাও, কর।

এইরূপে পুনঃপুনঃ হাতল ধরিয়া তোলা ও নামানতে যখন (ক খ ও খ গ) সমুদয় স্থল বায়ুশূন্য ও জলপূর্ণ হইবে, তখন হু হু করিয়া কেবলই জল বাহির হইবে।

মাখন।—অতি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি। দাদাবাবু, আমার ইচ্ছা হইতেছে, একটা এইরূপ পম্প তৈয়ার করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি।

বালকগণ।—ঠিক, ঠিক। দাদা বাবু আপনি যদি রামচরণ টীনওয়ালাকে বলিয়া দেন, ত সে ঐ রকম যন্ত্র গড়িয়া দিতে পারে।

নবীন বাবু স্বীকার করিলেন ও বলিলেন যে এইরূপে সব কাজ নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বড় উপকার হইবে, সেদিন রাত্রি বেশী হইয়াছিল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৯১-৯৪। ১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১০৮-১১১। ১ : ৮ : অগাস্ট ১৮৮৩, পৃ. ১২২-১২৫। ১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৩৪-১৩৮। ১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৬১-১৬৫। ২ : ১ : জানুযাবী ১৮৮৪, পৃ. ৭-১০। ২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪. পৃ. ৩৪-৩৭। ২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৮৮-৯০। ২ : ৮ আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২২-১২৫। ২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৫, পৃ. ১৫২-১৫৬। ৩ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৫, পৃ. ১৩-১৬। ৩ : ৩ : মার্চ ১৮৮৫, পৃ ৩৪-৩৮। ১০ : ১২ · ডিসেম্বর ১৮৯২, পৃ. ১৮১-১৮২। ১১ : ৩ : মার্চ ১৮৯৩, পৃ. ৪২-৪৫।

সর্পের ঔষধ

প্রমদাচরণ সেন



মরা মার্চ মাসের 'সখা'তে বলিয়াছি কিরূপ সতর্ক হইলে সাপের ভয় অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু সাপে কামড়াইলে কি করা উচিত, তাহা এ পর্যন্ত লিখি নাই। মার্চ মাসে যে সর্পের চিত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহা বিষাক্ত নহে অর্থাৎ তাহারা কামড়াইলে বিষ লাগে না। কিন্তু অদ্য যে চিত্রটী দিলাম, এই দলের সাপ বড় ভয়ানক! দেখিয়াছ, কি ভয়ানক ফণা ধরিয়াছে! আমরা আজিও সাহসের সহিত বলিতে পারি না, সর্পাঘাতের যথার্থ ঔষধ আছে কি না। তবে অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যতগুলি ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তাহা নীচে লিখিয়া দিলাম—আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমাদের কিন্তু সব গুলিতে বিশ্বাস হয় না।



১. একুশটী গোলমরীচের সহিত শ্বেত দূর্বার শিকড় বাটিয়া খাইলে সাপে কাটা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

২. যেখানে সাপে কাটিবে. তাহার একটু উপরে খুব শক্ত করে দড়ি বা সূতার দ্বারা তাগা বাঁধিবে। তাহার পর লোহা গরম—লাল—করিয়া সেই স্থানটি পোড়াইয়া দিবে।

৩. পূর্বের মত তাগা বাঁধিবে। তাহার পর মোরগের একটী শিরা কাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে ; এই রূপ একটীর পর একটী ক্রমাগত লাগাইতে থাকিবে, যখন দেখিবে শেষ মোরগটী মরিল না, তখনই জানিবে বিষ গিয়াছে।

৪. সাপুড়িয়ারা একটী ঔষধ বলিয়া থাকে ; চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন ফল-ধরে-নাই-এমন বেলগাছের উত্তরমুখী একটা শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিয়া রাখ। এই শিকড় সাপের যম। আমরা সংক্রান্তি, উত্তর দক্ষিণ, বা—এক নিশ্বাসের কথা কিছুই জানি না। তবে বেলের শিকড়ে সাপের ভয় আছে তাহা জানি। বোধ হয় ইহাতে ঔষধেরও কাজ করিতে পারে।

১ : ৭ : জুলাই, ১৮৮৩, পৃ. ১০৪-১০৫।

সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে

কালীকৃষ্ণ দত্ত



ক দিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটির পর আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহাদের মধ্যে কেহ শীঘ্রই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আসিত তাহারা যথাসময়ে পরিবার-বর্গের সহিত একত্র আহার করিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটী বালকের ও আর একটী বালিকার বাড়ী অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্বতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত। কিন্তু তাহারা অতি খারাপ দিন ছাড়া অন্য কোনদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহাদের মাতা নলিনের মত সৎ ও সতর্ক বালকের হস্তে ক্ষুদ্র ভগিনী কুন্দকে নিরুদ্বেগে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত তাহা হইলে নলিন আপনার জামার দ্বারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর লাগিয়া কুন্দের ক্ষুদ্র পা দুটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেই স্থানে নলিন প্রিয়ভগিনীর হাত দুটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তাহাদের একটী ছোট খাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুন্দকে পিঠে করিয়া সেই খাল পার করিয়া দিত। এদিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাই ভগিনীকে পাঠের সময় ছাড়া প্রায় কখনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত অন্য বিদ্যালয়ে পড়িত। ছুটী হইলে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা লাফাইতে লাফাইতে হাসিতে হাসিতে, দুজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আজ বৈকালে নলিন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য হইল যে কুন্দের আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের স্কুলের দিকে আসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। হাত দুটী ধরিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "প্রিয় ভগিনি। আজ তোমার কি হইয়াছে?" নলিনের এই কথা শুনিয়া কুন্দমালা সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু সে এত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে ছিল যে নলিন তাহার একটীও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কতকগুলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা-বিদ্যালয়ের একটী বড় মেয়ে কুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই দিন প্রাতে

কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটী ছোট চক্‌চকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অবশ্য সেই পাত্রটী দূরে রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু ছুটির পর কুন্দমালা সঙ্গিনীদিগকে দেখাইবার জন্য তাহা বাহিরে আনিল এবং বিদ্যালয়ে যাইবার পথে একখানা বেঞ্চের উপর রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড় পরিতেছিল, অমনি ভূপাল নামে একটী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া অভদ্রভাবে উহা কাড়িয়া লইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল ; এমন কি তাহার হাত ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল যে সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ দুষ্ট বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "না, নিবনা বইকি? আমার খুসী আমি একশবার নিব!" অন্যান্য বালক বালিকারা যদি ঐ দুষ্ট বালকের রাগ থামা পর্যন্ত তাহাকে কিছু না বলিত, কিম্বা বেশ বুঝাইয়া দু একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি! ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এই রূপ করাতে ভূপালের আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে সে ভাঁড় মাথার উপর করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া, বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটীর ভাঁড়টী দেয়ালে আছাড় মারিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল "কেমন কুন্দ এইবার আসুক না, আর ভাঁড় নিয়ে যাক না।" বলা বাহুল্য যে সাধের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের দুঃখের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া দুজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসাহাসি মুখখানি আজ বড় দুঃখে ভার হইয়াছে, কুন্দের দুঃখে নলিনের ভয়ানক দুঃখ হইয়াছে। বালিকার ঘিন্‌ঘিনে স্বভাব ছিল না, শীঘ্রই পথের ধারের বনফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভুলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অর্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় তাহাদের সহিত নলিনের একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, আমি কাল স্কুলে যাইব।" নলিন হেঁটমুখে বলিল "তা বেশ!"

দেবনাথ বলিল, "কেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্ষ ও গম্ভীর দেখাইতেছে কেন? তুমি কি আজ স্কুলে কোন লজ্জায় পড়িয়াছিলে?" নলিন বলিল "তা না। কিন্তু ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে?' দেবনাথ বলিল, "ভূপালের অতিশয় অন্যায় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার দুঃখিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি সে আমার অপেক্ষা বলবান না হইত তাহা হইলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যখন তাহা পারিতেছি না, আমি হয় তাহার নূতন লাঠিম ভাঙ্গিয়া দিব না হয়—" দেবনাথ বলিল, "এ! থাম, থাম। তোমার এ প্রকার বলা বা এমন কি ভাবাও উচিত নহে। তুমি কি জান না ইহাকেই প্রতিশোধ লওয়া বলে অর্থাৎ খারাপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় কিন্তু আমাদের খারাপ ব্যবহার করা? কিন্তু আমাদের কি করা উচিত? আমাদের অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করা উচিত?" নলিন বলিল, "কেন আমরা স্কুলে কিছু দোষ

করিলে শিক্ষক মহাশয় ত আমাদিগকে শাস্তি দেন।" দেবনাথ উত্তর করিল "বটে ; কিন্তু আমাদিগকে সেই কার্য হইতে ভাল করিবার জন্য ; কিন্তু তুমি ভূপালের শিক্ষক নও ; আর তা ছাড়া তুমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাও, কারণ তোমার মনে একটী খারাপ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই 'প্রতিহিংসা' বলে।" নলিন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল ; পরে বলিতে লাগিল, "ভূপাল যদি আমার কোন অপকার করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম ; কিন্তু হায় আমার ভগ্নী কুন্দ! আহা! তার ক্ষতি করিল কেন? আমি কাহাকেও কুন্দকে কষ্ট দিতে দিব না।" দেবনাথ বলিল "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাঠিম ভাঙ্গিয়া দাও, তাহা হইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি এরূপ আর কাহারও প্রতি দয়ালু হইতে বা মৃদু ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? আমার পিতা সে দিবস বলিতেছিলেন, আমাদের প্রিয়জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাসা বড়ই শক্ত কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা দেওয়া উচিত।" নলিন প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার বোধ হইতেছে যেন ভূপালকে ক্ষমা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" দেবনাথ বলিল, "ভাল, তোমার এই যে সৎইচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাক। যাহার ইচ্ছা ভাল ঈশ্বর তাহার সহায়'—এই কথা বলিতে বলিতে দেবনাথ পথের এমন স্থানে উপস্থিত হইল যেখান হইতে তাহার যাইবার পথ অন্যদিকে ফিরিয়াছে। অতএব নলিনকে বলিল "এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।" নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুন্দও পথ পার্শ্বস্থ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইয়ের হাত ধরিয়া অবশেষে দুজনে গৃহে পৌঁছিল। বাড়ী আসিয়াই কুন্দ মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল এবং তাঁহাকে মাটীর ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন খানিকক্ষণ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি? সে কি এখন কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নষ্ট করিবে তাহা ভাবিতেছে? না, কি রূপে সে নিজের রাগ থামাইবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দের শর্দি হওয়াতে স্কুলে যাইতে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটী বালক কাঁদিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই বালক আর কেহই নয় আগেকার চেনা লোক— ভূপাল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যখন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তখন সে কিছু না বলিয়া অমনি মুখ নামাইল। নলিন পুনরায় মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ভূপাল! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল তোমার কি হইয়াছে।" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি অতিশয় ক্ষুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জ্বরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্যন্ত কিছুই খাই নাই।" নলিন বলিল, "দুর্ভাগা বালক, আহা, তুমিত ক্ষুধিত হইবেই! আমার সহিত একখানা ভাল রুটি আছে আমি উহা তোমাকে দিতেছি।" ভূপাল বলিল, "এই রুটী তোমার নিজেরই আবশ্যক হইবে, ইহা তোমার সকাল বেলার খাবার।" নলিন ক্ষুদ্র একখণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া অপরখণ্ড ক্ষুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত তথাপি তাহার মনটী নিতান্ত মন্দ ছিল না। এই জন্য নলিনের এই দয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে

বলিল "আমি তোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিলে আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগ্য নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি আর কখনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপাল বলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।"

সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপাল তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল ; আর কখনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা শুনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকাদিগের প্রতিও সে আর কখন অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সেই দিন হইতে সে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলায় খরচ করিবার জন্য একটী সিকি পাইয়াছিল। তখন সে আর কিছু না কিনিয়া কুন্দের সেই ভগ্ন ভাণ্ডের মত আর একটী ভাঁড় কিনিতে সেই সিকি খরচ করিল। নলিন যে দেবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার উপদেশ মত কার্য করিয়াছিল ইহা কি নলিনের পক্ষে ভাল হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। প্রতিহিংসা বা রাগ হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। অপরে করুক না করুক আমরা যেন কখনও কর্তব্য কার্য হইতে বিমুখ না হই।

১ : ৭ · জুলাই ১৮৮৩, পৃ ১০৫-১০৮।

আমরা এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থানে বদলিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধ-প্রেরকের প্রতি অনুরোধ, ভাষার দিকে এবং প্রবন্ধের আকারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। সখা-সম্পাদক।

"না, আমি প্রতারণা করিব না"

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



মাদের 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত বিষয়টী আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের কিরণবালার বয়স ৯ বৎসর মাত্র, তাহার দাদা নগেন ১৪ বৎসরের। কিরণ জুন মাসের "সখা" পড়িয়া তাহার ধাঁধা গুলির উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে পাঠাইবে বলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় নগেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল "কি কর্চ্ছ, কিরণ?" কিরণ বলিল "দাদা অলকাসুন্দরী নামে এক সদাশয়া রমণী ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার মধ্যে যে অধিক সংখ্যক হেঁয়ালির উত্তর ঠিক করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বৎসরান্তে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন, তাই আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি কয়টী পারি—লিখিয়া পাঠাইব।" নগেন হাসিয়া নিকটে গিয়া বলিল "আয় আমি তোকে সব বলিয়া দিতেছি ; আমি পরশু পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সমস্ত বলিয়া লইয়াছি। বেশত তাহলে তুমিই ৫৲টী টাকা পাইয়া যাইবে ; কেমন?" কিরণবালা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি! ছি! দাদা! তোমার এমন মন্দ বুদ্ধি? পরের নিকট বলিয়া তাতে কি ফল হইল? তাহাত প্রতারণা হইল? আমি কি এমনি নীচ? না আমি প্রতারণা করিব না।" নগেন বলিল—"সখার লেখক ত আর দেখিতে আসিতেছে না।" কিরণ আরও রাগিয়া বলিল নাই বা তিনি দেখিলেন, আমি নিজে ত জানিতে পারিলাম যে কাজটা অন্যায়? সর্বদর্শী ঈশ্বর ত জানিলেন, তার চেয়ে

কি সখার সম্পাদক? ছি দাদা! তুমি কি এই শিখিতেছ? এতে ৫ৎ টাকা চুরি করাই হইল। আমি তাহা কখন পারিব না। কেন, টাকার অভাব কি? মাকে বলিলে এখনি ৫ৎ টাকা লইতে পারি। কেবল ক্ষমতার পরীক্ষা ও উন্নতি বিধানের জন্যই না পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে? আর যদিই টাকার অভাব থাকে, তথাপি চরিত্রে এমন ভয়ানক দোষ পড়িয়া টাকা লওয়া কি ভাল? টাকা আগে না চরিত্র আগে? চল দেখি মার কাছে যাই,—তিনি কি বলেন শুনিবে?”

তখন নগেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল “তবে তুমি কি লিখিয়াছ দেখি?” কিরণ তাহাতেও সম্মত হইল না ; বলিল “না আমি তাহাও করিব না। আমি তোমাকে দেখাই আর তুমি বল ‘এইটা ভুল হইয়াছে’ আবার আমি চেষ্টা করিয়া লিখিব। সেও ত তোমার সাহায্য লওয়া হইবে। তাহাও এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য নহে। আমি তোমার সাহায্য লইব না। আমার নিজ বুদ্ধিতে যা আসে সাধ্যমত চেষ্টা করিব : যাহা পারিব, লিখিয়া পাঠাইব ; তুমি যাও।”

তাহাদের পিতা অন্তরাল হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিরণকে কোলে লইয়া পরমানন্দে মুখ চুম্বন করিলেন ও ৫ৎ টাকার একখানি নোট তখনি তাহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে দিলেন। সেই অবধি নগেনেরও জ্ঞান হইল। সে আর কখন ওরূপ কার্য করে নাই।

আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর “সখা”র প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এইরূপ চরিত্র বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করুন। তাঁহাদের জনক জননী ও অভিভাবকগণও যেন তাঁহাদের এই হিত ইচ্ছা বাড়াইতে যত্ন করেন, নতুবা বালক বালিকাদিগের চরিত্র-রত্ন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবেক।

১ : ৮ : আগস্ট ১৮৮৩, পৃ ১১৫-১১৬।

আমার কপাল মন্দ

বিপিনবিহারী সেন


মরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে বৃদ্ধ, যুবা, বালক, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই যখন কাহারও অবস্থা ভাল দেখেন তখনই তাহার কপাল ভাল ও নিজের কপাল মন্দ বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহারা জগদীশ্বরকে কতই নিন্দা করেন ; তাঁহারা বলেন তিনি পক্ষপাতী! আবার যখন কেহ কোন কার্যে অকৃতকার্য হয়, তখন নিজের কার্যের ভুল বাহির করিতে না যাইয়া কপাল মন্দ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই “কপাল মন্দ” বাক্যটা ব্যবহার করিয়া অনেক বালক কোন কার্যে অকৃতকার্য হইয়াও সন্তুষ্ট থাকেন এবং অন্যের অবস্থা ভাল দেখিয়াও নিজের অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করেন না। আমরা যাহার “কপাল মন্দ” তাহার কপাল কি করিয়া ভাল হয় তাহা সারদার উপদেশ হইতে জানিব।

এক দিবস সারদা ও তাঁহাদের গ্রামের একটী বালক সন্ধ্যার সময় বেড়াইতেছেন। বালকটীর নাম রাসবিহারী। রাসবিহারী বলিল :—

“ভাই। আজ চারি বৎসর হইল গোপালের সহিত একত্রে একই স্কুলে পাঠ করিতেছি। গোপাল প্রত্যহ গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে, আবার গাড়ি চাপিয়া বাড়ী যায়। আমরা রৌদ্রের

মধ্যে এক মাইল হাটিয়া স্কুলে যাই আবার রৌদ্রের মধ্যে বাটীতে আসি। আবার দেখ তাহার কপাল কেমন ভাল—সে ভাল পুরস্কার পায়। ভাই! যাহার কপাল মন্দ তাহার কিছুই হয় না। না?”

সারদা—তুমি কি কোন দিন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ?

রাসবিহারী—না ভাই। আমি প্রত্যেকবার পরীক্ষার একমাস পূর্বে আমাদের পাড়ার গণকের নিকট পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে আমি পরীক্ষায় বেশ করিব। কিন্তু সময়ে কিছুই হয় না।

সারদা—আমি গোপালকে বেশ জানি। তোমার মনের ভাব ও তাহার মনের ভাব এক নহে। তুমি ভবিষ্যৎ ফল জানিবার জন্য গণকের নিকট যাও, গোপাল তাহা করে না। সে জানে যে গণক নক্ষত্রের অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যের ভবিষ্যৎ ফল বলে, কিন্তু তাহার নিকট মনুষ্যই তাহার নিজ নক্ষত্র সুতরাং সে জন্য গণকের নিকট যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের নক্ষত্র কি? যখন দেখিব যে মনুষ্য পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, যখন দেখিব যে মনুষ্য অধ্যবসায়ী, যখন দেখিব যে, তাহার ইচ্ছা সৎ, তখনই জানিলাম যে তাহার নক্ষত্র ভাল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। শ্রম, অধ্যবসায় এবং সৎ ইচ্ছাই যাহার নক্ষত্র তাহারই ‘কপাল ভাল’ হয়, আর যাহার নক্ষত্র কেবল গণকের পুস্তকে লিখিত তাহারই কপাল মন্দ তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি গণকের নিকট যাইয়া শুনিলে যে তোমার পরীক্ষার ভাল ফল হইবে অমনি তুমি নৃত্য করিতে করিতে বাটীতে আসিলে এবং পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধটুকু ছিল তাহা দূর করিলে। এদিকে দেখ গোপাল দেখিল যে তাহার নক্ষত্র তাহার নিজের শ্রম এবং অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে সুতরাং সে পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আরও দৃঢ় করিয়া লইল। এক্ষণে বল দেখি পুরস্কার কে পাইবে?

রাস।—তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝিলাম। তোমার কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গোপাল অতি নির্বোধ। সে এত পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিল, যদি ঘটনাক্রমে ব্যারাম হইয়া পুরস্কার না পায় তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। আর পুরস্কার পাইবে এমনই বা কি কথা?

সারদা—এ প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে আমি তোমাকে অন্য একটি কথা বলিব। কৃষক অতি যত্ন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিল ; রৌদ্রে বৃষ্টির মধ্যে কত কষ্ট সহ্য করতঃ সে চাস করিয়া বীজ বপন করিল। কৃষক কি এই সমুদয় কার্য করিবার সময় নিশ্চয় করিয়া জানিত যে সে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে প্রচুর পরিমাণে শস্য আনিয়া গৃহে স্তূপাকার করিয়া রাখিবে? হইতে পারে অতি-বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি বশতঃ তাহার শস্য নষ্ট হইল এবং তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। কিন্তু গোপাল পুরস্কার লাভের জন্য পরিশ্রম করিল ; সে যদি পুরস্কার লাভ করিতে অক্ষম হয়, তবে যে বিদ্যা লাভ করিল তাহাই তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার। সুতরাং পরিশ্রমের পুরস্কার হইবেই হইবে। মনে রাখিও।

“যে অলস সে দরিদ্র, যে পরিশ্রমী সে ধনী” গোপাল গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে আর গাড়ী চাপিয়া বাড়ী যায় কি করিয়া? তাহার পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিশ্রমী ছিলেন তাই তাঁহারা পরিশ্রমের ফলে ধন পাইয়াছেন তাই আজ গোপালের সুখ। আবার দেখ গোপাল যে রকম পরিশ্রমী সেও সম্ভবতঃ কালে ধনী হইবে এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণ সুখে দিন কাটাইবে,

"কপালমন্দ" বলিয়া তুমি যদি এই প্রকার উৎসাহহীন হও, তোমার সন্তানগণ তোমার ন্যায় গোপালের সন্তানদের অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিবে। শ্রমী যে ধনী হয় ইহার অর্থ কেবল টাকা সম্বন্ধে নহে, আরও অনেক আছে তাহা কালে বুঝিবে।

গোপাল যদি প্রথমবার পুরস্কার না পায়, তবে সে পরিশ্রম করিতে বিরত না হইয়া, বরং নূতন উৎসাহের সহিত কার্য করে। কোন কার্যে যদি প্রথম অকৃতকার্য হও তবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিও না। "Try again" "পুনর্বার চেষ্টা কর" এই নীতি বাক্যটী সর্বদা মনে রাখিও। স্কটলাণ্ড দেশীয় কোন বীর পুরুষ স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য একবার, দুইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। এক দিবস তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একটী পোকা প্রাচীরের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পোকা যদি তৃতীয়বারের চেষ্টায় সর্বোচ্চ স্থানে উঠিতে পারে, তবে আমিও তৃতীয়বার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি না পারি তবে জন্মের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। পোকা তৃতীয়বার কৃতকার্য হইল। বীরপুরুষও তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তৃতীয়বার মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং কৃতকার্য হইলেন। তিনি পোকার নিকট হইতে যে মহৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

রাসবিহারী! এখন দেখিতে পাইলে যে কপাল ভাল করিবার জন্য শ্রম এবং অধ্যবসায়ের আবশ্যক? কিন্তু আরও কয়টি বিষয়ের আবশ্যক আছে। ইউরোপীয় কোন সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে যে সমুদায় উপদেশ পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিব। এই সমুদায় উপদেশ পালন করিও—দেখিবে তোমার মন্দ কপাল শীঘ্রই ভাল হইবে এবং তুমিও কালে পুরস্কার পাইবে। উপদেশগুলির মধ্যে এই কয়টী বিষয় নিতান্ত আবশ্যকীয়।

১। অতি ভোজন পরিত্যাগ কর।

২। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এইরূপ কথা কহিও। সামান্য গল্পাদি পরিত্যাগ কর।

৩। দ্রব্য সকল যথাস্থানে স্থাপন কর ; প্রত্যেক কার্যকে উপযুক্ত সময় দাও।

৪। যে কার্য সম্পাদন করিবে বলিয়া ভাবিয়াছ তাহা করিতে প্রতিজ্ঞা কর। যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা কার্যে পরিণত করিতে বিরত হইও না।

৫। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এরূপ কার্যে অর্থব্যয় কর অর্থাৎ অপব্যয় করিও না।

৬। বৃথা সময় নষ্ট করিও না— কোন না কোন উপকারী কার্যে সর্বদা নিযুক্ত থাকিও। সমস্ত অনাবশ্যকীয় কার্য পবিত্যাগ কর।

৭। কাহাকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিও না। যাহার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করিতে আলস্য করিওনা।

৮। কোন কার্যের দাস হইও না।

৯। সর্বদা নম্র হইবার জন্য চেষ্টা কর।

১০। মনে খারাপ চিন্তা আসিতে দিও না।

১ : ৮ : আগস্ট ১৮৮৩, পৃ. ১১৭-১১৯।

পেঁচো চোরা কি?

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়


র্ব মঙ্গলা আমার দু বৎসরের ছোট। তাহার সহিত আমার বড় ভাব। সে আমার প্রতিবেশীর কন্যা; গ্রাম সম্পর্কে ভগিনী হইত। আমাদের বাড়ীর পাশেই তাহাদের বাড়ী; সেই জন্য দুজনে এক সঙ্গে রাত্রি দিন থাকিতাম, এক সঙ্গে বেড়াইতাম, একত্রে লেখাপড়া করিতাম; শয়ন ও ভোজন অনেক দিন এক সঙ্গেই চলিত। সে আমাকে বড় ভালবাসিত, এক দণ্ড না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিত না—আমার মনও ঠিক সেইরূপ হইত। ছেলেবেলা দুই জনে বড় আমোদে কাটাইয়াছিলাম। এখন আমি বা কোথায় আর মঙ্গলাই বা কোথায়! আমি এখন বিদেশে চাকুরী করি, মঙ্গলা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে, কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে, আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। ছেলেবেলার ভাল-বাসার পরিণামটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ী এসে পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মঙ্গলা আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, তাহার একটি ছেলে হইয়াছে,—আজ ছয় দিন। শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার আদরের সেই মঙ্গলার পুত্র, মনটা একেবারে গলে গেল—দেখিবার বড় ইচ্ছা হ'ল। আহারাদির পর তাহাদের বাড়ীতে গেলাম, গিয়া বলিলাম "খুড়ী মা—(মঙ্গলার মাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতাম) প্রণাম করি, আমি বাটি এসেছি, মঙ্গলার ছেলে হয়েছে, তা—আমাকে দেখাও।" খুড়ীমা তাড়াতাড়ি বাহিরে এলেন; "এস বাবা এস" বলে কত আদর করিতে লাগ্‌লেন। সাত রাজার ধন এক মাণিক পেলেও লোকের অত আনন্দ হয় না। আমার মন্‌টা বড় ভিজিয়া গেল, সহরে থাকি, সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে সত্য, কিন্তু এমন মিষ্ট করে মিষ্ট ভাষায় কেহ ডাকে না। তিনি আমাকে কোথায় রাখ্‌বেন, কোথায় বসাবেন তাহার স্থান খুঁজিয়া পান্ না। তার পর মঙ্গলা যেখানে ছেলে কোলে করে বসে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সে যায়গাটা দেখে আমার প্রাণটা চম্‌কে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম "একি সর্বনাশ! এত আদরের ধন, হৃদয়ের আশা ছেলেটিকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে!" দেখ্‌লাম ঘরটি অতি ক্ষুদ্র, একটি ছোট দুয়ার, কেবল একটি মানুষ কোনরূপে যেতে আসতে পারে, আর কোন স্থানে ফাঁক নাই। সেই আতুড় ঘর দেখেইত আমার চক্ষুস্থির—একটু খানি সেখানে থাকাতেই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। মঙ্গলা ছেলে কোলে করে কুঁড়েখানিকে আলো করে রেখেছে। সেই ত ঘরের শ্রী; আবার তাহার এক পাশে একটা আগুণের কুণ্ড, তাতিয়া ধোঁয়া উঠ্‌ছে; কতগুলা ময়লা ছেড়া কাপড় পড়ে রয়েছে, তার গন্ধে ভূত পালায়। আবার ঘরের মেজেটা জলে জব্‌জবে হয়েছে। ছেলে দেখে মনটা সুখী হয়েছিল, কিন্তু তাকে যে যায়গায় রাখা হয়েছে তা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, প্রাণটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। বাহিরে এসে বল্‌লাম "খুড়িমা! অমন চাঁদপানা ছেলেটিকে অমন যায়গায় রেখেছো কেমন করে? আর তোমার সেই মঙ্গলাত, যে নরম দুধে-ধোয়া বিছানা না হলে শুতে পারে না, যাকে কত আদর করে চুল বেঁধে দিতে, পরিষ্কার রাখ্‌তে, যার কাপড় একটু ময়লা হলে কত বক্‌তে, তাকে ঐ নরককুণ্ডে রেখেছ কি করে?" তিনি বল্‌লেন "তা বাছা কি কর্‌ব বলো,

নটা দিন বৈত নয়, তার ছদিন কেটে গেল, দেশের আচার এইরূপ।" আমি ব'ল্লাম "যে-ভাবে ওদের রেখেছ, তাতে ছেলের একটা ব্যামো না হলে বাঁচি।" এ সকল দেখে সুখী হলাম না—বাড়ী চলে এলাম।

ছ দিনে ষেটাড়া। ১২টি বামুনের পায়ের ধূলা চাই ;আজ বিধাতা পুরুষ ছেলের কপালে লিখ্বেন—তারও উদ্যোগ করা হয়েছে। বেলা অল্পই আছে, তখন বিধাতা পুরুষের লিখিবার সময় হয় নাই। এমন সময়ে মঙ্গলার গলা শুন্লাম—সে একেবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। বাড়ীর মেয়েরা 'কি হলো কি হলো' বলে সেই দিকে ছুটে গেল। আমি তখন একখানি খবরের কাগজ পড়্ছিলাম ; কিন্তু কান্নার স্বরটা শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড় করে উঠ্‌ল। বাহিরে এসে শুন্লাম মঙ্গলার ছেলেকে পেঁচো চোরায় পেয়েছে। ভাব্‌লাম "এ আবার কি ; এই কতক্ষণ বেশ ছেলে দেখে এলাম, এর মধ্যে চোর এল কোথা হ'তে। যাই দেখ্তে হলো" বলে দৌড়াদৌড়ি গিয়ে দেখি আতুড় দুয়ারে আর লোক ধরে না সকলে ঠেলাঠেলি কর্‌ছে, সকলেই তাহার ভিতরে যেতে ইচ্ছুক ;কিন্তু ভিতরেও তিলমাত্র স্থান নাই। আমি কি হয়েছে কি হয়েছে বলে সেখানে গিয়া উঠ্‌লাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমায় দেখে লজ্জায় ঘাড় হেট করে তফাতে গেল, আর কতকগুলিকে ধমক দিয়া তফাৎ করে দিলাম—একেবারে আতুড় ঘরে ঢুকে পড়্লাম, গিয়ে দেখি সেই সোণার চাঁদ এখন কালি হয়েছে, হাত পা খিচুনি ধরেছে, দুধ খায় না, মায়ের স্তন মুখে করে না, আগে যে দুধ খেয়ে ছিল তাহা দই হয়ে বেরিয়ে পড়্ছে, চো'ক মেলে চায় না। আমি ত তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে করে বাহিরে আনিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলাও বাহিরে এলো। তাদিগকে সঙ্গে করে এক খানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্লাম। আমি একটু ডাক্তারী জান্তাম, অবস্থা বুঝে একটু ঔষধ খাইয়ে দিলাম—ঔষধ আমার বাড়ীতে ছিল। বাহিরে ভাল বাতাস পেয়ে এবং সময় মত ঠিক ঔষধ পেটে পড়াতে ছেলেটির হাত পা খিচুনি কমে এলো—ক্রমে চোক মেলে চাইলে। মানা করে দিলাম আর যেন কেউ সে ঘরে না আসে—ওরূপ জটলা না করে। মঙ্গলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেল। বিধাতা পুরুষ কপালে না লিখ্তেই একটি কাণ্ড ঘটে গেল। রোগের প্রভাব কমে এলো দেখে যেমন যেমন ঔষধ খাওয়াতে হবে তা বলে দিলাম—আরও বল্লাম যে, যেন আতুড় ঘরে আর না নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ছেলে আর বাঁচবে না।—যখন বাড়ী এলাম তখন রাত তিনটা বেজেছে।—তার পরদিন সকালে অনেক লোকের নিকট লাঞ্ছনা খেতে হয়েছিল। কেউ বলে খ্রীষ্টান হয়েছে, কেউ বলে ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গিয়েছে ; সব সাহেবী চাল চলন শিখেছে। কিন্তু আমার অপরাধ কি তা ত আমি জানি না!

এখন কথা হ'চ্চে পেঁচো চোরা কে? সে কোথা থাকে? পেঁচো চোরা একটা মানুষ নহে, সে ভূত প্রেতও নহে, তার হাত পাও নাই ; কিন্তু তার ক্ষমতা বড়! আমরা যে রকম করে আতুড় ঘর বাঁধি, তাতেই ত পেঁচো চোবা বাঁধা থাকে ; আমরা তাকে আদর করে এনে সেই ঘরে বাসা দিই। তা না হলে আর সেখানে আস্‌বে কেমন করে?

জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন ; কোন রকমে যদি তাহা দূষিত হয় তা হলে পীড়া জন্মে। আতুড় ঘরখানি যেমন স্থানে যে প্রণালীতে বাঁধা হয় সে কথা বলিতে লজ্জা করে। ছোট ঘর, ছোট একটি দুয়ার, জমি সেঁতসেতে, চারিদিক বেশ ঘেরা—তাহার চারি পাশ নানারকম জঞ্জালে পোরা। সেই ঘরে সদ্যোজাত বালক থাক্‌বে। ছেলেটি যেমন ভূমিষ্ঠ

হবে অমনি পাড়ার লোক দলে দলে দেখ্‌তে আস্‌বে ; সেই দুয়ারটিতে সকলেই সে ঘরের বায়ু হইতে নিশ্বাস লইবে—সেই ঘরে প্রশ্বাস ফেলিবে, কাজেই ঘরের মধ্যে যে বাতাসটুকু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। আবার বাহিরের বায়ুও আসিতে পায় না, কেন না, দুয়ারে যে একটু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। সুতরাং বিষের মত বায়ু সেই ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া যায়। মা ও ছেলে দুই জনেই তাহা নিশ্বাস টানিয়া লয়। এই বায়ুই পেঁচো চোরার একটি প্রধান. চোর।

জমি সেঁতসেতে তাহাতেও বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। আবার সেই মাটিতে শুইয়া থাকাতে শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে ; তাহাতে শ্লেষ্মা-কফ কাশি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং এই আর একটি চোর।

ছেলেকে শোওয়াইতে যে বিছানা দেওয়া হয় তাহা ময়লা দুর্গন্ধ যুক্ত, সেই দুর্গন্ধ রাত দিন ছেলের নাকের মধ্যে যায়। তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সুনিদ্রা না হওয়া রোগের ঘর। ইহাই চোরের মধ্যে গণ্য।

আতুড় ঘরের মধ্যে একটি করিয়া আগুণের কুণ্ড থাকে তাহাতে কাট দেওয়া হয় সেই জন্য তাহাতে তাতে খুব ধোঁয়া উঠে। সেই ধোঁয়া চোকে লেগে ছেলে কাঁদিতে থাকে—চোক দিয়ে জল পড়ে। কেঁদে কেঁদে পীড়া হবে তাহার আশ্চর্য কি? আবার ইহা বায়ু দূষিত করিবার একটি কারণ। এইত গেল চার চোর।

তারপর আহার—সে ব্যবস্থাও সুন্দর নহে। আমরা কচিছেলের জন্য গোদুদ্ধ ব্যবস্থা করি, তাহা আবার ঘন করে জ্বাল দিই। আবার রাত্রির জন্য এবং পরদিন প্রাতঃকালে দুধ পাওয়া যাইবে না বলিয়া দিনে জ্বাল দিয়ে আগে তুলিযা রাখিয়া দিই। সেই দুধ ছেলেকে খাইতে দেওয়া হয়। ঘন দুধ পেটে সয় না, কাজেই পেটের পীড়া হয় ; তার পর আবার বাসি দুধ খাওয়ান হয় বলে, ছেলের অম্ল রোগ জন্মায়—তাই দুধ খেলেই ভেদ হইয়া যায়। দুধ তোলা রোগের সৃষ্টি এইরূপে হয়।

পেঁচো-চোরা এই পাঁচটি একত্রিত হইয়া হইয়াছে। এখন তোমরা এক দুই করে পাঁচটি চোর গুণে লও। চোরে লোকের কি ক্ষতি করে, ঘটিটা বাটিটা বা দুচারি খান গহনা, না হয় নগদ টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু.সে প্রাণে মারে না। পেঁচোর হাতে পড়িলে আর নিস্ত'র নাই, শুধু যে কেবল ছেলেটি মরে গেল তা নয় ; তার শোকে বাপ মার মনে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার সংসারের অনুরাগ চলিয়া যায় ; মন উদাস হয়ে পড়ে, শরীরের প্রতি যত্ন থাকেনা, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়, কাজেই ভগ্নদেহ ভগ্ন মন নিয়ে ঘর করিতে হয়। সে বড় কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে। পেঁচোর হাত হতে যাতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার উপায় করা উচিত। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা এখন ছোট আছ ; এখন তোমাদের সে ভয় নাই বটে। কিন্তু পরে আবার তোমরাই সংসারী হবে, তখন যাতে এই দুস্তর ব্যাধির হাতে না পড় তার চেষ্টা করিবে। কেবল আতুড় ঘরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যত ছেলেকে পেঁচোয় পায় তাহা প্রায়ই আতুড় ঘরে দেখা যায়। এই কথাটি যেন বেশ মনে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলতে পারবে, সেই ভাবে চলিলে পেঁচোর হাত হইতে উদ্ধার পাবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নাই।

১ : ৮ · আগস্ট ১৮৮৩, পৃ. ১২৫-১২৭।

সিংহ ও মাতাল

প্রমদাচরণ সেন



মসিং, বিউগেলদার—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন যায়গায়, সৈন্যদলে বিউগেল বাজায়। বিউগেল কাহাকে বলে, তাহা বোধহয় জান। সানাইয়ের মত একটা যন্ত্র, তাহার শব্দের ইঙ্গিতে গোরাদের সমস্ত কাজ কর্ম্ম হয়। যাক্—ভীমসিংহ সৈন্যদলে বিউগল বাজায় এবং মনের সুখে দিন কাটায়, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু তা' হইলে কি হয় সে বড় মদ খাইত। যখন কাজ কর্ম্ম থাকিত না, তখনই গিয়া দেখ ভীমসিং চোখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে অনেক দিন যায় ;—এক দিন বিকালবেলা, ভীমসিংহ অন্য দুই তিন জন সঙ্গীর সহিত, তাহাদের কেল্লার নিকটে বনের ধারে বসিয়া মদ খাইতেছিল—বিউগেল কোমরে বাঁধা আছে। ক' বোতল মদ তাহারা খাইয়াছিল, আমরা তাহার কোন খবর পাই নাই ; তবে ভীমসিংহের বড়ই নেশা হইয়াছিল, একথা আমরা শুনিয়াছি। সঙ্গীরা তাহার রকম সকম দেখিয়া সরিয়া পড়িল—ভীম সিংহও যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না—সেইখানে পড়িয়া গেল। চোখ বুঝিয়াই ভীমসিংহ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 'যেন সে রাজা হইয়া গদীতে বসিয়াছে—আর চোখ্ রাঙ্গাইয়া সকলকে হুকুম করিতেছে আর সকলে তাহার সিংহাসন কাঁধে করিয়া একবার রাজসভাতে এক বার এখানে, একবার সেখানে লইয়া বেড়াইতেছে'! ভাল, ভীমসিং! তুমি তোমার সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাক, আমরা ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাকে আর কি ঘটিয়াছিল, সে কথা বলিয়া ফেলি।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।—যে বনের কাছে ভীমসিং পড়িয়াছিল, তাহাতে সিংহ বাস করিত, সুতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া পশুরাজ উদরের চেষ্টায় বাহির হইলেন। পশুরাজ বাহির হইয়া দেখিলেন, বা! বা! বা! একটা মানুষ পড়িয়া আছে—তাইতো বিনা পরিশ্রমের শিকার! সিংহ নিকটে আসিয়া দেখিল বেশ জোরাল মানুষ, দু এক দিনের খাবার বেশ চলিবে, তখন বিনা আপত্তিতে তাহাকে পিঠের উপরে ফেলিয়া পশুরাজ ঘরে চলিলেন।

যখন সিংহ ভীমসিংকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়, তখন ভীমসিংহ ভাবিতেছিল হয় রাজবাড়ীর চাকরেরা তাহার সিংহাসন বহিয়া লইয়া যাইতেছে, না হয় তাহার বন্ধুরা তাহাকে কেল্লায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু খানিকটা যাইতে যাইতে তাহার একটু নেশা ছুটিল। তখন সে চোখ খুলিয়া দেখিল সিংহের পিঠে মা দুর্গার মত কোথায় যাইতেছে—সিংহ তাহার পেটের এক ধার কামড়াইয়া আছে, পাছে পড়িয়া যায়। তবেই তো কি হবে? হঠাৎ তার বিউগেলের কথা মনে পড়িল—যদি বিউগেলে বিপদের সময়কার শব্দ করিলে কেল্লা হইতে লোক আসিয়া সাহায্য করে। এই ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে কোমর হইতে বিউগেলটী খুলিয়া লইল, এবং তাহাতে শব্দ করিল।

টু—টু—উ—উ—উ—উ—উ

বেচারা সিংহ চমকিয়া উঠিল, ভাবিল এ আবার কি?—এবং চমকিয়া দাঁড়াইল। মাতাল দেখিল শব্দে কাজ হইয়াছে। আবার বাজাইল টুট্টু—টূ—টূটু—টূ—টু—উ—উ—উ—উ।

এবার সিংহ ভয়ে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু বিউগেল আর থামে না।

টুটু—ভু পূঁ—ভো পোঁ—টু-টু-টু-টু-টু-টু-উ-উ-উ। বেচারা সিংহ আর কি করে, চার ধারে ছুটোছুটি করিয়া শেষকালে শিকার ফেলিয়া মার দৌড়! ভীমসিংহও ভাবিল বাঁচিলাম, সিংহও ভাবিল 'বাঁচিলাম'।

ইতিমধ্যে এই শব্দ কেল্লার লোকদিগের কানে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা ভীমসিংহের কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বন্দুক, লাঠি, তরবার লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পথেই ভীমের সহিত দেখা হইল। ব্যাপার কি শুনিয়া সকলেই হেসে আকুল।

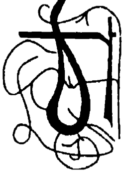
যাহা হউক, সিংহের পিঠে ভগবতীর মত চাপিয়া মাতালের একটা উপকার হইল, সেই-দিন হইতে সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আর কখনও মদ খাইব না'। সে অনেক দিনের কথা। আমরা শুনিয়াছি তাহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। ভীমসিং আজও মদ খায় না।

১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৩৮-১৪০।

"সহচরী" হইতে পরিবর্তিত

নরেনের স্বর্গ দর্শন

(উপকথা)



কুরমার গল্প না শুনিলে নরেনের ঘুম আসিত না। সন্ধ্যা হইলেই নরেন ঠাকুরমার কাছে গিয়া বসিত ও কত রকম গল্প শুনিত। ঠাকুরমার গল্প ঠাকুরদের কথা লইয়াই হইত। ঠাকুরদের কথা বলিতে গেলেই স্বর্গের কথা আসিত; ইন্দ্রভূবন, পারিজাত কানন, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র ইত্যাদি কত রকম গল্প হইত। নরেন এই সকল কথা এক মনে শুনিত, নরেনের মনে হইত স্বর্গ কি দেখা যায় না? স্বর্গ দেখিবার জন্য নরেনের বড়ই ইচ্ছা হইল।

নরেনের অবিনাশ কাকা নরেনকে একখানি ছবির বই দিয়াছিল। নরেন ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসিত। ঘরের এক কোণে নরেন ছবি দেখিতেছিল। প্রথম ছবিখানি ইন্দ্রালয়। সহস্রলোচন ইন্দ্রদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দিকে গন্ধর্ব বালকগণ দাঁড়াইয়া; তাহাদের কেমন হাসি হাসি মুখ। নরেনের ইচ্ছা হইল ঐ বালকদিগের সহিত খেলা করে। এমন কি চারিদিক চাহিয়া ছবির বালকগণকে নরেন বলিয়া ছিল "আমার সঙ্গে ভাব কর্‌বে, আমি সন্দেশ দিব"। আর একখানি ছবি, পদ্মবনে বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ছোট ছোট বালকগণ বসিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং বীণাপাণি বালকগণকে পড়াইতেছেন। নরেন গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতে ভাল বাসিত না। গুরু মহাশয় বড় ধমক দেন। ছবির বালকদিগের সহিত বসিয়া নরেনের পড়িবার ইচ্ছা হইল। তৃতীয় ছবিখানি বৈকুণ্ঠধাম। শ্রীকৃষ্ণ বালক ধ্রুবের হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে উপস্থিত। লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া কত আদর করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মনোহর ছবি দেখিয়া নরেনের স্বর্গ দেখিবার সাধ আরও প্রবল হইল। কাহার না হয়?

নরেন মনে করিল, ঠাকুরমা স্বর্গ দেখিবার সন্ধান বলিতে পারেন। এক দিন নরেন

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হ্যাঁ, ঠাকুরমা, ঐ যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, অ্যাঁ ঐ যে চাঁদ উঠেচে অ্যাঁ ওর ভিতর কি স্বর্গ আছে?" ঠাকুরমা বলিল, "হ্যাঁ দাদা ওরই ভিতর স্বর্গ আছে।" "আচ্ছা ঠাকুরমা স্বর্গ কি দেখা যায় না?" "এখানকার লোকে কি স্বর্গ দেখিতে পায়। এখন যে ঘোর কলি পাপে ভরা। সে কালের লোকদের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা কথা কহিতেন। তারা স্বর্গ দেখিতে পাইতেন!"

নরেন তাহার অবিনাশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ কাকা আকাশের ভিতর যাওয়া যায়?" "দূর, আকাশের কাছে গেলে মানুষ মরে যায়, আকাশ কেবল ধোঁয়া বইত নয়।" "তবে দেবতারা থাকে কেমন করে।" নরেনের কাকা হাসিয়া বলিল, "দেবতারা কি আর আছেন, তাঁরা ধোঁয়ার ভিতর দম আট্‌কে মরে গেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কেবল একজন আছেন, কিন্তু তাঁকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে।" নরেন বুঝিল কাকা তামাসা করিলেন।

একটু সূর্যকিরণ নরেনের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়া খেলা করিতেছে। কখন একটি বেলোয়ারির মার্বেলের উপর পড়িয়া কত রকম রং ফলাইতেছে। আবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নরেন এক দৃষ্টে বাক্সর দিকে চাহিয়া স্বর্গ দেখিতেছিল হঠাৎ মনে হইল, কিরণ স্বর্গে থাকে, বলিতে পারে কিরূপে স্বর্গ দেখা যায়। ছেলে বুদ্ধি তাড়াতাড়ি কিরণটুকুকে হাত চাপা দিয়া ধরিল "অ্যাঁ, তুমি আমার খেলনা লইয়া খেলা করিতেছ, আজ তোমায় ছাড়িব না, আগে বল আমায় স্বর্গ দেখাইবে?" কিরণটুকু হাসিতে হাসিতে নরেনের আঙুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল, নরেন শুনিতে পাইল কে যেন বলিল "সহজে কি স্বর্গ দেখা যায় দিব্য চক্ষু পাইবার চেষ্টা কর, তবে স্বর্গ দেখিতে পাইবে।"

দিব্য চক্ষু পাইলেই স্বর্গ দেখা যায়! তবে আর কি নরেনের দুটি টাকা ছিল, বাক্স হইতে টাকা দুটি লইয়া কেষ্টোর দোকানে ছুটিল। "কেষ্টো, কেষ্টো? দিব্যচক্ষু আছে।" "দিব্যচক্ষু না বাবু আমরা দিব্যচক্ষু বেচি না, লজঞ্চুষ চাই?" দিব্যচক্ষু কিনিতে পাওয়া গেল না।

এক দিন নরেন বাগানে বেড়াইতেছে, একটি সুন্দর গঙ্গাফড়িং আসিয়া একটি গোলাপ ফুলে বসিল। নরেনের একটি পাখী ছিল, পাখীকে খাওয়াইবার জন্য নরেন ফড়িং দেখিলেই ধরিত। এটিকেও পা টিপে টিপে যাইয়া ধরিল, কিন্তু ফড়িং কথা কহিয়া উঠিল। তাইত ফড়িং কি পাখীর মতন পড়িতে পারে? এমন সুস্বরে কথা কয় কে? নরেন এমন কথা ত কখন শুনে নাই! অবাক হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল তাহার হাতের ভিতর ফড়িংটির উপর বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—প্রজাপতির ন্যায় পোযাক। পরিধানে প্রজাপতির ডানা। দেখিতে বড়ই সুন্দর। তিনিই নরেনকে বলিতেছিলেন "ছি বাবা, কাহাকেও পীড়ন করা ভাল নয়, ফড়িং ছাড়িয়া দাও, অনেক দূর আসিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে, তাই তোমার গোলাপ ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, ছাড়িয়া দাও, আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে?" নরেন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কতদূর।" "ঐ যে আকাশে একটি আলো দেখিতে পাইতেছ ঐখানে আমার বাড়ী।" এই বলিয়া নরেনকে একটি আকাশের তারা দেখাইয়া দিল। "ও তবে তুমি স্বর্গে থাক, তোমায় কখন ছাড়িব না। একবার আমাকে স্বর্গ দেখাইতে পার, তা হ'লে ছাড়িয়া দিই, নতুবা আমার বাক্সর ভিতর পুরিয়া রাখিব।" সুন্দরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি আর কেহ নয় স্বর্গের একটি অপ্সরা। অপ্সরা নরেনের

আবদার শুনিয়া অবাক। নরেন তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আচ্ছা স্বর্গ না দেখাইতে পার, আমাকে দিব্যচক্ষু দাও তা হ'লে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি।" "দিব্যচক্ষুর যে দাম অনেক।" "কত দাম আমি এখনি তোমায় টাকা দিতেছি।" অপ্সরা বলিল "বোকা ছেলে, স্বর্গের জিনিষ কি তোমাদের সামান্য টাকায় পাওয়া যায়, স্বর্গের টাকা চাই? তা এক কাজ কর তোমাকে একটি ছোট কৌটো দিতেছি—একটি সুকাজ করিলেই কৌটার মধ্যে একটি টাকা আপনি আসিবে ; কিন্তু একটি কুকাজ করিলেই জমানো টাকা হইতে একটি উড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন তোমার এক কৌটো টাকা হইবে, আমি আসিয়া তোমায় দিব্যচক্ষু দিব।"

নরেন হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, ফড়িং আলগা পাইয়া এক লাফে চলিয়া গেল। নরেন কৌটা লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিল। নরেন বাটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভিখারী একটি পয়সার জন্য চীৎকার করিতেছে। নরেনের কাছে পয়সা ছিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার ইচ্ছা ছিল না। নরেন ভিক্ষুককে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল এমন সময় তাহার অবিনাশ কাকাকে জানালায় দেখিতে পাইল। অবিনাশ কাকা নরেনকে দান করিতে দেখিলে বড় খুশি হন এবং দানের চতুর্গুণ পুরস্কার দেন। কাকাকে দেখিয়া নরেন ভিখারীকে দুইটি পয়সা দিল। সে দিন নরেনের কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, নরেনকে একটি আধুলি বকসিস দিলেন। নরেন মনে করিল দেখি দেখি কৌটায় টাকা আসিয়াছে কি না, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া ত খুব ভাল কাজ! কৌটা খুলিয়া দেখিল ফোক্কা। কে যেন বলিল "আধুলির লোভে পয়সা দিয়াছিলে, আধুলি পাইয়াছ আর টাকা পাইবে না।"

নরেনের বন্ধু বরেনের বড় জ্বর। নরেন বরেনকে দেখিতে গিয়াছিল। বরেন ডালিমের জন্য বড় আবদার করিতেছে। মা বুঝাইতেছিলেন "ডালিম কোথা পাব বাবা! ছিঃ কেঁদনা, এই দেখ ঘড়া বাঁধা দিয়া তোমার চিকিৎসা হইতেছে।" ছেলেয় তা কি শোনে ; বরেনের মার কথা শুনিয়া নরেনের বড়ই দুঃখ হইল, সে কাহাকে কিছু না বলিয়া কেষ্টোর দোকানে আসিয়া দুটি বেদানা কিনিয়া বরেনকে দিয়া আসিল। বরেনের মা কত আশীর্বাদ করিল। ঠুন ঠুন! ওকি! নরেন কৌটা খুলিয়া দেখে দুটি চকচকে টাকা কৌটায় আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া নরেন দেখিল, তাহার ছোট বোন "বুড়ী" তাহার এ, বি লিখিবার খাতা লইয়া হিজিবিজি কাটিতেছে। "পোড়ার মুখী, কি কচ্ছিস্" বলিয়া বুড়ীকে একটি চড় মারিয়া খাতা কাড়িয়া লইল। ঠুন্! কৌটার একটি টাকা নাই।

একদিন নরেন কতকগুলি সিসের ফৌজ লইয়া খেলা করিতেছে। দুই দিকে দুই দল সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে করিয়া খাড়া রহিয়াছে। নরেন এক বার একটিকে সরাইতেছে, ওটিকে সম্মুখে আনিতেছে, আর একটিকে পশ্চাতে দাঁড় করাইতেছে। ভয়ানক ব্যস্ত! তুমুল যুদ্ধের পূর্বে কোন্ সেনাপতি স্থির থাকিতে পারেন? এ সময়ে বুড়ী ডাকিল "দাদা দাদা, আমার অতের নিশেন পয়ে গেল, অ্যা—।" আঃ এমন সময়েও বিরক্ত করে। এক বার মনে করিল ধমক দিয়া বুড়ীকে তাড়াইয়া দিই। কিন্তু আবার মনে পড়িল মা বলিয়াছেন "ছি ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে কি ঝগড়া করে, তারা যে ছেলেমানুষ তাদের কি বুদ্ধি আছে।" যুদ্ধ থামাইয়া, নরেন বুড়ির রথের নিশান সারিয়া দিল। ঠুন! আবার টাকা আসিয়াছে। তাই ত স্বর্গের টাকা খুব সস্তা।

প্রথম প্রথম টাকার লোভে সৎকার্য করিয়া নরেনের এমনই অভ্যাস হইয়া গেল যে নরেন

আর ভুলেও অন্যায় কার্য করে না।

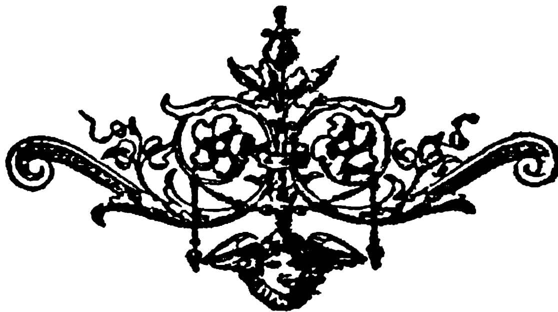
আজ নরেনের এক কৌটা টাকা। বড়ই আহ্লাদ। তুমি বলিতেছ নরেনের এত আহ্লাদ কেন, তোমার এক সিন্দুক টাকা আছে তোমার ত এত আহ্লাদ হয় না। কেন হবে? এ টাকায় আর তোমার টাকায়? নরেন কি পরের অন্ন মারিয়া টাকা জমাইয়াছে, না অপরকে ঠকাইয়া নিজের কৌটা পূর্ণ করিয়াছে?

অপ্সরার কথা মিথ্যা হয় না। এখন স্বর্গ দেখিবার উপায় হইল। মনের আনন্দে নরেন বাগানে বেড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া নরেনকে আশীর্বাদ করিয়া দাঁড়াইল। নরেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল—"তোমার হাতের কৌটা দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে স্বর্গের টাকা আছে, আমারও ঐরূপ এক কৌটা টাকা ছিল, কাল গঙ্গাস্নান করিবার সময় কৌটাটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যাইয়া বাস করিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু সম্বল হারাইয়াছি, কেমন করিয়া যাই? আমাকে কৌটাটি যদি দাও তোমাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া যাই—" সর্বনাশ! সন্ন্যাসী তো জানিত কতকষ্টে এক কৌটা টাকা হয়। নরেনের এত যত্নের ধন চাহিতে তাহার লজ্জা হইল না?

কিন্তু নরেনের মনে এরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। নরেন ভাবিল, সন্ন্যাসী যে প্রকার বুড়ো হইয়াছে টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার বিস্তর সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এমন কত কৌটা জমাইতে পারিব। নরেন অম্লান বদনে সন্ন্যাসীর হস্তে কৌটা দিল। সন্ন্যাসী কৌটা পাইয়া বলিল, "তোমার দান মিছা হইবে না, আমার নিকট একটি জিনিষ আছে তোমাকে দিই। চক্ষু মুদ্রিত কর।" নরেন চক্ষু মুদিল। সন্ন্যাসী নরেনের চক্ষুতে হস্ত বুলাইল। নরেন চাহিল। সন্ন্যাসী নাই। কিন্তু নূতন চক্ষে সে সকলই নূতন দেখিতে লাগিল।

নরেন যে দিব্য চক্ষুর জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল সেই দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সে পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইল ; পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের মনোরম সুখ পাইতে লাগিল। হে বালক বালিকাগণ! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাও, তবে পরোপকার কার্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দাও। স্বার্থপরতা ও ছোট মন লইয়া আর থাকিও না।

১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ ১৪০-১৪৩।



বীরেন্দ্র সিংহের রত্ন-লাভ

(বড় বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত)

শ্রীমতী***দেবী

। আমরা গতবারের নরেনের স্বর্গ দর্শন নামক সুন্দর গল্পটী 'সহচরী' পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিয়া কাহারও কাহারও কাছে গালাগলি খাইয়াছি ; তাঁহারা বলেন যে "মিথ্যা গল্প দিলে বালকদিগের মনে অনেক বিষয়ে ভুল বিশ্বাস হয়।" যাহারা কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বুঝিতে না পারে, তাহাদের পক্ষে 'সখা' নয়, এরূপ আমরা বলিতে সাহস করি না ; তবে নীচের গল্পটী কেবল তাঁহারাই পড়িবেন, যাঁহারা সত্য মিথ্যা বাছিয়া উপদেশ লইতে পারেন।।



রাকালে ভারতবর্ষে বীরেন্দ্র সিংহ নামে এক সুবিখ্যাত, এবং মৃগয়া-প্রিয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্য-সভাসদ-সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করিলেন,—সহস্র সহস্র অশ্ব পদদাপে প্রান্তর পথ কম্পিত করিয়া মৃগয়া-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। ক্ষেত্রের প্রান্ত-সীমা হইতে একটী হরিণশাবক, সচকিতে ভয়বিহ্বল-নেত্রে গের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সহসা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, মহারাজ সঙ্গীবর্গকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে, সূর্যের প্রখর কিরণে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, উত্তপ্ত বায়ুস্রোতে উত্তপ্ত ধূলিকণার তরঙ্গ উঠিয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ—বিশাল দিগন্ত শূন্য প্রান্তরে মৃগশিশুটি বিদ্যুতের মত এক একবার মহারাজকে দেখা দিয়া মাঝে মাঝে একটি গাছ গাছড়া ও তৃণমণ্ডলীর আড়ালে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। আর লোক নাই, আর পশু নাই,—অগ্নিময় প্রান্তর যেন জীবশূন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহারাজের শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত, মৃগয়া উৎসাহে তথাপি তিনি শ্রান্তি অনুভব করিতেছেন না—অবিশ্রান্ত অবারিত বেগে মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে মৃগ প্রান্তর ছাড়াইল, তিনিও প্রান্তর ছাড়াইলেন, মৃগ এক অনিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনিও প্রবেশ করিলেন ; বন মধ্যে একটি মন্দির ছিল, তথায় মৃগশিশু প্রাণপণ গতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল—রাজা হতাশ হইয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন তাহা মন্দিরের প্রতিপালিত মৃগ—তাহা অবধ্য।

নিরাশ অবসন্ন রাজা শ্রান্তি দূর করিতে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুরোহিতের আতিথ্য সৎকারে সজীব হইয়া কিছুক্ষণ পরে দেব-চরণে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। অপরাহ্নের নিস্তেজ সূর্যরশ্মি মন্দির ভেদ করিয়া দেবমূর্তি উজ্জ্বল করিতে অক্ষম,—মন্দিরস্থিত জ্বলন্ত দীপালোকে ব্রহ্মার চতুর্মুখ মূর্তি বিভাসিত। প্রণাম কবিয়া উঠিবার সময় মহারাজের প্রদীপে দৃষ্টি পড়িল—কি আশ্চর্য! দেখিলেন প্রদীপ তৈলশূন্য অথচ তাহার প্রজ্জ্বলন্ত দীপ্তির কিছুমাত্র হ্রাস নাই। মহারাজকে বিস্মিত দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন "মহারাজ বিস্মিত হইবেন না ইহার নাম ইচ্ছাদীপ্ত প্রদীপ। এই প্রদীপের নিম্নভূমিতে ব্রহ্মা একটি দেবরত্ন রাখিয়া ইহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ সেই রত্নটি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তবেই এই প্রদীপ নিভিবে নহিলে ইহার নির্বাণ নাই—" মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন "সে রত্নটি কি?" পুরোহিত বলিলেন "তাহা জগতের সার রত্ন তাহা লাভ হইলে দেবত্ব লাভ হয়।"—

মহারাজের লোলুপ হৃদয় তাহা লাভ করিতে উৎসুক হইল ; তিনি বলিলেন "তাহা কিরূপে লাভ করা যায়?" পুরোহিত বলিলেন "ইহা লাভ করিতে হইলে পৃথিবীজয়ী হইতে হইবে, পৃথিবী জয়ী না হইলে আশা বৃথা।" মহারাজ তাহা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইবার সময় পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটি কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া তাহাকে দেব প্রদীপের কালী মাখাইয়া বলিলেন "যেদিন দেখিবে এই কালীর দাগ মুছিয়া গিয়াছে সেইদিন বুঝিও তুমি পৃথিবী জয়ী হইয়া এই রত্ন লাভে অধিকারী হইয়াছ—দীপ নিভিয়াছে।"

রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—দিগ্বিজয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত হইল, মহারাজ দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন। তখন রাজাগণ ভারত জয় করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পৃথিবী জয়ী জ্ঞান করিতেন। বীরেন্দ্র সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, আহ্লাদে হৃদয় উন্মত্ত, তিনি মানব হইয়া স্বক্ষমতায় দেবরত্ন লাভ করিবেন এ পর্যন্ত ধরাধামে এরূপ সৌভাগ্য কাহারো ঘটে নাই ; —কিন্তু সহসা তাঁহার সে আহ্লাদ দূর হইল, পুরোহিত কুশাঙ্গরীয় পরাইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল, হস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয়কের কালীর চিহ্ন যেমন তেমনি রহিয়াছে। মহারাজ নিরাশ হৃদয়ে মহা মহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভা আহ্বান করিলেন। মন্দিরের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন "পুরোহিতের কথামত আপনি পৃথিবী জয় করিলেন কিন্তু তাহাতেও যখন অঙ্গুরীয়কের কালী মুছিল না, তখন পুরোহিতের কথার যথার্থ অর্থ তাহা নহে। পৃথিবীর রক্তপাতে যথার্থ পৃথিবী জয় হয় না। যখন আপনি পৃথিবীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন তখন যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবেন। জগতের লোক ভয়দৃষ্টিতে আপনাকে মনুষ্য-হন্তারক বলিয়া না দেখিয়া যখন ভাল বাসার চক্ষে, ভক্তির চক্ষে দেখিবে, যখন জগতের হৃদয় অধিকার করিবেন, তখনি আপনি পৃথিবী জয়ী হইতে পারিবেন।"

মহারাজ এই কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন ;—রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধন রত্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, যশে জগৎ ধ্বনিত হইল, কিন্তু হায়! রাজা ব্যথিত হৃদয়ে দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক এখনো কালীময়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথাও ব্যর্থ দেখিয়া কালী মুছিবার উপায় জানিতে, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে আবার সেই দেব মন্দিরের পুরোহিতের নিকট যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পথে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার ম্লান বদন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিশেষ শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন "বৎস! রক্তপাত করিয়া কিম্বা যশের কামনা পরবশ হইয়া পৃথিবী জয়ী নামের আশা করিও না। তাহাতে সে প্রদীপ নিভিবে না। যদি আত্মজয় করিতে পার তাহা হইলেই যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবে ও তাহা হইলেই তুমি সেই দেবরত্নের অধিকারী।"

সন্ন্যাসীর কথায় মহারাজের চৈতন্য হইল। তিনি মন্দিরে না গিয়া পথ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যায় রূপে যে সকল রাজস্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহা ফিরাইয়া দিলেন, নিজের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আন্তরিক প্রার্থনায় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইলেন—ক্রমে লোভ, ঈর্ষা, অহঙ্কার সকলি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তিনি ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাঁহার হস্তের কালী মুছিয়া গেল, কিন্তু তখন আর কোন রত্ন লাভে তাঁহার লোভ রহিল না, তিনি বাসনাহীন হৃদয়ে পুরোহিতকে ধন্যবাদ করিতে এবং মন্দিরদেবকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে সেই মন্দিরে গমন

করিলেন ;—দেখিলেন প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। পুরোহিত বলিলেন—"তুমি যে রত্ন লইতে আসিয়াছ তাহা ইতিপূর্বেই তোমার হইয়াছে এই দেখ দীপ নির্বাপিত। এখন তুমি কেবল মাত্র পৃথিবী জয়ী নহ—ত্রৈলোক্যজয়ী!"

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বদা
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
ন বিভেতি রনাদ্ যোবৈ সংগ্রামেঽপ্য পরাংমুখঃ
ধর্ম যুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

সত্যই যাঁহার ব্রত এবং সর্বদা দীনে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

ধর্মযুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৫৪-১৫৬।

বানর

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



নুষের বুদ্ধি বেশী ; মানুষ সকলের রাজা ; মানুষের পরেই বানর। দুয়ের চেহারায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় স্বভাবেরও সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক পণ্ডিত ঠিক করিয়াছেন বানর মানুষের পূর্ব পুরুষ! অর্থাৎ বানরই কালে রূপান্তরিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

বানর শব্দটীর উপর কিছু মন্তব্য আবশ্যক হইয়াছে। এই জাতীয় জন্তুদের মধ্যে যাহাদের লেজ আছে তাহারাই যথার্থ আইন-সঙ্গত বানর। "হুকু" "বনমানুষ" প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় আছে তাহাদের বানরত্ব পরিচায়ক ঐ বিশেষ চিহ্নটুকু নাই ; এ স্থলে বানর বলিতে আমরা তাহাদিগকে বুঝিব।



তবে দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ বানর দুই প্রকার ; সলাঙ্গুল আর অলাঙ্গুল। সলাঙ্গুলদের মধ্যেও দুইটী সম্প্রদায় আছে। এক দলের লেজ, আমরা যতদূর বুঝি শোভার জন্য ; আর লোমে ঢাকা। অপর দলের লেজ প্রায় লোমশূন্য, কিন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ আছে যে তদ্বারা স্পর্শন, অবলম্বন, প্রভৃতি হাতের প্রায় সমস্ত কার্য হয়। সকল বানরেরই সাধারণ কয়েকটী গুণ আছে। যথা :—বুদ্ধি, কৌতূহল, অনুকরণ-প্রিয়তা, ক্ষতি-প্রিয়তা ইত্যাদি। আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এই তিন খণ্ডেই অসংখ্য বানর দেখিতে পাওয়া যায়, সামুদ্রিক

দ্বীপ সকলেও বানরের অভাব নাই। তবে সভ্য দেশ বলিয়াই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক, ইউরোপে বানর বড় নাই। প্রায় সকল বানরেই নিরামিষ খায়, গাছে থাকে এবং বিরক্ত হইলে তিরস্কার স্বরূপ নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী করে। বানরের সম্বন্ধে ইংরাজি বই এবং অন্যান্য স্থান হইতে আমরা কতকগুলি সুন্দর গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। সেইগুলি আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

অপত্য স্নেহ।—কোন ডাক্তার সাহেবের চাকর একটী ছোট বানর ধরিয়া সাহেবের তাঁবুতে লইয়া আসিল। বানরটীকে খুব যত্ন করা হইত। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া আনাতে একটী বুড়ো বানর—বোধহয় তাহার মা—এত কষ্টে পড়িল যে সে সর্বদাই তাঁবুর কাছে বসিয়া থাকিত আর কিচ্ মিচ্ করিয়া ডাক্তার সাহেবকে মনের কষ্ট জানাইত। ডাক্তার সাহেব তাহার চীৎকারে থাকিতে না পারিয়া অবশেষে বানরটীকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। বুড়ী তাহাকে লইয়া আনন্দে স্বজাতীয়ের সমাজে গেল। কিন্তু বোধ হয় বানরদের "পঞ্চায়েৎ" মনে করিলেন যে এদের জাত গিয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। তখন সকলে মিলিয়া হতভাগিনীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কয়েকদিন পরে ডাক্তার সাহেব দেখিলেন সেই বানর বুড়ী ছানা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আপনা আপনি তাঁবুর ভিতরে আসিল। এবং আস্তে আস্তে সেখানে ছানাটীকে রাখিয়া কিছু দূর যাইয়াই পড়িয়া মরিয়া গেল। মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সে ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে, আর সমস্ত গায়ে প্রহারের এবং আঁচড়ের দাগ।

স্বার্থপরতা।—আমেরিকার এক সাহেব কাফির ক্ষেত করিয়াছেন। কাফি প্রায় সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এক দিন ক্ষেতের দিকে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তখন দুরবীণ দিয়া দেখিলেন যে একদল বানর কাফি খাইতে আসিয়াছে। কাফির প্রায় প্রত্যেক গাছেই বোলতার বাসা। নিষ্কণ্টকে কাফি খাওয়ার পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। দলপতি তখন ভাবিলেন "নিজে কেন ঠকি?" সুতরাং তিনি বোলতা তাড়াবার জন্য ছোট ছোট বানর-গুলিকে গাছে ফেলিয়া দিতেছেন। বোলতার কামড়ে বেচারারা ক্যাচ ম্যাচ করিতেছে ; তাই অত গোলমাল।

প্রতিহিংসা।—একটা স্তম্ভে একটা বানর বাঁধা ছিল। কাকগুলি মনে করিল যে, "বাঁধা আছে, এই বেলা বড় সুযোগ"। তাহারা খাবার জিনিস দুটী একটি করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বেচারা কি করে! শেষটা মড়ার মত হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিল। পক্ষীগুলি আস্তে আস্তে কাছে আসিতে লাগিল, বানর কিছু বলে না। কাক মহাশয়েরা মনে করিলেন বুঝি মরিয়া গিয়াছে। তখন আর স্থানাস্থান রহিল না, পারিলে তাহার বুকে উঠিয়া মুখের খাবার খুলিয়া খান। বানরের কার্যোদ্ধারের সময় উপস্থিত! সে খপ্ করিয়া একজনকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিল। মারিয়া ফেলিলে উপযুক্ত শাস্তি হইবে না একথাটা বানর বুঝিতে পারিল। সে নিষ্কর্মার মত বসিয়া আস্তে আস্তে এক একটী করিয়া কাকের সমস্ত পালক ফেলিয়া দিল। তার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কি হইল বুঝিতেই পার।

বানর এবং কেউটে সাপ।—বানরটী পাটনার একটা বড় বটগাছে থাকিত। গাছে উঠিতে যাইবে এমন সময় গাছের গোড়ায় একটা বড় কেউটে সাপ দেখিতে পাইল। সে গাছে উঠিতে চাহিলেই সাপটা মাথা তুলিয়া কামড়াইতে আসে। বানর ঘুরিয়া গাছের

ও-পাশে গেল। সাপও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির। কোন মতেই গাছে উঠিতে দিবে না। ইহা দেখিয়া বানর লাফাইতে আরম্ভ করিল। একবার এখানে যায়, আবার ওখানে যাইয়া লাফায়, কখনো বা সাপের গলা ধরিতে হাত বাড়ায়। সাপও কোন দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত বানরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল এবং শেষটা ক্লান্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন বানর আস্তে আস্তে অতি সাবধানে সাপের কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার গলা ধরিয়া ফেলিল। সাপ ও বানরের গা জড়াইয়া ধরিল। বানর কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া নিকট হইতে এক খানা ইট লইয়া সাপের মাথা ক্রমাগত ঘসিতে লাগিল। ঘসিতে ঘসিতে মাথার আর কিছুই রহিল না। তখন মৃত সাপটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বানর নির্ব্বিবাদে গাছে উঠিল।

অনুকরণ-প্রিয়তা।—জাবাদ্বীপে একজন ডাক্তার সাহেব থাকিতেন তাঁহার খুব বড়-জাতীয় একটা বানর ছিল। মৃত শরীর পরীক্ষা করিতে হইলে সাহেব একটা টেবিলের উপর ফেলিয়া অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দেখিতেন ; বানর কাছে বসিয়া তামাসা দেখিত। একদিন সাহেব যেই ঐ টেবিলের কাছে গিয়াছেন অমনি বানর তাঁহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিল। তার পর মড়া কাটিতে হইলে সাহেব যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইতেন বানর তাহাই করিতে লাগিল। সাহেব নিতান্ত 'বেকায়দা গোছ' দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক ঘরে আসিলে বানর থামিল।

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৮৪-১৮৬।

খোলা ভাঁটীর ফল

প্রমদাচরণ সেন

রাধালতার দুঃখের কথা


জকাল আমাদের দেশে সকল স্থানেই মদের দোকান হইয়াছে, এই সকল াকানে মদ প্রস্তুত হয় বলিয়া দোকানদার বেশ অল্প মূল্যে মদ বিক্রয় করিতে পারে। আগে মদের দাম অধিক ছিল, এই জন্য টাকা না থাকিলে যে সে মদ খাইতে পাইত না, কিন্তু এখন সস্তা হইয়া অনেক গরিব দুঃখী লোকও মদ খাইতে শিখিতেছে। নিজের পরিবারেব ছেলেদের হয়ত মুখের খাবার নাই, পরিবার কাপড় নাই, অথচ বাড়ীর কর্তা ঘটী, বাটি বেচিয়া মাতাল হইতেছে, এবং বাড়ীতে সকলের উপরে উৎপাত করিতেছে। আজ কাল এইরূপ যে কত স্থানে হইতেছে তাহার খোঁজ নাই। আমরা এইরূপ একটী পরিবারের দুঃখের কথা বলিব।

রামগোবিন্দ যে গ্রামে বাস করে, সেখানকার পাল্‌কী বেহারাদিগকে 'কাহার' বলে। রামগোবিন্দ এই 'কাহার'-এর কাজ করিত। তাহার শরীর বেশ মোটা সোটা ; গায়ে বেশ বল, পাল্‌কী বইতে তাহার মতন মজবুত আর কে ছিল? কিন্তু দেশে মদের দোকান বসিয়া মদ সস্তা হইয়া গেল ; তখন কি "ভদ্দরলোকের খাবার" না খাইয়া গরিব কাহারের ছেলে থাকিতে পারে? রামগোবিন্দ মদ ধরিল ; —কি সর্বনাশ! এক দিন খাইয়া আর একদিন খাইতে

ইচ্ছা হইল, তার পর আর এক দিন, তার পর আর একদিন, এই রূপে রামগোবিন্দ ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিল। তাহার স্ত্রী একটী ছোট মেয়েকে লইয়া পাড়ায় ঘুরিয়া কখনও চা'ল, কখনও ডা'ল ভিক্ষা করিয়া আনিত, এবং নিজেদের বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে শাকটা, পাতাটা, কুড়াইয়া তাহার দ্বারাই কোনমতে বাঁচিয়া থাকিত। অবশেষে মনের দুঃখে, ক্ষুধার জ্বালায়, ব্যামোয় পড়ে, সতী সাধবী মরিয়া গেল। একদিন রামগোবিন্দ টলিতে টলিতে ঘরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে ; তখন সে তথা হইতে চলিয়া গেল। রাধালতা তখন ৯ বৎসরের বালিকা। সে নিরুপায় দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া দেখিলেন—মায়ের মৃত শরীরের পাশে পড়িয়া রাধালতা ফুপিয়া কাঁদিতেছে। তখন তাঁহারা দয়া করিয়া রাধার মায়ের শরীর শ্মশানে লইয়া গেলেন—শরীর পুড়িয়া গেল। যাক্ ; চিরকাল জ্বলে পুড়ে মরা অপেক্ষা একেবারে পোড়া ভাল নয় কি?

অনেকে ভাবিয়াছিল স্ত্রী মৃত্যুতে মাতাল ভাল হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। নেশা ছুটিয়া গেলে রামগোবিন্দ একটু নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "রাধা! তুই রান্না বান্না কর্, আমি একবার বেড়িয়ে আসি। আজ থেকে তোকেই সমস্ত কর্‌তে হবে—আর কে কর্‌বে?" এই কথা শুনিয়া রাধা কাঁদিয়া উঠিল, এবং আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কি রাঁধিবে তাহার উদ্যোগ দেখিতে গেল ;—রামগোবিন্দও একটুখানি 'টানিতে' গেল।

প্রায় আড়াই বৎসর এই ভাবে কাটিল ; রাধার বয়স এখন ১১ বৎসরের কিছু অধিক। এতদিন মাতাল রাধাকে কিছুই বলে নাই, কিন্তু এখন বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। নিজে পয়সা দিবে না, ঘটী বাটি সমস্তই, হয় বিক্রয় হইয়াছে, না হয় বাঁধা আছে, অথচ বাড়ীতে আসিয়া খাবার না পাইলে রক্ষা ছিল না। বেচারা রাধা ছেলেমানুষ, এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন?

শীতকাল, তাহাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে ; পৃথিবীর যত শীত, আজ যেন সমস্তই রাধার ঘরে আসিয়া যুঠিয়াছে। ঘরটীকে ঘর না বলিয়া 'গোয়াল' বলিলেও হয়, চারিদিকে খড় উড়িয়া গিয়াছে, মেটে দেয়াল হাজার ছিদ্রে পূর্ণ, মেজেয় ধূলো উড়িতেছে, এইত দশা; তাহাতে আবার গায়ে মোটা কাপড় ছিল না, কেবল আঁচলটী জড়াইয়া কোন মতে বালিকা শীতনিবারণ করিতেছিল। ও পাড়ায় জগ'পিশী খানকতক কাঠ দিয়াছিলেন, তাহাতে আগুন ধরাইয়া রাধা একটু ছোট আগুন তোয়ের করিয়া শীত থামাইতে লাগিল এবং কখন্ বাবা বাড়ীতে আসিবেন, তাহার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ঘরে একটুখানি বাতি ছিল ; রাত্রি হইয়াছে দেখিয়াও রাধা তাহা জ্বালিল না, কারণ ফুরাইয়া গেলে আর কে দিবে? একটী মাদুরের উপর পড়িয়া রাধা নানা রকম দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সে দিন রাধার খাওয়া হয় নাই,—কে দিবে? রাধা গরিবের মেয়ে, কিন্তু কখনও ভিক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না। এত ক্ষুধায় বালিকার নিদ্রা আসিল? আশ্চর্য! কিন্তু ঘুমাইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে নাই, কি একটী শব্দে রাধালতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

রামগোবিন্দ ঘরে আসিতেছে, এ তাহারি শব্দ। হুড়্‌মুড়্ শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া রামগোবিন্দ ঘরে ঢুকিল এবং অন্ধকারে 'রাধা' 'রাধা' করিয়া ডাকিতে লাগিল। রাধা বলিল 'বাবা! এসেছ? কি চাও?"—মাতাল আলো জ্বালিয়া খাবার দিতে বলিল। রাধালতা সেই পুঁজিকরা বাতিটুকু ধরাইয়া আলো জ্বালিল বটে, কিন্তু খাবার কোথায় পাইবে? বলিল "বাবা! আজ আর কিছুই

নাই—আমি নিজেও কিছুই খাই নাই।” মাতাল ভয়ানক রাগিয়া বলিল “ভিক্ষা ক'রে, না হয় চুরী ক'রে আন্‌তে পারিস্ নি?” বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, মাতাল বাধা দিয়া বলিল “মুখে মুখে উত্তর?” এই বলিয়া বালিকার কোমল শরীরে যে কি ভয়ানক প্রহার করিল, তাহা মনে করিতেও কান্না পায়। প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া বালিকা পিতার হাত ছাড়াইয়া ঘরের বাহিরে গেল, এবং “ওমাগো” “ওমাগো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিল।—টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে হাড়ভাঙ্গা শীত। হায়! হায়! মদে কি সর্বনাশ করিল? কেন রামগোবিন্দ মদ ধরিয়াছিল? বালিকা সেই রাত্রে ঘূরিতে ঘূরিতে এক বাড়ীর বারান্দার নীচে দাঁড়াইল, ক্রমে বসিয়া পড়িল, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া গেল।

কোন্ দিক দিয়া রাত্রি চলিয়া গেল, রাধা তাহা জানিল না ; আবার সূর্য উঠিল, পাখীগুলি আবার মনের আনন্দে গান গাহিল, তাহারা দুঃখিনী বালিকার দুঃখ বুঝিল না। রাধালতা চেতনা পাইয়া খানিক দূরে রোদ্ পোহাইতে বসিল ; তাও কি বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় বসিতে পারে?—সে বসিয়া “ওমাগো! ক্ষুধায় প্রাণ গেল! পরমেশ্বর!” এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাধার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। যদি সে পরমেশ্বরকে ডাকিতে জানিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই বলিয়া ডাকিত—“দীনবন্ধু! তুমি না কাঙ্গালকে ভালবাস? কাঙ্গাল কার কাছে যাবে? তুমি না রাখলে কোথায় যাবে?” ক্রমে রাস্তা দিয়া দুই চারি জন লোক চলিতে লাগিল ; রাধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ভিক্ষা চাহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কে তাহাকে ভিক্ষা দেয়—কেহই দিল না।

অতি দুঃখে মানুষ চেঁচিয়ে কাঁদিতে পারে না রাধারও তাহাই হইল। সে দুটী হাতে মুখ লুকাইয়া ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় ভট্টাচার্যদের বাড়ীর সুবালা সেইখানে আসিল। সুবালা বড় ভাল মেয়ে,—কাহারও সহিত ‘ঝগড়া-ঝাটী’ নাই, মুখপোরা হাসি, কথাগুলি বড়ই মিষ্ট, যে শোনে তাহারই মন মোহিত হয়। একটী জিনিশ সুবালা বড়ই ভালবাসিত—সেটি খেলা ; কিন্তু পুতুলের কাছে খেলাও কিছুই নয়। এই পুতুল কিনিবার জন্য সুবালা একটী সিকি লইয়া পাড়ার পাশে খেলনা দোকানে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল যে তাহারই মত একটী ছোট মেয়ে ভয়ানক কাঁদিতেছে। তখন সুবালার বড় দুঃখ হইল—সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “হ্যাগা, তুমি কেন কাঁদ্‌ছ? বল না? আমায় বলনা?”—রাধা নিজের দুঃখের কথাগুলি সমস্ত বলিল। আহা! দয়া যেখানে থাকে, সেখানে বুঝি ছোট বড় থাকে না? বড় লোকের মেয়ে সুবালা গরিবের ঘরের রাধার দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। ভগ্নী যেমন ভগ্নীর দুঃখে কাঁদে, এ সেইরূপ কান্না ; পরে কিছু শান্ত হইয়া বলিল—“তুমি কাল থেকে কিছু খাওনা ; এই সিকিটা লইয়া খাবার খাও।” ওইযা! সুবালা পুতুল কিনিবার সিকিটা দিয়া ফেলিল? এত সাধের পুতুল কেনা হবে না? সুবালা সে কথা ভাবিল না—সিকিটী ফেলিয়াই দৌড়িয়া মায়ের কাছে গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল। মা বড়ই খুশী হইয়া সুবালার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাহার সহিত আসিয়া দেখিলেন, বাধা শীতে কাঁপিতেছে, উঠিয়া খাবার আনিতে যাইবে এমন সাধ্য নাই। সুবালার মা তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়া. তাহাকে কিছু গরম করিয়া, গরমজলে স্নান করাইয়া দিলেন। সুবালার আহ্লাদ দেখে কে? তাহার খেলিবার একটী সঙ্গী যুঠিল। এখানে থাকিয়া গরিবের মেয়ে রাধা ঘরের কাজকর্ম করিয়া কিছু কিছু উপার্জন

করিতে লাগিল, এবং তাহার দ্বারা পিতার খরচ চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহার বাপ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার অত্যাচারে রাধা বাড়ী ছাড়িয়াছে, তখন কোথায় তাহার মনে কষ্ট হইয়া মদ ছাড়িয়া দিবে, তাহা না হইয়া সে আগের মতই রহিল। অবশেষে একবার চুরী করিয়া সে জেলে গেল, এবং সেইখানেই ভয়ানক পরিশ্রমে ব্যারাম হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। রাধার কানে এই সম্বাদ গেলে সে অনেকদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে শান্ত হইল। এমন বাপের এমন মেয়ে? বাপ চিরকাল অত্যাচার করিলেন, মেয়ে চিরকালই ভাল বাসিল। কিসে এ তফাৎ? উত্তর—রামগোবিন্দ মাতাল, রাধা মদ স্পর্শও করিত না। মদে এত সর্বনাশ করে? তবুও লোকে মদ খায়।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৬৪-১৬৭।

২

ভিক্ষা দাও গো!



ই দুঃখিনী স্ত্রীলোক ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, শুষ্ক মুখে, দুটী ছোট মেয়েকে লইয়া, "ভিক্ষা দাও গো" বলিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইল, উহাকে চেন? কে উহার এ দুর্দশা করিল? উহাকে দেখিলেতো ভিখারীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না! মুখে কেমন একটু লজ্জা রহিয়াছে—চক্ষু যেন ছল ছল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় বড় কষ্টে পড়িয়াছে। তাই তোমার দ্বারে, নতুবা আসিত না। আহা! উহার সমস্ত দুর্দশার কথা শুনিতে চাও, তবে শোন।

বসন্তপুর নামক গ্রামে কেদারনাথের মত ভাল ছেলে কে ছিল? তাহার হাসি হাসি মুখখানি, বিনম্র ব্যবহার, লেখাপড়ায় মনোযোগ, ছোট ভাইবোনের প্রতি ভালবাসা, এসকল যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন কেদার এর পর একজন বড় লোক হইবে। কেদার জাতিতে কায়স্থ ছিল, কিন্তু বসন্তপুর গ্রামে কেদারকে সকলেই দেবতার ছেলের ন্যায় ভক্তি করিত। সেই গ্রামে একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কেদার বরাবর পড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উঠিল। কেদারের মা বাবার কত আশা! তাঁহারা বড় গরিব, বিদেশে প্রচুর খরচ করিয়া কেদারকে পড়াইবেন, এরূপ সঙ্গতি নাই, মনে ভাবিলেন এইবার পরীক্ষা দিয়া কেদার যদি বৃত্তি পায়, তাহা হইলে সে একটু লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয় এবং তাঁহাদেরও আর কষ্ট থাকে না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফলে বাপ মায়ের আশা পূর্ণ হইল। পরীক্ষার প্রায় ২ মাস পরে একদিন পাড়ার দুর্গাচরণ বাবু আসিয়া কেদারের বাপকে বলিয়া গেলেন তাঁহার কেদার 'জলপানি' পাইয়াছে। কি আনন্দ! কেদারের মা বাপের সুখে সকলেই সুখী হইলেন। কিন্তু ৪ টাকা বৃত্তিতে সমস্ত খরচ চালান ত সহজ নহে—কেদার কোথায় যায়? তাহারও বন্দোবস্ত হইল। কিছু দূরে কোন গ্রামে একটী এন্ট্রান্স স্কুল ছিল, তথায় পড়িবার জন্য কেদারকে সেইখানে পাঠান হইল। কেদার কায়স্থের ছেলে, ঘরের একটু একটু কাজ করিয়া দিবে, এইরূপ কথাতে সম্মত হইয়া সেই গ্রামের বড় একটী ভদ্রলোক কেদারকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কেদার সেইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে কেদারকে ভাল ছেলে বলিয়া চিনিল। সেই গ্রামে কেদারের অপেক্ষা বয়সে বড় অনেক বাবু, কেদারকে ডাকিয়া তাহার সহিত আলাপ করেন, নানারকম কথাবার্তা বলেন ; কেদার গরিব বেচারা, বয়সে বড়, টাকা কড়িতে বড়, বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া নিজেকে একটু

সুখী, একটু কৃতার্থ মনে করে। ইহাতেই কেদারের কপাল পুড়িল।

তিন চার বছর মিশিয়া মিশিয়া কেদারের মনে বিশ্বাস হইল, "ইঁহারা আমা অপেক্ষা যখন অনেক বেশী জানেন, তখন ইহাঁদের কথা অনুসারে চলা উচিত, তবে কখন কখন যে সকল খারাপ বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহা শুনিলে দোষ কি, সেই রূপ কাজ না করিলেই হইল।" *এইরূপ ভাবিয়াই কেদার ধীরে ধীরে পাপের দিকে যাইতে লাগিল। তাহার মনে একদিন পাপের প্রতি যে ভয়ানক ঘৃণা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে লাগিল।* বয়সের বড় যাঁহারা, তাঁহারা অনেক খারাপ বিষয়ের কথাও হয়ত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বালক কেদারের যেখানে যাওয়া উচিত নয়, তাহাদের সহিত অধিক মেশা উচিত নয়, এইরূপ কথা অনেকে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনায় কেদারের যখন কিছুই ত্রুটি নাই, তখন তাহাকে কে সাহস করিয়া বারণ করে? কেদার সর্বনাশের পথে যাইতে বসিল।

যখন কেদার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তখন তাহার বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া তাহার সর্বনাশের পথ আর একটু পরিষ্কার হইল। তাহার সঙ্গীগণ এই উপলক্ষে তাহাকে এরূপ কুৎসিত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, যে শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক দিন তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, "ভাই, নতুন বিবাহ করিলে, আমাদের কিছু নূতন জিনিষ খাওয়াও।" মিঠাই, সন্দেশ, প্রভৃতি অনেক জিনিষের নাম করা হইল কিছুই বাবুদের পসন্দ হইল না, কারণ তাহা নূতন নহে এবং তাহার দাম অনেক। অবশেষে একজন বলিলেন, "এক বোতল মদ আন—চারি আনা হ'লেই সকলে চলিবে।" কেদার প্রথম একটু আপত্তি করিল, শেষে ভাবিল "তা, আমিত খাব না, ইহাঁদের দিই না কেন।"—মদ আসিল। হো! হো! করিয়া সকলে মদ খাইলেন। কেদারকে ছাড়ে কে? চক্ষুলজ্জায় তাহাকেও খাইতে হইল।

একদিন খাইলে আর তাহাকে ছাড়ে কে? "আমি মদ খাই না" একথা বলিবার যো যাই, অথচ "মদ খাইবনা" এতটুকু মুখের জোরও নাই, কাজেই কেদার গেল।

এইবার কেদারের এন্ট্রান্স দিবার বছর। কিন্তু দলে পড়িয়া কেদারের পড়াশুনার দিকে অধিক মন রহিল না। এদিকে যে বাড়ীতে কেদার ছিল, সেই বাড়ীর কর্তা কেদারের খারাপ চরিত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কেদার অহঙ্কার এবং রাগে পূর্ণ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমরা বলিব না ; ভয়ানক কষ্টে, ভয়ানক দুঃখে, কেদারের দিন যাইতে লাগিল। এন্ট্রান্স পরীক্ষাতো কোথায় গেল। ক্রমাগত ৭ বছরকাল কেদারনাথকে পথে পথে ঘুরিতে হইল,—কখনও কেরাণীগিরি , কখনও নকলনবিশি, কখনও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া কেদার নিজের পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনে কেদার ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কেহই তাহাকে বিশ্বাস করেনা। একদিন অল্প মদ খাইয়া বাড়ীতে আসিয়া নিজের দুর্ভাবনা ভাবিতেছিল, তখন তাহার দুটী মেয়ে হইয়াছে, কিন্তু কষ্টে অত্যাচারে বাপ মা মরিয়া গিয়াছেন। কেদার ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং মদ খাইয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবে বলিয়া প্রায় আধবোতল মদ খাইল। পরদিন প্রাতে তাহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিল কেদার মরিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীর ক্লেশ কে দেখে! ত্রিসংসারে সেই অভাগিনীর আপনার জন কেহ ছিলনা, দুঃখিনী কোথায় যায়? তবুও অনেকদিন কষ্টে সৃষ্টে গেল। কিন্তু আর চলে না। অবশেষে নিরাশায় পূর্ণ হইয়া সে দুটী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া ঘরের বাহির হইল। তোমরা দেখ মদে

কি সর্বনাশ করিল! ওই দেখ আজ একটী স্ত্রীলোক পথের ভিখারিণী হইল। ছল ছল চক্ষে, মলিন মুখে, দুটী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কেদারের স্ত্রী দেশে দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে যায় এবং বলে "ভিক্ষা দেও গো।"

আহা! উহাকে দয়া কর। মাতালের স্ত্রীকে দয়া কর, এবং মদে কি সর্বনাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া মদকে ঘৃণা করিতে শেখ।

২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১১-১৩।

৩

জিকার ঘটনা সমস্তই সত্য। বিনয়দের বাড়ীতে আজ কেন কান্নার ধূম পড়িয়াছে, বলিতে পার? ঐ দেখ বিনয়ের মা কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। বিনয় শিশু, সেও সকলের দেখাদেখি কাঁদিতেছে।

বিনয়ের বাপ স্কুল কলেজে বড় ভাল ছেলে ছিলেন, তিনি এন্ট্রান্স পাশ করিয়া মেডিকাল কলেজে ভর্তি হন। যথা সময়ে মন্মথ বাবু ডাক্তারী পরীক্ষায় 'পাশ' হইয়া ডাক্তার হইলেন। তাঁহার যেমন দয়া, ঔষধপত্রের জ্ঞানও তেমনি; কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খুব নাম হইল। মন্মথ বাবু দিন রাত্রি রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন সময়ে নাওয়া খাওয়া হইত না, রোগীরা তাঁহার নামে এমনি আশা পাইত যে কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িত না। সাহেব মহলেও তাঁর বেশ নাম ছিল, সাহেবেরা তাঁহার ব্যারাম ভাল করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ডাকিত। এই সাহেবদের বাড়ীতে গিয়াই মন্মথ বাবুর সর্বনাশ হইল। তোমরা বোধ হয় জান যে সাহেব বিবিরা মদ খাইয়া থাকেন। তাঁহারা মন্মথ বাবুকে আদর করিয়া মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অন্য দশটা খাবারের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু মদও খাইতে দিতেন। আমাদের ডাক্তার বাবু প্রথম প্রথম আপত্তি করিতেন বটে, কিন্তু শেষে ভদ্রলোকদিগের নিকট চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া রাজি হইলেন—তাঁহার কপাল পুড়িল। অল্প অল্প করিয়া তিনি ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিলেন। যদি তিনি আগে হইতেই প্রতিজ্ঞা করিতেন যে কখনও মদ খাইব না, তাহা হইলে এমন চাযা কেহই নাই যে তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া মদ খাইতে বলিবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর না করিয়া তাঁহার প্রাণ গেল। কলিকাতায় যে সাহেবের অধীনে তিনি সরকারী ডাক্তারের কর্ম করিতেন, একদিন নেশার ঝোঁকে তাহার সহিত ভয়ানক চটাচটি করিলেন, এই সময় তাঁহার কতকগুলি কুসঙ্গী যুটিয়া গিয়াছিল, তাহারা এই আগুণে বাতাস দিতে লাগিল। তাহাদের পরামর্শে ও নিজের গোঁয়ার বুদ্ধিতে, মন্মথ বাবু কর্তা সাহেবদিগকে বলিয়া চট্টগ্রামের পাহাড়ে বদলী হইলেন। এই দূরদেশে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, এমনকি আপনার লোক কেহ ছিল না যে তাঁহাকে একটু অল্প করে মদ খাইতে বলে। দিন রাত্রি তিনি মদ খাইতেন, অন্য আহার ছিল না। এইরূপ করিয়া কত দিন চলে? তবুও সেখানকার বড় সাহেব তাঁহাকে ভাল করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে হুকুম দিলেন—"ডাক্তার বাবুকে যে মদ দিবে, তাহার জরিমানা করিব।" কিন্তু তাহার হুকুমে কোন ফল হইল না। যাহাকে মদের ভূতে ধরিয়াছে, সে হতভাগার মত দুঃখী কি আর এ পৃথিবীতে কেউ আছে? মন্মথ বাবু লুকাইয়া মদ খাইতেন। অত অত্যাচার যেন পরমেশ্বর সহিতে পারিলেন না! এক দিন রক্ত বমি করিয়া মন্মথ বাবুর প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কথা বলিলাম। মদ ধরিবার পূর্বে তিনি কিরূপ দেবতার মত ছিলেন, কিরূপ সচ্চরিত্র, ধার্মিক লোক ছিলেন এবং মদ খাইতে শিখিয়াই বা কিরূপ পিশাচের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কথা বেশী করিয়া লিখিতে পারিলে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিতেন মদে কি সর্বনাশ করে। আমাদের আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত কথা আছে, তাহার অর্থ এই—

মদ পান করিবে না, কাহাকেও দিবে না, কাহারও নিকট হইতে লইবে না।

এই কথা চিরকাল মনে রাখিও। সাহেবেরা যাহা করে, তাই যে ভাল, তাহা মনে করিও না। সাহেবেরা মদ খায়, বলিয়া কি আমরাও খাইব? থাক্, বাপু! এ সভ্যতা! মদখোর সভ্য হওয়ার চেয়ে জলখোর অসভ্য হওয়াও ভাল।

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৪৬-৪৭।

একটী অন্ধ সীলের[১] কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ক্লু উপসাগরে একটী সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারেই একটী ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি তাকে তাঁর রান্নাঘরে রাখিয়া পুষিতে লাগিলেন। সে খুব বাড়িতে লাগিল ; চাকরদের সঙ্গে তাহার খুব ভাব, বাড়ীর এবং বাড়ীর লোকের প্রতি বেশ মমতা। স্বভাবটী অতি মৃদু, কারু কিছু ক্ষতি করেনা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আর কর্তার ডাক শুনলেই কাছে হাজির হয়। তার প্রভুভক্তির কথা বলিতে হইলে বুড়ো বলিতেন "যেমন কুকুরটী"; আর আমোদ তামাসার কথা বলিতে হইলে বলিতেন "যেমন বিড়াল ছানাটী।"

সীলটী রোজ মাছ ধরিতে যাইত, আর নিজের যোগাড় হইলে পর প্রায়ই কর্তার জন্য দু একটী মাছ আনিত। গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রে বসিয়া থাকিত আর শীতের সময় ঘরের আগুনের এক পাশে একটা যায়গা পাইলে বড় খুসী হইত। আর হুকুম পাইলে তুন্দুরটার[২] ভিতর যাইয়া বাসা লইত।

বার বছর এইরূপে সীলটীকে পোষা হইল। এরপর একবার কর্তার "গোয়ালে" এক প্রকার রোগ দেখা দিল। কতকগুলি পশু মরিয়া গেল ; অন্যান্য পশুদের রোগে ধরিল। অন্য লোকের গরু স্থান পরিবর্তনে ভাল হয় ; কিন্তু কর্তার গরুর তাহা হইল না। কর্তা একটী স্ত্রী-ওঝার নিকট পরামর্শ লইলেন। সে বলিল "ওগো! তুমি ওটা কি ধরে এনেছ, তাতেই তোমার গরু মরে যায়। ওটাকে তাড়িয়ে দাও নৈলে আমার ওষুদেও ধরবে না, রোগও সারবে না!" সুতরাং সীলটীকে একটী নৌকায় তুলিয়া অনেক দূরে গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেখানে তার যা খুসী তাই করুক। নৌকা ফিরিয়া আসিল ; বাড়ীর সকলে ঘুমাইল। সকালে একটী চাকরাণী আসিয়া কর্তাকে খবর দিল "সীল তন্দুরের ভিতরে শুয়ে আছে।" বাড়ীর মায়ায় বেচারা রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটী জানালা খোলা পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া

১. প্রাণী বৃত্তান্তে সীলের বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে, আমাদের বড় ভাল না লাগাতে আমরা 'সীল'ই রাখিলাম।
২ রুটী প্রস্তুত করিবার বড় উনুনকে 'তন্দুর' বলে।

তাহার যায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

পরদিন আর একটী গরুর ব্যারাম হইল। সীলটাকে আর রাখা হইল না। অনেক দূর হইতে জেলে-নৌকা মাছ লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝি ২।৩ দিনের পথ লইয়া গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার পাইল। তাহাই করা হইল। একদিন এক রাত্রি গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় চাকর আগুন উস্কিয়া দিতেছিল, এমন সময় দরজার কাছে খট্ খট্ শব্দ হইল। চাকর মনে করিল কুকুরটা বুঝি ; অমনি দরজা খুলিয়া দিল—আর থপ্ থপ্ করিয়া সীলটা ঘরে আসিল। অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছে, তাই এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া মনের সন্তোষ জানাইল, তারপর হাত পা ছড়াইয়া আগুনের কাছে সুখে নিদ্রা গেল।

এই অমঙ্গলের খবর কর্তার কানে গেল। কর্তা বিপদ ভাবিয়া 'জান'কে জাগাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। জান বলিল, 'সীল মারলে অশুভ হয়, তবে চোখ দুটো খুঁড়ে ফের সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এস।" কর্তার বুদ্ধি চড়ায় ঠেকিয়াছে, কর্তা তাহাতেই রাজি। নিষ্ঠুরেরা সেই নির্দোষ বেচারার চক্ষু দুটী নষ্ট করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে বেচারা যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এরূপ অবস্থায় তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এক সপ্তাহ কাল গেল। কর্তার অমঙ্গল যেন যো পাইল। গরু ক্রমাগত মরিতে লাগিল। শেষটা ওঝা আসিয়া বলিলেন, "ওগো আমি আর পারিনে। তোমায় বড় ভূতে পেয়েছে; আমার আর সাধ্যি নেই।"

আটদিনের দিন ভয়ানক তুফান হইল। মাঝে মাঝে বিরামের সময় দরজার নিকট কান্নার শব্দের মত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকালে দরজা খোলা হইল। সিঁড়ির উপর সীলটা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭০-১৭১।

সর্বোত্তম ছাত্রী

কুমারী হেমলতা দেবী



বিত্রী দেবী নাম্নী একটি ভদ্র স্ত্রীলোক কালীঘাটের নিকটে কোন এক স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইতে কত পরিশ্রম হয়, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তিনি বালকবালিকাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার এ কাজে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। এক দিন রাত্রিতে তিনি কর্মস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে স্কুলের নিকটে তাঁহার জন্য একটি ছোট বাড়ী ঠিক করা হইযাছে। সাবিত্রী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক প্রফুল্লমুখে তাঁহার জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—"আসুন, নমস্কার। স্কুলের অধ্যক্ষ আপনার সুবিধার জন্য সব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলেছিলেন। আমার বোধ হয়, সব ঠিক হয়েছে। আমার স্বামী কর্মস্থান হইতে বাড়ীতে আসিলে, আপনার জিনিষ সব উপরে তুলিয়া দিয়া আসিবেন।"— নূতন শিক্ষয়িত্রী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ বাড়ীটি বেশ;—তার মধ্যে এই ঘরটি সকলের চেয়ে ভাল।" প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন,—

এ বাড়ীটি বেশ। একটি বসবার ঘর, ঐটি রান্নাঘর, আর উপরে দুটি শোবার ঘর আছে। সকলেরই পক্ষে বাড়ীটী সুবিধাজনক, কেবল মহামায়াদেবীর আর মন উঠ্‌লো না।"

সাবিত্রী। তিনি বুঝি আগে এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন?

"হ্যাঁ! কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামে থাকার উপযুক্ত ছিলেন না! তিনি ইচ্ছা করতেন মেয়েরা খুব বেশী বেশী শিখে যাক্, কিন্তু তাঁহার মনের মতন না হইলে ভয়ানক বকিতেন। আপনার চেহারা দেখে বোধ হয় আপনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশ মিশে চল্‌তে পারবেন। তা, আমি এখন যাই, আমার স্বামীর আস্‌বার সময় হ'ল। আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। যদি কোন কিছু দরকার হয়, তবে 'শোভার মা' 'শোভার মা' বলে ডাক্‌লেই আস্‌ব ; আর আমার শোভনা আপনার অনেক কাজ করে দেবে।"—এই কথা বলিয়া শোভার মা চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী দেবী মনের আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আহার করিতে বসিলেন। বিদেশে গিয়া কোথায় থাকিব, কেহ ভালবাসিবে কি না, বন্ধুবান্ধব যুঠিবে কি না, আগে এই সকল ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার আশা হইল শোভার মায়ের মত যত্ন যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কিছুই কষ্ট বোধ হইবে না। সাবিত্রীদেবী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় কে দরজার কড়া নাড়িল। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং দেখিলেন যে একটি ছোট মেয়ে একটি মাছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি বলিল, "মা আপনাকে এই মাছ দিয়াছেন।"

শিক্ষয়িত্রী। কেন? এত কষ্ট করে তোমার মা না পাঠালেও পার্‌তেন ত? তোমার নাম কি?

বালিকা উত্তর করিল "আমার নাম শোভনা।"

শিক্ষয়িত্রী। ওঃ তুমি তাঁর মেয়ে। এস বাছা এস। তোমাদের স্কুলে যত খবর জান, আমায় বলত।

শোভনা স্কুলের বিষয় যাহা জানিত সমস্তই বলিল ;—মনোরমা বসু সব চাইতে ভাল মেয়ে, সুনীতি দেবী পড়া না পারাতে রোজ কোণে দাঁড়ায় ; সরলতার বড় লজ্জা, কথা বল্‌তে মুখ লাল হ'য়ে উঠে, মাটি থেকে চক্ষু তোলে না ; স্কুলের অধ্যক্ষ বুড়ো মানুষ, তিনি প্রায় রোজই স্কুলে আসেন, মেয়েদের বড় ভালবাসেন—এ সকল কথাই বলিল। অবশেষে সাবিত্রী-দেবীর কাজের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া বাড়ী যাইবার সময়, তাঁহার প্রদত্ত একখানি সুন্দর ছবির বই লইয়া গেল। শোভনা বাড়ীতে গিয়াই মাকে পুস্তক খানি দেখাইল। তাহার মা বলিলেন "বা! বা! দেখ দেখি কেমন ভালমানুষ! তোমাদের আগের শিক্ষয়িত্রী কি মেয়েদের এমন ভালবাসিতেন, না কাহাকেও এমন ছবির বই দিতেন? এবার তোমরা বড় ভাল শিক্ষয়িত্রী পাইলে।" শোভনা কিছু বলিল না, কেবল মনে মনে ভাবিল "যাহাতে ইনি বিরক্ত না হন, এইরূপ ব্যবহার করিতে সর্বদা চেষ্টা করিব।"

পরদিন সাবিত্রীদেবী স্কুলের কাজ আরম্ভ করিলেন। কে কি রকম মেয়ে তাহা চিনিয়া বাহির করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। তিনি মনে বুঝিলেন শোভনাই সর্বাপেক্ষা ভাল ছাত্রী। যদিও মনোরমার বেশ বুদ্ধি, কিন্তু সে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে বড় চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কয়। বুদ্ধি থাকিলেই ভাল হয় না—যে সৎ অথচ বুদ্ধিমতী সেই ভাল। শোভনা সর্বদাই ছোট মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, অথচ তাহার বেশ বুদ্ধি আছে, এই জন্য শোভনাকে

নূতন শিক্ষয়িত্রীর বড়ই মনে ধরিয়াছিল।

কিছুদিন চলিয়া গেলে সাবিত্রীদেবী দেখিলেন যে, সমস্ত স্কুল একা চালান যায় না। তখন তিনি স্কুলের অধ্যক্ষকে বলিয়া স্থির করিলেন যে সর্বাপেক্ষা ভাল দুটি মেয়েকে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াইবার কতক ভার দিবেন। ছোট মেয়েদিগকে ভালবাসে এবং তাহাদের সহিত আপনার লোকের মত মিশিতে পারে, এইরূপ কোন বালিকাকে বাছিবার পরামর্শ হইল।

তখন সাবিত্রীদেবী এক সপ্তাহকাল মেয়েদের বাড়ীতে ঘুরিয়া, কে কিরূপ ব্যবহার করে, কে কি করিতে ভালবাসে তাহার খোঁজ করিলেন এবং স্কুলের ব্যবহারের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিলেন।

একদিন মেয়েরা অঙ্ক কষিতেছিল, এমন সময় সাবিত্রীদেবী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি, ছোট মেয়েদের পড়াবার জন্য যে দুটি মেয়েকে পসন্দ করিবার ভার আমার উপরে ছিল, আমি তাহাদিগকে বাছিয়াছি ; সে দুটি মেয়ে—শোভনা রায় ও সুকুমারী চট্টোপাধ্যায়।" এই কথা শুনিবামাত্র মনোরমা একেবারে চম্‌কিয়া গেল—"কি? আমার নাম হ'ল না?"—পাশের মেয়েটির কাণে কাণে বলিল—"হ্যাঁ, আমার নাম হল না ; আমি মাকে বলে দিব।" এই কথা শুনিয়া আর একটি বালিকা চম্‌কিয়া গেল—সে শোভনা। কিন্তু তাহার চম্‌কিয়া উঠিবার অন্য কারণ। সে বলিল 'আমি তো বড় নই ; আমি ভাল পার্‌ব না ; অন্য বড় মেয়েরা এ বন্দোবস্ত বোধ হয় ভালবাসবেন না। শিক্ষয়িত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ঠিক করিবার ভার আমার উপর। তুমি বেশ লিখিতে পড়িতে পার, ছোট মেয়েরাও তোমাকে ভালবাসে, তুমি আমার বেশ সাহায্য করিতে পারিবে।"

"আচ্ছা আমি চেষ্টা করিব" এই বলিয়া শোভনা কতক আহ্লাদে, কতক ভয়ে বাড়ীতে গেল।

সাবিত্রীদেবী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শোভনা যতদিন স্কুলে ছিল, সেই সকলের অপেক্ষা ভাল ছাত্রী ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তাহার জীবন বাল্যকালের মত হইল। সৎচরিত্র এবং সুবুদ্ধি, এই দুই গুণ থাকিলেই বালকবালিকারা ভাল হইয়া থাকে।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ ১৭২-১৭৩।

খেলা

প্রমদাচরণ সেন



দিন সন্ধ্যার পর আমার একটী বালক বন্ধু আমাকে মহা আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "—বাবু! আমরা আজ 'ব্যাটবল' খেলায় সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়াছি।" আমি শুনিয়া বলিলাম "বেশ!" তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, সাহেবদিগকে হারাইয়া এত আনন্দ কেন? সকল দেশের ছেলেরাই খেলা করে, তবে সাহেবের ছেলেরাইবা এত উঁচু যায়গায় কেন, আর আমাদের ছেলেরাইবা এত নীচুতে কেন? তাহার উত্তর এই যে, আমাদের দেশের কর্তারা ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রম 'দুচোখে' দেখিতে পারেন না। তাঁহারা চান, ছেলেরা নড়িবে না, উঠিবে না, ছুটিবে না, কেবল

এক মনে পুস্তকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, আর পরীক্ষা দিবে। শরীরকে ভাল রাখা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শরীর ভাল রাখিলে যে মন ভাল থাকে, এ কথা অনেক অভিভাবকই বুঝেন না। অপর দিকে, সাহেবদিগের মনের বিশ্বাস আর একরূপ। তাঁহারা ছেলেদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে যেমন যত্নবান, খেলার দ্বারা শরীরের বল বৃদ্ধি করাইতেও সেইরূপ মনোযোগী। সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছর কোন না কোনরূপ 'জোরাল' খেলা খেলিয়া থাকে। ঘোড়ায় চড়া, দৌড়াদৌড়ি, ব্যাটবল, দাণ্ডাগুলি, ইহার একটা না একটাতে সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছরই লাগিয়া আছে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে সাহেব বালকেরা কালে খুব মজবুত হইয়া উঠে ; তখন তাহাদের সঙ্গে ঐ সকল খেলাতে সমান হওয়া কাহারও পক্ষে সহজ হয় না। এই জন্যই আমার সেই বালকবন্ধু, গড়ের মাঠে সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়া, আহ্লাদে 'আটখানা' হইয়াছিল।

আমাদের দেশে নানারূপ খেলা আছে কিন্তু এমন খেলা অধিক নাই, যাহাতে শরীরের চালনা, মনের স্ফূর্তি এবং বুদ্ধির কৌশল এক সঙ্গে থাকে। 'কপাটী' বা 'ডুডু' খেলাতে শরীরে বেশ চালনা হয় বটে, বুদ্ধিও খাটাইতে হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী 'ব্যাটবল খেলা যত নির্দোষ এবং তাহাতে মনের যত স্ফূর্তি জন্মায়, ইহা তত নির্দোষ নহে এবং ইহাতে তত স্ফূর্তি জন্মায় না—আমাদের বালক পাঠকমাত্রই একথা জানেন। ইংরেজী খেলা আমাদের দেশে যত বাড়ে ততই আমাদের মঙ্গল, কারণ আমাদের দেশে শরীরে চালনা হয়, এরূপ কুস্তি, মাটিয়াম অনেক আছে বটে, কিন্তু যেখানে দুইদল বাঁধিয়া খেলা হয়, সেখানে পরস্পরের সহিত 'আড়ি'তে যত উৎসাহ হয়, আপনার মনে একলা একলা খেলিলে কখনই সেইরূপ হইতে পারে না ; ইংরাজদিগের অনেক 'জোরাল' খেলাই এইরূপ দুদলে হয় বলিয়া তাহা বড়ই উপকারী। আমাদের দেশে যে এরূপ নাই তাহা বলিতেছি না, তবে এইরূপ খেলা যত বাড়ে ততই মঙ্গল, ইহাই বলিতে চাই। আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এইরূপ দুইদলে মিশিয়া খেলিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল স্থানে তাহা নাই, এই জন্য তাহার দু একটী আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্যাটবল, কপাটী প্রভৃতি সকলেই মোটামুটি গোছ জানেন সুতরাং তাহার কোন উল্লেখ করিলাম না :—

'চী'কুৎকুৎ।[১]—এই খেলাতে বালকের সংখ্যার ঠিক নাই, ৮ হইতে ১৬ জন পর্যন্ত এক সঙ্গে খেলিতে পারে। যতগুলি বালক জুটিবে, তাহাদিগকে সমান দুইভাগ করিতে হইবে। কোন্ দল আগে খেলিবে তাহা প্রথম স্থির করিয়া লইবে। তাহার পর, যাহারা খেলিবে তাহাদের মধ্যে একজন খুব চতুর রকমের বালককে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইবে। এই বালকের নাম 'কুৎ'। 'কুৎ'কে উঠাইয়া তথা হইতে খানিকটা দূরে যে 'চড়াই' পূর্বে ঠিক করা থাকিবে, (২০ হইতে ৩০ হাত দূরে হইলে চলিতে পারে) সেখানে আনিতে হইবে। খেলিবার দল আনিতে চেষ্টা করিবে, খাটিবার দল বাধা দিবে, 'কুৎ' সুযোগ দেখিবে—এ খেলার সারমর্ম এই। কিরূপে খেলিবার দলের লোক চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতেছি।—খেলিবার দলের একজন 'চড়াই' হইতে বা 'কুৎ'কে ছুঁইয়া[২] 'চী' এই শব্দ করিতে করিতে এক নিশ্বাসে খাটিবার

১. কোন কোন স্থানে এ খেলাকে 'বউ বসান' বা 'বউ তোলা' খেলা বলিয়া থাকে, কিন্তু আমরা এ নামটি পসন্দ করি না।

২. কুৎকে ছুঁইয়া নিশ্বাস লইলেই ভাল হয়।

দলের একজন বা সম্ভব হইলে অধিক লোককে তাড়া করিয়া যাইবে ; যতক্ষণ তাহার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ সে যাহাকে ছুঁইবে সে মরিবে, কিন্তু নিশ্বাস লইয়া যদি সে চড়াইয়ে ফিরিয়া আসিতে না পারে এবং নিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে যদি পথে তাহাকে খাটিবার লোক কেহ ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেও মরিল। এদিকে খাটিবার লোকেরা সতর্ক আছে,—যখন দেখিল খেলিবার লোক তাহাদের এক জনকে তাড়া করিয়া গেল অমনি একজন বা অনেকে কুতের মাথা ছুঁইয়া গেল, কারণ খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া গেলেই যদি খাটিবার লোক কুতের মাথা না ছোঁয়, তাহা হইলে 'কুৎ' সুযোগ পাইলেই উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু খাটিবার লোকেরা একবার মাথা ছুঁইয়া গেলে, দ্বিতীয় খেলিবার লোক 'চী' না ধরা পর্যন্ত 'কুৎ'কে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বুদ্ধিমান 'কুৎ' সর্বদা সুযোগ খোঁজে, যাই দেখিল তাহাদের দলের একজন, খাটিবার লোকদিগকে তাড়া করিয়া গিয়াছে, আর কেহ তাহার মাথা ছুঁইয়া যাইতেছে না, অথচ সকলে ব্যতিব্যস্ত, অমনি সে উঠিয়া পলাইয়া চড়াইয়েতে গেল—পথে খাটিবার লোক কেহ ছুঁইয়া দিলে 'কুৎ' মরিল, এবং অন্যপক্ষের খেলিবার পালা হইল ; নতুবা নিরাপদে পৌঁছিলে খাটিবার লোকদিগের উপরে এক 'বাজি' জিৎ হইল।

খেলিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—যখন 'চী' বলিয়া কুতের মাথা ছুঁইয়া খাটিবার লোককে তাড়া করিয়া যাইবে, তখন যত দৌড়িতে পার তাহা যাইবেই ; সঙ্গে এমন আন্দাজে নিশ্বাস ফেলিবে যাহাতে একজনকে মারিয়াও চড়াইয়েতে ফিরিয়া আসিতে পার ; নতুবা যেখানে নিশ্বাস পড়িবে, প্রাণের আশা ছাড়িয়া সেখান হইতেই 'গাও হে' বলিয়া চীৎকার স্বরে সঙ্গীদিগকে খবর দিবে। ইহাতে এই ফল হইবে যে, তোমাদের দলের আর এক জন 'চী' ধরিবে. কাজেই তুমি এতক্ষণ যাহাকে তাড়া করিতে ছিলে, সে তোমাকে মারিবার সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াও 'কুৎ'কে বক্ষা করিতে সেই দিকে দৌড়িতে পারে—তাহা যদি না যায়, তা না হয় মরিলে, ভয় কি? খাটিবার লোক সকলকে মারিলে, শেষকালে একজন আসিয়া 'চী' ধরিয়া এক নিশ্বাসে 'কুৎ'কে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া চড়াইয়েতে যাইতে পারে।

কুতের প্রতি উপদেশ।—তুমি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, যতক্ষণ পলাইবার পথ খুব ভালরূপ বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ মোটেই নড়িবে না, কারণ একবার একটু উঠিবার উদ্যোগ করিলেই তুমি মরিলে, এবং তুমি মরিলে তোমার দলের খেলা গেল। যদি কুকুরেব মত দুবার উল্টা পাক দিয়া খাটিবার লোকদিগের হাত ছাড়াইতে পার, ভালই ; নতুবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে! একটী বিষয় যেন মনে থাকে, তোমার দলের লোক তোমার মাথা ছুঁইয়া গেলে, তখনি অর্থাৎ খাটিবার দলের লোক আসিয়া তোমার মাথা ছুঁইবার আগেই, তোমাকে প্রস্থান করিতে হইবে ; অপর পক্ষের কেহ মাথা ছুঁইয়া গেলে, আর সে 'চী'তে উঠিবার যো নাই।

খাটিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া চলিয়া গেলেই কুতের মাথা ছুঁইবে। যাহাকে তাড়া করিয়া যাইবে, সে যখন দেখিবে, 'চী'র নিশ্বাস শেষ হইয়া আসিতেছে, তখন বেশী তাড়াতাড়ি না পলাইয়া, নিজে মারা না যাই, অথচ 'চী' এর নিশ্বাস পড়িলেই তাহাকে দৌড়িয়া ছুঁইতে পারি, এই ভাবে ছুটিতে হইবে। যাহারা 'কুৎ' এবং চড়ায়ের মাঝখানে থাকিবে, তাহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এই খেলাতে দুদলের লোকই মরিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালা খেলায় যেমন হয়,

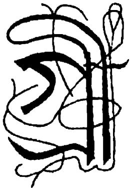
এখানে সেরূপ একের পরিবর্তে আর একজন বাঁচিবে না। 'চড়াই' বলিয়া যে দাগটী কাটিবে, কুৎকে বা খেলিবার লোকদিগকে যে সেই লাইনের উপরে আসিতে হইবে তাহা নহে, তাহার সোজা সোজি যেখানে হউক, এক জায়গায় আসিলেই চলিতে পারে। যদি একদল ক্রমাগত বাজি শোধ করিতে না পারিয়া, ৭ বার হারিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা গেল দুই ভাগ সমান হয় নাই ; তখন আবার ভাগ করিয়া লইবে।

এবার স্থানাভাবে আর কোন খেলার কথা দেওয়া গেল না।

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৭-১৭৯।

নিয়ম এবং অনিয়ম ; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা[১]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



গ্রীষ্মকাল ; সকালবেলা একদিন বড় সুন্দর দেখ্‌তে হ'য়েছে। একটী কর্মকার মৌমাছি মধু আন্‌বার জন্য বাহির হ'ল। এমন সুন্দর রোদ্! বেশ গরম বাতাস! সে উড়ে উড়ে অনেক দূরে গেল। শেষে একটী সুন্দর বাগানে এসে প'ড়্‌ল এবং সেইখানে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াতে লাগল। আনন্দে চোঁ বোঁ শব্দ করে করে এত মধু জমাইয়া ফেলিল যে আর বেশী নিয়ে যেতে পারে না। বেলাও শেষ হয়ে এসেছে, তখন বাড়ী ফিরে আসবার কথা মনে হ'ল। তাহার আসবার পথে এক বড়লোকের বাড়ীতে জানালা খোলা ছিল, সে মনে করিল ঐ বুঝি পথ, সুতরাং তার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর গেল। সেখানে ভারি খাবার ভিড়—ডাকাডাকি, হাকাহাকি, মহা গোলমাল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কথা বল্‌তে কিছু বেশী চীৎকার করে ফেল্‌ছেন ; দেখে শুনে বেচারা মৌমাছির মনে বড় ভয় হল—"এ কোথায় এসে প'ড়লাম রে বাবু।"—কিন্তু তা'হলে কি হয়, বাবুরা যে লাল টুক্‌টুকে রসগোল্লা পাতে নিয়েছে, তার একটুখানি একবার চেটে না দেখ্‌লে কি চলে? মৌমাছি সেইদিকে গেল। এর মধ্যে একটা ছেলে চীৎকার করে বলিল—"ওরে! মৌমাছিটে, ধর! ধর!"—মাছি ভাবিল, "বাবা গো! এই বেলা পালাই।"—এই ভাবিয়া বোঁ ক'রে ছুটে বাহিরের দিকে গেল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে বস্তুজ্ঞানটা তত ছিল না ; তাই বাহিরে যেতে গিয়ে জানালার সাসীতে মুখের ঘেন্টা লাগিয়া গেল। বড় বেদনা লাগাতে, বিশেষতঃ বাহিরে যাবার আর পথ না থাকাতে বেচারা মৌমাছি সেই সাসীর গায়ে আস্তে আস্তে হাট্‌তে লা'গল, ভাবিল বিশ্রাম করে গায়ে একটু বল হলেই চলে যাব।

হঠাৎ একটু একটু কাণাকাণির শব্দ তাহার কাণে গেল। চেয়ে দেখলে যে দুটী ছেলে হাঁটু গেড়ে বসে তারি দিকে চেয়ে আছে।

একটী আর একটীকে বলিল "দেখ বোন্! এটা একটা কর্মকার মৌমাছি। ওর উরুতে ঐ দুটো থলে। ওতে ফুলের গুঁড়ো রাখে। তোফা লোক! ওই কাজের লোক! কেমন সারাদিন খাট্‌ছে।"

মেয়েটী বলিল "ফুলের গুঁড়ো আর মধু কি ও নিজেই এনেছে?

"হাঁ : ফুলের ভিতর থেকে ঐ গুলো আনে। সে দিন মৌমাছিটাকে কেমন দেখেছিলাম ;

---

১ Parables from Nature নামক পুস্তকের একটি গল্প অবলম্বনে লিখিত।

হল্‌দে ফুলগুলির ভিতরে বাহিরে কেমন ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের কেমন হাসি পেয়েছিল। ক্রমাগত খাট্‌ছে,—আর কতই ব্যস্ত। হল্‌দে ফুলের গায় কালো মৌমাছিগুলি কেমন সুন্দর দেখিয়েছিল। একে আজ বোঝাই হতে দেখলে হত। কিন্তু এ আরো অনেব কাজ করে। মৌচাক তৈরী করে ; আর এ ছাড়া প্রায় অন্যান্য সকল কাজই করে। ও কর্মকার মৌমাছি! গরিব বেচারা!"

"কর্মকার মৌমাছিটে কি দাদা? আর ওকে 'গরিব বেচারা' কেন বল্‌লে?"

'বা! তাও কি জান না? সে দিন পুলিন কাকা বলেছেন যে সব লোক অন্যের জন্য খাটে, নিজের কাজ কর্তে জানে না, তারা সবগুলো হতভাগা। আর এও যে ঠিক্ তাই করে। চাকে রাণী মৌমাছি আছেন, তার আর কোন কাজ নেই, কেবল খাবেন আর বসে থাকবেন ; হুকুম জারি করবেন, আর ডিমছানা গুলোকে দেখবেন ; আর সকলে তাঁর কাছে এসে জোড় হাত করে থাকবে আর তাঁর আজ্ঞা পালন করবে। তার পর জামাই মৌমাছিরা আছেন—বাবুদের আর গড়াগড়ি করেই সময় হয় না। তার পর কর্মকার মৌমাছিরা যেমন এই একজন, তারা বেচারারা আর সকলেরই সব কাজ করে দেয়। পুলিন কাকা জান্‌লে কেমন হাস্‌তেন।"

"পুলিন কাকা মৌমাছির কথা জানেন না বুঝি।"

"না বুঝি। মালী আমাদের বলেছিল আর রাণী মৌমাছি না হলে এদের কাজ চলে না। একথা জানলে কি আর মৌমাছির গল্প বলে বলে পুলিন কাকার কথা ফুরুত? কাল শুনলাম পুলিন কাকা বলছেন—রাজা রাণী ওসব স্বভাবের বিরুদ্ধ। স্বভাবতঃ তো আর কেউ রাজা কি মুচি হয়ে আসেননি, সকলেই একরকম ; তাই উনি বলেন রাজা রাণী ও সব বড় অন্যায়।"

মেয়েটী চুপি চুপি বলিল, "মৌমাছিদের তো আর অত বুদ্ধি নেই যে তারা ও সব জানবে।"

"তাতো নয়ই! তবে বেচারারা খেটে খেটে মারা যাচ্ছে ; মালী আমাকে যা বললে সে সব যদি ওরা একবার শুনতো তা হলে ওদের কেমন রাগ হত!"

"মালী কি বল্‌লে?"

"এই যে, সে, বল্‌লে কি না যখন জন্মায় তখন কর্মকারও যা রাণীও তা ; ঠিক এক রকম ; তারপর ওদের খাবার আর থাকবার যায়গা এতেই দুটীকে দুরকম করে তোলে। ধাই মৌমাছিরা ঐ কাজটা করে। একজনকে একরকম আর একজনকে অন্য রকম খেতে দিলে; দুজনের ঘর দুরকম করে দিলে, আর অমনি একজন রাণী হয়ে উঠ্‌লেন, অন্য গুলি খেটে মরুক গে। পুলিন কাকাও রাজা রাণীর কথা ঠিক্ ঐ রূপ বলেন—স্বভাব সকলকেই একরকম করে। ঐ যা! খাওয়া হয়ে গেল ; চল যাই।"

"একটু দাঁড়াও দাদা ; মৌমাছিটাকে বাইরে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া সেই ছোট মেয়েটী তাহাকে আস্তে আস্তে একখানা রুমালে করিয়া লইল। তারপর একটু দয়ার ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "গরিব বেচারা! তারা যদি তোমাকে ভাল খাবার দিয়ে ভাল করে থাক্‌তে দিত, তাহলে তুমিও রাণী হতে পারতে। আহা কেন তারা দিলে না! তা যে রকম হয়েছে বাপু! যে রকম দেখ্‌ছি তাতে তোমার খাটুনীতেই জীবনটা যাবে। মধু আনবে আর মোম তয়ের করবে। তা এখন যাও। খেটে খেটে সুখে থাক্‌গে!" এই কথা বলিয়া সে খোলা জানালার ভিতর দিয়া রুমাল ঝাড়িল। মৌমাছিটী পুনরায় বাতাসে ভাসিয়া চলিল।

কেমন সুন্দর সন্ধ্যাকাল! কিন্তু ঐ মৌমাছিটীর সেরূপ বোধ হইল না। সূর্য দেখিতে কেমন সুন্দর হইয়াছে! ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই মৌমাছি বেচারার মনে হইতে লাগিল যেন আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। বাস্তবিক কাল মেঘ তাহার নিজের অন্তরেই ছিল! তাহার মনে অসন্তোষ এবং দুরাশার সঞ্চার হইয়াছে। সে এখন বিদ্রোহী, জন্মাবধি যাহারা তাহার মতে তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদিগের উপর আজি তাহার রাগ হইয়াছে।

অবশেষে বাড়ী আসিল।—প্রাতঃকালে কেমন মনের সুখে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল! কিন্তু মুখভার করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিল এবং রাগের সহিত তাড়াতাড়ি হুড় মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া, থলে ঝাড়িতে লাগিল। থলে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল "আমার মত দুঃখী আর কেউ নাই।"

একজন বৃদ্ধ আত্মীয় নিকটে কাজ করিতে ছিল,—সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন কি হয়েছে? কি করেছ তুমি? কোন বিষাক্ত ফুলের রস খেয়েছ? না মধুখোর প্রজাপতি আমাদের চাকের কোথাও ডিম পেড়েছে, তাই দেখেছ?"

"ওগো, তা নয়, তা নয়, অনেক দূর বেড়িয়েছি, আর নিজের কথা বিস্তর শুনেছি, আগে তাব কিছুই জা'ন্‌তাম না। এখন বুঝি আমরা কত দুঃখী!"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "ওরূপ উল্টো বুদ্ধি কোন্ পণ্ডিত তোমার পেটে ঢুকিয়ে দিলে?"

মৌমাছির রাগ হইয়াছে—"খাঁটি কথা! তা যেই বলুক না কেন, তাতে কি?"

"তাতো নয়ই। তা যে সে একটা বোকা জন্তু এসে বল্লে 'তুমি বড় দুঃখী, তাতেই তুমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে, এতো বেশ কথা? ঐরূপ কথা শোনবার আগে তো তোমার কোন কষ্ট ছিল না! ও নেহাত কাঁচা কথা; তা আমি আর তোমায় বেশী কিছু বল্‌ছিনে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আত্মীয় আপন কাজে গেলেন এবং সুখে গান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বুড়ো হাসিলেন বলিয়া পথিক মৌমাছির দুঃখ যাবার নয়। সে তাহার যুবা সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনিল। বড় লোকের খাবার ঘরে যাহা কিছু শুনিয়া আসিয়াছে সমস্ত তাহাদিগকে বলিল। শুনিয়া সকলে অবাক্; অনেকে কথাগুলিতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তাহার কথায় ওরূপ একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে কত খুসি হইল; তখন বুদ্ধি ক্রমেই ঠিক হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর দীর্ঘ বক্তৃতা।—রাজারাণী ও সব থাকা বড় অন্যায়—যখন হয়, তখন সকলেই তো এক রকম?—কথা সকল এত উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল যে পুলিন কাকা শুনিলে চারি হাতে পায়ে হাত তালি দিতেন।

মৌমাছি থামিলে কতক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া থাকিল। তারপর শোঁ শোঁ করিয়া কেহ কেহ রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ কেহ চোঁ বোঁ করিয়া কার্য-প্রণালী স্থির করিতে বসিল। কিন্তু উৎপাতটা নিতান্ত নূতন; কেমন করিয়া কি করিতে হইবে তার সম্বন্ধে মতটা কাহারও তত পরিষ্কার বোধ হইল না। কেহ কেহ বলিল "পুলিন কাকা যদি দেশের সব মৌচাকের কর্তা হতেন, তা হলে তিনি সকলকেই রাণী করে দিতেন,—বাঃ তবে কি মজাই হত!" বুড়ো তখন এক কোণ হইতে উকি মারিয়া বলিল "কাজ করে দেবার লোক না থাকলে রাণী হয়ে কি মজা পেলে বাপু?" দল শুদ্ধ মৌমাছিগুলি বুড়োর কথায় শোঁ শোঁ করিয়া উঠিল। বুড়োকে বোকা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। বলিল, "কেন, পুলিন কাকা কি এও

দেখবেন না যে যাঁরা এতদিন রাজা রাণী রাজপুত্তুর হয়ে বসে বসে মোটা হচ্ছেন তাঁরাই যত দিন বেঁচে থাকেন, অন্য সকলের কাজ করে দেবেন।"

বুড়ো হাসিয়া বলিল "তারা মরে গেলে পর?" "শোঁ—শোঁ—শোঁ—শোঁ।—বুড়ো চুপ মারিল। তার পর আর এক মৌমাছি উঠিয়া বলিলেন "সকলেই রাণী হবে এটা কেমন কেমন দেখায়। তাহলে মধু আন্‌বে কে? চাক তোয়ের কর'বে কে? বাড়ী বাঁধবে কে? ছেলে রাখবে কে? এর চাইতে রাণী টানী কিছু না থেকে সকলেই যদি খেটে খাই তাহলে কি ভাল হয় না?"

আবার ঐ নাছোড় বুড়ো কোণ থেকে উঁকি মারিয়া বলিল "তাতেই বা লাভটা কি হল? এখনও তো খেটেই খাচ্ছো!" বুড়োর কাণে কতকগুলি রাগ-সূচক শোঁ শোঁ শব্দ আসিল। বুড়ো আবার আপন কাজে গেল।

অবশেষে রাত্রি আসিল। ভালই হইল। দিবসের পরিশ্রম শেষ হইয়াছে—চাকের সকলে এখন নিঃশব্দে নিদ্রা গেল। কিন্তু যেই প্রাতঃকাল ফিরিয়া আসিল অমনি সেই হতভাগা আন্দোলন। পথিক মৌমাছি এবং তাহার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে ছোট ছোট দলে একত্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিল। অন্যান্য মৌমাছিরা নিজের কাজে এত নিবিষ্ট ছিল যে তাহাদের কেহ দেখিল না। কিন্তু কতকগুলি মাথাগরম যুবক ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া এরূপ ঝড় তুলিলেন যে আর কাহারও বুদ্ধি ঠিক্ থাকিল না। ঝগড়া বিবাদের উপক্রম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় আমাদের পথিক সেখানে উড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে বলিল যে সকলেই যখন বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের আর রাণী হওয়ার আশা বৃথা ; তবে রাজা রাণী ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত কর্মকার মিলিয়া একটা সাধারণ তন্ত্রই করা যাউক না কেন? কথাটা চমৎকার বোধ হইল ; সুতরাং সকলে বিনা আপত্তিতে চাক ছাড়িল। তাহারা খোলা বাতাসে আসিয়া বাগানে সকাল বেলায় বায়ু সেবন করিতে চলিল ; দলটিকে দেখিতে তখন বেশ দেখা গেল। কিন্তু মৌমাছির দলে রাণী নাই পথ দেখাবে কে? সুতরাং তাহাদের দল বাঁধাই সার হইল। তার পর সকলে মন্ত্রণার জন্য আবার একত্র হইল ; তখন কথা হইল 'কেমন যায়গায় বাড়ী বাঁধিতে হইবে।'

একজন বলিল "বাগানে আর কি।" আর একজন বলিল "না, মাঠে।" তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "ভাল একটা চালা ঘরের তলায়।" অন্যতম প্রস্তাব করিলেন "একটী গাছের গর্ত হলে আর কিছু চাইনে।" পঞ্চম কর্তার মত হইল "গাছের ডালে বেশ স্বাধীন ভাবে থাকা যায়।" সকলেরই ইচ্ছা তাঁহার নিজের মত বহাল থাকুক। সুতরাং তাহাদের মীমাংসার সম্ভাবনা খুবই দেখা গেল!

শেষে পথিক উঠিয়া বলিলেন "তোমাদের কারখানা দেখে বড় রাগ হয়। অর্দ্ধেকটা প্রাতঃকাল চলে গেল, এখনো যে গোলমাল নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতেই আছি!"

কলহকারিরা বলিল, "যে রকম বল্‌ছো, তাতে দেখছি তুমিই রাণী হয়ে উঠ্‌লে! আমাদের ইচ্ছে হয়েছে আমরা সারাদিন বসে কামড়াকামড়ি করবো, তোমার কি তাতে? তোমার কাজ তুমি করগে যাও।"

সে তাহাই করিল ; সে এখন বড় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছে। মনের কষ্ট দূর করিবার জন্য সে বাগানের ও পাশে গেল। সেখানে দেখিল অতি সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ সে ফুলের মধ্যে গিয়া বসিল,—যদি মধু সঞ্চয় করিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। আহা সে কত সুখ পাইল! মধু সঞ্চয় আর তাহার কাছে এত ভাল লাগে নাই? তাহার দৈনিক সেই সুখের গান ধরিল। তখন অন্যান্য দিনের মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে একান্তই ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে যখন একটা ফুলের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল তাহার বুড়ো আত্মীয় অন্য একটার ভিতর হইতে আসিতেছেন।

বুড়ো বলিলেন "কে জান্‌তো তোমাকে এখানে একা পাওয়া যাবে! সঙ্গীরা কোথা!"

"কি জানি ; তাদের বাগানের বাইরে ফেলে এসেছি।"

"কি কোচ্ছে তারা?"

"···মারামারি···" কথাটা কিছু বিরক্তির সহিত হইল।

বুড়ো একটু মিষ্ট মুখ করিয়া বলিল,—

"এমন সুন্দর সকাল বেলায় মৌমাছির আর কাজ কি!"

পথিক এবারে জব্দ হইয়াছেন ; বলিলেন "আর হাস্‌বেন না ; আমি কি করি, বলে দিন। পুলিন কাকা যে স্বভাব, স্বভাব, সাম্য ; সাম্য, করেন—শুন্‌তে তো বেশ শুনায়। কিন্তু যাই সব ভাই সমান হতে যবো, অমনি কেমনকরে যেন ঝগড়া বাধিয়ে বসি।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বয়েস কত?"

"সাত দিন।"

"আমার বয়স কি হবে?"

"সে হয়ত ক মাসইবা হয়।"

"ঠিক। আমি এক প্রকার বৃদ্ধ হয়েছি। তা-বাপু! এস একবার যুদ্ধ করি।"

"তা কখনই হবে না। আমার গায় বল বেশী, মশাই কষ্ট পাবেন।"

"তোমার চাইতে অত দুর্বল একটা জন্তুর উপদেশ নিতে এসেছ! বড় তাজ্জব দেখ্‌চি যে।"

"আজ্ঞে! আপনার গায়ে যোর নেই বলে কি আপনার জ্ঞান কম? আপনার জ্ঞান বেশী বলেই আপনার উপদেশ নিতে এসেছি। আমি বড় ন্যাকা হয়েছি, কেমন কেমন বোকা বোকা ঠেক্‌ছে।"

"বুড়ো, ছেলে—বলবান—দুর্বল—চালাক বোকা—সাম্যটা কোনখানটায় বাপু? তা যাক্ এ থেকেই করে দেওয়া যাবে একটা। তা চল আমরা একত্র থাকি।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোথা গিয়ে থাক্‌ব?

"আগে বল, মতের মিল না হলে মীমাংসা ক'রবে কে?

"আপনি ; আপনি জ্ঞানী।"

"উত্তম! খাবার মধু আন্‌বে কে?"

'আমি আন্‌বো ; আমার গায়ে বল আছে।"

"বেশ কথা ; এই দেখ, আমাকে। রাণী কর্‌লে আর তুমি কর্মকার হলে। আরে বোকা, সাবেক বাড়ী আর সাবেক রাণীতে কি কাজ চলে না? এই তো দেখ্‌ছো দু জন এক সঙ্গে থাকতে হলেই একজন হুকুম দিচ্ছে আর একজন খাটছে। একটা দল যখন হয় তখন কেমন হবে দেখ দেখি।"

মনের সুখে বুড়োর কথায় সায় দিয়া পথিক আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফুলের দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শেষে সে বলিল "এখন সঙ্গীদের দেখলে হয়।" এই বলিয়া দুজনে মিলিয়া বাগানের বাহিরে কলহকারী সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিল।

এখনও তাহারা বিবাদ করিতেছিল, কিন্তু আর তেমন উৎসাহ নাই। বুদ্ধির গোলমাল হইয়াছে। ইতিপূর্বেই অনেকে অন্যান্য দিনের মত মধু বহিয়া বাড়ী যাবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অত্যল্পকাল পরে দেখা গেল যে একদল মৌমাছি আনন্দে বোঁ বোঁ করিতে করিতে দলপতি বৃদ্ধ এবং পথিকের পশ্চাতে গালভরা মোম লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে।

যেই তাহারা ঘরে যাইবে, অমনি একজন দ্বারপাল তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিল "দাঁড়াও ; রাজপরিবারের একটী মৃত শরীর যাচ্চে।"

বাস্তবিকও তাই। শীঘ্রই একটী মৃত রাণী মৌমাছি দেখা দিলেন। দুধারে কর্মকার মৌমাছিগণ তাঁহাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহারা চাক হইতে তাহাকে ফেলিয়া মৃত সৎকার করিল।

অনেকের মনে বড় দুঃখ হইয়াছে ; সে জিজ্ঞাসা করিল "এ কেমন করে হল? রানীর তো কিছু হয় নি।"

প্রহরী উত্তর করিল "না না ; তবে আজ সকালে হঠাৎ চাকে একটা গোলযোগ হয়েছে। কয়েকজন আতুড়ে চৌকিদার আজ কোথা চলে গেছে। এর মধ্যে একটী ছোট রাণী মৌমাছি ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন ; ঘরটা আরো দু চার দিন বন্ধ থাকা উচিত ছিল। দুজন রাণীতে দেখা হতেই ওঁরা যুদ্ধ কর্তে লাগলেন। যুদ্ধ করে করে ছেলে রাণী মারা পড়েছেন। এবারে অত শীঘ্র আমরা এক ঝাঁক পাঠিয়ে দিতে পারবো না ; তা ওর আর কোন উপায় নাই।"

পথিক ভাবিল "কিন্তু এর তো উপায় হ'ত।" সেই এ সব ক্ষতির কারণ এই কথা মনে করিয়া তাহার ভয়ানক কষ্ট ও অনুতাপ উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ আত্মীয় তাহার গায়ে একটু ঠেলা দিয়া বলিলেন "দেখেছ রাণীরাও সকলে সমান নয়। রাজা একজনের বেশী একবারে হয় না।" পথিক মৌমাছি মনের দুঃখে বলিল "হাঁ।"— নিয়মে বাধ্যতা সকল সুখের মূল, অনিয়ম এবং অবাধ্যতাতে অনেক অসুখ, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে মানুষের কি করা উচিত তাহা কি আর শিখাইতে হইবে?

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৯-১৮৬।

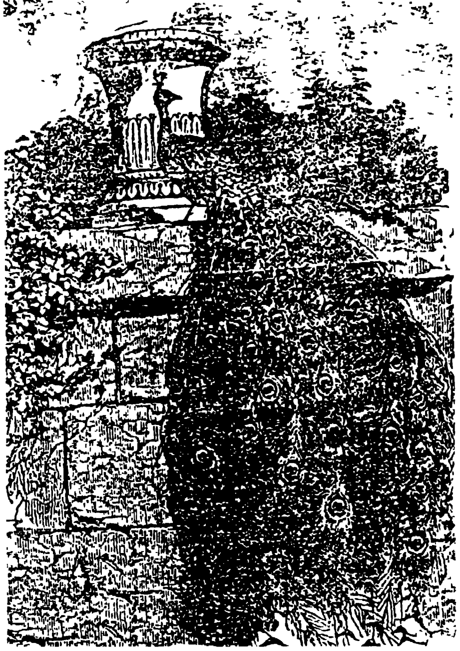
ময়ূর

প্রমদাচরণ সেন



ই যে দেয়ালের উপরে পাখিটী বসিয়া আছেন, উহাঁর সঙ্গে আমার কখনই বনিল না। আমি ছেলেবেলা হইতেই ময়ূরের উপর চটা। এখন অনেক বুঝিয়া, তবে একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি বটে, কিন্তু ময়ূরকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না। কেমন বিশ্রী ডাক, নীচু করে কি রকম সাপের মত গলা উচু চলা ফেরা কেমন কদর্য, এই সকল দেখিয়াই কার্তিক ঠাকুরের বাহনের

উপর আমি চটিয়াছি। দেবতা কার্তিক ঠাকুর যেমন বাবু, তাঁহার বাহনটী ও তেমনি, সুন্দর পোষাক-পরা রাজার ছেলের মত, ডানাগুলি ছড়াইয়া ময়ূর যখন সূর্য কিরণে উঁচু যায়গায় গিয়া বসে, তখন দেখিতে বড়ই চমৎকার। আবার যখন মেঘের সময় ডানাগুলি ছড়াইয়া 'পাকাম' ধরে, তখন ময়ূরকে কেমন দেখায় তাহা যে দেখে নাই, তাহাকে বুঝান যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তবুও ময়ূরকে আমি দেখিতে পারি না। ময়ূর যেন বড় লোকের মত সর্বদাই অহঙ্কারে ডগমগ হইয়া আছে—দেখিবে উঁচু যায়গা না হইলে তাহার বসা হয় না। খাবার খাইতে নীচু যায়গায় নামেন বটে, কিন্তু উড়িয়া বসিতে হইলে প্রায়ই চালের মটকায় বা কোটা বাড়ীর আল্‌সেতে গিয়া বসেন। তা, আবার বসিয়া কতবার গলা বাঁকান হয়, ঝুঁটি নাড়া হয়! উঃ তার রকম দেখিলেই গা জ্বালা করে। যাহারা জানে না, তাহারা সুন্দর পাখীটীকে দেখিয়াই মনে করে, না জানি উহার ডাক কত সুন্দর। ওইযা। খানিকক্ষণ বাদে পাখী ডাকিয়া উঠিল—ক্যাঁ য়্যাঁ-ক্যাঁ! ছি! ছি! ছি! এমন সুন্দর পাখীর এমন খারাপ স্বর?



একবার ভাবি ভাল, ময়ূরের অপরাধ কি? তাহাকে পরমেশ্বর যেমন করিয়াছেন, সে তেমনি আছে,—পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহার উপর কি বলিব? কিন্তু বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে এইরূপ ময়ূয়ের দল আছে, সে দোষ কাহার? দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কার সাজগোজ, সমস্তই ফিট্‌ফাট অথচ মাকাল ফলের মত এমন ছেলে মেয়ে অনেক আছে যাহাদের চরিত্রের দোষে তাহাদিগকে ভালবাসা যায় না। একটী সুন্দর বালক অথবা সুন্দরী বালিকা নিজের চেহারার অহঙ্কারে হয়ত কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কন না, কিম্বা একজন বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজেদের টাকার অহঙ্কারে দুচোখে পথ দেখেন না, কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া ভাল বাসেন না, আজ যাহার সহিত কথা কহিলেন, বেশ আলাপ করিলেন, কাল তাহাকে পথে দেখিয়া চিনিলেন না, আপনার গরবে আপনি মত্ত হইয়া বিয়াল্লিশ রকম অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে কোটাবাড়ীর উচ্চ আল্‌সে হইতে নীচু দিকে অনুগ্রহ করিয়া এক এক বার তাকাইতে লাগিলেন—অথচ বিদ্যা, গুণপনা কিছুমাত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই—এমন বালকবালিকাদিগকে ময়ূর বলিব না তো কি বলিব?

পরমেশ্বর যাহাকে রূপ দিয়াছেন, তাহাকে অহঙ্কৃত হইতে বলেন নাই ; তিনি যাহাকে ধন দিয়াছেন, তাহাকে বলেন নাই দরিদ্রকে অগ্রাহ্য করিও,—তবে এমন দশা অনেক সময়

দেখি কেন? এইরূপ বালক বালিকাদিগকে কেহই ভালবাসে না। ময়ূরের মত কেবল রূপ বা কেবল টাকা থাকিলেই বড় হওয়া যায় না, লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বড় হইতে হইলে নত হইতে হয়, সকলকে ভালবাসিতে হয়, গরিব দুঃখীকে দয়া করিতে হয়। আর তাহা না হইয়া, দয়াধর্ম ভুলিয়া যদি কেবল অহঙ্কারে ফুলিয়া থাকি, আশ্রিত গরিব দুঃখীদিগকে কষ্টদিতে কাতর না হই, তবে আমাতে আর মাকালফলে, আমাতে আর ঐ জেঁকো ময়ূরপাখীতে তফাত কি?

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ ১৮৬-১৮৬।

হাবা গঙ্গারাম

প্রমদাচরণ সেন



অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন কেহ কোন নির্বোধের কার্য করিলে তাহাকে অন্যান্য গালাগালির মধ্যে 'হাবাগঙ্গারাম' এবং 'বোকা রামমোহন' বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে। গঙ্গারাম কে ছিল, কোথায় তাহার বাড়ী ছিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না, তবে তাহার 'হাবা' নাম কেন হইল তাহার কতকগুলি গল্প আমরা শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিব। যাঁহাদের অধিক বয়স, তাঁহারা হয়ত এই গল্পের দুই একটী বা সমস্তগুলিই জানেন, কিন্তু আশা করি অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট ইহার প্রায় সমস্তগুলিই নূতন লাগিবে। আজ গঙ্গারামের কথা বলিলাম, পরে রামমোহনের কথা বলিব।

১। গঙ্গারাম যে বাড়ীতে চাকর ছিল, সেই বাড়ীর কর্তা একজন বড় পুলিশ-দারোগা ছিলেন, অনেক সাহেবসুবোর সহিত তাঁহার ভাব ছিল। গঙ্গারাম অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিল যে সাহেবরা বাড়ীতে আসিলেই তাহার-বাবু মাথায় টুপি পরিয়া নিকটে গিয়া সাহেবের হাত ধরিয়া নাড়েন ; গঙ্গারামের বিশ্বাস হইল সাহেব বাড়ীতে আসিলেই বুঝি এইরূপ করিতে হয়। একবার বাবু বাড়ীতে গেছেন, কিন্তু গঙ্গারাম বাসায় আছে, এমন সময় এক সাহেব একদিন বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিল। গঙ্গারামের বিশ্বাস ছিল সাহেবসুবো বাড়ীতে আসিলে যদি 'দস্তুরমত' ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে বাবুর বড় ক্ষতি। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া গঙ্গারাম যখনি দেখিল যে সাহেব আসিতেছে অমনি রান্নাঘরের কাজ রাখিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং বাবুর একটা টুপি মাথায় পরিয়া একটা কোট গায়ে জড়াইয়া বাহিরে গিয়াই সাহেবের হাত দুইহাতে ধরিয়া বিলক্ষণ ঝাঁকিয়া দিল। কিছু না বলিয়াও ছাড়িল না। বলিল "ফ্যাট্‌ফুট্‌ গাইড়্‌— বাবু বাড়ীতে গেছে"!! এই "দস্তুরমত" ব্যবহারে সাহেব অবাক হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল,—একমাস তাহার হাতে বেদনা রহিল। এদিকে রান্নাঘরে আসিয়া গঙ্গারাম বলিতেছে "হ্যা দাদাঠাকুর! বাবুব মান রেখেছি। সাহেবকে এমন আদব কায়দা দেখিয়েছি, যে আর কথা নাই।"

২। একবার একদল ডাকাত ধরিতে গিয়া গঙ্গারামের মনিবকে বড় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ডাকাতেরা তাঁহাকে একলা পাইয়া এমন প্রহার করিয়াছিল যে বাবুটীর অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না। গঙ্গারাম এতক্ষণ মার না খাইয়াও চীৎপাৎ হইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া

গোঁ গোঁ করিতেছিল, বাবু চৈতন্য পাইয়া ডাকিলেন 'গঙ্গারাম'! গঙ্গারাম চক্ষু না খুলিয়াই বলিল "দোহাই বাবা! আমার কেবলার আমি বই কেউ নাই।"—বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন গোঁ গোঁ কর—ডাকাত নাই ; চোখ খোল।" গঙ্গারাম কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু খুলিলে বাবু বলিলেন—"কোথায় কবিরাজ বাড়ী আছে যাও, এক চোঙ্গা ওষুধ তেল নিয়ে এস—বেদনায় প্রাণ গেল।"—সেই ঘরে এক পোয়া ওজনের একটী বাঁশের চোঙ্গা ছিল। গঙ্গারাম সেইটী লইয়া তেল আনিতে গেল। কবিরাজবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে গঙ্গারাম যে সকল কাণ্ড করিল, তাহা বলার নয়।—যাক্, কবিরাজবাড়ীতে গিয়াই সে মনিবের জন্য ঔষধ চাহিল। কবিরাজের লোক চোঙ্গা পূরিয়া ঔধষ দিল। পাড়াগেঁয়ে চাষালোকের কেমন দর করা অভ্যাস—গঙ্গারাম বলিল "একটু ফাঁউ দেবে না?" কবিরাজের লোক বলিল "কোথায় নেবে?" গঙ্গারাম আস্তে চোঙ্গাটী উল্টাইয়া ধরিল, বলিল "এইখানে দাও।" কবিরাজ বলিলেন "সব পড়িয়া গেল যে।" গঙ্গারাম দেখিয়াও সে কথা বিশ্বাস করে না, বলিল "অ্যাঃ, আর যেতে হয় না, ওটুকু খারাপ ; ভালটুকু ভিতরে আছে।" কবিরাজ হাসিয়া অপর দিকের ফাঁপা যায়গাটা ঔষধে পূরিয়া দিলেন। গঙ্গারাম 'বড় জিতিয়াছি' ভাবিয়া মনিবের নিকটে আসিল। মনিব বলিলেন "আর কোথা? মোটে এইটুকু?" গঙ্গারাম বলিল "ওদিকে আছে।" মনিব বলিলেন "যা যা! আর চালাকী কর্‌তে হ'বে না।" গঙ্গারাম বলিল "এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি? এই দেখুন।"—এই বলিয়া চোঙ্গাটী উল্‌টিয়া ধরিতে, যেটুকু ছিল তাহাও পড়িয়া গেল। বাবু তাহাই কোন মতে আঙ্গুলে টানিয়া লইয়া মাখিলেন। সে দিন শনিবার ছিল—গঙ্গারাম চিরকাল বিশ্বাস করিত যে তাহার দোষে নয়, কিন্তু শনির দোষে অন্য দিকের তেল উড়িয়া গিয়াছিল।

৩। একবার গঙ্গারাম মনিবের সহিত নৌকায় চড়িয়া কোন দূরস্থানে যাইতেছিল, অনেক জিনিষ—বিছানাপত্রে নৌকা বোঝাই। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় নদীতে পড়িয়া নৌকা ঢেউএর বেগে ভয়ানক টলিতে লাগিল। মাঝিরা বলিল "কর্তা! নৌকা বড় বোঝাই হইয়াছে, তাই এত টলিতেছে।" গঙ্গারাম এতক্ষণ কর্তার পশ্চাতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ভাবিতেছিল নৌকা ডুবিলে কর্তাকে ধরিয়া বাঁচিবে—মাঝির এই কথায় তাহার মনে একটা বুদ্ধি হইল। সে বলিল "বাবু! এক কাজ করলে হয় না? বোঝাটা একটু কমিয়ে ফেলি!" বাবু বলিলেন "কেমন করে?" গঙ্গারাম বলিল "ইঃ—এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি? এই দেখুন" ; এই বলিয়া কতকগুলি বিছানা বালিশ, ইত্যাদি এক সঙ্গে বাঁধিয়া মাথায় করিয়া বসিল। বাবু বলিলেন "ও কিহে?" গঙ্গারাম বলিল "এখন আমার মাথায় বোঝা, নৌকার মাথায় ত আর নয়? তবেই নৌকা পাত্‌লা হল।" সেই সময় ভাগ্যক্রমে ঢেউ কমিয়া আসিয়াছিল, দেখিয়া গঙ্গারাম বলিল—"দেখুন বাবু—বোঝা কমে গেছে ; কৈ আর তো নৌকা টল্‌ছে না। হাঁ! কেমন বুদ্ধি খেলেছি।"

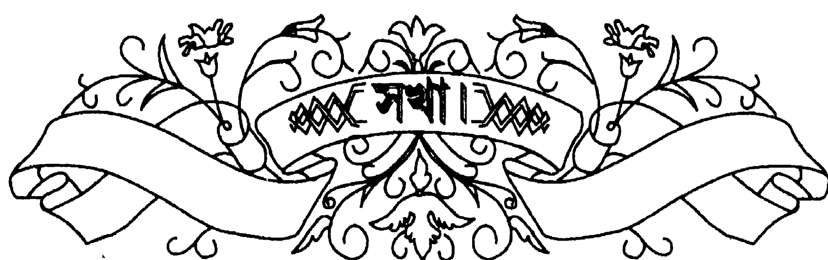
৪। গঙ্গারাম একবার দুমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। এক বুড়োমা এবং কেবলা নামে একটী ছোটছেলে ভিন্ন গঙ্গারামের আর কেহ নাই। গঙ্গারাম বাড়ীতে আসিয়াই খুব ঘটা করিয়া বড়লোকের মত বেড়াইতে লাগিল ; কারণ সে বড়লোকের চাকর। সে প্রাতঃকালে খাইয়াই তাস পাশা খেলে, ছেলেকে আদর করে, এবং পাড়ার দশজনের সঙ্গে নানারূপ গল্প করে,—বৈকালে বেড়ায় ; হাটবারে হাট করিয়া বাড়ীতে আসে। রাত্রিতে বুড়োমাকে সাহেবের

গল্প, ডাকাতের গল্প প্রভৃতি নানারূপ গল্প বলে। এইরূপে অনেক দিন যায়, একদিন হাটবারে গঙ্গারাম একটী টাকা লইয়া হাটে লবণ কিনিতে গেল। পথে খানিক দূরে গিয়া দেখিল ৪ ক্রোশ দূরে যে জমীদারের বাড়ী আছে, সেখানকার হাতী মাহুতকে পিঠে করিয়া লইতে আসিয়াছে। হাতী দেখিয়াই গঙ্গারামের "বড়লোকের চাল"টা বাড়িয়া গেল। সে মাহুতকে ডাকিল, "ও মাহুত, মাহুত! আমায় হাতী চড়াবি" মাহুত বলিল "কত দেবে?" গঙ্গারাম লবণ কিনিবার টাকাটী বাহির করিয়া বলিল "একটী টাকা"। মাহুত বলিল "এস"। গঙ্গারাম বলিল "আমাকে কিন্তু সমস্ত গ্রাম ঘূরাইয়া বাড়ীর কাছে পৌছাইয়া দিতে হইবে।" মাহুত তাহাতেই রাজি হইলে গঙ্গারাম হাতির পিঠে উঠিল। উঠিয়া গঙ্গারামের বাহার দেখে কে! হাতীর চলিবার ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া গঙ্গারাম "হ্যাইও! হ্যাইও!" করে, এবং যাহাকে পথে দেখিতে পায়, তাহাকেই বলে "কিহে খবর কি! বাড়ী যাচ্ছি!" যখন মাহুত গঙ্গারামকে বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিল, তখন গঙ্গারামের মা সেখানে ছিলেন না; ছেলের এমন বাহার মা দেখিলেন না, ইহাতে গঙ্গারামের বড়ই কষ্ট হইল। যাক্, কি হবে? গঙ্গারাম বুক ফুলাইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল। মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গঙ্গা! নুন কোথায়?" গঙ্গারাম গম্ভীরভাবে বলিল—"আনিনি!" মা বলিলেন "তবে টাকা?" গঙ্গারাম খানিকক্ষণ মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকিল, কোন উত্তরই দিল না। পরে বারবার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিল "যাও যাও! যা কোন পুরুষে হয় নাই, তাই হয়ে গেছে এক টাকায়!" মা বলিলেন "ওমা সেকি?" গঙ্গারাম বলিল "হা! হা! হা! বাদশার মত হাতী চড়ে এসেছি! তার কাছে আর নুন"?

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন "হাবাগঙ্গারাম" কেউ আছে?

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৮৯-১৯১।





কবিতা, ধাঁধাঁ ও অন্যান্য



আঃ ছেড়ে দাও না!

প্রমদাচরণ সেন



আঃ ছেড়ে দেওনা কুকুরচন্দ্র
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে, ভাই?
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোওয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে, 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটা সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে ক'রব খেলা যত ভেবে পাই।
কাজ ছেড়ে না ক'রব খেলা, ছেড়ে দাও না হলো বেলা!
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই!

: ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৮।

ঊষা

প্রমদাচরণ সেন

উঠ, উঠ, ছোট বোন! পোহাইল রাতি ;
কতকাল রবে আর পড়িয়া শয্যায়!
ওই দেখ ডালে ডালে ফুল কত জাতি!
বাগান করেছে আলো বিমল শোভায়।

ওই শোন পাখীগণ ধরিয়াছে গান,
টুপটাপ্‌ জলবিন্দু যেন তাল ধরে ;
আলোকে শিশিরজল হীরক-সমান
শোভা পায় ; ঝুপ্‌ ঝুপ পড়ে বায়ু ভরে।

গুন গুন রব তুলি শ্রমী মধুকর,
মধু আশে ঘুরিতেছে বাগান-মাঝার
চলি ফিরি পরিশ্রমে না হয় কাতর—
মধু ঘুটে, ছুটে ছুটে ফিরে অনিবার।

চেয়ে দেখ জলাশয়ে ছোট মাছ কত
লেজ নেড়ে উচু নীচু ছুটিয়া বেড়ায় ;
জল নাড়ে খেলা করে, যার সাধ যত ;
প্রভাতের কাজে সবে শরীর লাগায়।

ওই দেখ মাঠে বসি, ছাড়িয়া গোপাল
গাছতলে, কুতূহলে রাখাল বসিয়া
করে গান, সুখী-প্রাণ ; সম্মুখে জাঙ্গাল
ভয় নাই কোন গরু যাবে হারাইয়া।

ছুটিয়া মায়ের কাছে, চলিছে বাছুর
মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে পলাইয়া যায় ;
মেয়ের শাবক মাকে দেখিয়া সুদূর
'ভ্যাভ্যা' রবে দুধ পানে মার পানে ধায়।

ওঠ বোন কতকাল রবে ঘুমাইয়ে,
পৃথিবীর সব জীব জাগিয়া উঠেছে ;
এ সময়ে কোন্‌ লাজে থাকিবে পড়িয়ে!
ওঠ ওঠ! রাঙ্গা রবি ওই প্রকাশিছে!

এমন সাধের দিবা কাটিলে নিদ্রায়,
কিবা কাজ হবে বোন তাই ভাবি মনে ;
ওঠ ওঠ! ছি ছি একি! দিন বহি যায়,
নিজ কাজে রত হও পরম যতনে।

গাভী মেষ আদি যত সবাই চেতনে,
পশু তারা তবু সবে নিজ কাজে রত!
তুমি তবে বল বোন! বলনা কেমনে
কাটাইছ কাল, আহা! নির্বোধের মত?

যাঁহার করুণা বলে এদিন পাইলে,
সুখেতে কাটিছ দিবা যাঁহার কৃপায়,
রজনীতে যাঁর কৃপা গুণেতে বাঁচিলে
আঁখি মেলি, ভক্তি ভাবে পড় তাঁর পায়।

১ : ১ । ১৮৮৩, পৃ. ৪।

আমার সাধের বিড়াল

প্রমদাচরণ সেন



সাধের বিড়াল মম আয় কোলে আয়!
'মিউ' মিউ' ডাক ছেড়ে মহাসুখে উঠে পড়ে,
ধীরে ধীরে লেজ নেড়ে আয় পায় পায়!
দেখিয়ে শরীর তব নয়ন জুড়ায়।

তোরে ভালবেসে মনে সুখ হয় কত!
এ ঘরের লোক হয়ে, থাক্ 'দলবল' লয়ে—
'ছেলেপিলে'ডেকে আন্, আছে তোর যত—
বেড়া ছুটে, খেলা কর্ নিজ মন মত।

কেমন শরীর আহা ধব্ ধব্ করে
কাল কাল মিশি তায়, মরি কিবা শোভা পায়!
চিকণ কেশের শোভা কি বাহার ধরে।
কোমল চরণ যেন আরামের তরে!

বড় ভালবাসি তোরে সাধের বিড়াল!
কাছে এলে কোলে করি কত সুখ, হয় মরি!
তোমারি কারণে দূরে ইঁদুরের পাল।
দুধ দিয়ে তাই তোরে পুষি চিরকাল।

কিন্তু বড় দুঃখ মনে, লোকে দেয় গালি
"বিড়াল লোভীর শেষ, নাহি বোঝে
কাল দেশ,
আপন উদর সার—এই ভাবে খালি!
খেদাও এমন জীবে মুখে দিয়ে কালী।"

বোবা তুমি আহা মরি! নহিলে এখন
দাঁড়াইয়া, উচ্চস্বরে ডাক দিতে নারী নরে—
করিতে তোমার এই কলঙ্ক ভঞ্জন।
হেন অপবাদ কেবা সহে অকারণ।

আমি জানি এ দুর্ণাম কি হেতু তোমার।
মানুষের অত্যাচারে মর তুমি অনাহারে,
ক্ষুধার বেলায় তাই না থাকে বিচার!
কেন মিথ্যা নিন্দা তবে হয় বারে বার?

উদর ভরিয়া খেতে দেয় কত জনা?
কষ্ট দেয় ঘরে পুরি, তাই তুমি কর চুরি—
পেটের জ্বালায় দোষী! তবে এ গঞ্জনা
কেন দেয় সবে মিলে? কেন এ লাঞ্ছনা?

আমার মতন সবে ওহে শিশুগণ!
যত্ন কর বিড়ালেরে—দেখ সে কি চুরি করে?
ভাল বাসে কি না বাসে আত্মীয় মতন!
কে কোথা রতন লভে বিনা সুযতন?

আমারি বিড়াল তুমি আমারি রহিবে—
উঠিয়া আমারি কোলে—ঘুমাইবে ঘুম পেলে
ভয় পেলে পাশে আসি ছুটে লুকাইবে
আমারি ঘরেতে সুখে জীবন যাপিবে।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ২৭-২৮।

প্রকৃতির শোভা

মনোরঞ্জন গুহ

১

আকাশে উঠেছে তারা
বাগানে ফুটেছে ফুল।
থোকা থোকা ফল ঝোলে
ডালে ডাকে পাখীকুল॥

২

নিশি করে ঝক্‌মক্
নদী করে কুল কুল!
পুরাণ পুকুর পারে
ফুটেছে বকুল ফুল॥

৩

মাঠেতে করেছে শোভা
থোকা থোকা পাকাধান।
প্রহরী চাষার ছেলে
মনে সুখে করে গান॥

৪

সপ সপ বায়ু বয়
পাতা করে মর্ মর্।
ঝন্ ঝন্ ধান বাজে
হেলে দুলে নাচে খড়।

৫

আকাশে উঠিয়ে চাঁদ
আলোক করিছে দান।
পুলকেতে পৃথিবীর
হাসি হাসি মুখ খান॥

৬

আধঘুমে জেগে উঠে
চাষার কোলের ছেলে
মধুমাখা আধ বোলে
কিতেছে মা মা বলে॥

৭

ঘন ঘন পেঁচা ডাকে
ভয়ে কাঁপে পাখীগণ।
বালক বালিকা বুড়ো।
ঘুমে সব অচেতন॥

৮

কালি হবে বাকি পড়া
আজি পড়া রেখে দাও।
হয়েছে অনেক রাতি
বই রেখে ঘুম যাও॥

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৮৮।



ওরে আমার পায়রা মণি

মনোরঞ্জন গুহ

ওরে আমার পায়রামণি কোথায় ছিলে এত বেলা?
খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে কোথা গে ক'র্‌ছিলে খেলা?
পেটের ভিতর পেট পড়েছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
এমন করে থাক্‌তে আছে
নাওয়ায় খাওয়ায় করে হেলা?
জান না, মা বলেন আমায়
"খেলায় ভুলে খেলে বেলায়,
পিত্তি পড়ে অসুখ হবে দুঃখ পাবে কত,
কটু, কষা, তেত ওষুধ খাইয়ে দেবে কত!!"
আর কখন এমন ক'রে,
খাবার ফেলে খেলার তরে,
পিত্তি পড়ে থেকনাক অবোধ ছেলের মত!
তা হ'লে ধন! দেখবে তখন ভালবাস্‌বো কত!
কত খাবার তোমার তরে, রেখেছি যে যত্ন করে,
দেখবে চল খাবে চল ক্ষিদে আছে যত;
মটর, কলাই, চাউল, ছোলা,
রেখেছি ওই ভরে ডালা,
যা'চাও তাই দেব যাদু! খাবে ক্ষিদের মত!
দু-পায় দুটী দেব ঘুমুর, বাজবে কেমন ঝুনুর ঝুনুর,
আহ্লাদেতে নাচবে যখন "বাকুম বাকুম" ক'রে।
মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি দেখবো দু চোক ভরে!
আবার যদি এমন তর, খাবার খেতে বেলা কর,
দেখ তখন বকবো কত অবোধ ছেলে ব'লে!
আর দেব না আদর তোমায় নেবনা আর কোলে!!



১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ ১১২।



দুর্গা-পূজো

প্রমদাচরণ সেন

লেগে গেল ঘোর রঙ্গ, উৎসবে মাতিল বঙ্গ,
রেলের গাড়ীর ঘরে বাধিয়াছে গোল—
সহরের ঘরে ঘরে, ছেলেগুলো গোল করে,
দোকানী পশারী সবে তুলিয়াছে রোল।
পটকা বন্দুক লয়ে, মারবেল বোঝা ব'য়ে,
ছেলে বাবু তাড়াতাড়ি চলিছেন ঘরে,
কর্তার না হয় ঘুম, পূজার বাড়িছে ধুম,
কি হইবে, কি করিব, ভাবেন অন্তরে।
শুকায়েছে কাদা জল, হাসিতেছে নভস্তল,
পরিয়ে চাঁদের আভা—আপনার গলে,
কুহুহু কোকিলা গায়, কুলকুল নদী ধায়,
শ্যামলা প্রকৃতি যেন হাসে প্রাণ খুলে।
পূজার বাড়ীতে আজি, মনোহর বেশে সাজি
ঘোরে ফেরে দলে দলে ছেলে আর মেয়ে ;
গরিবের ছেলে যারা, মনোদুঃখে মনে মারা
তারাও পরেছে আজি সুবসন চেয়ে।
কিন্তু এ আনন্দ দিনে, আহা ! কত দীন হীনে
অনাহারে দিনে দিনে যায় শুকাইয়ে,
পিতা মাতা নাহি যার, দিবা রাতি হাহাকার,
সুখহাসি চির তরে গেছে পলাইয়ে।
উৎসবেতে রুচি নাই, হেন কত শত ভাই,
নীরবে আকাশে চেয়ে ফেলে নেত্র নীর—
'কবে প্রাণ বাহিরিবে, এ যাতনা দূরে যাবে,'
ভাবে তাই কোলে বসি ঘোর রজনীর।
আজি ইহাদের তরে, কার অশ্রু জল ঝরে,
উৎসবেতে উষ্ণশ্বাস পড়ে আজি কার ?
কার প্রাণ দয়া ক'রে, আজি অভাগারে স্মরে,
কে শুনিছে আজি ওই ঘোর হাহাকার ?
আমার ভগিনী ভাই ! প্রাণে ব্যথা, বলি তাই,
দুখীরে রাখিও মনে এই সুখ-দিনে,
আর কি চাহিতে পারি,— বিন্দুমাত্র অশ্রুবারি,
ফেলাইও ফেলাইও স্মরি দীন হীনে।

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৫৮।

শরদের নিশি

রজনীকান্ত চৌধুরী

১

কাননে ফুটেছে ফুল,
গগনে ফুটেছে তারা,
শরদের নিশি খানি,
হাসিতেছে মুখভরা।

২

বিমল চাঁদিমা খানি
সুনীল গগন কোলে
হাসিতেছে ভাসিতেছে
ডুবিছে মেঘের কোলে।

৩

ঝক মক্ করিতেছে
যেন রজতের থালা,
মেঘে ডুবি খেলিতেছে
কত লুকোচুরী খেলা!

৪

ধবল আলোক তার
পড়েছে গঙ্গার গায় ;
ঝিকি মিকি করিতেছে
মরিকি শোভিছে হায়!

৫

ঝপা ঝপ্ দাঁড় বেয়ে
তরণী দিয়েছে সারি,
দাঁড়ি মাঝি মন খুলে
গাইছে সুখের শারি।

৬

কাঁপিছে গাছের পাতা
মৃদুল পবন বায়,
আহা কি শীতল বায়ু
শরীর জুড়ায়ে যায়।

৭

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সকলি ধবল ময়,
ধবল তুষারে বিশ্ব
নিরমিত মনে হয়।

৮

সাধ হয় মনে মনে
বিষম দাসত্ব ফেলে,
আজীবন শুয়ে থাকি
এ হেন নিশির কোলে।

৯

টুপ টাপ্ পড়িতেছে
বকুলের ফুল গুলি ;
প্রভাতে গাঁথিব মালা
ভাই বোন্ দোহে মিলি

১০

এ হেন সুখের নিশি,
হেরিনু কৃপায় যাঁর,
আয় বোন্ করযোড়ে
প্রণমি চরণে তাঁর।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭১।



ভাইবোনের দোলনা

কুমারী হিরণ্ময়ী দেবী

পূরবে উঠেছে রবি, ঊষার হিঙ্গুল ছবি,
সুমুখে খেলিছে ;
বকুলের তরুকোলে, চারু লতিকার দোলে,
দুজনে দুলিছে।
বকুলের ফুলগুলি, টুপ্‌টাপ্‌ খুলি খুলি,
মাথায় পড়িছে ;
হেলি চলি দুইজনে, দুলিছে আপন মনে
(আর) চাহিয়া রয়েছে।
নিকটেতে রবিকরে, করুণার জল ঝরে,
কি শোভা তাহার।
দিশেহারা ভাইবোনে, দুলিতেছে একমনে ;
একি চমৎকার!
শিশির মুকুতা-কণা, রোদে ধরি বর্ণ নানা,
গড়ায়ে পড়িছে ;
কেহবা জড়ায় দেহ, কপোলে পড়িয়া কেহ,
সোহাগ করিছে।
ক্রমে মৃদু হেলি দুলি, ওই ঊষা গেল চলি ;
তবুও দুলিছে!
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'য়ে হারা, জগৎ পাশরে তারা ;
তবুও দুলিছে!
হায়রে! কি ছেলে এরা! কেনরে এমন ধারা,
আপনা পাশরি,
প্রখর রবির করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে,—
তবু দোলা ধরি?
দু'একটী রবিকর, সাহসে করিয়া ভর,
ঘন পাতা ছেড়ে,
ছেলেটীর মেয়েটীর, মুখের উপরে—ধীর,
মৃদু আসি পড়ে।
কি জানি কি ভাবে ভোর, কি লেগেছে ঘুমঘোর
কথাটী না সরে ;
ভুলিয়ে জগত-জনে— দোলা ধরি সযতনে,
যায় আর ফেরে।
ওই চলি গেল বেলা, সাঙ্গ নাহি হ'ল খেলা ;
হবে কি জীবনে?
ওই যে পড়িল ডুবি, দেখ রে সাঁঝের রবি,
পশ্চিম গগনে!

ছাড়ায়ে অনন্ত কায়া—অর্ধ আলো অর্ধ ছায়া-
গোধুলি আসিছে ;
পাখীগুলি কাছে এসে, গান গেয়ে হেসে হেসে,
কত কি ভাষিছে!
হেথা হোথা রাঙ্গারাঙ্গা, মেঘগুলি ভাঙ্গাভাঙ্গা,
বেড়ায় ভাসিয়া।
রাত্রি হ'ল সুগভীর, সাড়া শব্দ পৃথিবীর,
যাইল মিশিয়া।
বালার মুখের পরে, জ্যোছনার থরে, থরে,
কি শোভা ধরিছে!
নিশীথ আকাশে তারা—হইয়ে অবাক-পারা,
তাহাই হেরিছে।
ক্রমে ফুরাইল রাতি, তারাসহ ইন্দুভাতি,
যাইল নিভিয়া ;
রাঙ্গা রবি পুবাকাশে, দেখা দিল পুনঃ হেসে,
মানস মোহিয়া।
তবু একি? না ফুরায়—কি এ খেলা? একি দায়!
হারায়ে চেতনা ;
তুলিয়া ঘরের কথা, ভুলি নিজ পিতামাতা,
ক্ষুধার যাতনা?
হায়রে এ পৃথিবীতে, জীবনের এ দোলাতে,
কত ছেলে মেয়ে,
ভুলে ঘর পরিজন, ক্ষুধা. তৃষ্ণা, বিচেতন—
দুলিছে পড়িয়ে!
দিন যায় রাতি আসে, নবারুণ পুনঃ হাসে,
চেতনা না হয় ;
মায়েরে পাশরি সবে, না জানি কেমন ভাবে,
মাতিছে খেলায়?
যেতে হবে পরলোকে—আরাম মায়ের বুকে ;
নাই তাহা মনে!
হেথা এসে ভুলে গিয়ে, কি ছার খেলানা নিয়ে
আছি রেতে দিনে।
জানি নাক কবে, হায়! জীবনের এদোলায়,
দোলা ফুরাইবে ;
জগৎ জননী কোলে—লুকাইব 'মা' 'মা' বলে
হেন দিন কবে!'

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

ধাঁধা

১। নাক হাতে করিয়া যায় কে?

২। —া—া—া—া = খাইতে মিষ্ট। প্রত্যেক ড্যাসের যায়গায় একটী মাত্র অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বসাইতে পারিবে। বলত কি জিনিশ?

৩। এরূপ ভাবে কতকগুলি কথা স্থাপিত করা যায়, যে লম্বার দিকে, চওড়ার দিকে—যে দিকে পড়িবে, একই কথা হইবে। যথা :—

অ—তু—ল
| | |
তু—মি—ও
| | |
ল—ও—না

এখানে লম্বা এবং চওড়ার প্রথম ছত্র 'অতুল', লম্বা এবং চওড়ার দ্বিতীয় ছত্র 'তুমিও', লম্বা এবং চওড়ার তৃতীয় ছত্র 'লওনা'। সমস্তটা এক সঙ্গে লইলে 'অতুল, তুমিও, লওনা' এই কথাগুলি হইল। এইরূপে 'মদন' এবং প্রমদা' এই দুটি কথার দ্বারা এইরূপ চতুষ্কোণী বিভাগ পদ রচনা কর দেখি।

৪। রামের বয়স যত, সরলার বয়স তত ; রাখালের বয়স তাহার দ্বিগুণ ; নবীনের বয়স রাখালের অর্দ্ধেক, চপলার বয়স নবীনের অর্দ্ধেক ; লাবণ্যলতার বয়স চপলার অর্দ্ধেক। রাখালের বয়স যদি ছ কুড়ির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়, তবে কাহার বয়স কত?

৫। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া তাহাতে কাহার নাম হয়, বাহির কর :—

নাম	বিশেষ পরিচয়
লঙ্কামোদহরমনর্কাতন—	ছেলেদের জন্য কতকগুলি পুস্তক লিখেছেন ; মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হ'লে যখন কেহই প্রথমে মেয়ে দিতে সাহসী হন নাই, তখন ইনিই প্রথমে আপনার মেয়েকে স্কুলে দিয়া জাতিচ্যুত হন, এবং অন্য সকলের মেয়ে দিবার পথ পরিষ্কার করে দেন।
শত্রন্দ্ররচমেমি—	কোনও এদেশীয় লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই, বড় লাট রিপন বাহাদুরের অনুগ্রহে ইহার সেই প্রধানতম পদ লাভ হইয়াছিল।

৬। একমাত্র চক্ষু মোর তাতে জ্যোতি নাই ;
অথচ তাতেই মম কার্য হয়, ভাই ;
মুখ মোর তীক্ষ্ণ অতি,
ব্যস্ত থাকি দিবা রাতি,
দরিদ্রের ঘরে তার জীবিকা যোগাই।

কাছে থাকি বালিকার,
কত কার্য করি তার ;
সুন্দর সুন্দর কাজে আমিই সহায়।

১ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১৫-১৬।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। হাতী। ২। ব-া-ত-া-স-া।

৩। ম—দ—ন অথবা ম—দ—ন
| | | | | |
দ—ম—ন দ—শ—ম
ন—ন—দ ন—ম—স্

দ্বিতীয় পংক্তির 'দমন এই কথাটীর স্থানে 'দহন' 'দলন' 'দর্শন' এই কথাগুলিও বসান যায়।

প্র—ম—দা
| | |
ম—দ—ন
দা—ন—ব

৪। রাখাল ২৪ ; রাম ১২ ; সরলা ১২ ; নবীন ১২ ; চপলা ৬ ; লাবণ্যলতা ৩।

৫। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ; রমেশচন্দ্র মিত্র।

৬। ছুঁচ।

নূতন

১। কোন্ নিরাকার ফুল সাকার হলে লেবু হয়?

২। এমন চারিটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর এক সঙ্গে লইলে একটী নগরের নাম হয়, এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে ভয় হয়? কাথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটীর অর্থ : হাতির শাবক।
২য় ... ... : কালীকলমের কাজ।
৩য় ... ... : তোপ।
৪র্থ ... ... : চুরুটের কাছাকাছি।

৩। 'সুশীল' এবং 'তরলা' এই দুটী কথা দ্বারা পূর্ব্ববারের ন্যায় চতুষ্কোণী দ্বিভাগ পদ রচনা কর দেখি?

৪। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় বাহির কর :—

নাম	বিশেষ পরিচয়
অমৃতাবিষ্যরিকা—	এই দোষে মানুষ পড়লে তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হয় ; তাতো হবেই। বিবেচনা না করে কাজ ক'রলে বিপদ কে রাখে!

মালমদকেত্তন ধুই সূদ— ইনি অনেকগুলি খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কেহ কেহ ইহাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট কবি, কেউ বা অতি নীচ রকমের কবি বলিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন ইনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন লোকের প্রশংসা বা নিন্দা ইহাঁর কি করিবে? অতি গরিবভাবে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

৫। গলায় দড়ি গোল গা। পেটের মধ্যে হাত পা। সদা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। চলে কিন্তু নড়েনা। এটা কি তা বল না?

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৩২-৩৩।

পূর্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ‘কমল’ নিরাকার অর্থাৎ আকার নাই তাহাতে আকার যোগ করিলে ‘কমলা’ হইল।

২। ক র ভ প্রথম অক্ষরগুলিতে ‘কলিকাতা’
লি খি য়া এবং
কা মা ন শেষের অক্ষরগুলিতে ‘ভয়ানক’
তা মা ক হইল।

৩। সু শী ল এবং ত র লা
শী ত ল র সা ল
ল ল না লা ল সা

৪। অবিমৃষ্যকারিতা ; মাইকেল মধূসূদন দত্ত।

৫। পকেট ঘড়ি।

[শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া, ইহাঁরা উপরের প্রশ্নগুলিব ঠিক উত্তর করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, কলিকাতা এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর ;ইহাঁরা একটী ভিন্ন আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।]

নূতন

১। ি—ি—ি— = খাইতে মিষ্ট ।—।—।—।—। = খাইতে মিষ্ট।

২। পুস্তকেতে আছি আমি, নাই কিন্তু মনে,
কাননেতে আছি আমি, নাই কিন্তু বনে।
কলিকাতা মাঝে আমি দুই ঠাঁই থাকি,
অথচ সহরে মোরে পাবে না নিরখি।
শিক্ষকেতে আছি আমি পণ্ডিতেতে নাই।
বল দেখি কোন্ প্রাণী আমি হই ভাই।

৩। আমার ১ম ও ৩য় অক্ষর···এক সঙ্গে লইলে—আশা।
———১ম ও ৪র্থ অক্ষর···ফলারে বামণের আশা কিন্তু পোড়োর ভয়।
———১ম ও ৫ম অক্ষব···বড়লোকে মাথায় বাঁধে।
———২য় ও ৪র্থ অক্ষর···এ সময়ে ছেলেরা বাহির হয় না।

——২য় ও ৫ম অক্ষর···চটা মেজাজ।

——২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ অক্ষর···একটা রাক্ষস।

বলত আমি কে?

৪। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় তাহা বাহির কর :

নাম	বিশেষ পরিচয়
সূর্ঘতাদীত্র—	এই দোষে লোকের কোন কাজ হয় না ; এ দোষ যাহাকে ধরে তাহাকে কি বিদ্যালয়ে কি অর্থোপার্জনে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে দেয় না। ইংরাজীতে ইহাকে লোকে সময়ের চোর বলিয়া থাকে।
রণতাশ্ব পয়রাঈ—	এই গুণ থাকলে মানুষ কখনও ক্লেশে পড়ে না, ঈশ্বরই তাহার সহায় হন।

৫। একটী ছেলে তান ছেড়ে দেশের কাছে গেল ; অমনি সে একটী ভাল খাবার জিনিশ হয়ে গেল! বল দেখি কেমন করে?

৬। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মম ধাম
দ্বিতীয় ছাড়িলে অর্থ অল্প-মাত্র হয়।
তৃতীয়ে ছাড়িলে পরে যন্ত্র অর্থ সবে করে
ভাষার বাহক আমি কেবা মহাশয়?

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, ৪৭-৪৮।

পূর্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। জি—লি—পি ; ছা—না—ভা—জা। ২। 'ক' এই অক্ষরটী। ৩। পারাবতগণ। ৪। দীর্ঘসূত্রতা ; ঈশ্বরপরায়ণতা। ৫। 'সন্তান' এই কথাটী হইতে 'তান্' ছাড়িয়া দিলে সন্ থাকে, তাহার নিকটে 'দেশ' এইটী বসাইলে 'সন্দেশ' হয়। ৬। কলম।

[নিম্নলিখিত স্থান হইতে উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর পাওয়া গিয়াছে ;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল ; শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য, পারসীর বাগান, কলিকাতা ; শ্রীছমিরদ্দীন আহম্মদ, কলিকাতা মাদ্রাসা ; শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া ; শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপালপুর ; শ্রীসতীনাথ বসু, বাগেরহাট ; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীমুক্তিদারঞ্জন বায়, কিশোরগঞ্জ।]

নূতন

১। আমার প্রসাদে কেহ ধনরত্ন পায়.
কৃপায় আমার কারো তৃষ্ণা দূরে যায় ;
তিনটী অক্ষর মম সুন্দর শরীরে,
প্রথম ছাড়িলে সবে ঘৃণা করে মোরে।
দ্বিতীয় ছাড়িলে পরে বালক উল্লাসে,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণে ন্যূনতা প্রকাশে।
কালেতে সুলভ আমি অকালেতে নই,
বলতো সুবোধ শিশু আমি কেবা হই।

২। একি দেখি সর্বনাশ! ডাকাতে ঘিরিল বাড়ী
ঘেরা হ'তে ঘর পালালো, গৃহীর গলায় দড়ি!
বলতো কেমন করে?

৩। আমি যদি না থাকি, তা' হ'লে রক্ষা থাকে না ; কিন্তু তবুও মানুষ আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। আমার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে থাকবার জায়গা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে খেলবার জিনিষ হয়। বলতো আমি কে?

৪। রাখালের বাপ আমার সমস্তটা ;তিনি এক দিন আফীশ্ হইতে আসিয়া আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিয়া দেখিলেন, রাখাল তাঁহার হুকুম না মানিয়া তাহার ভগ্নীর প্রথম ও তৃতীয় লইয়া খেলা করিতেছে ; তিনি রাগিয়া রাখালকে আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারিলেন।

৫। গ্রীষ্মকালে পথ হাটিয়া যে মানুষ বাড়ীতে আসে তাহাকে পাখী বলা যায় কি না? পাখীতে তাহাতে তফাত কি?

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৬৪।

পূর্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। কমলা=লক্ষ্মী, লেবু। ২। জাল দিয়ে মাছধরা। ৩। বাতাস। ৪। উকীল। ৫। দুয়েরই পাখা আছে, প্রভেদ এই পাখীর পাখা শরীরে, বাবুর পাখা হাতে, বাতাস খাইতেছেন।
[নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে উপরের উত্তর গুলি সমস্ত পাওয়া গিয়াছে ;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল ; যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যাসডাঙ্গা ; সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, কলিকাতা ; শ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া ; বিহারীলাল গোস্বামী এবং হরিভূষণ গুপ্ত, পাবনা।]

নূতন

১। একটী সাড়ে চার বৎসরের বালক 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে :
—"বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে"—কে?

২। একজন শিক্ষকের অনেকগুলি ছেলে, তাহাদের মধ্যে একজন খুব চালাক। শিক্ষক একদিন রাগিয়া তাহার আক কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। বলতো খাওয়াটা কি রকম হইল?

৩। এমন সাতটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষরগুলি একসঙ্গে লইলে একজন লাট সাহেবের নাম, শেষের অক্ষরগুলি একসঙ্গে লইলে অন্য একজন লাট সাহেবের নাম হয়।
কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটী ইংরাজী	=	কার্য বিবরণ।
২য় কথাটী	=	অত্যন্ত।
৩য় কথাটী	=	৯০০।
৪র্থ কথাটী	=	বাণান।
৫ম কথাটী	=	সর্বদা।
৬ষ্ঠ কথাটী	=	২ নয়।
৭ম কথাটী	=	প্রস্তুত করিব।

৪। নিম্নলিখিত পত্র খানির মধ্যের শূন্য স্থান পূর্ণ কর, কেবল সাবধান হইবে যে প্রথম শূন্য স্থানটী যে কথাটী বা কথাগুলির দ্বারা পূর্ণ করিবে, দ্বিতীয় স্থানটী, সেই কথার উল্‌টা কথা দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে ; যথা, প্রথমটী পূর্ণ করিতে যদি 'তন' লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টী পূর্ণ করিতে, 'নত' বসাইতে হইবে।—

ভাই যদু—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং—সে দিন—তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল।—ও সঙ্গে ছিল কিন্তু—কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন—; কিন্তু আমার—না শুনিয়া,—সেই—রাতিই—তে গেল।—একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোনমতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।—রফল ও পাইয়াছেন ;—রফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি,—গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের—অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং—কে—র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ—হবে তাহার সম্ভাবনা নাই ; বলিতে কি এখন সে—র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব ইতি।

তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৯-৮০।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ইজের বডি বা জামা। ২। 'চালাক' এই কথাটী, হইতে 'আক' ছাড়িয়া দিলে, 'চাল' থাকে, চাল সিদ্ধ করিয়া খাইলেন ভাত খাওয়া হইল। ৩। কথাগুলি এই—রিপোট পরম, নয়শ, বানান, হামেসা, দু নহে (ই) রচিব। প্রথম অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে "রিপণ বাহাদুর এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে 'টমশন সাহেব' হইল। ৪।

ভাই যদু,—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং (দীন) সে দিন (নদী)তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল। (নবীন) ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু (নবীন) কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন (থাক) ; কিন্তু আমার (কথা) না শুনিয়া, (তারা) সেই (রাতা) রাতিই (নদী)তে গেল। (দীন) একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোন মতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। (না শুনা)র ফলও পাইয়াছেন ; (না শুনা)র ফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি (কতক) গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের (কতক) অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং (দীন)কে (নদী)র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ(রাম) হবে তাহার সম্ভাবনা নাই ; বলিতে কি এখন সে (মরা)র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি।

তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

নূতন

১। এই কথাগুলি সাজাইয়া একটি বাক্য রচনা কর দেখি ; নূতন কথা বসাইতে পারিবে না এবং ইহার একটিও ছাড়িতে পারিবে না ;—
যদি, যদি, যদি, হইতে, থাকিতে, হয়, হয়, হয়, সুস্থ, প্রশংসাভাজন, প্রকৃত, সকল, প্রার্থনীয়, শারিরীক, মানসিক, বাঁচিয়া, হইয়া, করিয়া, করিও, মনুষ্যনাম, হস্ত ক্ষেপ, তবে, মনে, তাহাতে দশের, ঈশ্বরের কার্যকেই।

২। বলতো কোন্ জিনিশ খেতে খুব মিষ্ট, কিন্তু দেখালেই বা খেতে বল্লেই লজ্জা করে এবং কখনও কখনও রাগ হয়?

৩। ভাগ্য দোষে দিবা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই,
অথচ ঘুরিতে কেহ নাহি দেখে ভাই।
কিন্তু নাহি যাই একা, যত লোকে পাই দেখা
সবারে সঙ্গেতে করি ভ্রমণেতে যাই।
মূলকথা রাজি রাগী, কিছুই বুঝিনা,
কেবা খোঁড়া কেবা অন্ধ কিছুই জানিনা—
চির রোগী যেই জন কিম্বা মৃত, অচেতন
আমাকে ছাড়িয়া থাকে, হেন কোন জনা?
সঙ্গে করে লয়ে ঘুরি,—তাওকি জাননা!

৪। একটী লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"আমার ঠাকুদ্দাদার বয়স আমার বাবার বয়সের ৪/৩ ; আমার বয়স বাবার বয়সের ৪/৭ ; এক বৎসর পূর্বে আমাদের তিন জনের বয়স এক সঙ্গে ৯×২০ ছিল।" স্থির কর কাহার বয়স কত?

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৯৬।

পূর্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যদি সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি দশের প্রশংসাভাজন হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্য নাম প্রার্থনীয় হয়, তবে শারীরিক, মানসিক সকল কার্যকেই ঈশ্বরের মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। ২। কলা। ৩। পৃথিবী। ৪। ছেলের বয়স, ৩৬ ; বাবার বয়স ৬৩ ; ঠাকুদ্দাদার বয়স ৮৪।

১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১১২।

নূতন

[গত কয়েক বারে স্থানাভাবে ধাঁধা দিতে না পারাতে আমরা দুঃখিত আছি।]

১। ব্রজ বাবুর ছেলে বিপিন এক দিবস আমাকে ঠিক সমান দুভাগ করিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম "ও কি করিলি?" তা,—সে উত্তর না দিয়া দেখিল দুই ভাগই ঠিক একরূপ ; তখন সে এক ভাগের নাম ধরিয়া জোরে ডাকিল ; তাহাতে ব্রজ বাবুর স্ত্রী এসে বলিলেন "কেন রে বিপিন?" বলতো বিপিন আমার কে?

২। হস্ত পদ নাই তার, নাহিক নয়ন,
তবু আমাদের মাথা রাখেন সে জন ;
রজনীতে তিনি যদি না রন্ সহায়,
কতকষ্ট পেতে হয় বলা নাহি যায়।
বলতো সুবোধ শিশু স্থির করি মন
(ঈশ্বর নহেন তিনি) তবে কোন জন?

৩। একটি ছেলে একজন বৃদ্ধকে বলিল "আপনি না একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন?" বৃদ্ধ কয়েকটী অঙ্ক লিখিয়া দেখাইলেন। বালক বুঝিয়া বলিল "তবে?" বৃদ্ধ আবার সেই কয়টি অঙ্ক লিখিয়া তাহাদের মধ্যে একরকমের কয়টি চিহ্ন দিয়া বালককে দেখাইলেন। বালক বলিল 'ইঃ আর দুই হইলেই তো এক কম পঁচিশ হইত!"

ছেলেতে বুড়োতে কি কথা হইল বল তো?

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৬০।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। আমি বিপিনের 'মামা'।

২। বালিশ।

৩। বুড়ো বলিলেন, ১, ১২, ৯ অর্থাৎ একবার নয়। ছেলে বলিল তবে? বুড়ো বলিলেন ১+১২+৯ অর্থাৎ ২২ বার।

[স্থানাভাবে নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।]

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৫।



মেয়েরা আমাদের কে?

প্রমদাচরণ সেন

ঠিকাগণ! পুরুষদিগের সহিত আপনাদের কি সম্পর্ক, তাহাই এই প্রস্তাবে বলিব। অতি বাল্যকালে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তখন মা কি ধন, তাহা জানিতাম না। আমার স্বভাব অত্যন্ত দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিল।—এই অবাধ্যতাতে যে আমার মাতার ভয়ানক ক্লেশ হইত, তাহা আমার ছোট বুদ্ধিতে আসিত না। আমি মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, এবং আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যের জন্য মায়ের প্রতি অত্যাচার করিতাম। মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন আমি নির্বোধ! মার স্নেহ বুঝিলাম না—ভাবিলাম "পীড়া হইয়াছে, তাহাতো ভালই! এখন নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিব।" অসহ্য যন্ত্রণায় মাতার মৃত্যু হইল, এক দিন মাতার কাছে বসিয়া পুত্রের কর্তব্য কাজ করিলাম না ; যে রাত্রিতে মাতা চলিয়া গেলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে—অবোধ আমি—ছুটিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেলাম।

অনেক দিন গেল। সকলেই ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়—আমি কার কাছে যাইব? কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। অবশেষে এক দিন আমার মাতার কথা মনে পড়িয়া গেল। বড় হইলাম—লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধি একটুকু পরিষ্কার হইল,—তখন একদিন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার মাতার চরিত্রের গুণে অনেকেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদেরই এক জন আমাকে নিকটে পাইয়া আমার মাতার ভালবাসার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার মাতা তোমাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা কি তুমি জান? যখন তিনি মরিতে বসিয়াছেন তখন আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'আমি চলিলাম। আমার ছেলেটী রহিল, উহাকে দেখিও। ও গোঁয়ার, যদি তোমাদিগের বালক-বালিকাকে প্রহার করে—আমার অনুরোধ উহাকে কিছু বলিও না। আমি ভগবানকে ডাকিয়াছি, তিনি উহাকে নিশ্চয়ই সুমতি দিবেন। যতদিন সে দিন না আসে ততদিন দয়া করে এ অভাগিনীর অনুরোধ মনে করিয়া সব সহ্য করিও' ; এই কথা বলিতে বলিতে মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।" আমি যখন এই কথাগুলি শুনিলাম, তখন আমার প্রাণ ধরিয়া কে যেন নাড়িয়া দিল। সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একস্থানে বসিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিলাম "হে জগদীশ! এইতো তুমি সুমতি দিয়াছ, এখন আর আমি গোঁয়ার নহি ; কিন্তু মাতো দেখিতে আসিলেন না, মায়ের প্রতিতো সদয় ব্যবহার করিতে পারিলাম না।"

মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া যে মাতা নিজের জ্বালা ভুলিয়া প্রাণের টানে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি স্ত্রীলোক। বালকবালিকাগণ! এখন হয়ত বুঝিতেছ না, 'মা কেমন স্ত্রীলোক', কিন্তু যে দিন মা থাকিবেন না, যে দিন পরের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে চাহিবে, যে দিন বড় হইয়া নানারূপ জ্বালায় যন্ত্রণায় পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে, তখন জানিবে মা থাকিলে কি হইত, এবং নাই যে তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছে!

আবার, যখন ছোট ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিতাম, তখনকার কথা মনে হইলেও

ভয়ানক ক্লেশ হয়। সে ভগিনীর সহিত এখন আর দেখা হয় না, কারণ তাহার বাড়ী আর আমার বাড়ী এখন আর এক নহে। দুই বৎসরে যদি দুদিন দেখা হইল তাহা হইলেই যথেষ্ট। বাল্যকালে যাহার সহিত মাতৃস্তন্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছি, আজ তাহার দিকে মন টানিতেছে; কিন্তু আর উপায় কি? ভাবিতেছি যত দিন ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ততদিন যদি তাহাকে ভালবাসিতাম তাহা হইলে আজ এত ক্লেশ হইত না। আজ তাহার নিজের একটী সংসার হইয়াছে, অথচ আমাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল। এ স্নেহের টান, এ ভালবাসা ভগিনী ভিন্ন আর কাহার হইবে? এমন ভগিনীও স্ত্রীলোক।

আমাদের মাতা স্ত্রীলোক, ভগিনী স্ত্রীলোক এবং অধিক ভাল বাসিবার লোক যাঁহারা সকলেই স্ত্রীলোক। কাহারও পিতামহী, কাহারও ধাত্রী (ধাইমা বা বুড়ি ঝি) এইরূপ সকলেরই স্নেহের আধার স্ত্রীলোক। এইরূপ ভালবাসা পুরুষের হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য সহজেই বুঝা যায় যে জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে দয়াতে, ভালবাসাতে পূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি যেন এই বলিয়া দিয়াছেন "হে আমার কন্যাগণ! তোমরা পৃথিবীতে যাও, এবং মাতা হইয়া, ভগিনী হইয়া, কন্যা হইয়া, ধাত্রী হইয়া কঠিন পুরুষকে স্নেহে ভাসাইয়া দিয়া সংসারকে স্বর্গ করিয়া দাও।"

সংসারকে স্বর্গ করাই স্ত্রীলোকের কার্য, ইহা যেন পাঠিকাদিগের স্মরণ থাকে। পাঠিকা-দিগকেও বলি তাঁহারা যেন অনর্থক আপন আপন ভগিনীদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে না যান, যাহাতে বালিকাদিগের উন্নতি হয়, যাহাতে তাঁহারা নিজের শক্তি বুঝিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারেন, সুশিক্ষিতা হইতে পারেন, পাঠকগণ যেন সে বিষয়ে মনোযোগী হন।

১ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১২-১৪।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা (পোষাক)

প্রমদাচরণ সেন



লিকাদিগের কিরূপ পোষাক হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদিগকে কেহ কেহ 'সখা'য় লিখিতে বলিয়াছেন। আমরা আজ এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি মেয়েরা এমন পোষাক পরেন যে সমস্ত শরীর দেখা যায়, কিন্তু তবুও তাঁহাদের লজ্জা হয় না, কেননা এইরূপ সরু কাপড়ের দাম অনেক, এবং কাজেই এই সকল কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া উচিত! পাতলা কাপড় পরিলে যে ভদ্রসমাজে লোকে লজ্জায় মুখ ফিরায় তাহা এই সকল মেয়েদের মনে থাকে না। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা মুখে হাত দিয়া বলেন "ওমা! পোষাকী কাপড় পরিব, তায় আবার লজ্জা কি!" আমরা এরূপ কথার উত্তর দিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় 'পোষাকী কাপড় পাতলা হইলে, তাহা শক্ত করিয়া দুফের দিয়া পরা উচিত, এবং পরিবার কাপড় পাতলাই হউক আর পুরুই হউক, দশজনের নিকট যাইতে হইলে সর্বদা একটী জামা গায়ে থাকা উচিত। যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা, এবং হাতকাটা (কনুই পর্যন্ত) একটা জামা পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলে বড়ই ভাল হয়। আজকালকার

কোন কোন মেয়ে সুশিক্ষিত বাপ বা ভাইয়ের যত্নে ভদ্র পোষাক পরিতে পান, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মেয়ে যেরূপ পোষাক পরেন, তাহাতে নিজের বাড়ীর লোকেরই সুমুখে যাওয়া কষ্ট, ঘরের বাহিরে, নিমন্ত্রণে যাওয়াত দূরের কথা। আজকাল যত লেখা পড়ার চর্চা বাড়িতেছে, ততই মেয়েদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের ঘরের অধিক-বয়স্কা গৃহিণীরা আজিও জামা গায়ে দেওয়ার উপরে বিলক্ষণ বিরক্ত। আমি একটী সুশিক্ষিত লোকের স্ত্রীর কথা জানি, তিনি বাড়ীতে গেলেই, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে বলিতেন "জামাটা খোল,—ভদ্রলোক হও দেখি—কি মুসলমানের না খ্রীষ্টানের মেয়ের মত একটা জামা গায়ে!" এইরূপ বলিয়া অনেক সময় জামা খোলাইয়া তবে তিনি ছাড়িতেন। যাঁহাদের এরূপ মত যে গায়ে জামা না থাকিলেই ভদ্র, এবং থাকিলেই ভয়ানক অভদ্র হইতে হয়, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব? তবে আমরা সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে মেয়েদের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পুরুষের নিকট বাহির হওয়া উচিত, কোন ক্রমেই খোলাগায়ে বাহির হওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন "জামা গায়ে দিলে কাজ কর্ম করিবে কেমন করিয়া?" তাহার উত্তরে এই বলিলেই হইবে যে যেরূপ হাতকাটা জামার কথা বলিয়াছি, তাহাতে কাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। এইতো গেল লজ্জানিবারণের কথা। তাহার পর এইরূপ জামা থাকিলে শীতের সময় বেচারা মেয়েদের কত সুবিধা, কর্তাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিয়া দেখিলে, পূর্বে যেরূপ জামার কথা বলিয়াছি সেইরূপ একটী জামা থাকিলে সবদিকেই ভাল হয়। এস্থলে গয়নার কথাও কিছু লেখা উচিত। আমাদের বিবেচনায় গয়নার ঘটা না করাই ভাল ;—পোষাক যত 'সাদাসিধে' হয়, ততই ভাল। যাঁহাদের যথেষ্ট গয়না আছে, তাঁহারা এইরূপ গয়না পরিলেই চলিতে পারে, যথা:—কাণে দুল্ বা ইয়ারিং, কি মাকড়ি ; হাতে বালা, চুড়ি, কি শাঁখা ; এবং গলায় চিক্ কি হার। আর অধিক গয়নার ঝম্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ করার কোন প্রয়োজন আমরা দেখিনা ; তবে অন্য কাহারও যদি অন্যমত হয়, তবে নাচার।

১ : ৬ . জুন ১৮৮৩, পৃ. ৯৫।



ঠিকাগণ! আপনারা যে আমাদিগের ঘরে বেতন না লইয়া নিজের ইচ্ছায় রন্ধন করেন এবং ঘরের অন্যান্য সমস্ত কার্য করেন, ইহাতে কি শুধু আমাদেরই সুখ, আপনাদিগের কি নাই? যখন আমার ভগ্নী অথবা আমার মাতা, অথবা আমার স্ত্রী, আমারই সুখের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করেন বা অনেক কাজ করেন তখন আমার ক্লেশের বোঝা কত কমিয়া যায়, প্রাণে কত আরাম হয়, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারেন? কিন্তু ইহাতে কি শুধু আমাদিগেরই আনন্দ, আপনাদিগের কি ইহাতে বিলক্ষণ আনন্দ নাই? সে মূর্খ যে বলে 'নাই!' "আমারই ভাই অথবা আমারি পুত্র, অথবা আমারি স্বামী আমার সামান্য পরিশ্রমের গুণে মনের সুখে, শরীরের সুখে কাল কাটাইবেন," এই চিন্তাতেও কোন্ স্ত্রীলোকের মন না উৎসাহিত হইয়া উঠে? জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে ঘরের গৃহিণী করিয়া বাস্তবিকই যেন পৃথিবীর দুঃখের বোঝা অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত গৃহকর্মের মধ্যে রন্ধন একটী প্রধান কর্ম ;—স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যত পরিপক্ক, পুরুষেরা প্রায়ই তত নহেন। যাঁহারা ধনী তাঁহারা অনেক সময় ব্রাহ্মণ রাখিয়া এই ভাল কাজ করেন না। রন্ধন যে স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থাতেই করিতেই হইবে

এরূপ বলিতেছি না, তবে ভগিনী, মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা নিজ হাতে কোন দ্রব্য সামান্য ভাবে রন্ধন করিলেও ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী, বা পিতার তাহা আহার করিতে যত মিষ্ট লাগিবে, হাজার ব্রাহ্মণে ঘিয়ের 'শ্রাদ্ধ' করিলেও কি তত মিষ্ট লাগিতে পারে? এই জন্যই, যাঁহারা ব্রাহ্মণের হাতে সমস্ত রন্ধনের ভার দিয়া নিজেরা কিছুই করেন না, আমরা তাঁহাদিগের এই কাজকে তত ভাল মনে করি না। আজ আমরা একটী পরম সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম পাঠিকাদিগকে শিখাইয়া দিব, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা শিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন। অল্পবয়স্কা পাঠিকাদিগের জন্য যদিও এইটী লিখিত হইতেছে, তথাপি আশা করি ইহাতে অনেক অধিক বয়স্কা পাঠিকারও উপকার হইতে পারিবে।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৬।

চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম



আগে এই কয়েকটি জিনিশ জোগাড় করিয়া রাখ :—(১) একটা ঝুনো নারিকেল ;(২) খানিকটা ছানা ; (৩) খানিকটা দোবরা চিনি, অভাবে যত ভাল পরিষ্কার পাওয়া যায়, সেইরূপ চিনি ; (৪) ২।৩ ঝিনুক দুধ ;(৫) খানিকটা ক্ষীর ;(৬) অল্প একটু ঘি ; (৭) পেস্তা, কিস্‌মিস, বাদাম ;(৮) মিশ্রির গুঁড়ো ; (৯) কিছু কলাপাতা ;(১০) এক যোড়া কাঁচি বা একখানা ছুরি, বা বঁটি ; (১১) গোটাকয়েক বাটী ;(১২) গোটা দুই কড়াই ;(১৩) শিল নোড়া।

তাহার পর নারিকেলের উপরটা ছোবড়া ছাড়াইয়া বেশ করিয়া চাঁছিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা না হইলে ছোবড়ার গুঁড়ো সকল উড়িয়া কুরিবার সময় আসিয়া পড়িবে। এইরূপ বেশ পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া কুর্‌তে হবে। তৎপরে খুব কাদার মত না হয়, একটু শক্ত থাকে, এই ভাবে বাটিতে হইবে, এবং ছানাও (যতটুকু দিলে ভাল হয় মনে হইবে' সেই আন্দাজে) নিংড়ে বাটিতে হইবে। এই দুটী বাটা জিনিশ একপাশে রাখিয়া দাও। এদিকে দোবরা চিনি জলে গুলিয়া চড়ান আবশ্যক ;চিনি যখন ফুটে উঠিবে, তখন ২।১ ঝিনুক দুধ ছড়াইয়া দিবে ; ইহাতে গাদ উঠিতে থাকে। গাদ শেষ হইলে, ঢালিয়া ছেঁকে লইয়া একটা বাটীতে রাখ।

ইহার পর কড়াটীকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বা অন্য একটা পরিষ্কার কড়ায়, নারিকেল এবং ছানার আন্দাজে এই রস চড়াও। রসটা বেশ ঘন হয়ে আসিলে নারিকেল, ছানা, আর তাহার উপযুক্ত ক্ষীর দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর খন্তি বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়া খানিকক্ষণ নাড়িতে থাক ; যখন দেখিবে বেশ পাক হইয়াছে অর্থাৎ এমন হইয়াছে যে ঘি হাতে মাখিয়া উনুনের উপরের জিনিশগুলি হাতে পাকাইলে হাতে লাগিয়া যায় না, তখন নামাইয়া পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্ পরিমাণমত দিয়া নাড়িতে হইবে। নাড়িতে নাড়িতে সবগুলি বেশ মিশিয়া গেলে, দুটো কলাপাতার ভিতরে ফেলিয়া দুহাত দিয়া চন্দ্রের আকার করিয়া ঠেলিতে হইবে। এই কার্য শেষ হইলে কাঁচি দিয়া কাটিয়া, প্রত্যেক পুলির উপরে মিশ্রির গুড়ো ছড়াইয়া দিবে।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৬-৭৭।

লজ্জা ও নম্রতা

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



নোদিনীর বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, লেখা পড়া অতি সামান্যই জানা আছে। বাপের এক মাত্র দুহিতা, সুতরাং বড় আদরের। বিনোর বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আজিও পিত্রালয়েই থাকে। বাল্যাবস্থা হইতেই বিনো বড় দুরন্ত, গালাগালি বৈ আর কথা নাই, সকলেরই সম্বোধন "পোড়ার মুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, সর্বনাশী" প্রভৃতি সুমধুর বচন! অথচ কেহ কিছু বলে না, পিতার আদরের ধন। এইরূপে আদর পাইয়া বিনোর চরিত্র ভয়ানক দূষিত হইয়া গেল, সে ঘোর অত্যাচারী ও ভয়ানক স্বেচ্ছাপ্রিয় হইতে লাগিল। রাগ হইলে সম্মুখে ঘটী বাটী, যাহা পাইত তাহাই চূর্ণ করিয়া ফেলিত, মাকে মারিয়া গালাগালি দিয়া উৎসন্ন করিয়া দিত, ঘোর দুরন্ত হইল। তথাপি কথা নাই! এখন বড় হইয়া অনেক দোষ সারিয়াছে বটে, কিন্তু যে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা একবার অভ্যাস হইয়া গেল তাহা আর গেল না। চিরকালের জন্য তাহার চরিত্রে একটী প্রবল দোষ স্থায়ী হইয়া গেল। সে এখনও যাহা ধরিবে তাহা না পাইলে কাহারও রক্ষা নাই, যাহা বলিবে তাহা না শুনিলে কাহারও শান্তি নাই। এত বয়স হইয়াছে অদ্যাপি স্থির গম্ভীর বুদ্ধিটুকু তার হইল না, কাকে কি বলিতে হয়, কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানে না। শিখাইলেও শুনিবে না। ভুলিয়াও সত্য কথা কয় না—এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া কহে যে তাহার সংখ্যা নাই, তাহা দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন লোকও অবাক হয়।

প্রিয় পাঠিকাগণ! আমাদিগকে নিন্দুক ভাবিবেন না, আমরা বিনোকে ভালবাসি এবং তাহার চরিত্র মন্দ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে, ও আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতে হইল। যাহা হউক এত দোষ সত্ত্বেও বৃদ্ধারা বিনোর বড় সুখ্যাতি করেন,—বিনোর একটী গুণ আছে, সে বড়ই লজ্জাবতী। তাহার লজ্জার সুখ্যাতি দেশে বিদেশে বিখ্যাত। বিনো যখন শ্বশুরালয়ে যায় তখন তাহার মূর্তি স্বতন্ত্র, তাহাকে তখন কাপড়ের পুতুল বলিলেও হয়, রাত্রিদিন বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ২।৩ হাত ঘোমটা টানিয়া ষষ্ঠি বুড়ি সাজিয়া বসিয়া থাকে। কেহ মুখ দেখিতে আসিলে বিনোর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত। সকলকে ধ্বস্তাধ্বস্তী করিয়া মুখ দেখিতে হয়! কথা ত নয়ই, কাহারও সঙ্গে না। কাহারও সম্মুখে আহার হয় না—ভয়ানক লজ্জা! কাজেই দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া বিনোর লজ্জার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমবয়স্কারা তাহার নিন্দা করে "এত বাড়াবাড়ী, মেয়ের সব মন্দ," প্রভৃতি নানা প্রকার নিন্দা করে। কত বুঝায়, কত উপদেশ দেয়, কে সে সব কথা শুনে? বিনোর স্বভাব যাইবার নয়।

তাহারই বাড়ীর পাশে বোসেদের কামিনী আর এক রকম মেয়ে। সে বাল্যাবধি পিতার নিকট লেখা পড়া শিখিয়াছে, ভাল ভাল স্থানে যাইয়া অনেক দেশের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও কত কার্য শিক্ষা করিয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেক ভাল ভাল বৈ তাহার পড়া হইয়াছে। শ্বশুরালয়েই থাকে, বাড়ীর মধ্যে সে আর তাহার শাশুড়ী এই দুটী স্ত্রীলোক আর সকলেই পুরুষ। কামিনী

অর্ধাবৃত মুখে তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে আসে, সকলের কথা মুখ নীচু করিয়া শুনে ও ঘাড় নীচু করিয়াই নিম্নদৃষ্টিতে তাহাদের উত্তর দেয়। বিনোর মত চীৎকার করিয়া ডাকা বা উচ্চহাস্য কামিনীর মুখে কেহ কখন শুনে নাই। কেহ দূরে থাকিলে সে তাহার নিকটে গিয়া কথা বলিয়া আসে, উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে না। হাসির কথায় যখন সকলে গড়াইয়া যাইতেছে, কামিনী তখন স্থিরভাবে বসিয়া—মুখে অল্প অল্প হাসি। খুব দুঃখ হইলেও কাঁদে না, কেবল চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়ে মাত্র। তাহার মুখে কেহ কখন গালাগালি শুনে নাই। আর সকলে যেমন সচরাচর গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকে, কোন লোক আসিলেই তাড়াতাড়ি গায় ও মাথায় কাপড় তুলিয়া দেয় ; কামিনী সেরূপ করে না, সদাই তাহার সর্বাঙ্গ সলজ্জ ভাবে আবৃত, অথচ সে কুঞ্চিত ভাব নাই যাহা অন্যের দেখা যায়। কামিনী সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিবার সময়ে নিজে অধিক কথা কয় না, মেলা অনাবশ্যক কথা কহিয়া গোল করে না। আবশ্যকমত ধীরে ধীরে ২।৪টী কথা বলে। কথা কহিবার সময়ে হাত পা নাড়িয়া সে কখন ব্যাপকতা প্রকাশ করে না। অতি মৃদুভাবে মধুরস্বরে কথা কহে, তাহার কথা শুনিলে ও তৎকালীন তাহার মুখের বিনম্রভাব দেখিলে সকলেই তাহাকে এ অল্প বয়সে দেবী মনে করে। তাহার চক্ষে কখন চঞ্চলতা দেখা যায় না, স্থির গম্ভীর ভাব।

এতগুণ থাকিলেও বৃদ্ধারা কামিনীকে দেখিতে পারে না, তাহার একটী মহৎ দোষ আছে—সে "বেহায়া"! সে অনায়াসে (নম্রভাবে) শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও অপরিচিত অতিথির সম্মুখেও বাহির হইয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দেয়, তাঁহাদের পরিবেশন করে, তাঁহাদিগকে নমস্কার করে, ইত্যাদি। কত দোষ বলিব? কামিনীর অনেক দোষ।—কামিনী বৈ পড়ে! পড়িয়া আবার প্রতিবেশিনীগণকে শুনায়! তাহার আর একটী প্রধান দোষ আছে।—সে স্বামীকে বন্ধু বলিয়া যত্ন করে! "ওমা! কলির মেয়ে" প্রভৃতি কতই দুর্ণাম যে তার, তা আর কি বলিব। যদি কেহ এ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন ত জানিবেন কামিনীর কত নিন্দা। কিন্তু তাহার দোষ কি? এ শেষোক্ত দোষটীর জন্য বিনোদিনী তাহার বড়ই নিন্দা করে।

পথে চলিবার সময় কামিনী বড় বেহায়াপনা করে ;—সে এত কম ঘোমটা দেয় যে তাহার মুখের অনেকটা দেখা যায়। বিনোর মত ১ হাত ঘোম্‌টা দিয়া যায় না, তাহার মত দুহাত ঘোম্‌টার মধ্যে ফাঁক করিয়া সব দেখিতে দেখিতে যায় না। আপন মনে পথ পানে চাহিয়া স্থিরভাবে চলিয়া যায়!

পাঠিকাগণ! আমাদের কোন দোষ নাই। যেমন জানি তেমনি সত্য সত্য দুজনেরই চরিত্র বর্ণনা করিলাম। উভয়েরই সুখ্যাতি আছে, উভয়েরই অখ্যাতি আছে। বৃদ্ধারা ও মূর্খ লোকেরা কামিনীর নিন্দা করে ও বিনোদিনীর প্রশংসা করে, কিন্তু যাঁহারা বুঝেন, যাঁহারা সততা ও নম্রতার পক্ষপাতী তাঁহারা বিনোর বড়ই নিন্দা করেন ও কামিনীকে দেবী জ্ঞান করেন। আমরাও তাই মনে করি। বৃথা বাহ্য লজ্জাতে আবশ্যক নাই। আন্তরিক নম্রতাই মানবের শোভা, এইটীর নামই প্রকৃত লজ্জা, নহিলে এ দিকে চূড়ান্ত বাচালতা, চূড়ান্ত দুরন্তপনা ও ঘোর বেহায়াপনা করিয়াও যদি একটু ঘোমটা টানিলেই লজ্জাশীলা হওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভরসা করি, আমাদের প্রত্যেক পাঠিকা কামিনীর মত লক্ষ্মী হইবেন ও বিনয় নম্রতা ও স্থৈর্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া স্ত্রীজাতির ভূষণ স্বরূপা হইবেন।

১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ ১৩২-১৩৪।

কে বড় লোক?

কুমারী হেমলতা দেবী


কজন ধনীর বাড়ীতে অনেক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে এবং তাঁঃ ছোট ছেলে মেয়েরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে যাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তিনি পূর্বে অতি সামান্য অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পিতা বড় গরিব ছিলেন। কিন্তু পিতা নিজে কষ্ট করিয়াও ছেলেকে স্কুলে দিয়াছিলেন ; ছেলের নিজেরও বেশ চেষ্টা, যত্ন ছিল। তাই সেই ছেলে আজ বড় লোক। ইনি কেবল টাকার বড় লোক তাহা নহে, ইঁহার যেমন বুদ্ধি, গরিবের প্রতি দয়াও তেমনি।

যে সকল ছেলে মেয়ে তাহাদের পিতা মাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারা সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে নীরজা নামে একটী ছোট মেয়ে দেখিতে অতি সুন্দর ; কিন্তু রূপ থাকিলে কি হয়, সে বড় দেমাকে। এ শিক্ষা সে দাস দাসীর নিকট হইতে পাইয়াছিল, পিতা মাতার নিকট নয়। তাহার পিতা আদালতের জজ। তাহা সে জানিত, তাই বলিল "আমি জজের মেয়ে, আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে, যারা বড় ঘরে হয় না, তারা কখনও বড় লোক হ'তে পারে না। আমি বড় ঘরে হয়েছি। আমি তাই বড় লোক হব—বড় ঘরের বউ হব, বড় লোকের স্ত্রী হব। যাদের বড় মানুষের ঘরে জন্ম হয়না, তাহা হাজার পরিশ্রম করে লেখা পড়া শিখুক, তবুও বড় লোক হতে পারবে না। আর যাদের নামের শেষে 'শ' আছে, তার কোন কর্ম্মেরই নয় ; এই দেখনা পুঁটীর বাবার নাম গণেশ তারা কত দুঃখী, ও-পাড়ার জগদীশ বাবুরা কত কষ্টে দিন চালায়, হাবোলের কাকা সতীশ বাবুর কেরাণীগিরি করেই প্রাণ গেল। এদের কিছু হবে না, কিছু হবে না, কিছু হবে না।" এই বলিয়া সে সুন্দর হাত দুখানি ছড়াইয়া দেখাইল কেমন করিয়া এই 'শ' যুক্ত লোকদিগকে দূরে রাখিতে হয়। এই কথা শুনিয়া ও এই হাত ঘুরানি দেখিয়া সরলার (সে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই বাড়ীর কর্তার মেয়ের) বড় রাগ হইল, কারণ তাহার বাবার নাম পরেশ। সে বলিল—"আমার বাবা ১০০ টাকার খেলনা কিনে দিতে পারেন, তোমার বাবা কি পারেন?"

সুরমা বলিল—"আমার বাবাও পারেন।" এই মেয়েটীর পিতা একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। সুরমা আবার বলিল "আমার বাবা,—তোমার বাবার, ওঁর বাবার সকলের নামেই ইচ্ছা করিলে কাগজে লিখিতে পারেন। মা বলেছেন বাবা কাগজে যা ইচ্ছা তাই লিখিতে পারেন ; সকলে বাবাকে ভয় করে।" এই বলিয়া ঝাঁক করিতে করিতে বালিকা এমনি ঘাড় ঝাঁকাইয়া বলিল যেন তিনি রাজার মেয়ে আর কি!

যখন এইরূপ গল্প হইতেছিল, তখন একটী দুঃখীর ছেলে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতে ছিল, সে ছেলেটীর নাম রমেশ। রমেশ বেচারা একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার সাধ্য কি এই সকল ভাগ্যবতী বড় লোকদের সঙ্গে কথা বলে ; সে তাহাদের সুন্দর পোষাকের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল আহা! আমি যদি ওদের মত হতাম? কিন্তু 'শ' যুক্ত নামের কথা শুনিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। "আমার নামের শেষে ত 'শ' আছে তবেত

আমি কখন বড় লোক কি বড় মানুষ হ'তে পারব না—এই ভাবনায় রমেশ বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল।

এই দিবসের লিখিত ঘটনার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। পাঠক পাঠিকা। আসুন আমাদের পূর্ব পরিচিত বালক বালিকারা কে কোথায় গেল খুঁজিয়া দেখি। ঐ দেখুন নীরজা দরিদ্রের ঘরে বড় ঘরের অহঙ্কার লইয়া গিয়া শাশুড়ী, ননদিনীর সহিত কি ভয়ানক ঝগড়া বাধাইয়াছে, শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, সে হাসি নাই, এবং সে স্ফূর্ত্তি নাই। সুরমা মধ্যবিত্তের ঘরে পড়িয়াছে সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া এবং দুল্লো কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাড় সার হইয়াছে। আর সরলা—তাহার কথা কি বলিব। ওই যে বিধবা দুটী ছোট ছেলেকে পাশে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, উহাঁকে চেনেন, উনিই সরলা। সে জাঁক নাই, পরের অধীন হইয়া কতক দুঃখে কতক সুখে দিন কাটাইতেছেন। আর সে গরিবের ছেলে রমেশ কোথায় গেল? ওই যে সুন্দর বাড়ীটী দেখিতেছেন, আসুন উহার মধ্যে যাই। ওই যে পুরুষটী যাঁহার নিকট অনেকে নানারূপ পরামর্শের জন্য আসিয়াছে, এবং যাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেছে, উহাঁকে চেনেন? কে জানিত যে, যে দুঃখীর ছেলে, একদিন বড় লোকের মেয়েদের সহিত সাহস করিয়া কথা বলিতে পারে নাই, আজ সে বড় লোক হইবে? কিন্তু ফলে তাহাই হইল। ভয়ানক চেষ্টায়, ভয়ানক পরিশ্রমে, নিজের বুদ্ধি বলে রমেশ পৃথিবীতে বড় লোক হইল। বৃথা গল্প যে করে, পোষাকের জাঁক করিয়া, বড় গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বাপের টাকা নষ্ট করিয়া যে বেড়ায় সেই বড় লোক, কি নিজের জন্য যে গরিবের মত থাকিয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করে সেই বড় লোক? কে বড় লোক তাহা আর বলিতে হইবে না।*

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা

প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত

উপক্রমণিকা



লক বালিকাগণ। শরীর রক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাই তোমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। এই দুয়ের মধ্যে যেটীকে অবহেলা করিবে, তজ্জন্যই ইহার পর ক্লেশ পাইতে হইবে। যেমন বিদ্যা না শিখিলে চিরকাল অতি গরিবের দশায় কাটাইতে হইবে, তেমনি শারীরিক নিয়ম অবহেলা করিলে চিরকাল সকল সুখে বঞ্চিত থাকিবে। যিনি তোমাদের সৃষ্টি কর্ত্তা তিনিই তোমাদের শরীর ও মন দুয়েরই চালনা করিতে বলিয়াছেন। যেমন পাঠশালায় উত্তম পড়া বলিতে পারিলে তোমাদের মনে আনন্দ হয়, সেইরূপ কোন নির্দোষ শারীরিক খেলায় খুব ভাল হইতে পারিলেও মনে অতিশয় আমোদ উপস্থিত হয় এবং কোনরূপ পরিতাপ হয় না, বরং শরীর ও মনে অতিশয় স্ফূর্তিই হইয়া থাকে। এই যে আনন্দ ও মনের স্ফূর্তি, ইহাতে এই কথাই প্রমাণ হইতেছে যে শরীরের

* এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আমরা পরিবর্তন করিয়াছি।

চালনা করাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সুতরাং শরীর ও মন ইহার কিছুই অবহেলা করিও না। যদি বিদ্বান ও ধনী হইতে চাও, প্রতিদিন শরীর ও মনে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। এই দুয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি করিলে তোমরা চিরকাল সুখী হইবে। তোমরা বোধহয় অনেকেই দেখিয়াছ, যে তোমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক কেবল শারীরিক নিয়ম লঙঘন করিবার অপরাধে কেহ বা অল্প বয়েসে মরিয়া গিয়াছেন কেহ বা চিরকাল রোগে সারা হইতেছেন। আমি অনেককে জানি যাহারা কালেজ হইতে বাহির হইয়া বা তৎপূর্বে মরিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং শিক্ষা দ্বারা তাঁহার কি তাঁহার পিতা মাতার কি ফল লাভ হইল দেশেরই বা কি উপকার হইল তাহার জন্য বলিতেছি, তোমরা যাহাতে শরীর ও মন উভয়েরই মঙ্গল সাধন করিতে পার, তাহা উন্নত করিতে পার, এরূপ চেষ্টা করিবে।

প্রথম উপদেশ

প্রাতঃক্রিয়া

সকালে নিদ্রা হইতে উঠিবে ; যাহাদিগের সকালে উঠিবার অভ্যাস আছে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়। বিলাতের এক জজ সাহেব তাঁহার কাছারীতে যত প্রাচীন সাক্ষী আসিত সকলেরই আহার ব্যবহারের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রাচীন সাক্ষীরা প্রায়ই বলিত, যে তাহারা অতি সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া থাকে। তোমরাও ভোরে উঠিবে, তাহা হইলে তোমরাও অনেক দিন বাঁচিতে পারিবে।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। যাহাদিগের সকালে এই কাজ করিবার অভ্যাস আছে, তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে ও পরিপাক শক্তি উত্তম হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম না থাকিলে নানারূপ পেটের অসুখে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহার পর চক্ষু ও মুখ শীতল জলে ধুইয়া যে-লিবে। অনেক বালক বালিকার তাহা অভ্যাস নাই। প্রত্যহ মুখ না ধুইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও অনেক পীড়া হইতে পারে। দাঁত গুলি প্রত্যহ কয়লার গুঁড়ো কি মৃত্তিকা বা খড়ি দ্বারা পরিষ্কার করিবে, নতুবা দাঁত রুগ্ন ও মলিন হয়। মলিন দাঁত দেখিতে বড় অপ্রীতিকর। যদি দাঁত পানসিয়া বা ইহার গোড়া নরম হয়, তবে খড়ি ও ফটকিরি একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিবে। মুখ ধুইবার পরে চিরুণি বা ব্রুস্ দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, এরূপ অভ্যাস থাকিলে মস্তকে উকুন কিম্বা খুসকী অর্থাৎ মরামাংস থাকিতে পারে না।

সকালে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। আম্র, কমলালেবু, কি অন্য কোন সুপক্ক ফল, রুটী ও মোহনভোগ, ডিম্ব কি অন্য কোন পুষ্টিকর পদার্থই আহার করিবে। কতকগুলি মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে না।

অনন্তর কোনরূপ ব্যায়াম করিবে, কিংবা খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে। এরূপ করিলে অনেকে মনে করেন যে পড়ার ক্ষতি হয়, ইহা নিতান্ত ভুল। কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পরে অতিশয় স্ফূর্তির সহিত পড়িতে পারিবে।

অনন্তর অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

দ্বিতীয় উপদেশ

অধ্যয়ন

ছাত্রেরা বলেন যে তাঁহারা পড়ার বিঘ্ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগ করিতে পারেন না। এ কথা নিতান্ত অসার। অধ্যয়ন ও শরীর রক্ষা উভয়ই যে সমান কর্তব্য আমরা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিয়মিত রূপে চলিলে পড়ারই বা অনিষ্ট কেন হইবে। আমরা নিম্নে ছাত্রগণের জন্য একটী কার্যের তালিকা দিতেছি, তদনুসারে চলিলে শরীর ও মন দুইই রক্ষিত হইবে।

ছাত্রগণের কার্যের তালিকা

প্রাতঃকাল	৫টা হইতে ৬টা	বাহ্যে ও মুখ ধোওয়া ইত্যাদি।
	৬টা হইতে ৭টা	কিঞ্চিৎ জল খাইবার পরে ভ্রমণ।
	৭টা হইতে ৯টা	অধ্যয়ন।
	৯টা হইতে ১১টা	স্নান, আহার, স্কুলে গমন।
মধ্যাহ্ন	১১টা হইতে ৪টা	স্কুল।
অপরাহ্ন	৪টা হইতে ৫টা	জল খাওয়া ও ব্যায়াম।
রাত্রি	৭টা হইতে ১০টা	অধ্যয়ন।
	১০টা হইতে ১১টা	আহার ইত্যাদি।
	১১টা হইতে ৫টা	নিদ্রা।

প্রায়ই বালকগণ ১০॥ ০ টা বা ১১ টার সময় স্কুলে যায়, এবং গড়ে ৬ টার সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সুতরাং স্নান, আহার, প্রাতঃক্রিয়া, ব্যায়ামাদির জন্য ৩॥ ঘণ্টা বিয়োগ করিলেও প্রাতঃকালে ২ ঘণ্টা পড়িবার সময় থাকে, বালকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

স্কুল হইতে আসিয়া শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কোন রূপ খাবার খাইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পরে ব্যায়াম করিবে। সন্ধ্যার পরে পড়িতে বসিয়া ৩ ঘণ্টা[১] পড়িয়া, আহারের পরেই শয়ন করিবে, আহারের পরে পাঠ করা অনুচিত।

পাঠগৃহ নির্জন, বায়ুযুক্ত, শুষ্ক ও শীতল হওয়া কর্তব্য। একজনের একস্থানে বসিয়াই পাঠ করা উচিত। যাহা পড়িবে, অতিশয় মনোযোগ পূর্বক পড়িবে, অন্য বিষয়ে মন দিলে পড়া হয় না। এই জন্যই মনোযোগী ছাত্রেরা দুই ঘণ্টায় যে পড়া করিতে পারে, অনাবিষ্ট বালকের পাঁচ ঘণ্টায়ও তাহা হয় না। সুতরাং মনোযোগী হইবে। পড়িবার পরে পঠিত বিষয় সকল মনে মনে আলোচনা করিবে, তাহা হইলে সকল পড়াই মনে আসিবে। এক বিষয় পড়িতে পড়িতে বিরক্তি হইলে অন্য বিষয় আরম্ভ করিবে। পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসিলে অঙ্ককষা বা লেখা দ্বারা তাহা দূর করিবে, অতিশয় বিরক্তি বোধ হইলে পরিষ্কার বায়ুতে কিঞ্চিৎ বেড়াইয়া আসিবে।

অনেকে বৎসরের প্রথমে অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, ও পরীক্ষার ২ কি ৩ মাস পূর্বে দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন, শরীরকে ক্লেশ দেন, ইহা বড় অন্যায়। যাহারা বৎসরের প্রথম

১. মনোযোগের সহিত পড়িলে বালকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম পড়িয়াও বেশ চালাইতে পারেন।

হইতে মনোযোগ পূর্বক বাড়ীতে ও স্কুলে পড়া শুনা করে, তাহারা পরীক্ষার সময়ে শরীর ক্ষয় না করিয়াও ভাল হইয়া থাকে।

পাঠ সময়ে যতদূর সম্ভব স্থিরভাবে বসিবে ;— চেয়ারে বসিয়া পড়িলে অনেক ভাল হয়। অনবরত মস্তক হেট করিয়া লেখা কি পড়া উচিত নহে। অনেক কৃতবিদ্য লোক এই অভ্যাসদোষে কুঁজো হইয়া থাকেন! অল্প কি তীব্র আলোকে পড়িবে না, পড়িবার সময়ে পুস্তক এমন ভাবে রাখিও না যে তদুপরি চন্দ্র কি সূর্য কিরণ পতিত হয়। যদি পড়িতে পড়িতে চক্ষু বেদনা বোধ হয়, তখন পড়া ত্যাগ করিয়া শীতল জলে চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে ও চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে মনে পড়ার বিষয় সকল আলোচনা করিবে।

তৃতীয় উপদেশ

স্নান

যদি শরীরে কোন অসুখ না থাকে, তবে প্রত্যহ স্নান করিবে। স্নানের কোন নির্দিষ্ট সময় হইতে পারে না। যাঁহার যেরূপ অভ্যাস, তদনুসারে সময় নিরূপণ করিবে। অধিকাংশ লোক প্রায় ৯টা। ১০টার সময়ে স্নান করেন, এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই স্নানের উপযুক্ত সময়। তখন প্রাতঃকালের শীত কমিয়া আইসে, অধিক গ্রীষ্মও থাকে না,— যে ঘর্ম উৎপাদন করিবে। অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে, এ অভ্যাস মন্দ নহে। দুর্বল শরীরে বিশেষ কাশীরোগ থাকিলে প্রাতে স্নান করা উচিত নহে।

স্নানের পূর্বে যে তৈল মাখার নিয়ম আছে তাহা অতি উত্তম। ইহাতে চর্ম মসৃণ থাকে, শরীর পোষিত হয়, ও লোমকূপ সকলের ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। স্নান সময়ে উত্তমরূপে শরীর মার্জন করিবে। স্নানের পরে ভিজে কাপড় শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কাপড় পরিবে, এবং শরীরে যাহাতে জল না থাকে এরূপ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

অনেকে শীতের ভয়ে স্নান করিতে চায় না, কিন্তু এ অভ্যাস অতি অনিষ্টকর। যদি শীতের অত্যন্ত আতিশয্য হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। কিন্তু অভ্যাস অনুসারে গরম জলে স্নান করা অনুচিত। অধিক বৃষ্টির দিনে জল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে এবং মস্তকে শীতল জল দিবে।

শরীর দুর্বল থাকিলে অথবা জ্বরাদি রোগ হইতে আরোগ্য হইবার সময়ে গরমজলে স্নান করিবে। শর্দি হইলে প্রথম দিবস স্নান বন্ধ করিবে, পরদিবস গরম জলে স্নান করিবে কিন্তু শর্দির অবস্থা তরুণ থাকিলে স্নান না করাই ভাল। শর্দি পুরাতন হইলে স্নান করার কোন বাধা নাই।

স্নান করার পূর্বে মস্তকে শীতল জল দেওয়া উচিত। সন্তরণ শিক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য, ইহা দ্বারা উত্তম ব্যায়াম হয়, এবং অনেক বিপদ আপদ সময়ে অনেক উপকার, কিন্তু ধীরভাবে সন্তরণ করিবে। বালকেরা যেরূপ দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া মহাবেগে জলমধ্যে পতিত হয়, তাহা অতিশয় অনিষ্টকর, ইহাতে বক্ষে অত্যন্ত আঘাত লাগে, অথবা জলমধ্যে কোনরূপ গোঁজ বা খোঁটা থাকিলে তদ্দ্বারা প্রাণ সংশয় হইতে পারে অথবা হস্ত পদ ভগ্ন হইতে পারে। আহারের ঠিক পূর্বে কি পরে স্নান না করিয়া আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্বে স্নান করিবে। জলমধ্যে অত্যন্ত অধিক সময় থাকা উচিত নহে। পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই ঘর্মাক্ত শরীরে স্নান করিবে না, এরূপ করিলে অনেক পীড়া হয়।

চতুর্থ উপদেশ

ব্যায়াম

চাষার হস্ত কেমন শক্ত এবং পাল্কি বেহারার কাঁধ কেমন দৃঢ়, আবার বাবুর হস্ত কেমন কোমল, ও স্ত্রীলোকের শরীর কেমন নরম? ইহার কারণ কেহ বলিতে পার? চাষারা সর্বদা হস্তদ্বারা কার্য করে, বেহারারা সর্বদা কাঁধে পাল্কি বহন করে, এই জন্য ঐ সকল অঙ্গ এত দৃঢ়। বাবুর হস্ত শোভার জন্য, কার্য করে না—এই জন্য দুর্বল ও কোমল, নারীজাতির শারীরিক পরিশ্রম কম, এই জন্য শরীর এত নরম। শরীরের যে অংশ চালনা করিবে সেই অংশ দৃঢ় ও সবল হইবে,—এই নিয়মানুসারে সমস্ত শরীর চালনা করিলে সমস্ত শরীর সবল হইবে—একথা সকলেই বুঝিতে পারে। কৃষকেরা পরিশ্রমী, সুতরাং তাহারা সবল শরীর ; বড় লোকেরা বিলাসী ও অলস,—এই জন্য তাহারা দুর্বল ও অল্পায়ু।

যদি বলবান হইতে চাও, নীরোগ হইতে ইচ্ছা থাকে, অনেকদিন বাঁচিতে চাও, তবে প্রত্যহ ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করিবে। ব্যায়াম করিলে বক্ষ প্রশস্ত হয় ও নিশ্বাসের যন্ত্রের বল হয়, রক্তের জোর অধিক হয়, চর্ম কোমল ও পরিষ্কার থাকে, সাহস ও মনের বল বৃদ্ধি হয়, পরিপাক শক্তি উত্তম হয়, হস্ত পদে বল হয়, সমস্ত শরীর নীরোগ, সতেজ ও সরল হয়—শরীর ও মনের অযথা কোমলতা দূর হয়। ফলতঃ শরীর ও মনের ইহার দ্বারা সরল প্রকার উন্নতি হয়।

এমন ব্যায়াম করিবে, যাহাতে সমস্ত শরীরেরই সঞ্চালন হয়। ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, সাঁতার দেওয়া, শারীরিক খেলা, কুস্তি প্রভৃতি নানাপ্রকারে ব্যায়াম করা যাইতে পারে। গান করা ও বাঁশী বাজানও একরূপ ব্যায়াম—এতদ্দ্বারা ফুসফুসের বল হয়। এমন কোন ব্যায়াম করিও না,—যার দ্বারা কোন বিপদ ঘটিতে পারে।

অপরিমিত ব্যায়াম করিলে ক্ষতি হয়। পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম অতি আবশ্যক এবং পরিশ্রমের নিয়ম থাকা কর্তব্য। খাদ্য সামগ্রীও এরূপ হওয়া উচিত যে, শরীর পোষণ করিতে পারে।

পঞ্চম উপদেশ

নিদ্রা

ঘর্ষণে ঘর্ষণে প্রস্তর ক্ষয় হয়, পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় দূর করিবার জন্য শরীরের বিশ্রাম চাই। এই জন্যই নিদ্রা অতিশয় আবশ্যক। নিদ্রা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং যাহার সুনিদ্রা হয়, সেই সুস্থ ও সুখী। কোন কারণেই নিদ্রায় অন্যথা করা অনুচিত।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। রাত্রিই নিদ্রার প্রকৃত সময়। সকাল রাত্রে শয়ন ও অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলে শরীর ভাল থাকে। অনেক ছাত্রের এমন অভ্যাস আছে যে তাহারা দিবসে আলস্য করিয়া কেবল রজনীতে অধ্যয়ন করে এবং ১২টা কি ১টা রাত্রির সময় তাহারা শয়ন করে, তাহাদিগের যত রোগ হয় এই রূপ অনিয়মই তাহার বিশেষ কারণ ; সুতরাং কেহ এরূপ করিও না। ১০টা কি ১১টার সময়ে নিদ্রা যাওয়া কর্তব্য। যে ঘরে শয়ন করিবে তাহা যেন পরিষ্কার বায়ুযুক্ত হয়। এক বিছানায় এক জনের অধিক শয়ন করা অন্যায়, যদি নিতান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যাহাতে একজনের নিশ্বাস অন্যের

শরীরে না লাগে এরূপ করিবে। গৃহমধ্যে বায়ুর প্রচুরতা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া মুক্ত বায়ুপথে শয়ন করা অনুচিত। শয়নকালে অন্যান্য জানালা খুলিয়া দিয়া মস্তকের নিকটস্থ জানালা সকল আবদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। রাত্রির বাতাস নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরে লাগিলে অপকারের সম্ভাবনা।

গুরুতর আহারের পরে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনুচিত, বাম কি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, সুতরাং নানা প্রকার ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। লোকে যাহাকে "বোবায় ধরা" বলে তাহাও এইরূপ কারণে উৎপন্ন হয়।

যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ নিদ্রার আবির্ভাব না হয় তবে হাত পা স্থির ভাবে রাখিয়া মনে মনে পড়া বিষয়ক বা অন্য কোন চিন্তা করিবে। যদি তাহাতেও নিদ্রা না হয়, তবে এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা করিবে। এরূপ উপায়েই অনেকের নিদ্রাকর্ষণ হয়। কেহ কেহ শায়িত অবস্থায় পুস্তক লইয়া পড়িতে পড়িতে সহজে নিদ্রিত হইতে পারেন।

যদি এ সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ দ্বারা নিদ্রা আনয়ন করিবে।

ষষ্ঠ উপদেশ

উপাসনা

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আমাদিগকে পালন ও সর্বসুখ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের শরীর ও মন সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার কর্তব্য আছে, ঈশ্বরের উপাসনাও তদ্রূপ।

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন কি না সে কথায় কাজ নাই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাভাবিক। যখন আমরা সামান্য উপকার পাইয়াই বন্ধুগণের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হই তখন যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত পাইয়াছি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের কর্তব্য নহে?

উপাসনা করিলে মন সবল ও সুস্থ হয়, সৎ প্রবৃত্তিসকল সতেজ হয়, পাপের চিন্তা দূর হয় এবং পাপ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যায়। নিষ্পাপ হইলে শরীর সুস্থ থাকে, সুতরাং উপাসনার এক ফল শারীরিক সুস্থতা লাভ।

অনেকে মনে করেন যে, ছাত্রদিগের উপাসনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধেরাই তাহা করিবেন। এ বিশ্বাস অত্যন্ত ভুল। শৈশবই আমাদিগের শিক্ষার সময়। এই সময়ে যাহা অবহেলা করিবে, তাহাই শিক্ষা হইবে না।

যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েন। যাহারা ঈশ্বর প্রেমিক ও উপাসনাশীল, তাঁহারাই ধার্মিক ও সচ্চরিত্র হয়েন, যাহারা ঈশ্বর মানে না ও উপাসনা করে না, তাহারা কুচরিত্র ও পাপী হয়। অনেক উত্তম ছাত্রেরাই উপাসনাশীল। উপাসনার পরে সাহস ও স্ফূর্তির সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

অতএব দিবসে অন্ততঃ দুই বার উপাসনা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে। এক এক বার অর্ধ ঘণ্টাই বালক বালিকার পক্ষে যথেষ্ট।

সপ্তম উপদেশ

একদিন উপবাস করিলে শরীর কেমন দুর্বল বোধ হয়, মাথা ঘুরে, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়, পা চলে না, শরীরের কি মনের কোন কার্যই করা যায় না, ইহা কে না জানে? আবার পরিমিতাহারের ক্ষণকাল পরেই শরীরে ও মনে কেমন স্ফূর্তি বোধ হয়। বাস্তবিক আহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু কেবল আহার করিলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে, এমন দ্রব্য আহার করা চাই, যাহা শরীর রক্ষার উপযুক্ত। কতকগুলি অসার বস্তু দ্বারা উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা অনাহারই ভাল। অতএব বিশেষ বিবেচনা সহকারে আহার্য পদার্থ নির্বাচন করিবে।

সচরাচর যে সকল দ্রব্য আমরা আহার করি, তাহাকে চারি ভাগ বিভক্ত করা যায়।

এক শ্রেণীর মধ্যে ভাত, রুটী, ডাউল, মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি প্রধান। মনুষ্য মাত্রেরই এই শ্রেণীর পদার্থ সকল প্রধান আহার। ইহারা শরীরের পুষ্টি করে, তাহার সারাংশ উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে চিনি, আলু, অনেক সুপক্ক ফল প্রভৃতি প্রধান, এতদ্দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তৈল, ঘৃত, নবনীত, মেদ, ইত্যাদি। ইহারাও তাপ রক্ষা করে ও মেদ উৎপাদন করে।

লবণ পৃথকভাবে ও শাক সবজির মধ্যে নানা প্রকারে অবস্থিতি করে, ইহা রক্তের উপাদান, ও অস্থি প্রভৃতি মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা চতুর্থশ্রেণী।

এই চারি শ্রেণীর সকলগুলিই শবীর রক্ষার্থ আবশ্যক, সুতরাং প্রকৃত শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য তাহাই, যাহাতে এই চারি শ্রেণীর পদার্থ সকল উপযুক্ত পরিমাণে অবস্থিতি করে। সুতরাং আহারের উপযুক্ত দ্রব্য নির্ণয় করিতে হইলে সকল শ্রেণীর পদার্থই কতক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। আহারের পরিমাণ শরীরের বৃদ্ধি, বয়স, পরিশ্রম, অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে পৃথক প্রকার, সুতরাং তাহা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। নিম্নে বালকদিগের আহার সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম লিখিতেছি, তদ্দ্বারা বোধ হয় অনেকেই চলিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়ম যে সকলের উপযুক্ত, এমত বলি না, কারণ এরূপ নিয়ম সম্ভব নহে।

সকাল বেলা দুগ্ধ ও ডিম্ব বা রুটী, চিনি ও দুগ্ধ, কিম্বা দুগ্ধ ও ভাত অল্প পরিমাণে এই সকল দ্রব্য আহার করিবে। যাহার অবস্থা এ সকলের উপযোগী নহে, তিনি গরম ভাত, মৎস্য প্রভৃতিও খাইতে পারেন। পক্কফল—আম্র, কমলালেবু—প্রভৃতিও উত্তম!

৯॥০টা বেলার সময় অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার পূর্বে ভাত, ঘৃত, মৎস্য, ডাল, মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি যথোপযুক্তরূপে আহার করিবে। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও ভাত, মৎস্য, ডাল, এবং দুগ্ধ ইহার কম কিছুতেই শরীর পোষিত হয় না। লবণাদি যাহা আবশ্যক, স্বভাবই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকে সুতরাং তাহা পৃথক ভাবে লিখিলাম না।

স্কুল হইতে আসিয়া লুচি, দুগ্ধ ও রুটী প্রভৃতি আহার করিবে ; কিন্তু তখন পূর্ণ ভোজন করিবে না। অধিক মিষ্টান্ন খাইবে না, কারণ তাহাতে উপকার যা হউক না হউক, বিলক্ষণ অপকার হয়।

রজনীতে আবার মধ্যাহ্নের ন্যায় পূর্ণ আহার করিবে। কেহ কেহ ভাতের পরিবর্তে রুটী ব্যবহার করেন ; যাহা হউক, তাহা অভ্যাস অনুসারে হইয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থ মধ্যাহ্নের ন্যায়।

নিম্নে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের গুণাগুণ লিখিলাম।

বাঙ্গালা দেশে ভাত প্রধান খাদ্য, ইহাতে শরীর রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু ময়দার রুটী তদপেক্ষা অধিক উপকারী।

মৎস, মাংস, ডিম্ব, এই সকল খাদ্য শরীর পোষণ করে, বলবৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের স্ফূর্তি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহা যে শরীর রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক এমন কথা বলি না। কারণ হিন্দু জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ইহা ব্যতীতও সবলকায় ও সুস্থ শরীর থাকে।

ডা'ল অতিশয় পুষ্টিকারক, ইহার মধ্যে মসূর, মুগ, প্রধান ; মটর ও খেসারি উৎকৃষ্ট নহে। মাংসাদির পরিবর্তে ডা'ল ব্যবস্থা হইতে পারে। নিরামিষভোজীদিগের ইহা একমাত্র শরীর-পোষক কিন্তু অধিক পরিমাণে ডা'ল খাইলে উদরের পীড়া হইতে পারে।

দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর, রক্ত বৃদ্ধি করে, বল বৃদ্ধি করে, শিশুর শরীর এতদ্দ্বারাই রক্ষা হয়। পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও ইহা অতি আবশ্যক। এরূপ সুস্বাদু নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য কিছুই নহে।

আলুও পুষ্টিকর। তরকারীর মধ্যে ইহা সর্বপ্রথম। আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহাই প্রধান খাদ্য।

কচু, কাঁচকলা, শালগম প্রভৃতিও উত্তম তরকারী মধ্যে গণ্য। পটল, মূলো, বেগুন, প্রভৃতি তরকারী মন্দ নহে কিন্তু বেগুন অধিক পরিমাণে ও অনেক দিন আহার করিলে চর্মরোগ হয়।

পক্ক ফলের মধ্যে কলা. আম্র, কমলালেবু, নারিকেল প্রভৃতি উত্তম ও উপকারী। আতা, পেয়ারা, লিচু, জাম, কুল, প্রভৃতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। কাঁঠাল অধিক পরিমাণে খাইলে অজীর্ণ উৎপাদন করে, অল্প পরিমাণে আহার করিলে মন্দ নহে। তাল অতি অপকারক। অম্ল ও কাঁচা ফল—জলপাই, কামরাঙ্গা, কুল, আমড়া—প্রভৃতি অপকারক।

ঘৃত, নবনীত, সর শরীর পুষ্ট করে, মেদবৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহা পরিমিতরূপে আহার করিবে।

ক্ষীর অতি গুরুপাক, সুতরাং অধিক আহার করা উচিত নহে। দধি ঘোল প্রভৃতি বিশেষ উপকারী নহে, অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। তবে ঘোল অজীর্ণতার উপকার করে।

পিষ্টকাদি বিশেষ উপকারক নহে, কখনও ইহা খাইতে হইলে অল্প পরিমাণে আহার করিবে, মিষ্টান্ন সকলই তদ্রূপ।

অধিক পরিমাণে মশলা দ্বারা যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, যেমন পোলাও, মাংসের নানা প্রকার ব্যঞ্জন, ইত্যাদি অতিশয় গুরুপাক। অধিক মশলার পাকের বস্তু আহার করিবে না। উপযুক্ত পরিমাণে মশলার পাকই উত্তম। অতি ভোজন অনুচিত, বরং অল্প অল্প ক্ষুধা রাখিয়া আহার কর্তব্য। ধীরে ধীরে আহার করিবে। আহারের সময় গল্প করিবে। আহারের পূর্বে বা পরেই স্নান, ব্যায়াম বা পাঠ করিবে না। আহারের পর দুই ঘণ্টা বিশ্রাম চাই।

২

শরীরের মধ্যে যে রক্ত থাকে, তাহার মধ্যে জলের ভাগ অধিক। সেই জলের অভাব হইলেই আমরা পিপাসার্ত হই। এই জন্য যতক্ষণ আমরা ক্ষয়িত জলের সমান পরিমাণ জল গ্রহণ না করি, ততক্ষণ আমাদের পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। স্নান সময় লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে, এজন্য স্নান দ্বারা অনেক সময়ে পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। জল পান দ্বারাই অবশিষ্ট জলের অভাব পূর্ণ হয়। অতএব জল অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। নিয়মিতরূপে জল পান করা কর্ত্তব্য। অনেকে আহার সময়ে প্রচুর জলপান করেন। কেহ কেহ আহারের দুই কি চারি ঘণ্টা পরে জলপান করিয়া থাকেন, অভ্যাস অনুসারে সকলই সহ্য হয়। আহারের সময় অতিশয় অধিক জল পান করা উচিত নহে, আহারের কিঞ্চিৎ পরেই জল পান করা কর্তব্য।

জল আমাদের যেমন উপকারী, অপরিষ্কৃত জল শরীরের পক্ষে তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে। ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগ অপবিত্র জলপানেই উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন উদরের পীড়া, কফ, কাশি, জ্বর প্রভৃতিও অপবিত্র জল ব্যবহার করিলে জন্মিয়া থাকে। অতএব শিশুগণ, সাবধান, অপরিষ্কৃত জল কদাচ উদরসাৎ করিও না, আর কোন উপায় না থাকিলে অন্ততঃ জলকে উত্তপ্ত করিয়া উত্তম রূপে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে।

জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ই আমাদের শরীরের পক্ষে আবশ্যক নহে, তথাপিও আমরা দেখিতে পাই, যে অনেকে জলের পরিবর্তে কতকগুলি অনিষ্টকর পদার্থ সেবন করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা অনেকগুলি কুঅভ্যাস শিক্ষা হয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থ আহার ও পানীয় মধ্যে গণ্য হয়। মদ তন্মধ্যে একটী। এই বিষ যতদিন সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ততদিন হইতে দেশের স্বাস্থ্য, অর্থ, উন্নতি সকলেরই ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি লোকে ইহার অনিষ্টকারিতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। আমাদের দেশের ধনী ও বিদ্বানগণ অনেকেই এই রাক্ষসী সুরার মায়ায় পতিত হইয়া ধন, মান, সকলই হারাইয়া অবশেষে অকাল-মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগের বিদ্যা, তাঁহাদিগের বুদ্ধি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করা দূরে থাকুক, আপনাদিগের অকাল মৃত্যু দ্বারা দেশের বিধবা ও অনাথদিগের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিশুগণ, এই পাপকে স্পর্শও করিও না।

সুরা শরীর পোষণের জন্য আবশ্যক নহে এবং মনুষ্য-শরীরের প্রকৃতিই এরূপ যে কোন অনাবশ্যক পদার্থ শরীর মধ্যে নিয়মিত রূপে লইতে আরম্ভ করিলে, এক দিনে হউক, এক বৎসরে হউক, অনিষ্ট সাধন করিবেই করিবে। সুরা সম্বন্ধেও সেইরূপ। সুরাপান দ্বারা নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুরাপায়ী প্রায়ই অকাল-মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন সে আপনার নিকট ঘৃণিত, পরিবারের অপ্রিয় পাত্র, ও ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয়। তাহার পুত্র পরিবার অন্ন বস্ত্র বিনা প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার শরীর অসুস্থ ও মন জড়বৎ নিস্তেজ হয়। যে সকল পবিত্র কার্য দ্বারা মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়, সে তাহার কিছুই করিতে পারে না। অতএব সকলেরই এই ঘৃণিত পাপকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

চা, কফি প্রভৃতিও ক্রমশঃ আমাদের দেশে অভ্যস্ত হইতেছে। সময়ে সময়ে চা শরীরের উপকার করে না, এরূপ নহে ; শর্দি হইলে অথবা অত্যন্ত শীতের সময়ে গরম চা অতিশয় উপকারী, কিন্তু তাহা বলিয়া এই চা কে অভ্যাসরূপে পরিণত করা উচিত নহে।

ধূম-পান।—আমাদের দেশে তামাক গাঁজা, আফিং, চরস প্রভৃতি হুঁকায় সাজিয়া ধূম-পান করার রীতি আছে, ইহাও অতিশয় অনিষ্টকর। তামাক সকল নর নারীর নিকট উপাদেয়, কেহ নস্যরূপে, কেহ শুধু তামাক পাতা, কেহ বা পোড়ান তামাক ব্যবহার করেন, কিন্তু চিকিৎসকেরা সকল প্রকার ব্যবহারকেই অনিষ্টকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব তামাকের অভ্যাস পরিত্যাগ করা কর্তব্য। গাঁজা অতিশয় অনিষ্টকর, গাঁজাখোরেরা ভদ্রলোকের ঘৃণার পাত্র হয়, এবং তাহারা প্রায়ই রক্ত-আমাশয় ও উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে। আফিং সর্বাপেক্ষা প্রধান বিষ, অতএব এই সকল নেশার কাছেও যাইও না।

পান প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য আমাদের দেশে চর্বিত হইয়া থাকে। তাহা সময়ে সময়ে উপকারক, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অনিষ্ট করে। আহারের পরে দুই একটী পান চর্বণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বরং উপকার হয়।

* * *

বালক বালিকাগণ, তোমাদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই লজ্জা বোধ হয়, অথচ বলিতেই হইবে। আমাদের সমাজ এরূপ এবং অভিভাবকগণ এমন অন্ধ যে তোমাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিতে পারি না।

বিবাহ কাহাকে বলে, তাহা তোমরা জান না, কিন্তু না জানিলে কি হয়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তোমাদিগেরও বিবাহিত হইতে হইবে। তোমরা চাও, আর না চাও, তোমরা জান আর না জান, কিন্তু সমাজ তোমাদিগকে ছাড়িবে না, তোমাদিগের পায়ে বেড়ী দিবেই দিবে।

"ইংরাজ দিগকে দেখিয়াছ? কেমন বলবান, সাহসী ও ধনী! কত দূর হইতে আসিয়াছে, কত অল্পলোকে তোমাদিগের এত কোটী লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে! তোমরা এমন পার না কেন? কারণ অল্প বয়সেই বিবাহিত হইয়া তোমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। দারিদ্র্য ও সংসারের জ্বালায় আর উচ্চতর প্রবৃত্তি সকল থাকে না। তোমরা বিদেশে যাইতে ভয় কর, প্রাণ দিতে পার না, কারণ তোমাদের পরিজনগণের কি উপায় হইবে! তোমরা স্কুল ছাড়িলেই চাক্‌রী লইতে হইবে, নতুবা তোমাদের সন্তানগণ উপবাস করিবে। সুতরাং এই বাল্য বিবাহই তোমাদের সকল উন্নতির কণ্টক।

আবার দেখ ঐ যুবক ১৮ বৎসর বয়সে সন্তানের পিতা হইল, উহার সন্তানের পীড়া সারিতেছে না, তাহার শরীরও সবল হইতেছে না— সে যদি বাঁচিয়াও থাকে, তথাপিও কোন কার্য করিতে পারিবে না, এবং বাঁচিবে কি না তাহাই সন্দেহ। আবার তাঁহার পিতাকে দেখ, শরীর কেমন রুগ্ন, পড়াশুনা হইল না। বল দেখি কেন? বাল্য বিবাহই ইহার কারণ।

ঐ সন্তানের মাতার দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার বয়স ১৩ বৎসর। সে বালিকা, খেলিতে চায়, পড়িতে চায়, কিন্তু তাহার সন্তান তাহাকে দেয় না। তাহার শরীর কত দুর্বল, চাহিয়া দেখ সন্তান হওয়ার পর হইতে তাহার আর রোগ ছাড়ে না। সে বোধ হয় ২৫ বৎসরের অধিক বাঁচিবে না। ইহার কারণ কি জান? বাল্য বিবাহ।

পাড়ার ঐ যুবককে দেখ, তোমরা মনে কর উহার বয়স ৪০ বৎসর, কিন্তু তাহা নয়, উহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাহার পাঁচটী সন্তান। উহার আয় মাসিক ২০্ টাকা, পরিবারের আহারের ব্যয় ১৯্ টাকা, আর এক টাকা যাহা অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা

ছেলেদের বস্ত্র দিবে. না ঔষধ দিবে, না পড়িবার সংস্থান করিবে। দেখ ইহাদের কেমন কষ্ট। কয়েক মাস হইল, উহার একটী সন্তান নষ্ট হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ হইয়াছিল, সে সামান্য রোগ কিন্তু উত্তম চিকিৎসা হয় নাই, কারণ চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে দিবে? এইরূপে অনাহারে রোগে শোকে যুবকের মুখ সর্বদা মলিন। তোমরা এইরূপ ক্লেশ চাও?। যদি না চাও তবে বাল্যবিবাহ করিও না।

আর কত প্রকারে তোমাদিগকে বলিব, শত শত প্রকারে বাল্য বিবাহ দেশের ও সমাজের নানা অনিষ্ট করিতেছে। বাঙ্গালী পরিবারে যত অকালমৃত্যু, শোক, দারিদ্র্য, রোগ, দেশের যত অভাব সকলই এই বাল্য বিবাহ জনিত। অতএব সাবধান! এই রাক্ষসকে সমূলে বিনষ্ট কর।

তোমরা আর কয়েক বৎসর পরেই দেখিবে, পিতা আজ তোমাদিগকে এই দুঃখ-বন্ধনে বান্ধিতে যত্ন করিতেছেন। পিতামাতা পরম পূজনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের অসঙ্গত কথাও যে মান্য করিতে হইবে তাহা নহে। তোমরা কাহারও কথায় বাল্য বিবাহ-করিও না। সাবধান শিশুগণ এই অনিষ্ট স্রোতকে আর প্রবাহিত করিও না।

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৮৬। ১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১০০-১০১। ১ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৩, পৃ. ১১৬-১১৭। ১ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৪৩-১৪৪। ১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৫২-১৫৪। ২ : ১ : নুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ৩-৪। ২ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ২১-২২।

কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

প্রমদাচরণ সেন



দিন মাঠে পাড়াগেঁয়ে দুটি লোক কলিকাতায় আসিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহারা গিয়া দেখে যাদুঘরের কাছে রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশ পর্যন্ত একটী পোল প্রস্তুত হইয়াছে এবং গড়ের মাঠের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া দুই জনে খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম ব্যক্তি বলিল—"দেখ দেখ! এখানে কি হবে বলতে পার?" দ্বিতীয় উত্তর করিল—"কে জানে বাপু? বোধ হয় সাহেব বিবিদের খানা হবে।" তাহারা এই রূপে কথা কহিতেছিল এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা কতকগুলি খবরের কাগজ লইয়া সেইখানে বিক্রয় করিতে আসিল। আমাদের দুজন বন্ধু দু-পয়সা দিয়া একখানি কাগজ কিনিলেন এবং তাহার শেষের পৃষ্ঠায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কথা লেখা আছে দেখিলেন। আমরা সেই কথা নিজেদের ভাষায় পাঠক-পাঠিকাদিগকে বলিতেছি—

আগামী ১৯-এ অগ্রহায়ণ হইতে ১৯এ ফাল্গুন পর্যন্ত তিনমাস ধরিয়া গড়ের মাঠে মহা ধূমধামের সহিত এই মেলা বসিবে।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী আছে সমস্তই এই মেলায় আসিয়াছে। এই সকল দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার নিমিত্ত আমাদের ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের হুকুমে যাদুঘরের দক্ষিণে ও গড়ের মাঠে আজ কয়েকমাস ধরিয়া গৃহাদি প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যত প্রকার কল শিল্প, কর্ম ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, সমস্ত

দ্রব্যই এই মেলায় আনীত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যত প্রকার বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে গর্ভনমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদিগের দ্বারা সে সমুদায়ও যোগাড় করা হইয়াছে। ভারতের গৌরব ও লক্ষ্মীশ্রী দেখিবার নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দেশ হইতে লোকের ভিড় হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীরাও পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকল দেশেরই আনীত চমৎকার দ্রব্য সকল দেখিতে পাইবেন। ইহার ফল হইবে যে বিদেশীয় নূতন নূতন শিল্প কর্ম দেখিলে ভারতবাসীরাও সেই সকল শিল্প কর্ম করিতে শিখিবেন। তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, ও এই সমস্ত দ্রব্য সস্তা হইয়া আসিবে।

উপরে যে সকল দ্রব্যের কথা লিখিত হইল ইহা ছাড়া বড় বড় মহারাজ, রাজা, নবাব, সর্দার, জমীদার, মহাজন ও অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিদিগের মহামূল্য মণি, মুক্তা, অলঙ্কারাদিও এই প্রদর্শনীতে আনা হইবে। এই সকল দ্রব্যের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা। এইগুলিকে সাবধানে রাখিবার জন্য গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে এবং যাহাতে উত্তম রূপে সকলেই দেখিতে পান, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই সমুদায় দ্রব্য সকল সময়েই সকলে দেখিতে পাইবেন। মেলায় দেখিবার আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিষ ছাড়া সাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বৈকালে ও সন্ধ্যার সময়ে নানা রূপ কৌতুক ও তামাশা দেখান হইবে—যথা গীত বাদ্য ও ভোজবাজীর মত অতি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বাজী।

মেলার ভিতর যাইতে হইলে টিকিট কিনিয়া যাইতে হইবে। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই বিনা কষ্টে যতবার ইচ্ছা ততবার গিয়া মেলা দেখিতে পাইবেন বলিয়া রবিবার ও বুধবার ছাড়া অপর সকল দিনে দশটা হইতে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত টিকিটের মূল্য চারি আনা নির্ধারিত হইয়াছে। ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার পর দেখিতে চাহিলে আট আনা করিয়া দিতে হইবে। যাহারা অধিক ভিড়ের ভিতর যাইয়া দেখিতে না ইচ্ছা করেন তাঁহারা বুধবার দিন একটাকা মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া বেশ দেখিতে পাবেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যাহাতে নির্জনে ও সম্ভ্রমের সহিত মেলা দেখিতে পান এ জন্য তাঁহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দিন নির্দিষ্ট হইবে। সে দিন কেবল স্ত্রীলোকেরাই যাইতে পাইবেন। পুরুষেরা যাইতে পাইবেন না। বোধ হয় বিবিরা সঙ্গে করিয়া দেখাইয়া লইয়া বেড়াইবেন।

এইরূপ আশ্চর্য চমৎকার ও মনোহর দ্রব্যাদি দর্শনের সুবিধা ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত আর কখনও হয় নাই ; ও অনেকের প্রাণ থকিতে যে পুনরায় এরূপ ঘটনা হইবে তাহারও কোন আশা নাই। ভারতবাসীদিগকে এই মেলা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম ও বিস্তর টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। সে জন্য গভর্ণমেন্টের একান্ত ইচ্ছা যে কি ইতর কি ভদ্র কি বড় কি ছোট কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই আসিয়া এই মহামেলা দর্শন করেন। সকলেই অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া টিকিটের মূল্য এত স্বল্প করা হইয়াছে। সকলেরই আসিয়া দেখা উচিত।

ইংরাজী ৪ঠা ডিসেম্বর এই মেলার প্রথম দিন স্বয়ং বড়লাট সাহেব উপস্থিত থাকিবেন। এই সভায় আমাদিগের মহারানীর পুত্র রাজকুমার ডিউক অব কনাট ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ছোট লাট সাহেবরা এবং অনেক রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিবেন।

সেই দিন যাহারা ভাল যায়গায় পৃথক বসিবেন তাহাদিগকে দশটাকা মূল্যের টিকিট লইতে হইবে। যাহারা সাধারণের সঙ্গে বসিবেন তাহাদিগের পাঁচ টাকা লাগিবে।

রবিবার মেলা বন্ধ থাকিবে। বুধবার টিকিটের মূল্য ১ টাকা এই দুই দিন ছাড়া আর সমস্ত দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ।০ এবং সন্ধ্যার পর ।।০ দিতে হইবে। আমরা আশা করি সকলেই আসিয়া এক একবার এই মহামেলা দেখিয়া যাইবেন।

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ৯১-৯২।

আখ্যান মালা

কুমারী হেমলতা দেবী

এ পৃথিবীতে আর আসিবে না।

একদিন সরোজা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন সময়ে একটু কাগজে লেখা এই কয়টি কথার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল :—"সৎলোকেরা মনে করেন, আমি এই পৃথিবীতে কেবল একবারই আসিব ; সেই সময়ের মধ্যে যত ভাল কাজ করা যায় ও করা উচিত, ইহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া আমার কর্তব্য নহে।" সরোজা এই কথাগুলি একবার পড়িল, দুইবার পড়িল,—এই কথাগুলি তাহার প্রাণে বিশেষ রূপে অঙ্কিত হইল। সে অতিশয় ভাবিতে ভাবিতে আহার করিতে বসিল। আহারের সময় মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার কোন সৎইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—যাহা আর হইবে না। সরোজা পূর্বে মনে করিয়াছিল এই ছুটির কয় দিন খুব আমোদে কাটাইবে, কিন্তু এখন তাহার ইচ্ছা হইল "যতদূর পারি কাজ করিয়া আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিব।" 'আমি আর এ সময় পাইব না'—এই ক্ষুদ্র কথাটি তাহার প্রাণকে নাড়িয়া দিল ; তাহার প্রাণে আর এক নূতন চিন্তার স্রোত বহাইয়া দিল। যদি মাতা দিন দিন রোগা হইয়া যান, যদি তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পায়, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, এই সকল মহাকষ্টকর ভাবনায় বালিকাকে অস্থির করিতেছিল। সে কেবল এই ভাবিতে লাগিল "হায়! আমি মায়ের নিকট তাঁহার স্নেহের জন্য ঋণী রহিলাম তাহার পরিশোধ কিরূপে দিব। যাহা হউক যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" আহারের পর সে আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি না বলেছিলে একদিন ভবানীপুরে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করিবে। আজই যেওনা,—আমি তোমার আজকার সমস্ত কাজ করিব।" মাতা উত্তর করিলেন "না মা! আজ অনেক কাজ আছে, আজ আর যাওয়া হবে না।" সরোজা বলিল "হাঁ মা! আজই যাওনা—আজ আর আমার কোন কাজ নাই, কেবল তোমার কাজই ক'রব।"

সরোজা তাহার কথা রাখিল। তাহার মাতা আসিয়া তাঁহার কার্য সমস্তই হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দিন হইতে সরোজাকে আর কোন কার্যের জন্য কিছুই বলিতে হয় নাই।



রাজার ভদ্রতা ও সুবুদ্ধি।

একদিন কোন একজন রাজা একটী দরিদ্র বালককে উপদেশ দিতেছিলেন দেখিয়া, একজন খোসামুদে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল ; তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, যদিও বালকটী গরিব তথাপি উহার আত্মা আমারই ন্যায় মূল্যবান, উহার ও আমার উভয়েরই এক ঈশ্বর ও এক পথ। তবে কেন উহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিব?"

এযে নূতন মেয়ে!

একবার একটি নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত একজন ধার্মিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালের কাজে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন—বৈকালে আপনার কাজ করিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই স্থানে যাইতে হইল। তিনি সেই স্থানে গিয়া সেই সকল লোককে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন একটি বালিকা অতি কদর্যরূপে কাপড় পরিয়া সেই স্থানের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে; তাহার রৌদ্রতপ্ত ছোট মুখখানি হাত দিয়া ঢাকা, এবং চক্ষের জল হস্তের মধ্য দিয়া দর দর করিয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুঃখে কষ্টে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী ফাটিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই আর একটি একাদশবর্ষীয়া বালিকা সেইখানে আসিল। সে এই বালিকাটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল এবং অতি স্নেহের সহিত তাহাকে নিকটের নদীর ধারে একখানি কাঠের উপর বসাইয়া হস্তে করিয়া জল লইয়া তাহার চক্ষু ও অশ্রুমাখা মুখ খানি শীতল করিয়া, তাহার সহিত অতি প্রফুল্ল ভাবে কত আলাপ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বালিকাটী পুনরায় প্রফুল্ল হইল, চোখের জল তাহার নিকট বিদায় লইল, মুখখানি ফের হাসিমাখা হইল। সেই ভদ্র লোকটী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা! এটি কি তোমার ছোট বোন"। বালিকাটি নম্রভাবে উত্তর দিল, "না মহাশয়! আমার একটিও বোন নাই।"

"তবে বোধ হয় তোমরা এক পাঠশালায় পড়, না?"

বালিকাটি বলিল "না, আমি ইহাকে কখনও দেখি নাই, জানি না কোথা থেকে এসেছে।"

"জান না? তা হলে কেমন করে ওকে নিয়ে এসে এমন যত্ন কর্‌ছ?"

"ও মেয়েটি এখানে নূতন এসেছে, একলা একলা, ফাঁক ফাঁক লাগছে,—কাহারও উহার উপর ভাল ব্যবহার করা উচিত, সেই জন্য আমি ওকে এখানে এনেছি।"

ভদ্রলোকটি মনে করিলেন "আমি আজ এই বিষয় লইয়া কিছু বলিব।" তাঁহার সেদিনকার উপদেশের বিষয় এই :—"তুমি তোমার ভাই বোনদিগের প্রতি যেটুকু ভাল ব্যবহার কর, সে টুকু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই কর।" তিনি বালিকা দুটিকে সেখানে লইয়া গিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে সকলকে জানাইলেন। অনেক বালকবালিকা একমনে সে কথা শুনিল।

ঠিক উত্তর।

একদিন একটি বালককে তাহার সঙ্গীগণ তাহার পিতার গাছ হইতে কতকগুলি আম পাড়িতে বলিল। কিন্তু তাহার পিতা সেই আমগুলিতে হাত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরা বলিল ;"তুমি ভয় পাও কেন? তোমার বাবাত আর তোমায় মারিবেন না?" বালকটি

উত্তর করিল, "সেই জন্যই আমার হাত দেওয়া উচিত নয়। বাবা আমায় আঘাত করিবেন না বটে, কিন্তু আমিত অবাধ্য হইয়া তাঁহার মনে আঘাত দিব?"

শাস্তি।

পাঁচ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কোন দোষ করাতে, তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া তাহার দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে সে যে দোষ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, ঈশ্বরের কাছে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তার পর একখানি বই হইতে, এই কথাগুলি পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন :—"যিনি সন্তান দোষ করিলে শাস্তি দেন না, তিনি সন্তানের মঙ্গল চান না। যে পিতা সন্তানের মঙ্গল চান, তিনি যথাসময়ে তাহার দোষের জন্যে তাহাকে শাস্তি না দিলে ছেলেদের জ্ঞান হয় না। ছেলেদের আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে দিলে শেষে এমন কাজ করে, যাহাতে পিতা মাতার নিন্দা হয়"। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বাপু! আমার কি করা উচিত বল দেখি?" ছেলেটি উত্তর দিল, "কেন বাবা! আমি যে দোষ করিয়াছি ও শাস্তি পাবার উপযুক্ত ; আমায় শাস্তি দিবেই।" শাস্তি পাবার পরে, বালকটি পিতাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা! আমি আর কখন তোমার অবাধ্য হইব না।"

শিশুর সততা।

গ্রামের কোন ছোট বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীর বালকদিগকে, তাহাদের পড়া লইতে লইতে, একটি কঠিন শব্দ বানান করিতে বলিলাম। প্রথম, দ্বিতীয়, করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সকলের চেয়ে ছোট একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে ঠিক বলিল। আমি তাহাকে প্রথম বসিতে বলিয়া আরও ভাল করিয়া শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যাই বোর্ডে লিখিয়া দেখাইব, অমনি ছেলেটি বলিয়া উঠিল "পণ্ডিত মহাশয়! আমি 'উ'র স্থানে 'ঊ' বলিয়াছি।" এই বলিয়াই সে আপন স্থানে আসিয়া বসিল। বল দেখি ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে ইহা কি সামান্য সুবুদ্ধি দেখান! যদি সে আপনার ভুল না বলিত তাহা হইলে আমি চিরকালই মনে করিতাম সে ঠিকই বলিয়াছিল, কিন্তু বালকটি এমন সৎ যে যাহা তাহার পাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহার লাভ করিবার ইচ্ছা হইল না।

১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ ১০১-১০৩।

প্রেরিত—১

দুটি প্রশ্ন।*

"সখা" সময়ে সময়ে নানাবিধ প্রশ্ন ও প্রহেলিকা প্রকাশ করেন। সখার সখাগণও তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। আমাদের দুটী প্রশ্ন আছে, প্রহেলিকা নহে। ভরসা করি সখার পাঠকগণ তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।

* এইরূপ প্রশ্ন 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের না করিয়া, তাহাদের অভিভাবকদিগকে করিলেই ভাল হইত। স স.।

১ম। ঘুড়ি সকলেই দেখিয়াছেন। ঘুড়ি উড়ান প্রচলিত নাই, পৃথিবীতে এমন দেশ আছে কি না জানি না। সখার পাঠক মাত্রেই ঘুড়ি না উড়াইয়া থাকিলেও অনেকেই তাহা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অনেক রকমের ঘুড়ি উড়াইয়াছি এবং উড়াইতে দেখিয়াছি। সচরাচর যে সকল ঘুড়ি উড়ান হয় তাহা ছাড়া সাপের মত, মানুষের মত এবং 'কিম্ভূত কিমাকার' অনেক ঘুড়িও উড়িতে দেখা গিয়াছে। কাঁঠাল, বাদাম, শাল, প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতার পত্রও ঘুড়ির ন্যায় উড়ান যায়। বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল প্রকার ঘুড়িই হয় চারকোণা না হয় ডিমের অর্দ্ধেকের মত কিন্তু একেবারে ঠিক গোলাকার ঘুড়ি কেহ কখনও উড়াইয়াছেন? কি উড়িতে দেখিয়াছেন? প্রশ্ন হইতেছে—সম্পূর্ণ গোলাকার ঘুড়ি উড়ে কি না? যদি না উড়ে তাহার কারণ কি?

২য়। এ প্রশ্নটী আরও গুরুতর ; ইহার ঠিক উত্তর হঠাৎ কেহ দিতে পারিবেন এরূপ আশা অতি অল্প। কারণ অনেক দেখিয়া এবং অনেক খোঁজ করিয়া, তবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ প্রদান করিতে কাহাকে অনুরোধ করি না—উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞাস্য এই—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কি হয় না? অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেশ লোমাদি পাকে, দাঁত পড়িয়া যায়, মাস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায়, ভিতরের যন্ত্র খারাপ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এবং শেষে ঘুমাইয়া পড়ার মত মরিয়া যায়, কেহ কোন পাখীকে সেইরূপ মরিতে দেখিয়াছেন কি না? পোষা পাখীর খারাপ আহারেতে যে মৃত্যু হয়, বা রোগে যে মৃত্যু হয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না, হইতে কেহ দেখিয়াছেন কি না, ইহাই আমার প্রশ্ন।

মনুষ্য ও পশু ঊর্ধ সংখ্যায় কত জীবিত থাকে তাহা একরূপ ঠিক করা হইয়াছে। মনুষ্য ও কোন কোন পশুর আয়ু বিষয়ে বোধদয়ের ছাত্রও উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু কাক কোকিল চীল প্রভৃতি, পাখীর আয়ুঃকাল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মুখেও কিছু শুনিতে পাই না। অধিক কি গৃহস্থ বাড়ীর পায়রা ও চড়াই কতকাল জীবিত থাকিয়া স্বভাবতঃ মরিয়া যায় তাহাও ঠিক জানা নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মতে আসিতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। আমরা লুই ফিগ্ওয়ারের "সরীসৃপ ও বিহঙ্গম" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হইতে যে অংশটুকু তুলিয়া দিলাম তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আমাদের কথা ভুল নহে।

"The duration of the life of birds in a state of nature is one of those subjects on which little is known. Some ancient authors–Hesiod and Plini, for example,–give to the crow nine times the length of life allotted to man, and to the raven three times that period ; in other words, the carrion crow, according to these authors attains to seven hundred and twenty years, and the raven two hundred and forty. The swan, on the same authority, lives two hundred years. This longevity is more than doubtful,"–Vide p. 203.

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারেন না। আমরা হঠাৎ ব্যারামে,

পোষার দোষে, কি অন্য কোন দৈবকারণ ভিন্ন পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কোথাও কখন দেখি নাই এবং খুঁজিয়া কাহার নিকট জানিতে পারি নাই। তাই আমাদের প্রশ্ন হইতেছে "পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না?"

মান্যবর শ্রীযুক্ত "সখা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
মহাশয়!

আমার এ ক্ষুদ্র পত্রখানি যদি "সখা"তে একটু স্থান দেন, তবে আমার ন্যায় অনেক পল্লীগ্রামস্থ বালকের বিশেষ উপকার হয়, আমিও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্প্রতি আমি একদা আমার একজন বন্ধুর সহিত হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে যাই। সেখানে গিয়া যে কি দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সারি সারি প্রায় ৪০/৫০টী বড় বড় আলমারি পুস্তকে পূর্ণ! কত শত সাহিত্য পুস্তক, কত উপন্যাস, কত ইতিহাস, কত শত লোকের জীবন বৃত্তান্ত, কত শত লোকের ভ্রমণবিবরণ, কত সহস্র সহস্র পুস্তক দেখিয়া আমার যেন মস্তক ঘুরিয়া গেল। আমি ইহার পূর্বে কখন এত পুস্তক দেখি নাই। আমি মনে করিতাম বাঙ্গালায় খানকতক ও ইংরেজীতে খানকতক বৈ পড়িলেই বুঝি পড়া শেষ হইল। কি ভয়ানক! ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অভিধানই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। নানাবিধ জীব জন্তুর ছবি যে কত, নানা স্থানের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, নানা দেশীয় বিখ্যাত লোকদিগের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি যে কত তাহার সংখ্যা নাই। উঃ! এক একটী দেশের ইতিহাস অমনি এক এক আলমারি পোরা। বিজ্ঞানের পুস্তকই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। সকলের নামের অর্থও জানিনা! ধর্ম পুস্তকই বা কত! চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে থাকিয়া যেন আমার কি বোধ হইতে লাগিল। এত বৈ আছে জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হতাশ হইলাম। আমাদের ক্লাশে আমি একজন উত্তম বালক, সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। হতাশ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত বৈ কি পড়িতে পারিব? কতই শিখিতে এখনও বাকী আছে? আমিত তেমন ভাবে সময়ের ব্যবহার করি না তবে কিরূপে এত বৈ পড়িব? আমার একখানি বৈ শেষ করিতে যদি একমাস লাগে তাহা হইলেও আমার জীবনে এত বৈ পড়িতে পারি না। তবে উপায় কি?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল এই যে এক একজন গ্রন্থকর্তা ২০/২৫/৫০/১০০ খানা করিয়া বৈ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাঁরাও ত আমার মত ছিলেন, তবে আমি কেন হতাশ হই? উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত পড়িতে আরম্ভ করিব, সময়ের রীতিমত ব্যবহার করিব ;তাহা হইলেই কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই। মনে আশা হইতে লাগিল। সেই অবধি যখনি আলস্য আসে তখনি ঐ পুস্তকরাশির কথা মনে কারিয়া শতগুণ উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয়।

সেই অবধি আমি যেন আর একটী পৃথিবীতে বেড়াইতেছি। পড়িবার এত আছে জানিতাম না, চেষ্টার সাধ্য এতদূর তাহা জানিতাম না। এখন আমার পড়া খুব আমোদের ও সুখের কার্য বোধ হইয়াছে, আর কোন বিষয়ে আমার তত সুখ, তত আনন্দ ও তত ভরসা হয় না। আমি এখন খুব পরিশ্রম করিতে পারি। সেই অসংখ্য গ্রন্থকর্তারা যেন সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহ দেন। এত সুখ, এত আশা যাহাতে আমার বন্ধুগণ সকলেই দেখিতে

পান, এই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। ইহাতে 'সখা'র পাঠক-পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি যেন তাঁহারা একবার কোন বড় পুস্তকাগার দেখিতে যান।

আপনার একান্ত স্নেহের—শ্রীঃ—

প্রেরিত—২

কি রূপে পড়িতে হয়?

[একটী ছোট বালক আমাদিগকে এই রচনাটী পাঠাইয়াছেন ; আমবা অহ্লাদের সহিত রচনাটী মুদ্রিত করিলাম। —স,স।]

একদিন বৈকালে শ্রীশ বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতে যাইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, যোগীন্দ্র 'সখা' পড়িতেছ ত?" যোগীন্দ্র বলিল "হাঁ, উত্তমরূপ পড়িতেছি।" শ্রীশবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, বল দেখি ওই যে মেঘ দেখা যাইতেছে, ওগুলি কি?" যোগীন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "হাঁ, একখানা 'সখা'তে মেঘের কথা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা কি পড়িয়াছিলাম, তা' আমার কিছুই মনে নাই, কেবল ঠাকুরমার কথাটা মনে আছে—তিনি বলিয়াছিলেন 'ও হাতীগুলা শালপাতা খাইতে যাইতেছে।' "

শ্রীশ।—হ্যাঁ, তবে যে তুমি বলিলে, বেশ সখা পড়িতেছি? ছিঃ, এ বড় অন্যায়। সখায় পড়িয়াছ, কিন্তু তোমার কিছুই মনে নাই কি জন্য? তবে তুমি 'সখা' পড়িতে জান না।

যোগীন্দ্র।—কেন আমি ত বেশ পড়িতে পারি? আজ বাটী যাইয়া আপনাকে পড়িয়া শুনাইব এখন।

শ্রীশ।—সে প্রকার পড়িলে হইবে না। বলি শুন। শুদ্ধ 'সখা' কেন, সকল পড়াই এই প্রকার করিয়া পড়িবে। তাহা হইলে যাহা পড়িবে তাহা আর ভূলিবে না।—যখন তুমি পড়িবে সে সময়ই তোমার মন যেন অন্য বিষয় না ভাবে। তুমি মুখে যাহা বলিবে তোমার মন যেন তাহা শুনিতে পায়। আর, তোমরা বালক, তোমাদের মন সর্বদাই চঞ্চল ; গল্প শুনিবার সময় উহা যেমন স্থির হয়, এমন আর কোন সময়েই হয় না। সেই জন্য ঠাকুরমার কথা তোমার মনে আছে। বোধ হয় তোমার এ কথাটা অনেক দিন মনে থাকিবে। সেইরূপ যখন 'সখা' কিম্বা অন্য কোন পুস্তক পড়িবে, তখন মনে করিবে যেন তোমার কাছে বসিয়া একজন গল্প করিতেছেন। তাহা হইলে দেখিবে, যাহা পড়িবে তাহা গল্প শুনার ন্যায় আর কখনও ভুলিবে না। আমি প্রতি শনিবার বাটী আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিব।

যোগীন্দ্র।—আচ্ছা, দাদা। এইবার অবধি আপনার কথামত 'সখা' ও অন্যান্য পুস্তক যাহা আমাকে পড়িতে হয়, সে সমস্ত পাঠ করিব, ও যাহা পড়িব তাহা বুঝিয়া আপনার নিকট বলিব।

শ্রীশ।—আচ্ছা, বেশ! অদ্য সন্ধ্যা হইয়াছে ; চল বাড়ী যাই। কিন্তু আমার কথা যেন মনে থাকে।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরীক্ষার ফল।—এবার এন্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষার ফল বড় ভাল হয় নাই ; প্রথমটীতে ১৪৫৮ জন এবং দ্বিতীয়টীতে ৪৪৬ মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় চারিটী ইংরাজ কন্যা এবং দুটী মাত্র বাঙ্গালীর কন্যা, সব শুদ্ধ ছয়টী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এলে পরীক্ষায় মহিলা একজনও উত্তীর্ণ হন নাই। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবার দুটি মহিলা বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালক ও যুবকদিগের ন্যায় বালিকা ও মহিলাগণ যত অধিক লেখা পড়ার চর্চা করিবেন, ততই দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

গো-দুগ্ধ।—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে গোদুগ্ধই মনুষ্যের সর্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য। শরীর ভাল রাখিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, গোদুগ্ধে সে সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, গোদুগ্ধ তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা মাংস ভাল বাসেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে গোদুগ্ধ মাংসের অপেক্ষা কোনমতে কম পুষ্টিকর নহে।

ভয়ানক মৃত্যু।—আমরা শুনিলাম কিছুকাল হইল আমেরিকাতে একজন লোকের বড় ভয়ানক মৃত্যু ঘটিয়াছে। একজন লোক ত থাকার একটী গাছের রস পান করিয়াছিল, সে গাছের রস তৃষ্ণার সময় খাইলে জলের কার্য করে। খানিকক্ষণ পরে একটা শুঁড়ির দোকানে গিয়া খানিকটা মদও খায়। তখন তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং এই যন্ত্রণাতেই সে মরিয়া গেল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার নাড়ি ভুঁড়ি রবারে জড়াইয়া গিয়াছে। মদের সহিত সেই গাছের রস মিশিলে যে জমিয়া রবারের মত হইয়া যায় বোঁধ হয় লোকটীর তাহা জানা ছিল না। যাহা হউক মদ খাইয়াই লোকটীর মৃত্যু হইল, বলিতে হইবে। কি সাধে যে লোকে মদ খায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কুকুর নাশ।—আমরা সে দিন কলিকাতার একটী বড় রাস্তায় এক ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। কতকগুলি 'ধাঙ্গড়' প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দেশী কুকুর দেখিলে তাহার মাথায় লাঠি মারে। এই ভয়ানক ঘা খাইয়া যখন কুকুরটী ছটফট্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়, তখন এই ধাঙড়েরা ধারাল ছুরি দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লয়। আমরা শুনিলাম তাহারা এই জন্য পুরস্কার পায়। সে দিন এইরূপ একটী কাণ্ড দেখিযাছি, কিন্তু তাহার কথা লিখিতেও ক্লেশ বোধ হয় বলিয়া কিছুই লিখিব না। শুনিলাম এই কুকুরগুলি ক্ষেপিয়া গিয়া মানুষকে কামড়ায়, এই জন্য ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তবে যে সকল কুকুরের গলায় শিক্‌লির দাগ, 'কালার' বা অন্য কোন চিহ্ন আছে (যাহাতে তাহাদিগকে কোন বাড়ীর কুকুর বলিয়া চেনা যায়) তাহাদিগকে মারা হয় না। ইহাতে আমরা এই বুঝি যে যে কুকুরের বাড়ী ঘর নাই তাহাকেই মারা হয়। রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরিয়া, আহার অভাবে খারাপ জিনিশ খাইয়া এই সকল কুকুর ক্ষেপিয়া যায়। আহা ! যে কুকুরকে পরমেশ্বর মানুষের সঙ্গী করিয়া, মানুষের

এত বাধ্য, এত অনুগত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে এইরূপে মরিতে দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? আমাদের পাঠকগণ কি দয়া করিয়া এক এক জন পাড়ার এক একটী কুকুরকে একটু স্থান দিয়া, একমুষ্টি খাবার দিয়া, তাহার গলায় একটা ফিতা পরাইয়া দিতে পারেন না? তাহা হইলেই তো বেচারা কুকুরগুলি বাঁচিয়া যায়? গবর্নমেন্টকেও বলি যে দুর্ভাগা কুকুরদিগকে যদি মারিতেই হয়, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে চক্ষের আড়ালে, কসাইখানা কি অন্য যায়গায় লইয়া গিয়া মারিলে হয় না?

নৈতিক বিদ্যালয়।—প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতায় একটী নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক রবিবার সিটীস্কুলের বাড়ীতে বেলা ৪টার সময় এই বিদ্যালয়টী বসিয়া থাকে। বালকদিগকে ভাল ভাল উপদেশ দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমরা জানি এই খানে বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর পদ্য মুখস্থ করান হয় এবং যাঁহারা গান গাহিতে জানেন তাঁহাদিগকে সুন্দর সুন্দর গান শেখান হয়। যে সকল বালক এই বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপন আপন পিতামাতাকে বলিয়া এখানে আসিলেই তাঁহাদিগকে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। ৪৫ নং বেনেটোলা লেনে বাবু শশিভূষণ বসু অথবা সিটীস্কুলে বাবু প্রমদাচরণ সেনের নিকট আসিলেই এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানা যাইতে পারে। আমরা আশা করি প্রত্যেক অভিভাবকই আপন আপন বালককে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাঠকদিগকে বলিব।

মুক্তি-ফৌজ।—'ফৌজ' এই নাম শুনিলেই আমাদিগের ভয় হয়, মারামারি কাটাকাটির কথা মনে পড়িয়া যায়; কিন্তু 'মুক্তিফৌজ' নামে যে একদল ইংরাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে মারামারির নাম গন্ধও নাই। যদি তাঁহাদের কোনরূপ যুদ্ধ করিবার থাকে, তবে তাহা পাপের সহিত, অসৎ চরিত্রের সহিত। এই দলের সাহেব বিবিরা হিন্দুস্থানীদিগের মত পোষাক পরেন, এবং দেশের সকল স্থানে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। প্রায় ১৭/১৮ বৎসর হইল উইলিয়ম বুথ নামক একজন সাহেব এই দল স্থাপন করেন; সেই অবধি ইহাঁরা যে ইংলণ্ডের কত উপকার করিয়াছেন বলিয়া উঠা যায় না। আমরা কয়েকদিন ইহাঁদিগের উপদেশ শুনিতে গিয়াছি। ইহাঁদের দলের কর্তা টকার সাহেবের স্ত্রী বিবি টকার অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ওরূপ ভাবের সহিত বক্তৃতা করা আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লজ্জা এবং ভয় অধিক, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হাজার হাজার পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের কথা বলিলেন! পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন এরূপ সৎকার্য্যে সাহস দেখাইতে পারেন?

ব্লুরিবন বা নীলফিতাধারী সৈন্যদল।—ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে 'নীলফিতাধারী সৈন্যদল' এই নামে একদল লোক আছেন; তাঁহারা নিজে মদ্যপান করেন না, এবং যত দূর সম্ভব আর কাহাকেও মদ্যপান করিতে দেন না, ইহাই তাঁহাদিগের কার্য। এই দলের চিহ্ন নীল ফিতা। ইংলণ্ডে এই সৈন্যদলের দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে; সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজের উদ্যোগে আমাদের দেশে এইরূপ একটী দল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহার শেষেরটীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম।

কয়েক জন সাহেব এবং আমাদের দেশের দুটী প্রধান লোক এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। আমরা দেখিলাম বক্তৃতার পর আমাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া নীলফিতা লইয়াছেন। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে ইহার পর অনেক বলিতে হইবে, সুতরাং এখন আর অধিক কিছু বলিব না। এইরূপ সভা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় হইলে মঙ্গল।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ২৪-২৭।

সম্পাদকের নিবেদন।

যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক এবং বন্ধু, তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে এই এক মাসের মধ্যেই 'সখা'র গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আমরা কার্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম প্রায় প্রত্যহই নূতন গ্রাহকের নাম আসিতেছে, এবং অনেক স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ, উপদেশপূর্ণ পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। 'সখা'র অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ উৎসাহ সকলে দিতেছেন, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যতদূর সম্ভব উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

কয়েকটী কথা এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমাদিগকে কেহ কেহ কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন ; তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর এইখানে দিতেছি, আশা করি তাহাতে অন্যান্য অনেকের কাজ হইবে।

১। 'সখা'তে বিবিধ সংবাদ নাই কেন? তাহার উত্তর স্থানের অভাব। আমরা স্থান হইলেই বিবিধ সংবাদ দিতে পারি।

২। ভীমের কপাল যেরূপ গল্প এই ভাবের গল্প অধিক থাকিবে কিনা?—যদিও এইরূপ ইংরাজী কাগজে এরূপ গল্প অনেক থাকে, তথাপি আমরা নানা কারণে ওরূপ গল্প অধিক দিতে পারিব না।

৩। নানারূপ খেলার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই কেন? নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় শিখাইয়া দেওয়া হয় নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন কয়েক জন করিয়াছেন, তাহারও উত্তর স্থানাভাব।

৪। 'সখা'র ভাষাটী আরও সহজ করা হইবে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন। 'সখা'র লেখক ও লেখিকাদিগকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে ; এরূপ আশা করা যায় যে অল্প কালের মধ্যেই 'সখা'র ভাষা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িবে। তবে 'ভীমের কপাল' প্রভৃতি গল্পের ভাষা খুব সহজ না হইলেও চলে, কেননা গল্প পাইলে ছেলেরা শক্ত ভাষা বুঝিয়া পড়িবে।

আমাদেব যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। 'সখা'র উপকারী বন্ধুদিগকে তাঁহাদেব উৎসাহ, উপদেশ প্রভৃতির জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমরা শেষ করিতেছি।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ১৭।



পত্র প্রেরকদিগের প্রতি

আমরা এবার নানা স্থান হইতে নানারূপ পত্র, রচনা ইত্যাদি পাইয়াছি। ইহার মধ্যে কতগুলি ভাল নয় বলিয়া এবং কতগুলি স্থানাভাব বলিয়া প্রকাশিত হইল না। এক খানি পত্র এইবার প্রকাশিত হইল।

নাক হাতে করিয়া যায় কে? এই প্রশ্নের কতকগুলি বড় আশ্চর্য উত্তর পাওয়া গিয়াছে! কেহ বলেন শর্দিওয়ালা লোক! কেহ বলেন বুড়ো ধার্মিক ভট্টাচার্য! কেহ বলেন যেখানে বড় দুর্গন্ধ!!

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৩০।

প্রাপ্ত

[আমরা একটী বালকের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাইয়াছি। 'সখা' পাঠ করিয়া কোন বালক আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে এরূপ পত্র লিখিবেন, আমরা তাহা ভাবি নাই এই জন্য আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এস্থলে বলা উচিত যে পত্রের ভাষা অনেক যায়গায় বদলাইয়া দেওয়া গিয়াছে।]

বালকবালিকাদিগের প্রতি

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! আমার স্নেহ ও বন্ধুভাব গ্রহণ কর। মনে আজ বড় আনন্দ হইতেছে তাই প্রিয় 'সখা'র সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিকটে আসিলাম, তোমরা কি বুঝিতে পার কেন এ আনন্দ?

রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্যকে দেখিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার চলিয়া গেল, অল্প অল্প বাতাস জানালা দিয়া বহিতে লাগিল, পাখীগুলি দলে দলে গান করিতে করিতে আকাশে উড়িল; পাতায় পাতায় ঢাকা গোলাপ কলি গুলি অল্পে অল্পে ফুটিয়া যেন উকি মারিতে লাগিল। সকলেই আনন্দ করিতেছে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে আজ সকলকে গিয়া ডাকিয়া বলি "ভাই ভগ্নীগণ! উঠ! কেন আনন্দ করি দেখ! ঐ দেখ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া 'সখা' আজ একমাস পরে আবার দেখা দিতেছেন। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উপদেশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ আমোদ যোগাইবার মতন সঙ্গী যে কেহ ছিল না ; প্রিয় 'সখা' যে সেই দুর্দশা দূর করিতে বাহির হইয়াছিলেন ;ওই দেখ একমাস পরে তিনি আবার দেখা দিলেন। আমাদের মঙ্গলই তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্যই তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ;তবুও কি তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিবে না?

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! বন্ধুকে কি ভালবাস না? যাহাকে ভালবাস তাহাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, যে প্রিয় 'সখা' সকল সময় তোমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে অযত্ন করিবে না। আশা করি প্রতি মাসে তোমরা তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিবে। আজ মনের আনন্দে তোমাদিগকে মনের আশা জানাইলাম ; আশায় বঞ্চিত না হইলে বড়ই সুখী হইব।

১ : ২ : ফেব্রুয়াবী ১৮৮৩. পৃ ৩০।

বালকবালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক

নীতি-কুসুম প্রথম ভাগ। শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ভবনাথ বাবু রয়েল রিডার প্রভৃতি পুস্তক এবং প্রোগ্রেস প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে দিয়াছেন, গল্পগুলি উপদেশে পোরা ; এই জন্য এই পুস্তক খানি সকল বালক বালিকারই পড়া উচিত। পুস্তকের মূল্যও খুব কম,-তিন আনা মাত্র।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৩১।

বিশেষ বিজ্ঞাপন

'সখা' পত্রিকা দেশ মধ্যে যাহাতে সর্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য সমুদায় স্থলেই এজেন্টের প্রয়োজন। এজেন্টগণ উপযুক্ত রূপ অর্থ পাইতে পারিবেন। যাহাতে সমুদায় শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের মধ্যে পত্রিকা খানি প্রচলিত হয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। যাঁহাদিগের এইরূপ সৎকার্যে উদ্যোগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহারা 'সখা' কার্যালয়ে পত্র লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

'সখা' কার্যালয়,
৫০ নং, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কার্যাধ্যক্ষ
কলিকাতা।

১ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩, পৃ. ৩১।

প্রত্রপ্রেরকদের প্রতি

দেবনারায়ণ ঘোষ, বগুড়া।—১। আপনার সমস্ত পত্র গুলিই পাওয়া গিয়াছে ; রচনা সংশোধন করিবার সময় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে না ; যাহা হউক কাগজে প্রকাশিত হউক বা না হউক আপনি ক্রমাগত রচনা করিবেন। ইহাতে কালে বিশেষ উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। ২। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী 'সখা'র সম্পাদক নহেন—সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় নহে।

শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া।—আপনাদিগের উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। 'সখা' পাঠে আপনাদিগের উপকার হয়, এ সংবাদে 'সখা'র লেখক ও লেখিকা মাত্রেই সুখী হইবেন।

শ্রীনীলকমল সরকার লাহিড়ী।—রচনাটি মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষরূপে বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইল, সেরূপ সময় আমাদের নাই। যদি আপনার নিকট রচনার নকল একটী থাকে তাহা হইলে 'কি ছার কুসুম' ইত্যাদি দুই এক স্থল বদলাইয়া দিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর।—আপনাদিগের উপকার হইতেছে জানিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপালপুর।—একটী ভিন্ন সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শালডাঙ্গা ; শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়, কালনা।
—দুইটী ভিন্ন সমস্ত গুলির উত্তর হইয়াছে।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ. ৪৭।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা ঢাকা নিবাসী বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও উপাসনা পদ্ধতি" নামক এক খানি ছোট পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে এইরূপ পুস্তক ভিন্ন আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা করি না, সুতরাং আমরা এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে কিছুই মতামত দিতে পারিতেছি না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে যদি আমাদের কোন পাঠক অথবা পাঠিকা 'ব্রহ্মধর্ম কি?' তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে এই পুস্তকে সে বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য এক আনা মাত্র।

১ : ৩ : মার্চ ১৮৮৩, পৃ ৪৭।

একটী আশার কথা।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে আমাদিগের মফস্বলের কোন পাঠক গতবারের ধূমপান বিষয়ক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া, তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ; নাম প্রকাশ লজ্জার কারণ হইতে পারে বলিয়া, প্রকাশ করা গেল না।

"মহাশয়!

আমি পূর্ব হইতে তামাক খাইতাম ; কিন্তু 'সখার' একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্য হইতে তামাক খাওয়া চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলাম। ইতি, তারিখ ১০ই চৈত্র, ১২৮৯ সাল।"

শ্রী—

'সখা'র পাঠক মাত্রেরই শুনিয়া আহ্লাদ হইবে যে বালকদিগের মধ্যে যাহাতে ধূমপান প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য এখানকার কোন কোন বন্ধু একটী সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি সভাটী বাস্তবিক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৬৩।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

আমরা এবার এত স্থান হইতে এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে সমস্ত গুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত আমরা করিতে পারিতেছি না। ধাঁধার উত্তর যাঁহারা ঠিক দিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই নাম যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, হেয়ার স্কুল।—প্রথমবারে বালকবালিকাদিগের আলোচনার জন্য খানিকটা স্থান রাখিবার কথা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই কোন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন নাই কাজে কাজেই সে বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই। কি বিষয়ে আলোচনা চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া সম্পাদকের কার্য নহে।

বালিকা সমিতির সভ্যগণ, বেথুন স্কুল।—ধাঁধার উত্তরগুলি সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এক সঙ্গে না মিলিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে উত্তর বাহির করিলেই ভাল হইত।

শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরী, মাধবকাটী।—হেয়ালীটী অত্যন্ত দীর্ঘ,—বিশেষতঃ তাহার কি উত্তর হইবে, লিখেন নাই।

শ্রীতুলসীচরণ দে, শ্রী অমৃতধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—যে হেয়ালী গুলি পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তরও সেই সঙ্গে পাঠান উচিত ছিল।

শ্রীচুনিনাল ঘোষ, কৈখালি।—হেয়ালী গুলির উত্তর পাঠান নাই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—হেয়ালীগুলি প্রকাশ করা যাইবে কি না, আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, ধূলজুরি।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। সখার লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত নহেন, কাজেই নাম প্রকাশ করা হয় নাই ; যাহা হউক, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, সখার আগামী কোন সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। রচনাটী আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ পাল, বরাহনগর।—ভাল হয় নাই।

শ্রীধ গ, ও শ্রীক্ষ, চ, কলিকাতা।—বেশ হইয়াছে, কিন্তু কিছু শক্ত বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপ্যাধায়, ফরিদপুর।—মন্দ হয় নাই, আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল। কেবল পদ্য না লিখিয়া যাহাতে বুদ্ধিব্যয় করিতে হয়, এরূপ বিষয়েও লিখিবেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞান, জীবন চরিত, ইতিহাস বা এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল, পিরোজপুর।—'সখা'র মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।০ মাত্র। এইরূপ অল্প মূল্যে সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন ; বিশেষতঃ পত্রিকার যে ব্যয় তাহাতে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে দিতে গেলে কাজ চলে না, এই জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি—সিকিমূল্য, অর্ধমূল্য বা তিন চতুর্থাংশ মূল্যে কাহাকেও পত্রিকা দিব না।

শ্রীপ্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি ; বরিশাল গবর্নমেন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী।—আপনাদের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর সব ঠিক হয় নাই।

শ্রীকরুণানিধান সিংহ, ভাস্তাড়া।—মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থান ছন্দ পতন হইয়াছে ; যাহা হউক আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীনিঃ, সিলং।—"উকিলের পরামর্শ," কলিকাতা ; স্থানাভাব।

১ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ৬৩।

নূতন বৎসরের সুখবর।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদিগের কোন বন্ধুর স্ত্রী ইচ্ছা করিয়াছেন সখার পাঠক পাঠিকাদিগের উৎসাহের জন্য কিছু পুরস্কার দিবেন। তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা গেল :—

"শিশুদিগের উৎসাহের জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে বালক কিম্বা বালিকা আপনার পত্রে মুদ্রিত ধাঁধা সকলের সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তর দিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে বৎসরান্তে ৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
অলকাসুন্দরী রায়।

বোধ হয় বলাবাহুল্য যে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের মাননীয়া পত্রপ্রেরিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম তাঁহারা এইবার চেষ্টা দেখুন। যে যতগুলি ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তাহার একটী হিসাব রাখিতে স্বীকৃত আছি। বৎসরের শেষে যাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে, তিনিই এই পুরস্কার পাইবেন। ধাঁধার উত্তর গুলি কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজে নিজে বাহির করিতে হইবে, এবং পত্রিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে আমাদিগের কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আর একটী আশার কথা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে 'সখা'র অল্পবয়স্ক একজন গ্রাহক নিজের সুখের ক্ষতি করিয়া 'সখা' গ্রহণ করিতেছেন। আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে এই বালকটী মাতার নিকট হইতে জলখাবারের জন্য একটী টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা জলখাবারের জন্য খরচ না করিয়া তাহা দ্বারা 'সখা'র গ্রাহক হইয়াছে। বালকদিগের মধ্যে যে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিন দিন বাড়িতেছে, সুখের একটু ক্ষতি করিয়াও যে বালকগণ নূতন নূতন বিষয় শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি?

বোধ হয় পিতা মাতা এইরূপ সৎকার্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহই দিবেন, কারণ সেই বালকই বড় হইয়া ভাল হয়, যে এই রূপে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার জন্য একটু একটু কষ্ট স্বীকার করা অভ্যাস করে। প্রত্যেক বালক বালিকারই উচিত এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলেন।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৭-৭৮।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যে মাসে পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইবে তাহার পূর্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রগুলি এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহাদের পত্রের বিষয়ে কিছু লেখা নাই, তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহাদিগের পত্র হয় মনোনীত নহে, নতুবা স্থানাভাব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।—একটী মাত্র গৃহীত হইল।

শ্রীশরৎকুমার সরকার, ঘোড়ামারা।—৪টীর উত্তর হইয়াছে।

শ্রীতুলসীচরণ দে, কাদিহাটী।—প্রথমটী ভাল হইয়াছে অন্যগুলি নয়, কিন্তু স্থানাভাব।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—বানানের দিকে আর একটু মন দিলে ভাল হয়। হেঁয়ালী মনোনীত নহে।

শ্রীসুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—এই রূপ প্রশ্ন পাইলে আমরা বড়ই সুখী হই, তবে কোন কোন বালক বা বালিকা যেমন সম্পাদকের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য যত রাজ্যের 'বিদ্‌ঘুটে' প্রশ্ন সকল করিয়া থাকেন, সেরূপ না করাই যথার্থ সুশীল বা সুশীলার কার্য। প্রশ্ন গুলির উত্তর এই ঃ—১। যখন আকাশে মেঘ উঠে, তখন সেই মেঘের মধ্যে তড়িৎ নামে একরূপ জিনিশ জন্মে—আবার তাহার ঠিক্ নীচে পৃথিবীতেও তড়িৎ জন্মে। তড়িতে তড়িতে পরস্পরের দিকে একটু যেন ভালবাসার টান আছে, তাই পরস্পরের কাছে যাইতে চায়। এইরূপ টান যদি দুখণ্ড মেঘের মধ্যস্থ তড়িতে হয় তাহা হইলে আর পৃথিবীর লোকের বজ্রপাতের ভয় থাকে না ; কিন্তু যখনই পৃথিবীর তড়িতে আর একখণ্ড মেঘের তড়িতে ভয়ানক টান হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে চলিয়া আসে। এই আসিবার নামই বজ্রপাত। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইবার সময় তড়িতের তেজে যে আলো হয়, তাহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বলি ; আর যে শব্দটী আমরা শুনিতে পাই তাহাও এই তড়িতের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যখন ভয়ানক তেজে, ভয়ানক বেগে বাতাসের মধ্য দিয়া মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে নামে, তখন বাতাস হঠাৎ দুভাগ হইয়া তড়িৎকে পথ দেয়, কিন্তু তাহার পরেই সে দুভাগ বাতাস খুব জোরের সহিত 'ঘষাঘষি' করিয়া মিশিয়া যায়। এই মিশিবার সময়েই দুভাগে 'ঘষাতে' যে শব্দ হয়, আমরা তাহাই শুনিতে পাই। বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আগে হয়, একথা না বলিয়া বোধ হয় ইহাই বলা অধিক সঙ্গত যে শব্দ হইবার আগে আমরা বিদ্যুৎ দেখি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই, যে শব্দ যত তাড়াতাড়ি চলে আলোক তাহা অপেক্ষা অধিক তাড়াতাড়ি যায়, এই জন্যই আমরা আগে বিদ্যুৎ দেখি, পরে শব্দ শুনি। বোধ হয় সকলেই জানেন যে যখন হাওয়া এক দিকে বহিতেছে, তখন যদি কেহ তাহার অন্য দিকে খানিকটা দূরে (মনে করুন নদীর একপাশে) দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ বা উত্তর পাশে, একজন ধোবা কাপড় পরিষ্কার করিতেছে, তাহা দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, কাঠের উপর কাপড় পড়িবার খানিক পরে শব্দটা কাণে আসে। এই দুই স্থলের কারণই এক। বজ্রপাত বলিলে সচরাচর সকলে মনে করে একখণ্ড লোহা মাথায় পড়িয়া মানুষ মরে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; তড়িতের তেজে শরীরের ভিতর এমন ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি লাগে যে তাহাতে তখনই প্রাণ বাহির হয়। ২। বিদ্যুতের দ্বারা অনেক উপকার হয় যাহা জানি ; এমনও অনেক উপকার থাকিতে পারে যাহা বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্তাই জানেন। একটী উপকার ;—ইহাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের দুষিতভাবটী শোধরাইয়া দেয় ; দ্বিতীয় উপকার,—ইহাতে অনেক পীড়া ভাল করে ; তৃতীয় উপকার,—মানুষের জন্য দেশে বিদেশে 'খবরাখবর' লইয়া বেড়ায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ৩। স্ফটিক প্রাসাদের ন্যায় প্রস্তাব থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিলাতের লেখিকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে বিদেশের কথা বলার আগে, দেশের নানারূপ খবর দিলে ভাল হয় নাকি? আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

শ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া।—পূর্বের রচনা প্রকাশিত হইবে না, স্থির করা গিয়াছে। আপনার শেষের পত্রের বিষয় আগামী বারে আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্বে আপনার বয়স কত তাহা জানা আবশ্যক, কারণ বালক ভিন্ন অন্ন কেহ এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারিবেন না।

শ্রীনলিনাঙ্গ রায়, কাড়াপাড়া।—স্থানাভাব, বিশেষতঃ লেখা কাগজের একপিঠে এবং আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। 'সখা' বালকবালিকাদিগের কাগজ হইলেও বালিকবালিকাদিগের লেখার দ্বারা আমরা 'সখা'কে পুরিয়া দিতে চাই না। বালকদিগের রচনায় অত সংস্কৃত শ্লোক কেন?

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৮-৭৯।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

অনেকে আপনাদের ইংরাজী বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে Professor of Sakha, Secretary of Sakha,ইত্যাদি নূতন নামে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক Editor কিংবা Manager, Sakha এই নামেই পত্র লিখিবেন; বাঙ্গালায় "সখা সম্পাদক" বা "সখা কার্যাধ্যক্ষ" বলিয়া পত্র লিখিলে আমরা আরও সুখী হই।

১ : ৬ : জুন ১৮৮৩, পৃ. ৯৪।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার পাঠকপাঠিকাদিগকে জানান যাইতেছে যে আমরা এবৎসর চিত্র বিষয়ে একটী পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ যে কোন বিষয়ে চিত্র করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা অন্য কোন ছবি দেখিয়া নকল করা না হয়। আগামী ১৫ই আগষ্টের অর্থাৎ আর এক মাসের মধ্যে ছবিগুলি আমাদের এখানে পৌছান আবশ্যক। পেন্সিল বা রং যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক বা প্রেরিকার নাম, ধাম, এবং বয়স লিখিতে হইবে. এবং শিক্ষক বা অভিভাবকের নিকট হইতে এই ভাবে লিখিয়া ঐ সঙ্গে পাঠাইতে হইবে যে, "এই বালক কিম্বা বালিকা কাহারও সাহায্য না লইয়া এই ছবিটী করিয়াছে।" আগস্ট মাসের শেষে পুরস্কারটী দেওয়া যাইবে। আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের একটুকুও চিত্র করিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারাই এইবার চেষ্টা করিবেন।

'সখা' কার্যাধ্যক্ষ।
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১১১।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর চান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সকল আবশ্যকীয় পত্রেরই উত্তর যথা সময়ে দিয়া উঠিতে পারি না; তবে অনাবশ্যকীয় পত্রের কি উত্তর দিব? যাঁহাদের পত্রোত্তর পাইবার নিতান্তই ইচ্ছা, তাহারা আপন আপন পত্রমধ্যে এক একখানা টিকিট বা পোস্ট কার্ড পাঠাইবেন। অনেক বালক রচনা পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে পত্র লিখিতে তাড়াতাড়ি ছাপাইবার অনুরোধ করেন, এবং ছাপান কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে বলেন। আমরা তদুত্তরে বলি যে আমরা অত অধিক অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি

না। পত্র প্রেরকগণ ছাপান না হইলেই জানিবেন, হয় স্থানাভাব না হয় মনোনীত নহে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সিটী স্কুল।—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের অনেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া একটী সভা আছে। স্কুলের অধ্যক্ষগণের এই সভার প্রতি যত্ন আছে। এই সভার সভ্যেরা পদ্য মুখস্থ বলা, কথোপকথন, অভিনয়ের ভাবে আবৃত্তি করা, চাঁদা তুলিয়া গরিবকে দান করা এবং রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া এই সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে রচনা পাঠ ও উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা হয়। আমরা সকল স্কুলেই এইরূপ সভা হওয়া উচিত মনে করি।

১ : ৭ : জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১১২।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমরা গতবারে যে চিত্রের পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম, সেই সম্বন্ধীয় সমস্ত চিত্র আগামী ১৫ই আগষ্টের পূর্বে এখানে পৌছান আবশ্যক। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আর ৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে।

কার্যাধ্যক্ষ।

(স্থানাভাব বশতঃ এবারেও ধাঁধা দেওয়া গেল না।)

১ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৩, পৃঃ ১২৮।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীমহম্মদ জামালুদ্দিন, শম্ভুগঞ্জ।—স্থানাভাব।

শ্রীমোহিনী নাথ রায়, পলাশডাঙ্গা।—আপনার 'নবকথা' মনোনীত নহে। শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—এরূপ পদ্য লিখিয়া ফল কি? আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি; 'দুর্গাপূজা' পদ্যটী কি আপনার রচনা? প্রকাশ করিবার স্থান নাই।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, ধূলজুড়ি।—১। আপনার ন্যায় 'নাছোড়' পত্রপ্রেরক পাওয়া ভার। 'সখা'র সম্পাদক যিনিই হউন, তাঁহার নাম আপাততঃ প্রকাশ করা যাইবে না ; লেখক লেখিকাদিগের নামও আমরা এখন প্রকাশ করিব না,—যদি নিতান্তই জানিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া বৎসরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তখন কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না। ২। আপনার ধাঁধার উত্তর না পাঠাইলে উহা মুদ্রিত হইতে পারে না।

শ্রীমনসাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা।—যাঁহাদের পড়া শুনার দিকে মন আছে, তাঁহারা অল্প বয়সে বিবাহ করা ভাল মনে করেন না। দেশের বৃদ্ধ লোককে পরামর্শ দেওয়া ভাল নহে। যাহাদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদেরই দল বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আপনার রচনা প্রকাশ করিয়া আর বিশেষ লাভ কি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, সৈয়দপুর।—লিখিয়াছেন, যে ছোট গোয়ালে পাতার রস সাপে কাটা যায়গায় রক্তের সহিত মিশাইয়া দিলে রোগী আরাম হয়। পবীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমরা সাপের ঔষধের কথা লিখিয়া, তাহার কিছু দিন পরে আর একটী ডাক্তারী ঔষধের কথা জানিতে পারিয়াছি ; খ্রীষ্টীয় বান্ধব বলেন—"পোটাসিয়াম আইওডাইটের

সহিত উগ্র সোলিউশান অভ আইওডাইট মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।”

শ্রীআ—,কাশী।—আমরা ইতিপূর্বে দুটী প্রশ্ন দিয়া যে পত্র ছাপাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাঠাইয়াছেন। প্রশ্ন ও উত্তর এইরূপ : (১) প্রশ্ন—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কেহ দেখিয়াছেন, কি না? উত্তর, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কারণ কোন জিনিশই চিরস্থায়ী নহে ; দ্বিতীয়তঃ উহাদেরও রোগ হইতে পারে, তাহা হইতে তাহাদিগের মৃত্যু হইতে পারে।” (২) প্রশ্ন—সম্পূর্ণ গোল ঘুড়ি উড়ে কি না? উত্তর—জানি না!!!

শ্রীভুবনমোহন দাসগুপ্ত, গফরগাঁও।—লিখিয়াছেন, “উহার (সখার) কোন এক খণ্ডে তামাক সেবনের দোষ বর্ণিত আছে তাহা দেখিয়া আমি আমার বহুকালের (১১ বৎসরের) ‘পাপ’ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি।” আমরা এই সম্বাদে বড়ই সুখী হইয়াছি, আশা করি যাঁহারা তামাক খান, তাঁহারা এ বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, এবং আমাদিগকে তামাক ছাড়ার সংবাদ দিয়া আরো সুখী করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল।—লিখিয়াছেন, যে কোড়কদি গ্রামে একটী ধূমপান বিরোধিনী সভা হইয়াছে। এ বড়ই সুখের সংবাদ। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সভা হইলেই মঙ্গল।

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৫৯।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি আমরা ‘সখা’র পরিবর্তে নিয়মিতরূপে পাইতেছি ; আশা করি অন্যান্য বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরাও আমাদের সহিত পরিবর্তন করিবেন।—(১) বঙ্গবাসী ; (২) সাধারণী ; (৩) চারু বার্ত্তা ; (৪) ভারতমিহির ; (৫) সঞ্জীবনী ; (৬) সময় ; (৭) সারস্বত পত্র ; (৮) ভারতী ; (৯) খ্রীষ্টীয় বান্ধব ; (১০) ভারতসুহৃৎ ; (১১) কিরণ ; (১২) বামাবোধিনী ; (১৩) নব্যভারত ; (১৪) বিজ্ঞানদর্পণ ; (১৫) বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়ান। এতদ্ভিন্ন “চিত্তরঞ্জিনী” নামে একখানি সুন্দর দ্বিমাসিক পত্রিকাও আমরা পাইয়াছি।

[গত কয়েকবারে স্থানাভাবে ধাঁধা দিতে না পারাতে আমরা দুঃখিত আছি।]

১ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৫৯-১৬০।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি

শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—ছি! ছি! ছি! ফের ওরূপ ঠকাবার চেষ্টা করিলে অভিভাবককে জানাইব। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পদ্য কতটুকু এবং বালকের লেখা কতটুকু তা কি বুঝা যায় না?

শ্রীঅ—না—ভা, কলিকাতা।—নেশা হইতে বিরত করিবার জন্য যদি সভা করিয়া থাকেন, তবে তাহার বিশেষ বিবরণ আমাদিগকে পাঠান নাই কেন? এটী কি বালকদিগের না বয়ঃস্থদিগের সভা? একজন ‘নস্যখোর’ আপনাদের চেষ্টায় নস্য ত্যাগ করিয়াছেন, লিখিয়াছেন—ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। পদ্যটী ভাল হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, কলিকাতা।—কয়েক মাস পূর্বে ‘সখা’তে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে একটী ধূমপান নিবারিণী সভা শীঘ্র স্থাপিত হইতে পারে। এই কথার উল্লেখ করিয়া

আমাদের পত্রপ্রেরক জানিতে চাহিয়াছেন যে এরূপ একটী হিতকরী সভা এত দিনেও কেন স্থাপিত হইল না। আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে যাঁহাদের মুখ চাহিয়া আমরা এই সংবাদ সখাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাঁহাদের উৎসাহ 'জল' হইয়া গিয়াছে। আমাদের পত্রপ্রেরক তাঁহার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্যে হস্তক্ষেপ করুন না? বাঙ্গালীর যাহা কিছু গুণপনা তা কি কেবল বক্তৃতাতেই থাকিয়া যাইবে নাকি? ধিক্ আমাদিগকে! আমাদিগের অনেক কাজ, সুতরাং এ কাজ অত্যন্ত ভাল হইলেও, ইহাতে প্রাণ মনের সহিত লাগিতে পারি না। নীচে থাকিয়া পরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে, আমরা তখনও প্রস্তুত ছিলাম ; এখনও আছি।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৪।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল ; কিন্তু এখনও অনেকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইল না। আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে পত্রিকা পাঠান বন্ধ করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তাঁহারা মূল্য দিয়া পুনর্বার পত্রিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি কোন দৈব দুর্ঘটনা না হইলে আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকার মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে, উভয়ের জন্য ১৲ এক টাকা করিব। কেহ কেহ পত্রিকাখানিকে পাক্ষিক করিয়া বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা স্থির করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি অনেকেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দেখাইয়া আমাদিগকে এক একখানি পোষ্টকার্ড লেখেন, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদের সহিত আগামী বর্ষের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি। আর যদি মাসিক থাকাই অনেকের প্রার্থনীয় হয়, তবে আগামী বৎসরের জন্য সকলে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে বড়ই সুবিধা হয়। পত্রিকার বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধেও আগামী বৎসর অধিক মনোযোগী হওয়া যাইবে—অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আমাদের দেশের বড়লোকদিগের জীবনী এবং বিখ্যাত স্থান সকলের বিবরণ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।—বলা বাহুল্য, অগ্রিম মূল্য প্রেরণ না করিলে আমরা বিশেষ পরিচয় ব্যতীত কোথাও পত্রিকা দিব না।

কার্যাধ্যক্ষ।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৫।

প্রাপ্তি স্বীকার।

(১) সংসার—নামক সাপ্তাহিক পত্র (২) মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য বিবরণ ; (৩) মুক্তাহার—কবিতা পুস্তক।

মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মাণিকদহ যেরূপ সামান্য গ্রাম সেইরূপ অন্যান্য গ্রামে আমরা সচরাচর দলাদলি, তাস, পাশা, প্রভৃতি এবং খোলাভাটীর প্রসাদে মদের আমদানি যথেষ্ট দেখিতে পাই। যথার্থ কাজ করিতে কাহারই প্রবৃত্তি নাই,—বালক বা যুবকদিগের মধ্যে যদিওবা দুই চারি জন কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহাদের উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। গ্রামগুলি হইতেই যদি উন্নতির আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই যে সমস্ত দেশে সেই উন্নতির ফল দেখা যায়,

তাহাতে সন্দেহ কি? যদি উৎসাহ থাকে, যত্ন থাকে, তাহা হইলে যে অনেক কার্য সুসম্পন্ন করা যায়, এই মাণিকদহ গ্রাম তাহার প্রমাণ। মাণিকদহের প্রাণ স্বরূপ জমীদার বাবু বিপীনবিহারী রায় এবং জ্বলন্ত উৎসাহে পূর্ণ ধার্মিকবর বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই দুই মহাত্মা, অন্যান্য বন্ধুদিগের সাহায্যে এবং প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় মাণিকদহ গ্রামটীতে যে কত কার্য করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সকল গ্রামেই যদি এইরূপ ভাল কাজের সূচনা হয়—বিশেষতঃ বালকদিগের জন্য মাণিকদহের বন্ধুদিগের যেরূপ যত্ন যদি সকল গ্রামেই সেইরূপ যত্ন দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়।

শেষের লিখিত কবিতাপুস্তকখানি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। স্থানে স্থানে যাহা পড়িয়াছি তাহা বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। আমাদের দেশে সদুপদেশপূর্ণ কবিতাপুস্তকের বড়ই অভাব। আর আমাদের এমনি কপাল যে, কলম ধরিয়া কবিতা লিখিতে বসিলেই লোকে, এমন কবিতা লিখিয়া বসে, যাহা পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গে বসিয়া পড়িবার যো নাই। আমাদের গৌরবের বিষয় এই মুক্তাহার এই শ্রেণীর পুস্তকের সীমা ছাড়া। ইহাতে কুরুচির ছায়া মাত্র নাই—বরং পড়িলে উপকারেরই সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে এমন কবিতাও আছে যাহা বালক বালিকাদিগের কণ্ঠস্থ দেখিতে ইচ্ছা করি। পুস্তকখানির মূল্য চারি আনা মাত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

১ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৭৬।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার বৎসর শেষ হইল। এই সঙ্গে যে সূচীপত্র দেওয়া গেল আমাদের পাঠক্ পাঠিকাগণ সে খানিকে গোড়ায় বসাইয়া ১২খানি এক সঙ্গে বাঁধাইয়া লইবেন। আগামী বৎসরের জন্য আমাদের পত্রিকার খুব ভালরূপ বন্দোবস্ত করা গিয়াছে। মফস্বলের মূল্য কমাইয়া এক টাকা করা হইল। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে মূল্য পাঠাইবেন, পুরাতন গ্রাহকেরাও মূল্য পাঠাইয়া সুখী করিবেন।

শ্রী অন্নদাচরণ সেন
'সখা' কার্যাধ্যক্ষ
৫০ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।

১ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ১৯২।

ওঃ নূতন বছরের আমোদ দেখ!!

নববর্ষ

বাহবা! বাহবা! হোঃ! হোঃ! হোঃ! ছেলে বাবুরা একেবারে হেসেই কুটপাট! বলি এত হাসি কেন? নূতন বছর এসেছে, বলেই বুঝি বাবুরা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছ? বেশ! বেশ!

নূতন বৎসর আসিয়াছে। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের আর এক বৎসর বয়স বাড়িল। এই বালকবালিকারা যেমন নূতন পোষাক পরিয়া আহ্লাদে হাসিতেছে, আমরাও আজ সেইরূপ

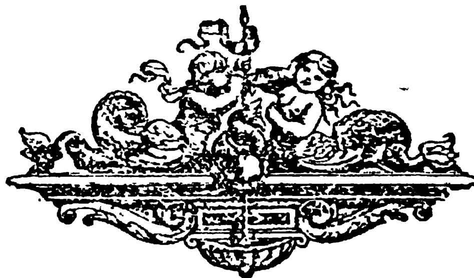
সনের আহ্লাদে, নূতন পোষাক পরিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকলকেই আমাদিগের মনের আদর এবং মঙ্গল ইচ্ছা জানাইতেছি ; আশীর্বাদ করি নূতন বৎসরে সকলে সুখে থাকুন।

একটী বৎসর চলিয়া গেলে—দেশের সকলেই আনন্দ করে। বাড়ীর গৃহস্থ, দোকানের দোকানী, নৌকার মাঝি, সকলেই নূতন বছরে আপন আপন থাকিবার স্থান সাজায় এবং আনন্দ করে। যাঁহারা লেখাপড়া, শিখিতেছেন, নূতন বৎসরের প্রথমে তাঁহারা আপন আপন ভাই ভগ্নী বা ভাল বাসার অন্য দশজনকে নানারূপ নূতন জিনিশ কিনিয়া দিয়া থাকেন। আমরাও নূতন বৎসরে আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু পাঠক পাঠিকাদিগকে কিছু উপহার দি, এমন সাধ্য আমাদের নাই। তবে নূতন পোষাক পরিয়া সকলের নিকট আসিয়া এই মনের কথা জানাইতেছি যে "ছবিতে চিত্রিত বালকবালিকাদিগের ন্যায় আপনাদিগের সকলের নূতন বৎসর ওইরূপ মনের সুখে কাটুক।"



কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটী কথা না বলিলে যথার্থ 'সখা'র কার্য করা হয় না। সমস্ত বৎসর কাটিয়া গেল—সকলের একবৎসর বয়স বাড়িল—কিন্তু এই এক বৎসরে 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কে কতখানি উন্নতি করিয়াছেন, কে কতখানি লেখা পড়া অধিক শিখিয়াছেন, কে কতখানি ভাল হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার এই সময়। যদি একটী বৎসর মিছামিছি নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আনন্দ করা উচিত হইবে কি? সেই হাসুক, যাহার বছর ভাল গিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থাতেই হউক না কেন, নূতন বৎসরের প্রথমে সকলে প্রতিজ্ঞা করুন 'যেন এই বৎসর সকলে ভাল কাজ করিয়া, ভাল হইয়া, নিজের উন্নতি করিয়া কাটাইতে পারি।' পরমেশ্বর 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের ভাল ইচ্ছার সহায় হউন, 'সখা'-সম্পাদকের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

১ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ ৭৭।



সখা



দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৮৪।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন-কর্ত্তৃক
সম্পাদিত



"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN"

কলিকাতা:

২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

সখা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাক টিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালক বালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানা পরিবর্তন তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
সখা-কার্যাধক্ষ্য।





মাদের 'সখা' আজ এক বছর কাটাইয়া দুবছরে পা দিতেছে, যারা 'সখা'র সুখে সুখী, তারা আজ এই সুখের দিনে আনন্দ কর। জন্মতিথিতে মানুষ কত আমোদ করিয়া থাকে, বন্ধুরা কত জিনিশ দেয়, মা বাপ কত খুসী হন, তবে আজ 'সখা'র জন্মদিনে কেন আনন্দ করিব না? 'সখা' গরিবের ছেলে, বালক বালিকাদিগের উপকার করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু সে এখনও যে গরিব সেই গরিবই আছে। তাই বলিয়া তার জন্মদিনে কি কোন আমোদ হবে না? আমরা কোন বড় লোককে 'সখা'র জন্মতিথিতে আনন্দ করিতে বলিতেছি না। যে সকল বালক বালিকা 'সখা'কে আপনার জন বলিয়া মনে করেন 'সখা'র সঙ্গে যাঁদের কিছু সম্পর্ক আছে তাহাদিগকেই এই জন্মতিথির নিমন্ত্রণে ডাকিতেছি।

এসো! 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণ, 'সখা'র জন্ম দিনে আনন্দ করি; তোমাদেরি কাজ করিবার জন্য 'সখা'র জন্ম হইয়াছে, সে চিরকাল তোমাদেরি সখা। কিন্তু গরিব বলিয়া 'সখা' অনেকের কাছে ভালবাসা পাইল না। 'সখা'র পোষাক ভাল নয় বলিয়া কোন কোন বড় লোক, 'সখা'কে গালাগালি দিয়াছেন, কিন্তু গরিব 'সখা' সাহেবদের মত পোষাক কোথায় পাইবে, তাহা কেউ বুঝে না। গালি খাইয়া 'সখা' যখন ছল্ ছল্ চক্ষে, মলিন মুখে চারিদিকে তাকাইতেছিল, তখন বালক বালিকাগণই তাহাকে স্থান দিয়াছেন। "এসো, ভাই, এসো! তুমি গরিব হইলেও আমাদের সখা, চিরকাল কিন্তু এ কষ্ট তোমার থাকিবে না"—এই বলিয়া অনেক বালকবালিকা গরিব 'সখা'কে যত্ন করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়াছেন; 'সখা' তাঁহাদেরই যত্নে ঈশ্বরের দয়াতে 'বাঁচিয়া রহিয়াছে। আজ দ্বিতীয় বৎসরে পা দিবার সময় 'সখা' পেছনে তাকাইয়া আগেকার কষ্টের কথা মনে করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতেছে এবং সুমুখে বেশ আশার অবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সেই সকল বালক বালিকাকে ধন্যবাদ দিতেছে, কারণ তাঁহারাই অসময়ে সখাকে বন্ধু বলিয়া ঘরে লইয়াছিলেন।

'সখা'র লেখক এবং লেখিকাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের দ্বিতীয় কাজ। তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া 'সখা'র জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ সকল লিখিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের এই পরিশ্রমের কিছুমাত্র পুরস্কার লন নাই, এজন্য যে সখা-সম্পাদক তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত উপকৃত, তাহা কি আর বলিতে হইবে।

আর অধিক বলিবার নাই। 'সখা'র সম্মুখে আর এক বৎসর উপস্থিত হইল। জগদীশ্বর করুন, যেন এই নূতন বৎসরে আমাদের লেখক লেখিকাগণ 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের উপকারের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক মনের সহিত লাগিয়া যান।

২ : ১ : জানুয়াবী, ১৮৮৪।

'সখা' পড়িবার কয়েকটী নিয়ম


মাদের একটী বড় দুঃখ হয় যে 'সখা'র আমাদের যে সকল পাঠক পাঠিকা আছেন তাঁহারা সকলে ভাল করিয়া 'সখা' পড়িতে জানেন না। অনেকেই স্কুলের পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকেন, 'সখা'কে নূতন বেলা একবার তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়াই তুলিয়া রাখেন, পরে প্রায় সমস্তই ভুলিয়া যান, সুতরাং আমরা যে এত কষ্ট করিয়া সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভাল ভাল কথাগুলি লিখিয়া দিই তাহা বৃথায় যায়, আর তাঁরাও যে বাৎসরিক টাকাটী দেন তাহারও ভাল ব্যবহার হয় না, এজন্য অনেকে আপনাদের কোন বিশেষ উপকার না দেখিয়া 'সখা' লওয়া বন্ধ করেন। এইরূপে আমাদের নানা প্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই অদ্য আমরা কিরূপে পড়িতে হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব ;—আশা করি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা মন দিয়া এইটী পাঠ করিয়া স্মরণ রাখেন ও এই কথা অনুসারে চলেন। তাহা হইলেই আমাদেরও শ্রম সার্থক হয়, তাহাদেরও অর্থ ব্যয় সফল হয়।

'সখা'তে যে সকল বিষয় সচরাচর লেখা হয় তাহাদিগকে প্রায় এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১ম) গল্প—যথা 'ভীমের কপাল' 'সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়', 'অন্ধ সীলের কথা' ইত্যাদি। (২য়) উপদেশ—যথা 'কে বড়লোক', 'ধূম পান', 'না আমি প্রতারণা করিব না' ইত্যাদি। (৩য়) বর্ণনা—যথা 'আলোক-মঞ্চ', 'কেন্দ্রীয় উষা', 'শ্বেত ভল্লুক' প্রভৃতি। (৪র্থ) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন শিক্ষা—যথা 'ঠাকুর দাদার গল্প' ইত্যাদি। (৫) জীবন চরিত—যথা 'হেয়ার সাহেব', 'কেশবচন্দ্র সেন', 'গারফীল্ড্', ইত্যাদি। (৬) পদ্য—যথা 'আঃ ছেড়ে দাওনা', 'ওরে আমার পায়রা মণি', 'কওনা কথা কাকাতুয়া' প্রভৃতি। (৭ম) ধাঁধা, (৮) অন্যান্য। এগুলির মধ্যে প্রথম জাতীয় গল্পগুলি খুব মন দিয়া পড়িবে, আর মনে করিয়া দেখিবে পূর্বে কি হইয়াছে। যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তবে আবার পড়িয়া দেখিবে। এই রকম করিয়া পড়িলে খুব মনে থাকে। ঠিক্ যেন গল্প শুনিতেছ, আর 'সখা' পড়া হইয়া গেলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিকট গিয়া আবার আবার পড়িয়া শুনাইবে। কোথাওবা ভীমের কপাল প্রভৃতি গল্পগুলি মা কি ঠাকুরমাদিগকে মুখে শুনাইবে। এরূপ করিলে আর ভুলিয়া যাইবে না। সর্বদা চর্চা করিবে। (২য়তঃ) উপদেশগুলি মনের সহিত পড়িবে, পড়িয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিবে তোমাদের চরিত্রে সেপ্রকার কোন দোষ আছে কি না? যদি থাকে তবে তখনই অবধি তাহা দূর করিতে যত্নবান হইবে, এবং যত দিন না তাহাতে সফল হও ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিবে না। কিছুতেই না পার তবে কোন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবে কিম্বা আমাদিগকে লিখিবে,—আমরা বলিয়া দিব কিরূপ করিলে সে দোষের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু খুব সাবধান, যে উপদেশ পড়িয়া বা শুনিয়াও নিজের দোষ তাড়াইতে যত্ন না করে তাহার পরকালের মাথা একেবারে খাওয়া হইয়া যায়। তাহার লক্ষ টাকা আয় হলেও সে পরম বিদ্বান হলেও তাহার দুর্দশার সীমা নাই, সে পশু। (৪র্থতঃ) বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা শিক্ষা করিবে, সেগুলি প্রায়ই শক্ত, সহজে বুঝিতে হয়ত পারিবে না, এজন্য তোমার নিজের চেষ্টার পরে দাদার বা শিক্ষকের নিকট বসিয়া পড়িবে ও বুঝাইয়া লইবে।

বৃষ্টির কথা পড়িলে, বৃষ্টির সময় সেই কথাটী আবার ভাবিবে, মনে না থাকিলে আবার পড়িবে। এইরূপে সমস্ত বিষয় যাহা শিখিয়াছ তাহা যেন মুখাগ্রে থাকে ; যখনই ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিলেই সব বলিতে পারিবে, এমন হওয়া চাই। (৫মতঃ) ভাল ভাল যে সকল জীবন চরিত লেখা হয় সেগুলি এমন ভাবে রাখিবে যেন তোমরাও ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। কত লোক সামান্য অবস্থা হইতে কেমন উন্নত হইয়া বিখ্যাত বড়লোক হইয়াছেন, দেখিয়া যেন তোমাদের সকলেরই মনে মনে লোভ হয়, আশা হয়। ঐরূপ হইতে দিন রাত্রি মনে ভাবিবে, কিরূপে 'আমি ঐরূপ হইব' ; তাহা হইলে আর অন্যায় কার্যে মন যাবে না, বৃথা সময় নষ্ট করা হইবে না, পড়াতে মন খুব হবে। কাজেই শেষে বড় লোক ত আপনিই হইতে পারিবে। বড় লোক ত আর গাছে ফলে না, কারও অদৃষ্টে লেখাও থাকে না! বাল্যকাল হইতে এইরূপ যত্ন করিলে প্রত্যেক মানুষই বড় লোক হইতে পারে।

(৬ষ্ঠতঃ) পদ্য। এগুলি বার বার না পড়িয়া কি থাকা যায়? এগুলি এতবার পড়িবে যে তোমাদের মুখস্থ হইয়া যাইবে। আর যাঁহার কুকুর আছে তিনি যেন কুকুরটীর সঙ্গে তেমনি করিয়া কথা কন :—'আঃ! ছেড়ে দাওনা' ইত্যাদি। যাঁহার পায়রা আছে, তিনি তাহাকে হাতে করিয়া 'ওরে আমার পায়রা মণি' বলিয়া আদর করিবেন। তাহলে দেখিতে শুনিতেও মিষ্ট ও মধুর লাগে, আর পদ্যটীও মুখস্থ হয়। যাঁহার কাকাতুয়া পাখী আছে, তিনি অমনি তাহাকে আদর করিবেন। (৭মতঃ) শিশু স্বাস্থ্যরক্ষাতে যে যে বিষয়গুলি লেখা থাকে, তাহা একজন বিদ্বান লোকের লেখা, অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার সে অমূল্য সদুপদেশ খুব মন দিয়া পড়িবে এবং খুব সাবধান হইয়া প্রতিপালন করিবে। একটুও অন্যথা না হয়, কেন না তাহা হইলেই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। যখনই কাহাকেও ঐ সকল সুনিয়মের বিপরীত কার্য করিতে দেখিবে, অমনি যেন সুবোধ পাঠক পাঠিকা 'সখা'খানি খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দেখান ও তাঁহাকে ঐ কুব্যবহার হইতে নিবারণের চেষ্টা পান। (৮মতঃ) ধাঁধাগুলি লেখা কেবল বালক বালিকাদিগের বুদ্ধির চালনার জন্য। ২দিন, ৪দিন, যত দিনে হয়, চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যেন স্বয়ং এই গুলির উত্তর দিতে যত্নবান হন। কাহারও নিকট বলিয়া লইলে কোন ফলই হয় না। নিজেরা চেষ্টা করিতে করিতে শেষে এমন হইবে যে আর কষ্ট হইবে না স্বভাবতঃই সহজে উত্তর হইয়া যাইবে ও সে জন্য কত যে বুদ্ধির উপকার হইবে তাহা পরে তাঁহারা জানিতে পারিবেন। (৯মতঃ) অন্যান্য অনেক বিষয় যাহা থাকে তাহা পাঠকগণ নিজেদের বুদ্ধির অনুসারে সাবধান হইয়া যত্ন পূর্বক পড়িবেন। কিছুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবেন না।

শেষকালে একটী কথা বলি। আমরা যে 'সখা' লিখি, ইহার উদ্দেশ্য কি? বড় মানুষ হওয়া? ছিঃ! কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। বরং ইহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতিই হইতেছে; গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়াতে, যতদিন না গ্রাহক বাড়িতেছে ততদিন 'সখা' নিজের ভরণপোষণের ভার নিজে বহন করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় 'সখা'র বেশ আয় হয়, তখন 'সখা'র টাকা 'সখা'রই প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় ব্যয় করিব।

আমাদের উদ্দেশ্য আমরা অতি মহৎ জানি। ছোট ছেলে মেয়েদের আমরা বড় ভালবাসি; তাঁহাদের কল্যাণ করিব ইহাই আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা। ছোট ছেলে মেয়েরাই এর পরে দেশের লোক হইবেন, ইহাঁদের উন্নতি করিতে পারিলেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি করা হইল। এই জন্যই আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে সকল বালকের প্রকৃত সখা ও বন্ধু হইয়া রাতদিন

তাঁহাদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষা দিই ও বড় লোক করি। কিন্তু তাহা অসম্ভব। এজন্য আমাদের পরিবর্তে এই 'সখা'কে তাঁহাদের নিকট পাঠাইতেছি, ভরসা করি যে সকলে ইহাকে আদর ও যত্ন করিয়া ইহার কথাগুলি মন দিয়া পড়িবেন ও তাহারা বাধ্য হইয়া চলিবেন। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে 'সখা' সকলের সঙ্গে সর্বদা থাকে। যখনই স্কুলের পড়া হইয়া গেল কোন আলাপী লোকের কাছে গিয়া গল্প সল্প করিতে ইচ্ছা হইল, অমনি যেন সকলে 'সখা' খুলিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করেন। 'সখা' যেন সকলেরই খেলায় খেলানী, পড়ায় শিক্ষক, গল্পে বন্ধু, উপদেশে গুরু, হইয়া ইহার কাজ করিতে পারে। ভাই! ভগিনি! 'সখা'র এ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার তোমরাই উপায়, ইহা সম্পূর্ণ তোমাদেরই হাতে। তোমরা সকলে যদি ভাল করিয়া 'সখা' পড় তবেই সেই কাজ ভাল করিয়া করা হয়, আর না হইলে বৃথা কষ্ট, বৃথা ব্যয় ;—শেষে 'সখা' মৃত্যু মুখে পড়িবে! পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি তাহাই চাও?

২ : ৬ . জুন ১৮৮৪, পৃ. ৮১-৮৩।

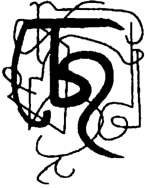



সখা
উপন্যাস



উপেন্দ্রকিশোর রায়

প্রথম অধ্যায়

লেবেলা একটু একটু এক গুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না; অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়। কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথা গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলে মানুষদের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্যলোককে বিরক্ত করে ; আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে; তার ব'য়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বই খানা হস্তে করিয়া কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোন জায়গায় বসিতাম। শেষে একদিন শুনিলাম বই খানা আমারও পড়িতে হইবে, আমার আনন্দে সীমা রহিল না ; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ পড়া হবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেনও না, ছবিশূন্য একটা পাত উল্টাইয়া এ, বি, সি, ডি, করিয়া কি বলিতে লাগিলেন! তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভাল মানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়ীতে তিন বছর থাকিয়া কয়েক খানা বই শেষ করিলাম। তারপর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম ;কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানাতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন ; সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক্ সেই বয়স। তবে আর চাই কি? ক্লাশে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ;— আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটার মধ্যে আঁটে না। তখনই লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ী হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড় লোক হওয়া যাইবে ; সতীশ বলিল "কালই চল"। কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হবে না সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম ; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ী ছিলেন না। বাড়ীর অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটী পুটলী বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ীর বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়িতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেই বাড়ীর কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোন কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু-একটী কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি ; বলিলেন, কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব।

খাইবার সময় ভদ্রলোকটী আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটী কুঠরীতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম ; ভাবিলাম, কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হবে না ; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম "সতীশ, সতীশ!"—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে! কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকও তাই ; অনেক পিড়াপীড়ি করার পর বলিল "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল, যে বাড়ী ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল যেন বড় লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশেরও মা বাপ আছে আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহারা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়ীতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগ করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই ; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাতে ধরিতে আসিলেন ; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইতে ছিলাম, এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চোখে দু-ফোঁটা জল আসিল ; কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমার ও যাওয়া হইবে না। রাত হয় তো আর বেশী নাই ; এই বেলা সতীশকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার

কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনও অনেক ছিল কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম ; কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে, আমিও সেই স্থানে যাইয়া থামিলাম ;—তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয় তো আরও অনেক দেরি। ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেক বার চালাইতে দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতে লাগিল আমি ও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব রহিল না। যে লগিটীতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল ; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়িতে লগিটী ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। বিপদের পরিমাণটা প্রথম তত বুঝি নাই ; শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউ গুলি তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নৌকাখানাকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ভয়ানক নদী ; আর বাড়ীর ছোট কুঠরীটী—সেই কোমল সুন্দর বিছানাটী—মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে চলিয়া গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

তৃতীয় অধ্যায়

এই ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকা খানি এক দিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল ; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারা আমার কথা বঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটী ভদ্র লোক সেখানে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন। নিজ হাতে আমার পুটলীটী যত্ন পূর্বক এক কোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন "আমি কা—যাইতেছি ; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। আমার বাড়ীতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।" আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা—ছোট একটী সহরের মত। অনেক লোক। বড় লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাস বাবু বলিব,—তিনিও একজন বড় লোক। এসব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড় লোক হওয়া যায় কি? যায় বৈ কি? না হলে এরা এত গাড়ী ঘোড়া

চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাস বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড় লোক হইয়া যাইব।

একদিন কালিদাস বাবু ডাকিলেন। কালিদাস বাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন ; কিন্তু আমার যে তখনও শিশুভাবটা যায় নাই। কালিদাস বাবু ও তাহা বেশ বুঝিতেন ; যাহা হউক আমি কালিদাস বাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, "গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?"

"দিব্যি।"

"বটে? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?"

"কোথা যাব? এখানেই থাকবো!"

"তা বেশ" বলিয়া কালিদাস বাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটী ছবি। আমার সেই সাহেব! আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেক দিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটী ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল ; আমি বলিয়া উঠিলাম "আরে!" কালিদাস বাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম "আজ্ঞে ঐ ছবিটে!"

"ইনি একজন বড় লোক ছিলেন, তোমারও বড় লোক হইতে ইচ্ছে হয় না" আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থত মত খাইয়া বলিলাম "বড় লোক কি সবাই হয়?"

"হয় বৈ কি? ইচ্ছে করলে তুমিও হ'তে পার।"

"আমিও পারি?"

"অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব ভেবেছি। লেখা পড়া না শিখ্‌লে বড় লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকে ছিলাম। কেমন?"

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ী ছাড়া সেই আপদ! আমি কোন কথা কহিলাম না। কালিদাস বাবু এত সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথা বার্তা কালিদাস বাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন :—"সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে?" "বাড়ী কোথা?" "মা বাপ নাই?" ইত্যাদি ;—আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাস বাবুর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পাইলে আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না, তখন তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোন মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাস বাবুর বাড়ীতে আর থাকা হবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলে ও এবার আর হাঁটিয়া যাওয়া হবে না। কা—হইতে দুখানা ষ্টিমার ধু—তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন ষ্টিমার চলে। ধু—যাইতে তিন দিন লাগে। হিন্দুরা এই

তিন দিনের চিঁড়ে পুটলী বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোর বেলা কা—— হইতে জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা ষ্টিমার এই মাত্র আসিয়া ঘাটে থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ ষ্টিমারে উঠিয়া ধু—চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড় চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাস বাবুর বাড়ী আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়া ছিলাম তাহার একটীও ব্যয় হয় নাই। কালিদাস বাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা মত খরচ করিবার জন্য দু-একটী দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়া ছিলাম বড় লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না। যাত্রার উপযোগী সকল জিনিষ প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না ; ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমারও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়ীতে চারিটা বাজিল ; আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুটলীটী। পুটলীতে কয়েকখানা কাপড় ;এক জোড়া চটী জুতা ; নগদ কিছু টাকা ; 'কালিদাস বাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সে গুলি—কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি ;—আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি ; পুস্তক গুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না ; তবে কালিদাস বাবু বলিয়াছিলেন "লেখা পড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না," তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া, ছাতাটী হাতে করিয়া, বিছানার চাদরখানা পুটলীর উপরে জড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। ষ্টিমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিলে, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু—পৌঁছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

রামলোচন বাবু আমাদের ওদিককার লোক। তিনি ধু—তে থাকেন ; সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম, দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটী ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর এক জন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "রামলোচন বাবুর এই বাড়ী?" সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাঁহাকে রামলোচন বাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম তিনিই রামলোচন বাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচন বাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো লোক আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁপগুলি সোজা সোজা। চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কাণে একটা কলম। হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন।

উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে উদ্দেশে কাহার প্রতি মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম পুঁছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটী মাটির দোয়াত। তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তার পর কলমটী মাথার চুলে ঘসিয়া কাণে বসাইয়া হাতের দুটী আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটীতে পুঁছিলেন। তার পর ক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া 'ভৌউ' শব্দে উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল ; তাহার পর বাঙ্গালা।

"কি চাই?"

"আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি"—

"আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।"

"আমার নিবাস সু—"।

"আমারও নিবাস সু—। তার পর?"

"মহাশয় যদি—"

"ম—হা—শ—য়—যদি! কি—ঞ্চি—ৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াছে চলে যাও।"

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচন বাবুর বাড়ীতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার যায়গা আর খেতে দেবে।" মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দু দিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপভাবে খাইলে বেশী দিন পয়সায় কুলাইবে না এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তার পর পুঁটলিটী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ী। এ বাড়ীর কর্তা রামলোচন বাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটী অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত হাসির কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবামাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কে বাবু?"

আমি।—"আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।"

ইয়ার।—"বড্ড খিদে পেয়েছে বুঝি?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না ; ইয়ার বাবু উত্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"হোটেল আছে, হোটেল! বাবুরচি লোক দিব্বি রাঁধে! রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।"

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন "নিজের বাড়ীতে একটী লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ী এসে চাযামো কর! তুমি আর আমার বাড়ী এসো না।" বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে সব কয়টা জন্মিয়া গেল। বাবু

আমাকে বলিলেন, "তোমার অন্য কোন রূপ কষ্ট না হইলে আমার বাড়ীতে তোমার থাক্‌বার যায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।"

"আজ্ঞে আমি অমনি থাক্তে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

"উত্তম! তুমি ইংরাজী লিখ্‌তে পার?"

"কিছু কিছু ইংরাজী পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানিনা।"

"কতদূর পড়িয়াছ?"

আমি বলিলাম।

"বেশ্। তাতেই হবে।"

আমি বাবুর বাড়ী রহিলাম। কাজের মধ্যে এই—বাবুর চিঠি পত্র সব একটা করে নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাসে মাসে বাড়ীর কথা ভাবিতাম। বড় লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড় লোক হইবার তো লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড় লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যত ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ী যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচ চলিবে না। সুতরাং এবার আর ষ্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ-তীর্থ এখান হইতে বড় বেশী দূরে নয় ; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব ; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ী যাইব।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—আসিতে বড় বেশী দেরী হইল না। যায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর ; একটী ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থ স্থান। পাথরের গায় সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথম যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম "যাত্রীরা কোথায় থাকে?" সে বলিল যাত্রীদের থাকবার ভাল যায়গা নাই ; প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়ীতে থাকে। উপরে যে দেবতার মন্দির সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথম যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ী দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম সে বিষয়টা তত সুবিধা জনক নহে। আমি যে সময়ে গিয়াছি সে সময়ে যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের তো কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন—"দেখবি? চল্"। আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক যায়গায় গেলাম ; সেটী একটী বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট একটী ঝরণার মত। পাণ্ডা বলিল, "এখানে পূজা করিতে হইবে।" কত লাগিবে, তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি

দেখিলাম, তাহলে আমার বাড়ী যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম "আমি ছেলে মানুষ পূজা কি করিব?" পাণ্ডা চটিয়া গেল ; সে দিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়ীতে থাকিবার জায়গা দিল না। অগত্যা আমায় সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছু দূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া—"পয়সা", "পয়সা" করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোন মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল ; কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে এক খানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলোকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা যোড়াটী ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২৫ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যে টুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি যোড়াটী পুটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুলিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একুট করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোন দোকানে যাইতে হইলে অন্ততঃ এক প্রহর চলিতে হইবে ; সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু-একটী গাছ দেখিলে ইচ্ছা হয় যেন সেইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে, এবং অন্য দিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটী বাড়ী খুঁজিয়া লইলাম। বাড়ীতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম ; সেখানে দুটী ছেলে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের নিকট আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম ; তাহারা "তুই" "তুই" করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। এক জন বলিল,—

"বাঙ্গালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী লোককে কিছু দি না।"

"আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ ; চোর নই।"

"যা তুই এখান থেকে ; c-r-i-p crip ; d-a-s-h dash ;

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরণেই কথা কহিতে লাগিলাম :—

"ওর মানে কি হল?"

"ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun.
বাঙ্গালি লোক চোর ; যা তুই এখান থেকে।"

"তোরা ইস্কুলে পড়িস্?"

এবার তাহারা কিছু যেন ভয় পাইল। বলিল—

"আমাদের মাষ্টার বড় বই পড়ে!"

"তোদের মাষ্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু? এই দেখ্‌তো!"

আমার পুঁটলীতে যে বইগুলি ছিল তাহার মধ্যে একখানা Lamb's Tales-ও ছিল। সেই খানা এখন বাহির করিলাম।

এই বেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখ ভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা

মনে করিয়া গিয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। তাহার কথায় এই বুঝা গেল যে তাহারা দু ভাই। সে ছোট। বাবা নাই; মা আছেন; ইস্কুলে পড়ে; টাকা আছে। চাকর-চাকরাণী আছে। বলা বাহুল্য যে সে বাড়ীতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজান চা'ল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটী আমার ঘরে বসিয়া আছে। চা'ল গুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চা'ল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটী আমার কাছে বসিয়া রহিল! তাহার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল—

"মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।"

"তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌বো যেন তিনি তোমার ভাল করেন।

তাহাকে বুঝান কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল "তবে যাই মার কাছে বলি গে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর ২ দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দুবেলা খাবার জন্য কোন মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার যায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হইল। গৃহস্থ যায়গা দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে "কড়া" "বগুণো" সব দেখাইয়া বলিলেন "কাল চলে যাবার আগে এই গুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙ্গালী তোমার এঁটো কে নেবে।" আমি মহাবিপদে পড়িলাম। বলিলাম "ও গুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সে গুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।" সুতরাং একখানা থালা, আর একটী বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। বাড়ীর কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিল, আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আনিলাম। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার

সময় কা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "একটা বড় মাঠ, তার পর একটা পাহাড়, তার পর কা—একই পথ ; ভুল হবার যো নাই।"

কিছুকাল হাঁটিয়াই মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটী ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, "বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সঙ্গীর প্রয়োজন কি?" সে বলিল "তুমি আর কখনো এখানে চল নাই, একা গেলে খেয়ে ফেল্‌বে?" আমার ভয় হইল।

মাঠের এ পাশ থেকে ও পাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট বড় বড় খস্ খসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে একজাতীয় পাখী। পক্ষীটী একটী চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ। ঠোঁট সরু এবং লম্বা ; স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।" লেজে একটু নূতনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটী সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, "শ্বশুর বাড়ী যাইয়া ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।" অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখীকেই বার বার ভাল করে দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটী ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিলেন, "আজ এখানেই থাকিতে হইবে।" আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "চারটের সময়ই বসে থাক্‌তেই হবে কেন?" সঙ্গী বলিলেন "মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।" বাঘে খায় এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির (!!) জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সব নাকী হাতীর শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হস্তীগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটী নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিলেন।

মাঠ পার হইতে প্রায় বারটা বাজিল। মাঠ যে যায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটী ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেলেন। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কতদূর যাইয়া একটী মাহুতকে পাইলাম,—সে হাতী লইয়া কা—চলিয়াছে। আমি চারি আনার পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতীর পিঠে একটুকু স্থান দিল। মহাসুখে কা—আসিলাম। কালিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটী মুদীর দোকানে আসিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

সে পথে যে সকল ছোট খাট ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে একদিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল মাঠ ; দুধারে উলুবন এবং অন্যান্য দু একটী ছোট ছোট গাছ। এরূপ যায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই! প্রাণ পণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুপাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ে লোক। সে আমাকে কি এক রকম ভাষায় বলিল "তুই কোথা যাস্ : তোর প্রাণের ভয় নাই।" এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সঙ্কেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা

পালন করিতে লাগিলাম। সে দু-হাতে উলুবন সরাইয়া শূয়ারের মত দৌড়িতে লাগিল আর মাঝে মাঝে আঁমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "আঁরে আয়, মরে যাবি।" আমি হত বুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ওপারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসে থাক্‌তে হবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুটলী হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল ; সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল "ঘুমিও না, খেয়ে ফেল্‌বে।" তেমন অবস্থায় ঐ রূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে "খ্যাঁওর, খ্যাঁওর" করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারি পাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনও ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছে ; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ও পারে গেলাম।

ইহার ৩ দিন পরে বাড়ীর কাছের বাজারে আসিলাম। সেখান দৈ চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দু'টোর সময় বাড়ী আসিলাম। তখন বাহির বাটীতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল ; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আসেপাশে যে কয়েকখানা লেপ কাঁথা ছিল উপর্য্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল।

সপ্তম অধ্যায়

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় এই নামের প্রস্তাবটী শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোন দিনই বড় লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের একশেষ তাহার জীবন হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সকল গুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সেগুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা খাটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ গল্প সকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সর্তক হওয়া ভাল।

বড় লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিন্তু বড় লোক হয় না ; তাহা হইলে অত কম লোক বড় হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছাতো সকলেরই আছে, তোমার আমার কি নাই? কিন্তু আমি যে আজিও ছোট লোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড় লোক হয় না ; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যতটুকু কুলাইয়াছিল

সে তো চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও যে সে বড় লোক হইল না? হইবে, কেমন করিয়া? কি রূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবেতো সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাসে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না। নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হ'তে হ'লে তেল পোড়াতে হয় খাটতে হয় কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়!" রামকান্ত একদিন বাড়ী আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর ঘরের চালে, দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপনে দুলিতে লাগিল। সর্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুনের উপর পড়িয়া অর্ধ-দগ্ধ, অর্ধ ভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল মাষ্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সে দিনই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড় লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড় লোক হইতে ইচ্ছা থাকে—'নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব—তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড় লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে ; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে ; তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমিও পারিবে কি না জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।—কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড় লোক, বড় লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড় লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বল ত দেখি লাখ টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল 'কেন, লাক টাকা আর লাক টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা।' বড় লোক হওয়া সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড় লোক না হও দুঃখ নাই ; কিন্তু ছোটলোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড়লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লোক, লর্ড রিপন বড় লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড় লোক, সুরেন্দ্র বাবু বড় লোক ইত্যাদি। ইহাঁদের সকলেরই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইহাঁদের যাঁহার মধ্যে যে টুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড় লোক বলা হয়। বড় চোরকে ও বড় লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকে ও বড় লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলি না। মহেন্দ্র বাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলিতাম না। অন্ততঃ তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন ইহাঁরা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিই বা জানেন না। তাহার হিসাবও হয়ত

আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে সেখানে তিনি পড়ান এজন্য তাঁহাকে কেহ বড় লোক বলে না। তিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড় লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড় লোক। বড় লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহা আগে হওয়া উচিত। কাহারও যদি এক কোটী টাকা থাকে তাঁহাকে শুধু ঐ টাকা গুলির জন্য বড় লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্‌গুণের সাহায্যে উহা উপার্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড় লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাহাকে যথার্থ বড় লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড় লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড় লোক বড় ; ভাল লোক ভাল, বড় লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

২ : ১ জানুয়াবী ১৮৮৪, পৃ. ২-৩। ২ : ২ : ফেব্রুয়াবী ১৮৮৪, পৃ ২৮-৩০। ২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৩৩-৩৫। ২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ ৫৪-৫৬। ২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৭২-৭৪। ২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৮৪-৮৬। ২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ ১৭৯-১৮০।





চিরদিন কি দুঃখে যায়?

কুমারী * দেবী

প্রথম অধ্যায়



অজা! অজা! কোথায় গেলি? হতভাগা ছেলেটা যে কোথায় যায়! অজা হতভাগা, এখনও এলি নে? তবে থাক্, আজ এলে পিঠের ছাল রাখব না ; ঘরে স্থান হয় না বুঝি?—এই বলিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া একজন বৃদ্ধা কোন হতভাগা বালককে গালাগালি দিতেছিল। সেই সময়, একটী বালক অন্ধকারে এই কথাগুলি বলিতেছিল : "ওই ঠাকুরমা বক্ছেন। আজ আমার কপালে মার আছে দেখ্ছি? কি ক'র্ব? উত্তর দিলে শুন্তেও পাবেন না, আর এতটা পথ হেঁটে যেতেওতো দেরী হবে দেখ্ছি। যাই! যা কপালে থাকে, মার তো খাবই! একটু শীঘ্র করে যাই ; না হলে যত দেরী হবে, তত বেশী রাগ ক'র্বেন।"

এই সময়ে একটী বালিকা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সেই এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া বলিল—"কে তুমি, অজা? ভাই! তোমার ঠাকুরমা বকিতেছেন না?"

অজা।—হাঁ ভাই! এখনই যাব, আর মার খাব।

বালিকা।—কেন ভাই! তুমি মার খাবে? আহা!

অজা।—হাঁ, প্রায়ই তো খাই।

বালিকা।—তুমি পালাতে পার না, আমি হলে পালাতাম। তোমার জন্য আমার এমন দুঃখ করে!

অজা।—ভাই, মেনা! তুমি কি জান না, আমি খোঁড়া, শীঘ্র শীঘ্র যেতে পারি না? তবু যদি পা থাকিত!

বালিকা।—আহা! অজা! তোমার কথা শুন্লে কান্না পায়।

অজা।—আমি চিরকালই এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। আমায় কেহ কখনও আদর করে নাই।

এই কথা শুনিয়া বালিকা তাহার অপরিষ্কার শুষ্ক মুখখানি স্নেহের সহিত চুম্বন করিল। বালক এমন মধুময় স্নেহমাখা চুম্বন কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত শরীর কি এক রকম ভাবে শিহরিয়া উঠিল। এমন ব্যথার ব্যথী পাইয়া সে আনন্দে ভেসে গেল। দুজনেই কিছুকালেব জন্য চুপ করিয়া রহিল ; কিছুক্ষণ পরে বালিকা বলিল—"তোমার মা নাই?"

বালক।—আমারতো মা কখনও ছিল না, তা এখন থাক্বে কি?

বালিকা—ওমা! সে কি কথা? এও কি হয়? মা বলেছেন সকলেরই মা থাকে ; তবে বোধ হয়, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তোমার মা মরে গেছেন।

বালক।—মেনা! কি ব'ল্লে? আমারও মা ছিলেন? আমার মা নাই।

বালিকা।—হাঁ, তিনি স্বর্গে আছেন।

বালক।—তবে কি কখনও আমার মা ছিল?

আমার এমন সুখ বোধ হচ্ছে! আমার মা? আমার মা? মা আমার স্বর্গে আছেন? মেনা! মেনা! ভাই মেনা! মা স্বর্গে কার কাছে আছেন?

বালিকা।—মা বলেছেন, মরে গেলে লোকে ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—স্বর্গ কোথায়?

বালিকা বালকের গলা জড়াইয়া সুন্দর আকাশ দেখাইয়া বলিল "ওই সুন্দর আকাশে"।

বালক আগ্রহের সহিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওই? ওইখানে? ওই আকাশে? তোমায় কে বলিল মেনা?"

বালিকা।—কেন? আমি নিজে জানি। তুমি কি জান না মরে গেলে প্রাণটা আকাশে উড়ে যায়? তুমি, আমি, সকলেই মরে গেলে ওইখানে যাব।

বালক।—হোঃ হোঃ আমিও যাব? আমার তখন কি সুখ হবে। মেনা?

বালিকা।—মা বলেছেন, সকলেই একদিন মরিবে ; মরিলেই ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—আমার কি সুখ হচ্ছে? আমিও ওখানে যাব?

বালিকা।—তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর না?

বালক।—ভাই! আমি তো জানি না যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। কি করে প্রার্থনা করে ভাই? তুমি কি ক'র?

বালিকা।—হাঁ, করি বই কি। মা আমাকে বলেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। ভাই! পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, খেতে দিচ্ছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন ; আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি। আমরা মরে গেলে তাঁর কাছে যাব।

বালক।—আমিও তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব।

এমন সময় একজন স্ত্রীলোক "মেনা! মেনা! উপরে এস" বলিয়া ডাকিলেন।

বালিকা।—যাই! ওই মা ডাক্‌ছেন। "মা! যাই—" এই বলিয়া ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মৃণালিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"অজা! তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ?"

অজা।—হাঁ! আমি স্বর্গের বিষয় ভাবিতেছি।

মৃণা।—মা তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছেন ; এই নাও।

অজা—যদিও আমার ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু তোমার মা কোথায় পাবেন?

মৃণা।—না ভাই! তুমি কি জান না, বাবা ভাল হয়েছেন? মদ টদ খাবেন না, টাকা কড়ি উপার্জন করবেন।

অজা।—বেশ হয়েছে! বড় ভাল হয়েছে! আর তোমার মাকে কষ্ট পেতে হবে না।

মৃণা।—অনেক রাত হয়েছে। যাই! মা শীগ্গির করে যেতে বলেছেন। বোধ হয় তোমার ঠাকু'মা আর তোমায় মার্‌বেন না।

অজা।—মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? স্বর্গে আমার মা আছেন, সেখানে তো একদিন যাবই। মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? একদিন তো সুখী হবই।

মৃণা।—তবে যাই, ভাই! তুমিও যাও!—

এই বলিয়া মৃণালিনী ছুটে চলে গেল।

অজা কি মার খাইল না? অজা! তুমি কি মার খাইলে না? তুমি বলিয়াছ তোমার মা'রে দুঃখ নাই। হা, চিরদুঃখী বালক! তুমি কতকাল এইরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিবে? সত্যই কি এই রাক্ষসী বৃদ্ধা তোমার ঠাকুরমা? তবে কেন এমন ক'রে কষ্ট দেয়। তোমার কি এ পৃথিবীতে কেহ নাই? তোমাকে কি এ পৃথিবীতে কেহ ভালবাসে না? কেন? মেনা তোমায় ভালবাসে। সেই স্নেহময়ী বালিকা—আহা সেই স্নেহময়ী বালিকা! তোমায় তাহার মা ভালবাসেন। তোমায় সেই বুড়ী ফলওয়ালী দয়া করে। তারা করে বটে, কিন্তু তোমার তো মা নাই। কে তোমায় মায়ের মত ভালবাসে? কে তোমার ক্ষুধা পাইলে খাওয়াইবে? কে তোমায় বিপদে রক্ষা করিবে। হা সরল বালক! তুমি এ বিষয়ে কিছুই জান না। সেই দুঃখীর বন্ধু, কাঙ্গালের রক্ষাকর্তা, দয়াময় পরমেশ্বর তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই চিরকাল তোমার মঙ্গল করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে স্থানে অজা মেনা বাস করিত, তাহাকে লোকে 'চক্' বলিত। অজাদের বাড়ীটা দেখিতে এক রকম ধরণের, সে বাড়ীতে অনেক পরিবার বাস করিত। অজার ঠাকুমা উপরে কোণের একটা ঘরে থাকিত। রাস্তার ওদিকেই মেনাদের বাড়ী। অজাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট ঘরে বুড়ো রামদাস ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন। এই লোকটী বড় ভাল মানুষ, অতিশয় ধার্মিক, কাজেই অতিশয় সুখী।

একদিন অজার ঠাকুরমা বড় রাগ করেছিলেন, অজাকে মেরে রাস্তায় দূর করে দিয়াছিলেন—তখন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। দুঃখে কষ্টে অজার ছোট প্রাণটী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কি করিবে?—সিঁড়িতে বঁসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই প্রাণ-গলানে কান্না আর কারো প্রাণে লাগুক আর নাই লাগুক, বুড়ো রামদাসের প্রাণে সকলের আগে লাগিল। এই দুঃখের কান্না শুনিতে পাইয়াই রামদাস স্ত্রীকে বলিলেন—"ওগো, দরজাটা খুলে দেখ দেখি, কে কাঁদ্‌ছে!" তাঁহার স্ত্রী কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একটী ছোট ছেলে। রামদাস একথা জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"তুমি ওখানে কেন? ভিতরে এসো। আমি বড় ছোট ছেলেদের ভালবাসি ; এসো তোমার সঙ্গে কিছু কথা কই। আমিতো হাঁট্‌তে পারি না, যে তোমার কাছে যাব? তুমিই এসো না—তাহ'লে আমার বড় আরাম হয়।"

অজা দিব্যি ঘরটী দেখিয়া এবং রামদাসের মিষ্ট কথা শুনিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। পরে রামদাসের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কি তুমি হাঁটিতে পার না? তুমি কি কখনও হাঁটিবে না?"

রামদাস।—এখানে হাঁটিব না বটে, কিন্তু স্বর্গে আবার হাঁটিয়া বেড়াইব।

অজা। হ্যাঁ, সত্যি নাকি,—তুমি কি সেখানে যাবে?

রামদাস। তুমি কি স্বর্গের কথা জান?

অজা। হ্যাঁ, আমি জানি। আমার মা সেখানে আছেন, আমিও সেখানে—

এই কথা বলিতে বলিতে অজার চক্ষে জল আসিল।

রামদাস।—বাছা! ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন, এখানে কেহই এই সকল বিষয় ভাবে না। তোমায় একথা কে বলেছে।

অজা।—মেনা আমায় বলেছে।

রামদাস।—সে কাদের মেয়ে?

অজা—কেন সে রাস্তার ওধারে বাড়ীটাতে থাকে (সে মনে করে পৃথিবীর সকলেই মেনাকে জানে ; ও তাহাকে জানা উচিত)।

রামদাস। সেই মেয়েটীকে একদিন এনতো? মেয়েটীতো বড় ভাল, সে এমন কথা কোথা হতে শিখেছে? তার বয়স কত?

অজা। সে আমার চাইতে এক বছরের বড়। তার বয়স দশ বৎসর।

রামদাস। এসব কথা বোধ হয় তার বাবা বলেছেন। আজ কাল বাবারা শিক্ষিত ও ধার্মিক।

অজা। না—না—ওমা তার বাবা যে মাতাল! তিনি বড় খারাপ লোক। মৃণালিনীর মা বড় ভাল স্ত্রীলোক। তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন। কিন্তু ভাগ্য দোষে মেনার বাবা বড় খারাপ।

রামদাস।—তোমার বাপ কোথায় আছেন ; তিনি কি বেঁচে আছেন?

অজা।—বাবা! আমি তা জানিনা।

রামদাস।—তবে তুমি কার কাছে খাও দাও?

অজা।—এই বাড়ীর ওই দিক্‌কার ঘরে আমি আর ঠাকুরমা থাকি।

রামদাস।—তোমার ঠাকুরমাকে সকলে কি বলে ডাকে?

অজা।—'চারুর পিশী।'

রামদাস।—তবে এখন এসো, আর একদিন সেই মেয়েটীকে সঙ্গে ক'রে এসো।

ইহার কিছুকাল পরে কি একটা পড়ার শব্দ হইল—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক বুড়ীর গলা শোনা গেল—বোধ হইল সে মুখ বিকৃতি করিয়া গালাগালি দিতেছে। "ওমা হতভাগা—কি করলি? ঘোড়া হয়েছিস্ না কি? কপালের মাঝে দুটো চোক্ রয়েছে কি কর্‌তে, যদি দেখ্‌তেই না পাবি? হায়! হায়! আমার এমন সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে দিলেরে! দিই দুই কিল বসিয়ে! দূর হ! বেরো! মর্! মর্! যম কি তোমায় ভুলেছে। বাঁদর! হতভাগা কবে মর্‌বি! আমার হাড়ে বাতাস লাগবে কবে! তাহ'লে আর দুবেলা গিলিয়ে দিতে হবে না। মর! মর! মর! বেরো! বেরো! বেরো! দূর হ!" তার পরেই আবার প্রহারের শব্দ হইল। এ কি? কে কাকে মারে! তাকি বুঝিতে বাকী আছে? একজন গুণবতী ঠাকুর মা। আর ওই হতভাগা বালকটী অজা। ওই গোলমাল শুনিয়া পাশের ঘর হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কিগো চারুর পিশী! কি হয়েছে? তোমার পাথর ভেঙ্গে দিয়েছে বুঝি!"

"হ্যাঁ! একেবারে টুকরা টুকরা করেছে। চোক্ নেই, অন্ধ হয়েছে, ঘোড়া যেন! আহা! আহা! এমন সুন্দর পাথর! আজ ওকে মেরেই ফেল্‌ব।" অজা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাইয়া দরজার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই যায়গাটী তার বসিবার স্থান। এখানে

বৃষ্টি তেমন পড়িত না। হায়! হায়! এমন ছেলে কোথায় পিতা মাতার আদরে, ভাই বোনের স্নেহে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে, কত খেলা করিবে, না কোথায় অভাগা বালক সুখের শৈশব কাঁদিয়া কাটাইতেছে! মুখের দুটী মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। পিতামাতার স্নেহ কিরূপ, আদর কিরূপ, তাহা কখনও ভোগ করিল না। যেন কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছে। আহা! যার পিতা মাতা নাই তার কেহই নাই!—সে বসে বসে কাঁদ্‌ছে এমন সময় মেনা তাহার কান্না দেখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেনা।—কাঁদ্‌ছ কেন? কি হয়েছে ভাই অজা?

অজা।—মেনা! আমার কপালে রোজই মার আছে। এমন একদিনও হয় নাই যে দিন ঠাকুমার কাছে গাল কি মার খাই নাই। আজ একখানা পাথর আমার হাত হতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে ঠাকুরমা আমায় মেরে ঘর হ'তে বের করে দিয়েছেন। আজ আমায় ভাত পর্যন্ত দেবেন না। ভাই! আমি চিরকালই মার আর গাল খাব। আমার আর কেউ নাই। আমি বড় দুঃখী। তুমি, তোমার মা, আর সেই ফল-বেচুনী বুড়ী আমায় ভালবাস। আর আজ একজন খোঁড়া বুড়োর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সে আমায় অনেক ভাল কথা বলেছে? সে তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছে।

মেনা।—কেন, আমি গিয়ে কি করব? আমায় কেন ডেকেছে?

অজা।—আমি তাকে তোমার কথা বলেছিলাম বলে সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

মেনা।—সে কোথায় থাকে?

অজা।—ঐ কোণের ঘরে।

মেনা।—তার পা নাই?

অজা।—হাঁ তার পা আছে বইকি। কিন্তু সে বলেছে, তাব পা দুটো কোন কর্মের নয়। সে তা দিয়ে হাঁটতে পারে না।

মেনা।—আচ্ছা আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাইতে বলিলে যাইব। তুমিতো ভাই জান মা আমায় সব যায়গায় যাইতে দেন না। তবে আমি যাই। আর কেঁদনা ভাই।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। অজাও এক দিকে চলিয়া গেল। তখনও মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। একে শীতকাল, তাতে তার গায়ে কিছুই নাই। সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তার এক ধারে বসিয়া ভিজিতে লাগিল। ফলওয়ালী তাহাকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিল "ওকি বাছা শীতে বৃষ্টিতে ভিজিতেছ কেন? এস-এস আমার কাছে এস। আহা! আহা! এমন ভয়ানক শীতে বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ হবে যে। তোমার নামটী কিযাদু, ভুলে গিছি।" বালক দুঃখের সহিত বলিল "আমার নাম অজা।"বুড়ী বলিল, "বেশ ছোট নামটী। আয় বাছা আয় আমার কম্বলের মধ্যে আয়। আর এই খাবারটুকু খা। এখন একটু গরম হতে পারবি।"—এই বুড়ীকে সকলে রামতারিণী বলে ডাকে। ছোট বেলায় ইহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে। এ বড় গরিব। ফল বেচিয়া খায়, একলা মানুষ তাহাতেই চলিয়া যায়। ইহার বড় দয়ার শরীর। বিশেষতঃ ছোট ছেলে মেয়ের উপর ইহার বড় মায়া। ছোট ছেলে মেয়ের কষ্ট মোটে দেখিতে পারে না। অজাকে দেখিয়া তাহার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে

তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল "বাছা আমার বড় ভিজে গিয়েছ? চোকে জল কেন? কি হয়েছে যাদু, তাই কাঁদ্‌ছ?"

অজা।—তুমি বড় ভাল মানুষ। তুমি স্বর্গে যাবে?

বুড়ী।—না বাছা! আমি সগ্‌গে যাব এত বড় কি ভাগ্‌গি করেছি?—এই কথা না শেষ না হতেই তার ঠাকুরমার গলা শুনে বেচারা অজা ভয়ে জড়সড় হয়ে বুড়ীর কম্বল মাথার উপর ঢাকা দিল।

অজার ঠাকুরমা বাড়ীর রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, একটা খোঁড়া হনুমান ছেলে দেখেছ?" বুড়ী তাড়াতাড়ি উত্তর করিল "ওমা হনুমান হবে কেন গা? কখনই হনুমান নয়।"

অজার ঠাকুরমা অবজ্ঞার সহিত বলিল, "তোমার চোকের চাউনিটা বড় ভাল দেখ্‌চি! সেটা বাঁদর নয়ত কি। আহা হা! ছিরি দেখলে চোক জুড়োয়!

বুড়ী।—ওমা তার মত ভাল বাঁদর এখানে পাওয়া যায় কি? অমন বাঁদর কার ঘরে আছে? যদি ছিরি দেখলে চোক না জুড়োয়, তবে দেখ কেন গা? না দেখলেইত পার।

"আমি দেখি আর নাই দেখি তোমার তায় কি গা" এই বলিয়া বুড়ী ঠাকরুন রাগে গজ্‌ গজ্‌ করে বক্‌তে লাগ্‌লেন। "হ্যাঁ গো হ্যাঁ।! আর বলতে হবে না, চুপ করে থাক। অমন ভাল বাঁদরের আজকাল আর ভাবনা নাই। দেখি সে বাঁদরটাকে পাই কি না। দেখব কেমন সে বড়্‌ডো ভাল বাঁদর হয়েছে, আসুক সে ; আজ বাঁচ্‌তে হবে না। যখন অজার ঠাকুরমা চলিয়া গেল, সে বলিল "তুমি কেন বলিলে তুমি আমাকে দেখ নাই।"

বুড়ী।—ও যাদু আমি বুঝি তাই বলেছি? বাছাদের কি হনুমান ব'লতে আছে? ষাট্‌! ষাট্‌! ষষ্টির বাছা! হনুমান হবে কেন?—অজা এ কথার উত্তর না দিয়া তার বুকের ভিতর গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

বুড়ী বসিয়া বসিয়া খরিদ্দারের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় অজাকে জিজ্ঞাসা করিল "ও ধন! তোর ঠাকুরমা কি তোকে মারে?"—অজা কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর করিল "হ্যাঁ মারে বই কি? এই দেখ!" এই বলিয়া হাতের যে মস্ত ঘা, তাহা দেখাইল।

বুড়ী।—আহা! হা! মরে যাই। ষাট! ষাট! পরাণে কি একটু মায়া নেই। এমন ধারা করে কি মারে। ওমা! ছ্যা! এইবার যখন তোরে মারবে আমার কাছে আসিস। আমি তোকে রাখব। দেখব কে আমার মাণিকের গায়ে হাত তোলে।

বুড়ী অজাকে যে খাবার দিয়াছিল তাই সে খাইতে লাগিল। এখন তাব খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ হয়েছে অজা এই বুড়ীর কাছে বসে আছে। এদিকে বুড়ী বাড়ী যাবার সময় হওয়াতে আপনার জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। তখন অজা তাহাকে বলিল—"দেখ আজ হতে তুমি আমার দিদীমা হ'লে ; আমি তোমাকে দিদীমা বলে ডাক্‌ব।" এখন অজার মনে হইতেছে যে দিদীমাই তাহার সর্ব প্রধান বন্ধু। মেনা যদিও সর্বদাই তাহাকে দয়া করে, সাহায্য করে, কিন্তু দিদীমার মতন কি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? তা কখনই পারে না? এখন তাহার দিদীমা বাড়ী চলে গেল। সুতরাং সে মুখ খানি ভার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনেক দিন হইল অজা বুড়ো রামদাসের কাছে যায় নাই। কিন্তু মেনাকে না লইয়াতো সে যাইতে পারে না, কারণ রামদাস মেনাকে লইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে অনেক দিন হইল মেনা অজার কাছে আসে না। কাজেই রামদাসের বাড়ীতে যাওয়া হয় না।

একদিন অজা বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল মেনা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহার নিকটে আসিতেছে ; তাহার কপালে মস্ত একটা কাল দাগ—অজা বুঝিল তাহার বাপ মাতাল হইয়া মারিয়াছে। মেনা মুখখানি দেখিলে বোধ হয় তার যেন কোন দুঃখ হইয়াছে। মেনা নিকটে আসিয়া বলিল—"অজা! আজ কাল তোমাকে রোজই এইখানে দেখি।"

অজা।—রোজই ঠাকুরমা বিকাল হলে বেড়াতে যান। যাবার সময় আমায় ঘর থেকে বের করে দিয়ে দুয়ারে চাবি দিয়ে যান। তাই এখানে বসে থাকি, আর কোথা যাব বল।

মেনা।—সেই বুড়োটীর কাছে যাবে না? আমায় মা যেতে বলেছেন।

তখন তাহারা দুজনে মিলিয়া রামদাসের ঘরের দরজায় গেল। দরজা খুলিয়াই দুজনে ভয়ে ভয়ে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল—ঘরে ঢুকিতে সাহস পাইল না।

রামদাস দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এসো, এসো, ভিতরে এস। আমি মনে করিতেছিলাম তুমি আমায় ভুলে গেছ। আজ, অনেক দিন পরে।

অজা।—না, না! ভুলি নাই। কিন্তু মেনা এতদিন আসিতে পারে নাই, তাই আমারও আসা হয় নাই।

রামদাস।—এই বুঝি মেনা! আমি তোমায় দেখে বড় খুসী হলাম। তোমার কপালে কিসের দাগ বাছা! পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? "না—পড়ে যাইনি—"আস্তে আস্তে থেমে থেমে মেনা এই কথাগুলি বলিল।

রামদাস স্নেহভরে মেনার মাথা ধরিয়া বলিলেন "দেখি মা! দেখি। আহা বড় লেগেছে না? খুব ভুগেছ না?—আহা! ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন।"

মেনা।—মা আমায় রোজ রোজ ঈশ্বরের কথা বলে উপদেশ দেন ; আমায় ভাল হতে বলেন।

রামদাস তাদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—"বেশ! আজ তোমার মা তোমায় কি বলেছেন?"

মেনা।—মা আজ আমায় বলেছেন ভাল না হলে মানুষ ঈশ্বরকে পায় না। আর আমাকে বলেছেন, তুমি ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'র আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র।

রামদাস।—আহা! বেশ কথা! দিব্যি কথা! তোমার বড় ভাগ্যি যে এমন মা পেয়েছ। আহা! ভাল মা পাওয়া কত সুখ! বাছা. যখন বড় হবে, তখন বুঝবে, যে এমন মা পেয়ে তুমি কতদূর সুখী হয়েছ।

মেনা মায়ের সুখ্যাতি শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এদিকে অজা মেনার কানে কানে বলিল "চল ভাই! আর দেরী ক'র না। চল! ঠাকুমা বক্‌বেন।"

মেনা রামদাসকে বলিয়া অজার হাত ধরিয়া বাহির হইল। আসিবার সময় রামদাস বলিয়া দিলেন—"আর একদিন এসো বাছা!"

তৃতীয় অধ্যায়

রাস্তার উপরে একটী বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক, তাঁহার স্বামীর হাতে একটী কাগজে কিসের ছবি আছে, তাই দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যায়গাটার নাম কি?"

স্বামী।—ইটের চক।

স্ত্রী।—এ যায়গাটার অবস্থা কেমন?

স্বামী।—বড় খারাপ। আমার ভগিনীপতি বল্‌লেন, এ যায়গাটাতে বাস্তবিকই কিছু কাজ করা যায়। কিন্তু এখানকার লোকেরা এমন খারাপ, যে আমাদের উপদেশের কথা শুনিলে হয়। তিনি আরও বল্‌ছিলেন, ভগবানের দয়ায় একটা ভাল কাজ করবার যায়গা পেলাম।

উপরে যে স্বামী স্ত্রী কথা বলিলাম, তাঁহারা পরোপকার করিবার জন্যই এই গরিবদের মধ্যে আসিয়াছেন। কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এমন থাকে যে, তাঁহারা পরের উপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ললিতমোহন বাবু এবং তাঁহার গুণবতী স্ত্রী কোন্ ধর্মাবলম্বী তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই ; তবে পরোপকার নামে যদি কোন ধর্ম থাকে, ললিত বাবু স্ত্রীর সহিত সেই ধর্মকে প্রাণে ধরিয়াছিলেন।

এই গ্রামে আসিয়া ললিত বাবু প্রায়ই রামদাসের কাছে যান। তাঁর কাছে অজা মেনার কথা প্রায়ই শোনেন। তাঁর যত্নে, তাঁরই চেষ্টায়, মেনার পিতা মদ ত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেন না, তাই আজ মৃণালিণীর বড় আহ্লাদ। ক্ষুদ্র বালিকার আহ্লাদ দেখে কে! আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, ছোট মুখখানি রাঙ্গা করিয়া প্রিয়সখা অজাকে সুখের সংবাদ দিতে আসিতেছে। পথে অজাকে দেখিতে পাইয়াই মেনা বলিয়া উঠিল—"ও ভাই! শুনেছ কি, কি হয়েছে? বাবা মদ ছেড়েছেন, আর মদ ছোঁবেন না। আমাদের এ'ত আহ্লাদ হয়েছে, যে মা আর আমি সমস্ত রাত কেঁদেছি"—এই বলিতে বলিতে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অজা।—তুমি কাঁদছ কেন? আহ্লাদ হলে কি মানুষ কাঁদে?

মেনা।—ওকি? তুমিও বোধ হয় বেশী আহ্লাদ হ'লে না কেঁদে থাক্‌তে পার না। কি করব, কান্না যে আপনি এসে পড়ে! চল, ভাই! রামদাসকে বলিগে, সে শুন্‌লে হয়তো কত সুখী হবে।

ইহার পর তাহারা দুজনে আস্তে আস্তে রামদাসের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইল। তাদের দেখিয়াই রামদাস বলিয়া উঠিল—"কি মা মিনু! ভাল খবর দিতে এসেছ বুঝি—এই বুড়োকে? আমি আগেই শুনেছি তোমার বাপ মদ ছেড়েছেন। আমার শুনে যে আহ্লাদ হয়েছে, তা আমি আর বলতে পারি না।

এই সময়ে ললিত বাবু রামদাসের ঘরে বসেছিলেন. তাঁকে দেখে অজা ও মেনা লুকাবার চেষ্টা করিল। তিনি তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এসো মা! এসো ; এসো বাবা! এসো ;—ভয় কিসের? এসো আমার কাছে এসো।"—এই বলিয়া তাদের নিকটে আসিয়া দুজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের নাম কি?"

তাহারা আপন আপন নাম বলিল।

ললিত বাবু।—তোমাদের দুজনে বুঝি বড় ভাব?

রামদাস।—একেবারে গলায় গলায়। যেখানে অজা সেই স্থানেই মেনা।

ললিত বাবু।—তোমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?

মেনা।—আমি এক বছরের বড়।

ললিত বাবু।—তুমি মা প'ড়তে পার?

মেনা।—হ্যাঁ, মা আমাকে রোজ পড়ান। আমি চারুপাঠ পড়ি।

ললিত বাবু।—তুমি বাবা কি বই পড়?

অজা।—আমি ক, খ, পড়ি। মেনা আমায় পড়ায়।

ললিত বাবু।—বেশ! খুব ভাল ক'রে পড়বে। ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'রবে, তাহ'লে তোমাদের সকলেই ভালবা'সবে।—মেনা! তোমার বাবার নাম কি?

মেনা বলিল।—"আমার বাবার নাম বিনোদবিহারী বসু।"

ললিত বাবু।—ওঃ! বটে? তুমি বিনোদবাবুর মেয়ে? তোমার বাপকে বলতে হ'চ্ছে তোমরা দুজনে রবিবার এক যায়গায় যাবে। তোমার বাপকে বলেলেই তিনি তোমাকে পাঠাবেন; অজার কথা তার ঠাকুরমাকে বল্লেই হবে।

ইহার পর ললিত বাবু অজার ঠাকুরমা ও মেনার বাবাকে বলিয়া অজা মেনার যাবার অনুমতি লইলেন। আজ রবিবার ;অজা মেনা ললিত বাবুদের বাড়ীতে বালক বালিকাদিগের সম্মিলনে গিয়াছে। এই সম্মিলনে ললিত বাবুর স্ত্রী সুরমা দেবী বালক বালিকাদের উপদেশ দেন, গল্প বলেন, ছবি দেখান, তাদের নিয়ে খেলা করেন ; এই জন্য ছেলেরা সকলে তাঁকে ভালবাসে। সুরমা দেবী অজা মেনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। অজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" অজা চমকিয়া উঠিয়া বলিল "এ্যা, আমার নাম অজা।"

সুরমা দেবী।—এতো ডাক্ নাম। তোমার আসল নাম কি?

অজা।—তা জানি না। আমার আর নাম নাই।

সুরমা।—নাম আছে বই কি? দেখি কে এর নাম ব'লতে পারে?

কেহই অজার যথার্থ নাম বলিতে পারিল না। তখন সুরমা দেবী কিছু আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিলেন "যাঃ—আজ আমি তোমাকে কার্ড (নাম লেখা রং করা মোটা কাগজ) দিতে পার্‌ছি না দেখ্‌ছি। তোমার নামটী আগে জান্‌তে হবে!"

এই কথা শুনিয়া অজা কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না দেখিয়া সুরমা দেবী তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিলেন "কেঁদ না, ধন! আস্‌ছে রবিবারে তোমায় একখানা দিব। তাতে দুঃখ কি? কেঁদ না, চুপ কর।"

বাড়ী যাবার সময় অজা কাঁদিতে কাঁদিতে মেনাকে বলিল "মেনা! সকলেই কার্ড পেলে, আমি পেলাম না, আমার মা নাই, আর এখন আবার নামও নাই।" মেনা পণ্ডিতের মত বুঝাইয়া বলিল—"তাতে আর দুঃখ কি? তোমার মা তো স্বর্গে আছেন? তোমার নামও অবিশ্যি কোথাও না কোথাও আছে"—পরে হঠাৎ কি মনে হওয়াতে বলিয়া উঠিল—"লোকে বলে ঈশ্বরের কাছে নাম লেখা থাকে। তা হলেই তো তোমার নাম ঈশ্বর

জানেন। এই তো মিট্ মাট্। আর কাঁদ কেন? তোমার মা স্বর্গে, তোমার নামও স্বর্গে লেখা আছে।"

মেনার মুখে এই কথা শুনিয়া অজা প্রফুল্ল হইল। মনে মনে বলিল "তবে আর কি? আমার মাও আছেন, আমার নামও আছে! এই বারে তাঁকে ব'লব, আমার নাম স্বর্গে আছে, তা হ'লে একখানা কার্ড় পাব।"

কিন্তু আজ অনেকদিন তারা কেউ ললিত বাবুর বাড়ীতে যায় নাই, কাজেই নামের কথাও বলা হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

ললিত বাবু আহার করিতেছেন, এমন সময় চাকর একখানা চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্রখানি পড়িয়া সুরমা দেবীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"পড়িয়া দেখ ; দেখে একটা কিছু ঠিক কর।"—সুরমা দেবী পড়িতে লাগিলেন—

"শ্রীচরণেষু,—দাদা! আমরা এখানে আসিয়া বেশ ভাল আছি। আমরা বেশ কাজ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কিছুরই অভাব নাই। বড় বাড়ী, ঘর দোর, পড়ে আছে; একটী ছোট ছেলে বেশ থাকিতে পারে, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু ভগবান আমাদের সন্তান দেন নাই। বাড়ী ঘর দোর আছে, কিন্তু ছোট ছেলের অভাব তাই দাদা! আমার বড় ইচ্ছা যে তোমাদের ও গ্রামের মধ্যে যে ছেলেটী বা মেয়েটীর অবস্থা বড় খারাপ এমন একটী ছেলে কি মেয়েকে পালন করি। দাদা! একটী ছেলে কি মেয়ে যাহা পাও, খুঁজিয়া আমাদের এখানে নিয়ে এসো। আর অধিক কি লিখিব। বৌদিদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিও। তোমরা কেমন আছ?

তোমার স্নেহের ইন্দু"।

সুরমা দেবী পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল? অজাকে দিলে হয় না? আমার তো ইচ্ছা তাকেই দাও।"

ললিত বাবু—সে যে খোঁড়া। তার শরীর বড় খারাপ।

সুরমা—ইন্দুতো তাই চায়। আহা! সে বড় কষ্ট পায়! এমন ছেলেকে যদি দয়া না কর তবে দয়ার পাত্র কে?

ললিত বাবু—হ্যাঁ, ছেলেটী বড় ভাল। রামদাস তার বড় সুখ্যাতি করে। অজার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিব. সে যদি দিতে চায়।

এইরূপ কথাবার্তার কিছু দিন পরে ললিত বাবু অজার ঠাকুরমার কাছে অজাকে দিবার কথা বলিলেন। তাহাতে সে উত্তর করিল—"ছেলেটাকে বিদায় কর্তে পার্লেই বাঁচি। কিছু টাকা দিলেই দি?"

ললিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "অজার আসল নাম কি?" অজার ঠাকুরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে চটিয়া উঠিয়া বলিল "তোমার ওর নামে দরকার কি? নাম অজা! যদি এ নাম পছন্দ না হয়, তোমাদের যা ইচ্ছা সেই নাম দিও।' এই সকল কথা শুনিয়া সুরমা দেবী বলিলেন,—"তবে আর কি হবে? না হয় কিছু টাকা দিও। এতদিন খেতে প'রতে দিলে.

তা টাকা নিতে পারে। গরিব মানুষ, কোথায় পাবে?" ললিত বাবু টাকা দিতে সম্মত হইলেন, অজার ঠাকুরমা চল্লিশ টাকা পাইয়া তাহাকে বিদায় দিল।

আজ ললিত বাবু অজাকে আনিতে গিয়াছেন। অজা আজ কাঁদিতে কাঁদিতে মেনার নিকট বিদায় লইতে যাইতেছে। মেনা তাহার চক্ষে জল দেখিয়াই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল ও গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! কাঁদ্‌ছ কেন?"—এই বলিয়া আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অজা আর থাকিতে পারিল না ; সে খুব জোরে কাঁদিয়া উঠিল—"ভাই! আর তোমাকে এ জন্মে দেখিব না। আজ বিদায় নিতে এসেছি ; আজ আমি যাব। আর তোমায় কখনও দেখিব না।"

মেনা।—"সে কি? তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর এখানে আসবেনা?" এই বলিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল—"যাই। রামদাসের কাছে যাই। এখনই যেতে হবে। এসো মেনা।"

মেনা মুখ খানি ভার করিয়া অজার সঙ্গে চলিল। রামদাসের ঘরের কাছে গিয়া দেখে দরজা খোলা। তাদের দেখিয়া রামদাস বলিয়া উঠিল—"বাবা! তুমি আজ না যাবে? ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। আর বোধ হয় তোমাকে কখনও দেখিতে পাব না। বাবা! চিরকাল সুখে থাক, এই আশীর্বাদ করি। ভগবানের উপরে যেন তোমার মতি হয়। এই বুড়োকে মনে রেখো।"

রামদাসের নিকট বিদায় হইয়া অজা দিদিমার নিকট বিদায় লইতে চলিল। যাইবার সময় মেনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভাই আর তুমি এখানে আসবেনা? আর তোমায় দে'খতে পাব না? তুমি সেখানে গেলে আমায় ভুলে যাবে? আমায় ভুলো না ; আমি তোমায় কখনও ভু'লব না। তুমি গেলে কার সঙ্গে খেলা ক'রব? কার সঙ্গে গল্প ক'রব? আমার আর কেউ রইল না।"

অজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, পরে মেনার গলা জড়াইয়া চোখের জল মুছাইয়া বলিল—"ভাই! কেঁদনা। আমি তোমায় ভু'লব না। যদি তুমি আমার বোন হতে, তা হলে তোমায় কখনই ছেড়ে যেতাম না। তোমার সঙ্গে খেলা ক'রতাম। লোকের ভাই বোনে ঝগড়া হয়—তোমার সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হ'ত না।"

"অজা!—ভাই! যাই, দেরী হ'লে বাবা ব'ক্‌বেন। আর কখনও দেখা হবে না"—এই বলিয়াই মেনা কাঁদিয়া ফেলিল। ফের্ "যাই" বলিয়া অজাকে বারম্বার চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন অজা দিদিমার কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। তাহা শুনিয়া ফলওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "যাবে? কোথা যাবে? আর আসবেনা?"

অজা।—বোধ হয় না।

ফলওয়ালী।—ওমা সত্য নাকি? আহা! চল্লে? বেঁচে থাক বাবা। সুখে থাক! তুমি বড় ভাল ছেলে। এই নাও, পথে এই আম দুটো খেও। দিদিমারে ভুলো না।

সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইলে, ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে করিয়া আপনার ভগ্নী ইন্দুরেখার বাড়ীতে যাত্রা করিলেন এবং পথে অনেকক্ষণ গাড়ীতে কষ্ট পাইয়া অনেক বিলম্বে সেখানে গিয়া পৌছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

যখন ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দুর বাড়ীতে যান, তখন ইন্দু দাদার অপেক্ষায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। দাদাকে দেখিয়াই ইন্দু বলিয়া উঠিলেন "দাদা! এই নাকি সেই ছেলেটী? আহা! একে এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন?" অজা সেখানে আসিয়া কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ইন্দুরেখা তাহাকে কোলে করিয়া পালঙ্কে লইয়া শোয়াইয়া মায়ের মতন ক'রে সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজার জ্ঞান হইল। সে চাহিয়া দেখে একটী সুন্দর সাজান ঘরে, সুন্দর পরিষ্কার বিছানায় শুইয়া আছে। এমন সুন্দর স্থান সে তাহার জীবনে কখন দেখে নাই। ফিরিয়া দেখে কাছে একজন (ঠিক যেন মায়ের মত) তার মুখপানে চাহিয়া আছেন ; আর তার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। এই সব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এই বুঝি স্বর্গ"! সে আস্তে আস্তে বলিল "এই কি স্বর্গ?" তাহার কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন "না বাছা! একি স্বর্গ? এ স্বর্গ নয়। " এই বলিয়া অজাকে এক বাটি গরম দুধ খাইতে দিলেন। তাহাকে দুধ খাইতে দেখিয়া ললিত বাবু বলিলেন "ইন্দু! ওকে একেবারে অনেক খেতে দিওনা। ওর কোন ভাল জিনিষ খাওয়া অভ্যাস নাই, অল্পে অল্পে খেতে দিও।"

ইন্দু।—তা দিব। কিন্তু দাদা! এর কাপড় বড় ময়লা, এ কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে একে স্নান করিয়ে দেব।

ইন্দুরেখা দেবী কাপড় খুলিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তার গায়ের একটা ময়লা জামার পকেট হইতে একখানা ছোট খাতা বাহির করিয়া অজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানা কি তোমার খাতা?"

অজা।—হ্যাঁ। আসবার সময় ঠাকুরমা আমাকে এখানা দিয়েছেন।

"তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি আসি" এই বলিয়া নীচে গিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ দাদা! ও ছেলেটীর নাম কি?"

ললিত বাবু।—ওর নামটাতো জানিনা। ওকে একটা নূতন নাম দিতে হবে। ওকে সকলে অজা বলে ডাকে, কিন্তু সেটাতো আসল নাম নয়!

ইন্দু।—কাজেই একটা নাম দিতে হবে। আর দেখ ওর কাপড় এত ময়লা যে আর এক দণ্ডও বাড়ীতে রাখ্‌তে পারি না। আর ভাল কথা মনে পড়েছে। ওর একটা পিরাণের পকেটে একখানা ছোট খাতা পেয়েছি ; তাতে হয়ত ওর নাম লেখা থাক্‌তে পারে।

ললিত বাবু।—নিয়ে এস তো দেখি? নামটা হয়তো থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

এখানে একটা কথা বলা উচিত ; ইন্দুরেখার স্বামীর নাম রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিও সেখানে বসিয়া ছিলেন। ইন্দুরেখা দেবী উপর হইতে খাতা খানি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন. ললিত বাবু খাতা খানি খুলিয়া দেখেন, একটীও পাতা নাই। দেখিয়া বলিলেন "এতে কিছু নাই—নামটা তবে পাওয়া গেল না।"

রাজকুমার বাবু।—দেখি! দেখি! থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। এই যে! এই যে! দেখি! অ—জি—ৎ—কু—মা—র—তার পর কি লেখা আছে পড়তে পারি না। প্রথম অক্ষরটা 'ব' তার পর কি পড়া যায় না।

ইন্দু।—অজিৎকুমার বোধ হয় ওরই নাম। অজিৎ থেকে অজা করে নিয়েছে। তাই হবে।

ললিত বাবু।—ও মেয়ে মানুষটী বোধ হয় ওর আপনার ঠাকুরমা নয়। আর ওর সঙ্গে কথা কইলেই বোধ হয়, যেন কিছু লুকান কথা আছে। যা হোক ওর উপর চোক্ রাখতে হচ্ছে।

কাল ললিত বাবু বাড়ী যাইবেন। ইন্দুরেখা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে স্বীকার করিয়াছেন যখনই ছুটী হইবে, তখনই সুরমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন। ললিত বাবু যাইবার সময় দেখেন অজা চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। মুখ খানি প্রফুল্ল। হাসিটী মুখে ধরিতেছে না। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেছিলেন, দাদাকে দেখিয়াই উঠিয়া বলিলেন "দাদা! এখনই চল্লে না কি? আবার কবে আস্‌বে? শীঘ্রই এস। বৌদিদীকে অবিশ্যি অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

ললিত বাবু।—আচ্ছা আর কতবার বল্‌তে হবে। ঢের হয়েছে। অজা! আমি যাচ্ছি কাকে কি বলতে হবে?

অজা।—সকলকে বল্‌বেন আমি এখানে বেস্ ভাল আছি, খুব সুখে আছি। আর মেনাকে বলবেন তাকে আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। সে যেন আমার জন্য না কাঁদে।

ললিত বাবু।—এই! আর কিছু নয়? ইন্দু আমি তবে আসি।

ইন্দুরেখা দেবী দাদার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্যন্ত গেলেন এবং ললিত বাবু চলিয়া গেলে অজার কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনেক দিন ধ'রে অজা রাজকুমার বাবুর বাড়ী আছে। সে রাজকুমার বাবুকে মেশো মহাশয় আর ইন্দুরেখা দেবীকে মাসীমা বলিয়া ডাকে। এখন অজাকে দেখিলে সে ছেলে বলে আর চেনা যায় না। সে এখন মোটা হয়েছে, লম্বা হয়েছে, তার শরীর পরিষ্কার, চুল পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার। তার পা এখন আর খোঁড়া নয়। যেন সে অজাই নয়। অজার মুখে সর্বদাই হাসি টুকু লাগিয়া আছে। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে পড়ান, সে এখন অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে, শীঘ্রই কথামালা ধরিবে। অজা এখন "রাজা" কুকুরের সঙ্গে প্রত্যহ বিকালে বাগানে ছুটাছুটি খেলিয়া বেড়ায়। অজা এখন কত কি কাজ করে। পড়ে, লেখে, বাগানে ফুলগাছ বসায়, গাছে জল দেয়, হাঁসকে খাবার দেয়, আরও কত কি কাজ করে। অজার আজ কাল এক নূতন নাম হয়েছে। মাসীমা সে নামে ডাকলে অজা বড়ই খুসী হয়। সে নামটী অজিৎ। আজ অজা বাগানে ফুলগাছ পুতিয়া গাছে জল দিয়া রাজার সঙ্গে খেলা করিতেছে, এমন সময় মাসীমা বাগানের দিকে আসিতেছিলেন, অজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "অজিৎ! এক খবর আছে শুনে যদি খুব খুসী হও, তবে আমায় কি দিবে?"

অজিৎ।—মাসীমা! আর কি দিব? তোমায় কুড়িটী চুমো দিব। বল না! মাসীমা কি? আমার বড়ই শুন্‌তে ইচ্ছা করছে।

মাসীমা।—কাল দাদা আর বৌদিদী এখানে আস্‌ছেন। এখনি একখানা চিঠি পেলাম।

অজিৎ।—হো! হো! আমি এবার ইটের চকের খবর পাব। হো! হো! আমি এইবারে দিদীমার কথা, মেনার কথা শুন্‌তে পাব।—এই বলিয়া সে মাসীমাকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর হাত তালি দিয়া বাগানময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার সঙ্গে খেলা দূরে গেল। রাজা বেচারি আর কি করে? অজিৎ নাচিতে নাচিতে যেখানে যায়, সেও তার পিছন পিছন ছুটিয়া গিয়া তার পায় কামড়ায়। অজিতের নাচ দেখিয়া ইন্দুরেখা দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অজিতের আমার নাচ দেখ! এখনও ইটের চকের কথা ভুলিতে পারে নাই। নাচটা একটু থামাও দেখি?"

অজিৎ।—মাসীমা! মামাবাবু আমায় দেখলে চিন্‌তে পারবেন না। আমি এখন দেখ্‌তে আর এক রকম হয়ে গেছি, না?

মাসীমা।—বোধ হয় চিন্‌তে পারবেন না। তুই একেবারে বদ্‌লে গেছিস্‌। তোকে যখন চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করবেন 'এ কে ইন্দু?' তখন আমি বলব 'এ সে অজা নয়—তাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।' কেমন? না। না। আমি বলব এই আমার লক্ষ্মীছেলে "অজিৎ-ধন"। এই বলিয়া তিনি অজিতের মুখে একটী আদরের চুম্বন দিলেন। যখন ইন্দুরেখা দেবী অজিতের সঙ্গে আদর ক'রে কথা বলিতেন, তখনই তুই বলিয়া কথা কহিতেন। এটাও ওঁর আদরের ডাক। এইরূপে অজিতের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ইন্দুরেখা দেবী চাহিয়া দেখেন সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্পে অল্পে অন্ধকার চারিদিক ঢাকিয়া আসিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে কাক "কা" "কা" করিয়া উড়িয়া বাসায় যাইতেছে। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া তিনি চমকিয়া বলিলেন "ওমা! কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চল অজিৎ! বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণ তোমার মেশো মশাই এসেছেন। না! আসেন নি ; এলে খবর পেতাম।" এই বলিয়া দ্রুত পদে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ আগে আগে ছুটিয়া বাড়িতে পৌঁছিল।

সপ্তম অধ্যায়

পরদিন প্রাতে অজিৎ বাড়ীর সম্মুখের বাগানে 'রাজা'র সঙ্গে খেলা করিতেছিল ; খেলাতে এতই মত্ত যে বাড়ীর ভিতরে একখানা গাড়ী গেল, তাহাও দেখিতে পাইল না। বলা বাহুল্য এই গাড়ীতে ললিত বাবু ও সুরমা দেবী আসিয়াছেন। অজিৎকে দেখিয়া সুরমা দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ, ওকি অজা? আমার বোধ হয় ও ছেলে সে অজা নয়।"

ললিত বাবু।—না। ও কখনই সে ছেলে নয়।

তেমন-খোঁড়া রোগা ছেলে দুদিনের মধ্যেই কি অমন মোটা সোটা হৃষ্ট পুষ্ট হতে পারে?

যখন তাঁহারা দুজনে গাড়ী থেকে নামিতে ছিলেন, তখন অজিৎ ঘোড়া দুটো দেখিয়া 'মামা বাবু আর মামীমা এসেছেন রে' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ললিত বাবু নামিয়াই ইন্দুরেখার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু! এ বোধ হয সে অজা নয়?"

ইন্দু।—হ্যাঁ! অবিশ্যি সেই ছেলে। এমন বদলে গেছে যে দেখলে আর চেনা যায় না। ললিত বাবু। ওমা! অজাকে দেখলে আর চেনা যায় না। অজা, কেমন আছ?

অজা বলিল 'ভাল আছি।'

ইহার পর ইন্দুরেখা সুরমা দেবীর হাতখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌদিদী! কতদিন থাকবে বল।"

সুরমা।—দুদিন। তারপর আমি বাপের বাড়ী গিয়া বাকী ছুটিটা কাটাব। তোমার বাড়ীতে বেশী দিন থাকা হল না। এবার এসে অনেক দিন থাকব।

ইন্দু।—তবে যাও। আমি মনে মনে কত আনন্দ ক'রছিলাম। দাদা! তোমাকে আমি বুঝি এই বলেছিলাম। দুদিনের জন্যে না এলেই তো হ'ত।

ললিত বাবু।—লক্ষ্মী দিদিটী! অত রাগ ক'র না। এইবারে এসে অনেক দিন থাকব।

অজা আস্তে আস্তে ললিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"মামা বাবু! মেনা কেমন আছে? ইটের চকের আর সকলে কেমন আছে?"

ললিত বাবু।—মেনা এখন খুব সুখেই আছে। তার বাবা এখন মদ টদ খান না। চাকরী করিতেছেন। এখন বিনোদ বাবুরা ইটের চকে নাই। মেনা এখনও আমাদের বাড়ীতে আসে। সে প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। ইটের চকের সকলে ভাল আছে। আচ্ছা! আমি এবারে গিয়ে মেনাকে কি বল'ব?

অজিৎ।—ব'লবেন আমি খুব সুখে আছি। আমার কোন কষ্ট নাই, কোন দুঃখ নাই। মাসীমা মেশো মশাই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি অনেকটা পড়ে ফেলেছি। আমার কোন কষ্টই নাই ; কেবল মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে দুঃখ হয়। আর তাকে ব'লবেন, যে সে আমায় মনে করে শুনে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমি তাকে ভুলি নাই।

অজিতের প্রফুল্লতা দেখিয়া সুরমা দেবী ও ললিত বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। দাদাকে বৌদিদীকে লইয়া ইন্দুরেখা দেবী সমস্ত দিনটা আমোদে কাটাইলেন। সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ইন্দুরেখা তাহা টেরও পাইলেন না। বিকালে সকলে মিলিয়া আমোদে আহার করিলেন। সেদিন হাসির রোলে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেদিন সকলের মুখেই হাসির রেখা ; ইন্দুরেখা দেবীর বিশেষ আহ্লাদ। আহার করিয়া সকলে বাগানে বেড়াইতে গেলেন। ইন্দুরেখা ফুল তুলিয়া বৌদিদীকে সাজাইয়া দিলেন এবং বৌদিদীকে এ গাছ ও গাছ দেখাইতে লাগিলেন। গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে চাঁদ আকাশে ফুটিয়া উঠিল, চারিদিক জ্যোৎস্নাময় হইল। তখন তাঁহারা সকলে ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পুষ্করিণীতে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ মিক্ করিতেছে ; গাছগুলি জোনাকীতে ভরা। সে সময়ের দৃশ্য কি সুন্দর তাহা বলা যায় না। ঘাটে বসিয়া তাহারা কত গল্প করিতে লাগিলেন,—গল্পে গল্পে অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাজাও এ দলের মধ্যে অবশ্য ছিল।

তার পরদিন ললিত বাবুরা যাইবেন। রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ইন্দুরেখা দেবী আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইন্দুরেখা দেবীর ইচ্ছা যেন সন্ধ্যা না হয়,—সন্ধ্যা হইলেই দাদা বৌদিদী চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যা ইন্দুরেখা দেবীর কথা শুনিল না, বরং সেদিন সন্ধ্যা শীঘ্র শীঘ্র আসিল। যতই অন্ধকার হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখ ভার হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা কোন মতেই দাদাকে ছাড়িতে চায় না। মনে বড় সাধ ছিল যে এবার ছুটিটা দাদা বৌদিদীর সঙ্গে সুখে কাটাইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। ইচ্ছা না থাকিলেও দাদাকে বৌদিদীকে ছাড়িতে হইল। যাবার সময় ইন্দুরেখার মুখ আরও ভার ভার হইল, চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ললিত বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে বলিলেন—"ইন্দু! তবে আমি আসি।

কিছু মনে করিও না। ইচ্ছা ছিল, এখানে সমস্ত ছুটিটা থাকিব, কিন্তু থাকা হ'ল না। এবারে এলে অনেক দিন থাকব।"

ইন্দু।—তা আর থেকেছ। সব বারেইতো থাকবো বলে যাও।

সুরমা।—ইন্দু! তবে যাই। বড় দুঃখিত হয়েছ, না?

ইন্দুরেখা দেবী কিছু বলিলেন না, কেবল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দাদা বৌদিদীকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন, এবং তাহারা চলিয়া গেলে, বিষণ্নমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ললিত বাবুরা ইটের চকে ফিরিয়া যাবার কিছু দিন পরে একদিন একখানা চিঠি পাইলেন। চিঠিখানা রামদাসের হাতের লেখা। তাহাতে লেখা আছে—"মহাশয়! আপনি পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবেন। অজার ঠাকুরমার অত্যন্ত অসুখ, বাঁচিবার আশা নাই। মরিবার আগে আপনাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছে। আপনার সঙ্গে বড় দরকার। অনুগ্রহ করিয়া অবশ্য আসিবেন।" পত্র পড়িয়া ললিত বাবু বড় আশ্চর্য হইলেন—"আমার সঙ্গে আবার কি দরকার আছে?" অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গিয়া দেখেন বৃদ্ধা বিছানার সহিত মিশাইয়া শুইয়া আছে। শীর্ণ মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই ললিত বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এমন ভয়ানক মূর্তি তিনি কখনও দেখেন নাই। ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমায় ডাকিয়াছেন, কি দরকার আছে বলুন।"

বৃদ্ধা।—তোমার সঙ্গে কথা আছে সেই জন্য ডাকিয়াছি, আর কোন দরকার নাই। যদি শোন তবে বলি।

ললিত বাবু।—বলুন আমি শুন্‌চি।

বৃদ্ধা।—অজা এখন কেমন আছে? বাবা আমি বড় পাপিষ্ঠা—আমার মত হতভাগিনী কে?

ললিত বাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? অজা ভাল আছে। আপনি বেশী কথা কহিবেন না।

বৃদ্ধা।—বাবা বল্‌তে আমার বুক কেঁপে যাচ্চে। আমার কথা বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। আমি বল্‌তে পার্‌ছি না। বাবা—তোমায় বলি—আমাব পাপের কাহিনী বলি—শোন বাবা শোন। অজা বেঁচে থাক্‌। অজা—আমার—আ—মা—র না—তি নয়।

ললিত বাবু।—সে কি? সে কি? তবে তাকে কেমন করে পেলেন। বেশী কথা করেন না।

বৃদ্ধা।—বাবা এতদিন বলি নাই। আজ আর পারব না। আজ শেষের দিন। কেমন করে পেলাম ; তবে বলি শোন। অজার মা একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে ৮ বছর আগে একখানা গাড়ী করে একদিন রাত্রে, এ রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। আমাকে তাঁব একজন চাকর জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গো বাছা! এখানে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আছে? একদিনের জন্য আমাদের স্থান দিতে পারে?" আমি হতভাগিনী বলিলাম "না—এখানে কারো বাড়ীতে

জায়গা নাই। এমন করে আবার কে আসে?” আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “না গো বাছা! আমার এখানে কেউ নাই। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। এখানে আমার স্বামী জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন ; খবর পাইয়া আসিয়াছি। আমার থাকবার জায়গা নাই, সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি থাক্‌তে দাও তবে আমায় বড় দয়া করা হয়। আমার কাছে টাকা কড়ি আছে ; তোমার কিছু ক্ষতি করব না। বড় বিপদে পড়েছি, দয়া করে এক রাত্রের জন্য স্থান দাও।” আমি দেখিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে বাস্তবিকই বিপদে পড়িয়াছেন। তাতে আবার টাকা কড়ি আছে শুনিয়া স্থান দিতে সম্মত হ'লাম। তারপর এ পাপিষ্ঠার পাপের কথা বলি শোন। স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত অসুখ হল। এই বিছানায়! হায়রে! সাধবী সতী ৮ বছর আগে এ ছার সংসার ছেড়ে গেছেন। সেই বিছানায় আমি পাপিষ্ঠা আজ পাপের বোঝা মাথায় করে মরিতে বাসিয়াছি।

বাবা আমি বড় পাষাণ। আমার প্রাণে দয়া মায়া নাই। আজ আমার সেই দিনকার কথা মনে পড়িতেছে। যখন অসুখে পড়ে তিনি ছেলেটীর মেয়েটীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল মুছিতেন, হায়রে পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে সেই মায়ের চোখের দুটী ফোঁটা জল দেখিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারে। আর আমি—আমি মহা পাতকী সে চোখের জলকে গ্রাহ্য করিতাম না। তাঁর চোখের উপরই আমি ছেলেটীকে মেয়েটীকে মার্‌তাম, খেতে দিতাম না, যত্ন করিতাম না। তাঁকে ত করিতামই না। শক্তি ছিল না যে একবার এদের কোলে করেন। আমায় কখন কিছু বলেন নাই। কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁর চোখ দুটী যেন আমাকে বলিত ; “আমার বাছাদের কষ্ট দিও না, এরা আমার মাণিক, আমার সর্বস্বধন!” ছেলেটী মেয়েটী খাট ধরে “মা” “মা” বলিয়া যেমন যেত তিনি জড়াইয়া ধরিয়া চুম খেতেন আর কাঁদিতেন ; মেয়েটী বলিত “মা ওঠ! ওঠ! মা তোমার কি হয়েছে, মা বাড়ী যাবে না।” তিনি কিছু বল্‌তেন না, কেবল কাঁদিতেন। এ সবে আমার মন গলিত না। আমি কি মানুষ! না মানুষের মন কি এত কঠিন হয়? আমি কখনই মানুষ নই। আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী!! বলি শোন—আমার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এত অসুখ হয়েছিল, একদিন ডাক্তার ডাকি নাই। অসুধ দিই নাই। যত্ন করি নাই। আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ। আমার হাতেই তাঁর প্রাণ গিয়াছে। উঃ! উঃ!! কি করেছি! তিনি আমায় বলিতেন “মা! এখানে ডাক্তার নাই?” আমি বলিতাম “ডাক্তার আবার তোমার জন্য ডাকে কে? অমনি সেরে যাবে।” তিনি আর উত্তর করিতেন না। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমিই তাঁকে মারিয়াছি। তাঁর যে কিছু টাকা কড়ি জিনিষ পত্র ছিল তা আমিই লই। অজা তখন ৬/৭ মাসের ছেলে। মেয়েটী প্রায় দুই বৎসরের। ছেলে মেয়ে দুটী দেখতে অতি সুন্দর ছিল। এদের মা দেখতে আরও সুন্দর ছিলেন। সে মুখখানি পানে চাহিলে লোকের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। মেয়েটীকে একজন নিলেন। কিন্তু কে জানে আমি ছেলেটীকে কেন দিলাম না। অজার কপালে কিনা এ সব ছিল। আমার মতন রাক্ষসীর ব্যবহার সহ্য করা তার কপালে ছিল। আমি আর বলিতে পারি না। বাবা—বাবা—আমার কি গতি হবে? আমার কি উদ্ধার আছে? বাবা—থাকে ত বল? আর সহ্য হয় না। আমি তাকে সারাদিনের মধ্যে জলমত দুধ দুই একবার খাওয়াইয়া দিতাম। খেতে দিলে খেত না। ভাল খাওয়া অভ্যাস ছিল কি না। ওকি খোঁড়া ছিল! ওকি অমন ছিল ! আমি করেছি। এ প্রাণ অমন কাজ কর্‌তে কেঁপে যেত

না। এ হাত অত্যাচার কর্‌তে ভয় পেত না। এ প্রাণ পাষাণে বাঁধা। কোলে বসাইয়া রাখিতাম, কাঁদিলে অত্যন্ত মারিতাম। মেরে মেরে না খেতে দিয়ে অমন দুর্দশা করেছিলাম। ওগো সতি! তুমি কি তোমার প্রাণের ধনের দুর্দশা দেখিতে? আমায় মাপ কর? করবে নাকি? ভগবান! তোমায় একদিনের জন্যও ডাকি নাই, আমার কি গতি করবে না? তুমি না করলে, ভগবান!—আর কোথা যাব। বাবা আর কথা কইতে পারি না। তুমি আমার কাছে ভগবানের নাম কর। আর ওই বই খানা অজার মায়ের। তিনি মরবার আগে বই খানা ওদের দিয়েছেন। তুমি ও খানা আমার অজাকে দিও। তাকে যদি একবার পাই, বুকে করে নিয়ে প্রাণ শীতল করি। তুমি ভগবানের নাম কর; ও নাম শুনি্‌তে বড় ইচ্ছা কর্‌ছে।

ললিত বাবু সব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বই খানা নাড়িয়া দেখেন, তাতে লেখা আছে "প্রাণের অজিৎ, ঊর্মিলাকে মায়ের ভালবাসার উপহার।"—কিরণমালা রায়।

ললিত বাবু তাঁর কাছে ভগবানের নাম করিয়া বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

নবম অধ্যায়

বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াই ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ইটের চকে আসিবার জন্য একখানা পোস্টকার্ড লিখিলেন। রাজকুমার বাবু পত্র পাইবা মাত্র ইটের চকে রওনা হইলেন, এবং তথায় পৌঁছিয়া ললিত বাবুর নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইলেন। সকল কথা শুনিয়া রাজকুমার বাবুর তাঁহার ছোট বোনের একটী গল্প মনে আসিল। তিনি ললিত বাবুকে বলিতে লাগিলেন—"আজ প্রায় অনেক দিন হইল আমার ছোট বোনের একজন উৎসাহী, সাহসী, ধার্মিক যুবা পুরুষের সহিত বিবাহ হয়। বাবা তার আর আমার বোনের উপর কি কথায় অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহাদিগকে সেই দিনই বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমার ভগ্নীপতির নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। শ্রীশ বাবু সেই দিনই আমার বোনকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমার বোনের বয়স ১৭ বৎসর। তাঁদের অল্প দিনই বিয়ে হয়েছিল। বাবাও জীবনে আর নাম করেন নাই—বাবার কি বিষম রাগ ছিল!—আমরাও আর তাঁদের বিশেষ কোন খবর পাই নাই।"

ললিত বাবু।—আপনার বোনের নাম কি?

রাজকুমার বাবু।—কিরণমালা।

ললিত বাবু।—ও! ও! অজার ঠাকুরমা অজাকে যে বইখানা দিয়াছেন সেই বইখানা অজার মা অজাকে আর অজার বোনকে দিয়া গিয়াছেন। অজার মার নামও কিরণমালা রায়। আপানার বোন ত নন?

রাজকুমার বাবু।—আচ্ছা বইখানা নিয়ে আসুন ত দেখি, সে খানা দেখলে আমি টের পাব কিরণের বই কিনা?

ললিত বাবু বইখানা আনিয়া রাজকুমার বাবুর হাতে দিলেন। বইখানা দেখিয়াই রাজকুমার বাবু বলিয়া উঠিলেন "দেখি! দেখি! এ খানা যে আমার বাবার বই!" বইখান লইয়া পাতা উল্টাইয়া এক যায়গায় দেখিলেন যে তাঁর বাবার নাম লেখা রয়েছে। নামটী পড়িয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"ও! তবে কি সত্য সত্যই অজিৎ আমার ভাগনে! কিরণ! দিদিটী আমার! বাবার জন্য তুমি কি না কষ্ট পেয়েছিলে? ভগবান! তোমার যে কি বিচিত্র লীলা! এ মিলনে তোমারই হাত! তুমিই আমাদের মিলাইয়া দিলে!! আজ আমার কি শুভদিন!!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি ললিত বাবুকে বলিলেন "চলুন আমরা সেই বুড়ীর কাছে যাই। আজ যদি আবার ঊর্মিলার কোন খোঁজ পাই। তাকেও খুঁজে বের কর্‌তে হবে।"

পরে ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু দুজনে বুড়ীকে দেখিতে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন বাড়ীর দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর কে এক জন বলিয়া উঠিল "কে গা! কাকে চাও?"

ললিত বাবু।—দরজাটা একবার খুলে দাও ত বাছা?

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া ললিত বাবু চিনিতে পারিলেন।

স্ত্রীলোকটী অজার ঠাকুরমার ঘরের পাশে থাকে। ললিত বাবু তাহাকে বলিলেন "হ্যাঁ গা বাছা! অজার ঠাকুরমা আজ কেমন আছেন?"

স্ত্রীলোক।—যদি আপনাদের দেখবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে একটু আগে এলে দেখতে পেতেন। এই দু ঘণ্টা হ'ল মরে গেছে। তাকে এখন ঘাটে নিয়ে গেছে।

ললিত বাবু।—ওমা, এত শীঘ্র মারা যাবেন ; তাত আমি বুঝিতে পারি নাই। আহা! বড় মাটি কর্‌লাম। রাজকুমার বাবু! কি করা যায় বলুন ত? তার পর (কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন) হ্যাগা বাছা! তুমি কি অনেক দিন হতে এই মেয়ে মানুষটীকে দেখিতেছ?

স্ত্রীলোক।—হ্যাঁ! অনেক দিন থেকে দেখছি। আমি এখানে যতদিন এসেছি ততদিনই দেখিতেছি।

ললিত বাবু।—তুমি অজার মাকে বোধ হয় দেখিয়াছ?

স্ত্রীলোক।—হ্যাঁ! আজ প্রায় দশ বৎসর হইল একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এসেই ভয়ানক রোগে পড়িলেন। কিছু দিন পরে ছেলে মেয়ে দুটীকে ফেলে মরে গেলেন। তার পর অজার ঠাকুরমা মেয়েটীকে নবকুমার বসুর স্ত্রীকে দিল ; ছেলেটী তার নিজের কাছেই রহিল। ছেলেটীকে অনেক কষ্ট দিত—খেতে দিত না মারিত। এত কষ্ট দিত যে দেখলে মানুষ না কেঁদে থাকিতে পারিত না।

ললিত বাবু।—আর থাক্, মৃতের নিন্দায় কাজ নাই। তুমি ছেলেটীকে যত্ন করিতে না? আর অজা কি ছেলে বেলা থেকেই খোঁড়া ছিল।

স্ত্রীলোক।—না। খোঁড়া ছিল না। দেখ্‌তে দিব্যি ছিল। আমি তাকে কি আর যত্ন কর্‌ব। আমার নিজের কত কাজ ছিল। আমি গরিব মানুষ, কত কাজ। যত্ন করবার সময় কোথায় ছিল?

ললিত বাবু।—নবকুমার বাবুরা কোথায় থাকেন, বলিতে পার কি?

স্ত্রীলোক।—শুনেছিলাম বড় বাজারে থাকেন। ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "চলুন একবার বড় বাজারে যাই, মেয়েটীকে খুঁজে বের করতে হ'বে।"

তখন ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু বড় বাজারে নবকুমার বাবুদের উদ্দেশে চলিলেন। সেখানে অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "নবকুমার বসুর বাড়ী কোনটা?" সে লোকটী বলিল "হ্যাঁ! নবকুমার বসু এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর এখানে নাই। নবকুমার বসুর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী আর একটী মেয়ে কিছুদিন এখানকার একটা বাড়ীতে ছিলেন। তারপর একদিন নবকুমার বাবুর

স্ত্রীর ছাত থেকে পড়ে একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে, এখানকার হাসপাতালে তাঁকে লইয়া যায়। তিনি গেলে মেয়েটী কিছুদিন বাড়ীতে একলা ছিল। কিন্তু নবকুমার বাবুর স্ত্রী আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁর কি হয়েছে জানিনা। তার পর কিছু দিন পরে বাড়ীওয়ালা মেয়েটীকে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিল। ঘরের জিনিষ পত্র বেচিয়া লইল। তার পর মেয়েটীর যে কি দশা হয়েছে তা আমি বলিতে পারি না।"

রাজকুমার বাবু।—মহাশয়! মেয়েটীর নাম কি ছিল, বলিতে পারেন?

ভদ্রলোক।—উর্মিলা না কি ছিল আমার ঠিক মনে নাই।

এই কথা শুনিয়া দুজনেই নিরাশ হইলেন। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুকে বলিলেন "সেই হাসপাতালে গিয়া নবকুমার বাবুর স্ত্রীর খোঁজ করিতে হবে। আজ তবে বাড়ী ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাজকুমার বাবু সেই দিনই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দশম অধ্যায়

রাজকুমার বাবু বাড়ীতে গিয়াই স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি ছোট বেলায় অজিতের মার সহিত এক ক্লাসে পড়িয়া ছিলেন, ইন্দুরেখা দেবী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বাস্তবিকই কিরণমালা অত্যন্ত ভালমানুষ এমন প্রফুল্ল, এমন সরল, এমন বুদ্ধিমতী ও মিশুকে—তাঁহার এই সমস্ত গুণ থাকাতে ক্লাসের সকল মেয়েই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

সমপাঠী—ননদিনীর পুত্র—অজিত ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। বিরহের পর আর তাঁহার সহিত দেখা না হোক তাঁর সন্তানকে তো পাইয়াছেন এই তে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এ সব কাণ্ড তাঁহার নিকট ভেল্কীর মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন "তবে কি অজিত আমাদের আপনার ধন! চল অজিতকে বলিগে?" এই বলিয়া তিনি অজিতকে ডাকিয়া সব বলিলেন ; অজিত অবাক হইয়া সব শুনিল। অজিত এমন অবাক তাহার জীবনে হয় নাই, তার কাছে সব ঠিক স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া কোলে টানিয়া লইয়া আদরে মুখচুম্বন করিবামাত্র অজিত তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ইন্দুরেখা দেবীও ধীরে ধীরে আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আজিত ধন কেঁদনা। তুমি আমাদের আপনার। এই তোমার আপনার বাড়ী। আমি তোমার মামীমা। ঐ তোমার মামা। কাঁদ কেন বাবা। চুপ কর কেঁদ না।" অজিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আজ থেকে তবে তোমায় মামীমা বলিয়া ডাকিব। মামা বাবু আমার দিদী কি বেঁচে আছে? আমার বোন আছে? আমার সকলেই আছেন! এসব কি হ'ল? তোমরা যখন আমাকে নিয়ে এসেছিলে তখন কি তোমরা জানতে যে আমি তোমাদের আপনার ছেলে? আর আমি জানিতাম না যে তোমরা আমার আপন।"

রাজকুমার বাবু।—আশ্চর্য মিলন! ইন্দু আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের আপনার ধনকে আমাদের হাতে দিলেন—এই বলিয়া রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। অজিত অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপরে রাজকুমার বাবু অজিতকে বলিলেন আজ তুমি পূর্ণ নাম পেলে। তোমার নাম অজিত কুমার রায়। তোমার

বাবার নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। তোমার মার নাম কিরণমালা। তোমার বাপ মা এখন আর এ জগতে নাই। তাঁরা পরকালে ঈশ্বরের কাছে—সুখে আছেন। তোমার বাবা যখন তোমার মাকে লইয়া চলিয়া যান তখন তোমরা হও নাই। হবার পরও তোমার বাপ মার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। তোমার বাবাকে আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। দেখিতেও খুব সুন্দর ছিলেন। তোমার মুখ খানিকটা তোমার বাবার মত হয়েছে। তোমার মা এমন ভাল মেয়ে ছিলেন ; দেখতে বড়ই সুন্দর ছিলেন। তোমার চোখ দুটী তোমার মার মত—আর কিছুই প্রায় হয় নাই। আমি তাকে বড় ভালবাসিতাম। কিরণ আমার চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল ; কিরণকে শ্রীশ বাবু বাড়ী থেকে নিয়ে গেলে আমি কত কাঁদিয়াছিলাম। কত চিঠি লিখিয়াছিলাম কিন্তু একখানারও উত্তর পাই নাই। বোধ হয় চিঠি পায় নাই। কিরণ আমার নিকট তিন চারখানা চিঠি লিখিয়াছিল। একখানাতে বাড়ীর জন্য মন কেমন করে লিখিয়াছিল ; আর একখানা উর্মিলা হবার পর লিখেছিল, তাতে—তারা অনেক দূর দেশে আছে, ভয়ানক কষ্ট হয়, শ্রীশ বাবু চাকরী করেন তাই লিখিয়াছিল, আর একখানা তোমার বাবা মারা গেলে, শেষ খানা পড়িয়া আমি যে কত কাঁদিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমি তোমাদের আনিবার জন্য বাড়ী গিয়া দেখি তোমার মা সে বাড়ীতে নাই। তার পর আর কোন খবর পাই নাই। বাবাকেও কিরণ চিঠি লিখিয়াছিল, বাবা তাহার উত্তর দিয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু কিরণ বাবার আদুরে মেয়ে ছিল। আমরা কেমন দুই ভাই বোন ছিলাম। আমরা পুরান বাড়ী থেকে উঠে আসবার পর আর চিঠি পাই নাই। শ্রীশ বাবুকে বাবা ছেলে বেলা থেকেই ভালবাসিতেন। তাই তার বড় অভিমান হয়েছিল। যদি কিরণ অত দূর দেশে গিয়া না পড়িত। তাহলে বোধ হয় আবার বাড়ীতে আসিত। সে কত দেশ বেড়াইয়াছে, কত বিপদে পড়িয়াছে তাহা ঠিক নাই। অজিত! আয় তোকে বুকে করে নিই, তুই আমার কিরণের ধন! তুই আমারও প্রাণের ধন! কিরণ! আমার কিরণ! তোমায় ছেলেবেলায় কত বকিয়াছি কত মারিয়াছি। তুমি 'দাদা! দাদা!' করে পাগল হতে। আমার কাছে মার খেয়ে কখনও বাবাকে বলে দাও নাই। আমাকে বাবা বকলে তুমি বাবাকে বল্‌তে। 'বাবা! তোমার দুটি পায়ে পড়েছি, দাদাকে বকো না, দাদা আর করবে না।' তুমি এমন বোন ছিলে। তোমার সঙ্গে আমার আর এ পৃথিবীতে দেখা হল না। কবে সেদিন হবে যে দিন পরকালে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

—এই বলিয়া রাজকুমার বাবু অজিতকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অজিৎ মামা বাবু ও মামীমাকে কাঁদিতে দেখিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। কি চমৎকার দৃশ্য! কি সুন্দর মিলন।

—অজিৎ রাজকুমার বাবুর গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মামা বাবু! মা কি আমার স্বর্গে আছেন? আমিও কি সেখানে যাব।"

রাজকুমার বাবু।—হ্যাঁ আমরা সকলেই একদিন সেখানে যাব।

তারপর বিকালে রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ! বইখানা কি এখনই অজিৎকে দিব।"

ইন্দুরেখা দেবী।—হ্যাঁ দেবে বইকি। এখনই তাকে দেওয়া যাক।

তাঁহারা অজিৎকে ডাকিয়া বলিলেন "অজিৎ! এই নাও। এখানা তোমার দাদা মহাশয়ের বই তোমার মায়ের বই, এখন ইহা তোমার ও তোমার দিদীর বই। তোমার মা এখানা তোমাকে

আর তোমার দিদীকে দিয়া গিয়াছেন।” অজিৎ বই খানাকে লইয়া বার বার চুম্বন করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল ; বই খানা খুলিয়া দেখে তাহাতে লেখা রয়েছে “প্রাণের অজিৎ ও উর্মিলাকে মায়ের ভালবাসার উপহার। কিরণমালা রায়।” এই লেখাটা পড়িয়া তার মাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে, মাকে ত আর দেখিবার উপায় নাই।

রাজকুমার বাবু কিছুদিনের মধ্যে ইটের চকে যাইবেন ঠিক করিলেন। অজিৎ তাঁহার যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, “মেসো মহাশয়! না-না মামা বাবু! আমি যাব। আমি দিদীকে খুঁজিতে যাব।” (অজিৎ প্রায়ই ভুলিয়া মেসো মহাশয় মাসীমা বলিয়া ফেলিত) অজিতের যাবার নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া রাজকুমার বাবু তাহাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন।’ তখন অজিতের আহ্লাদ দেখে কে? সে হাতে তালি দিতে দিতে নাচিতে নাচিতে, বাগানে ছুটিয়া গেল। যাইতে যাইতে দেখে যে বুড়ো চাকর কালাচাঁদ সেই দিকে আসছে। কালাচাঁদ অজিৎকে নাচিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল দাদাবাবু! তোমার আজ এত আহ্লাদ কেন?

অজিৎ।—কালাচাঁদ! আহ্লাদ হবে না? আমি মামা বাবুর সঙ্গে ইটের চকে যাব। তুমি আমার গাছগুলোতে জল দিয়ো। যত্ন করো বুঝেছ?

কালাচাঁদ গাছে জল দিতে স্বীকৃত হইল। তখন অজিৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যাইবার জন্য সব জিনিষ ঠিক করিতে লাগিল। পড়িবার বই লইল। তাহার খেলিবার যত জিনিষ লইল। রাজার কাছে বিদায় লইল। অজিৎ রাজার গলা জড়াইয়া বলিল “রাজা ভাই! ইটের চকে যাব। আমার কেমন মজা হবে। তুমি থাকলে—মামীমা একলাটী রহিলেন, তার কাছে থেকো। আহা! বেচারি মামীমা একলা থাকিবেন। আমি মামা বাবু দুজনেই চলে যাব। কেবল তুমি আর মামীমা থাকবে। তুমি আমার ছোট ভাই। তুই যাদু! তুই সোনা! তুই রাজাধন! রাজা সব বুঝিল! আহ্লাদে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অজিতের কোলে লাফাইয়া উঠিল।

অজিৎ বুঝিল রাজা সম্মত হইয়াছে। এই প্রকারে অজিৎ রাজার সহিত আলাপ করিতেছে এমন সময় ইন্দুরেখা দেবী কি কাজে সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অজিৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া চুম খাইয়া বলিল “মামীমা! আমি ইটের চকে চলে গেলে, তোমায় একলা থাক্‌তে হবে না ; রাজা তোমার কাছে থাকবে। আমি শীঘ্রই মামা বাবুর সাথে ফিরিয়া আসিব। আমি এখন যাবার ঠিক করিতেছি।”

ইন্দুরেখা দেবী অজিৎকে দেখাইবার জন্য মুখখানি ভার করিয়া কহিলেন, “আর যাও। তুমি আমায় ফেলে চল্লে। আমি কি করে একলা থাকব! অজিতের মায়া দয়া নেই। রাজাকে লইয়া কি করিব? রাজা কি আমার অজার মত?

অজিৎ মামীমার মুখ ভার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল “তুমি যদি কাঁদ আর দুঃখ কর তাহলে আমি আর যাব না তোমার কাছে থাকব।” এই কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা দেবী হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন “না! না! তুমি যেও। রাজা আমার কাছে থাকবে। আমি যাই, কাজ ফেলে এসেছি। তুমি আপনার কাজ কর। পড়া করে রাখ, দুপুর বেলা পড়া নেব।” এই বলিয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজকুমার বাবু অজিৎকে সঙ্গে করিয়া ইটের চকে গেলেন। ইন্দুরেখা দেবী কিছুদিনের জন্য একলা বাড়ীতে রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়

অজিৎ হাসিতে হাসিতে ললিত বাবুর বাড়ী নামিল। আজ তাহার আহ্লাদ দেখে কে? "মেনাকে দেখিব", "রামদাসকে দেখিব", "দিদীমাকে দেখিব" এই ভাবিয়াই সে আহ্লাদে আটখানা। অজিৎকে মেনাদের বাড়ী রাখিয়া রাজকুমার বাবু ও ললিত বাবু আবার উর্মিলার সন্ধানে বাহির হইলেন। হাসপাতালে গিয়া দেখেন তাহাদের খাতায় লেখা রহিয়াছে তিনি রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় যে গেলেন তার আর ঠিক নেই। আহা! তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইলেন না। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুর উপর ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু অজিৎ কোন মতে যাইতে চাহিল না। সে বলিল, "আমি দিদীকে লইয়া একসঙ্গে বাড়ী যাব, মামা বাবু! আমি এখন যাব না।"

সুরমা দেবীও বলিলেন, "থাক! বিনয়ের (ললিত বাবুর ছেলের) সঙ্গে খেলা করিবে। কিছুদিনের জন্য থাকিতে ইচ্ছা হয়েছে থাক।" রাজকুমার বাবু কাজেই অজিৎকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ যায় নাই বলিয়া ইন্দুরেখা দেবী কিছু কষ্ট পাইলেন। অজিৎ এখানে প্রত্যহ মেনার কাছে যায়। কত খেলা করে। কত বই পড়ে, রামদাসের কাছে যায়। দিদীমাও ফাঁক যান না। এই কদিন অজিতের খুব আনন্দে কাটিয়া গেল।

একদিন অজিৎ রামদাসের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে এমন সময় কে একটী মেয়ে ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রামদাস বলিয়া উঠিল "কেগা!" উমু নাকি?" বালিকা! হ্যাঁ আমি এই দোকানে খাবার কিনতে যাচ্ছি।—

তাহাকে দেখিয়া অজিৎ বলিয়া উঠিল "ও কে, কার মেয়ে রামদাস"। রামদাস। আহা! বাবা! ওর কেউ নাই। ওর ত্রিসংসারে কেউ নাই। মেয়েটীর কেউ নাই। মেয়েটী বড় ভাল।

অজিৎ।—ও কার কাছে থাকে। এতটুকু মেয়ে একলা থাকে? ওর ভয় করে না?

রামদাস।—আর কেইবা ওর কাছে থাকবে? ও চিরকাল কি একলা আছে? এতদিন এর আগে ও নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। তিনি মারা যাবার পর নবকুমার বাবুর স্ত্রী একদিন ছাত থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তিনি আর ফিরে আসেন নাই। তারপর বাড়ীওয়ালা বেচারীকে তাড়াইয়া দিল। তারপর হেথায় হোথায়, পথে ঘাটে, এর বাড়ী তার দুয়ারে এমনি করে বাছা মানুষ হচ্ছে। তুই বাছা যেমন কষ্ট পেতিস, উমুও তেমনি কষ্ট পায়। ভগবান তোর শুভ দিন এনে দিলেন, তোর কপাল ফিরে গেল। এর আর কি তা হবে! এর আর কি কপাল ফিরবে! চিরটাকাল এই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে এ প্রাণটা যাবে। আহা! কচি প্রাণে কি এতই সয়?

অজিৎ, কি রামদাস? তুমি বল্লে এ কার কাছে ছিল না? তার নাম কি? বলনা?

রামদাস।—নবকুমার বাবু। তা শোনবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

অজিৎ।—কি বল্লে? নবকুমার বাবু? (বালিকার প্রতি) তোমার নাম কি?

বালিকা আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বলিল "আমার নাম উর্মিলা।" অজিৎ "উর্মিলা!! উর্মিলা!!! দাঁড়াও দাঁড়াও আমি আসছি।

এই বলিয়া সে প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ী গেল। তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ললিত বাবু সুরমা দেবী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অজিৎ, কি হয়েছে? অত ছুটে আসছ

কেন?" অজিৎ। মামাবাবু! মামাবাবু!! দিদী! দিদীকে পেয়েছি। আসুন! আসুন! তাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সে নিশ্চয় আমার দিদী। তার নাম উর্মিলা। সে নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। সব মিলছে। সব মিলেছে। মামা বাবুকে টেলিগ্রাম করুন। দিদীকে পাওয়া গিয়াছে।

ললিত বাবু।—থাম। থাম! অত ব্যস্ত কেন? ঠাণ্ডা হও, তারপর বলিও। কাকে দিদী করে এলে তার ঠিক নাই।

অজিৎ।—কাকেও দিদী করি নাই। দিদীকেই দিদী করিয়াছি। সে আমার দিদী। সে আমার দিদী!

সুরমা দেবী।—আচ্ছা তোমার মামা বাবু যাচ্ছেন, যাও না গো। ওর সঙ্গে যাও। আহা! বেচারা অত করে ছুটে এসেছে। সত্য সত্যই বোধ হয় উর্মিলাকে পাওয়া গেল।'

ললিত বাবু।—তুমি কি পাগল! আমি কি যাব না বলেছি। আমি এই যাচ্ছি, চল অজিৎ! যাই দেখিগে তোমার দিদী কেমন।

অজিৎ ছুটাছুটী রাস্তা দিয়া চলিল। আজ তার সঙ্গে চলে সাধ্য কার?

ললিত বাবু বার বার বলছেন "অজিৎ! অজিৎ! একটু আস্তে অজিতের কি সে কথা আর কানে যায়। ললিত বাবুর আস্তে যেতে বলা অন্যায়। বোধ হয় তিনি ওর অবস্থায় পড়লে ওর চাইতে তাড়াতাড়ি ছোটাছুটি যাইতেন। যাহোক ঝড়ের মত, হাঁপাইতে, হাঁপাইতে, অজিৎ রামদাসের ছোট কুঁড়েঘর খানিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ললিত বাবু ও মিনিট কতক পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজিৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল 'এই! এই! এই দেখুন! এই দেখুন!

ললিত বাবু।—অত ব্যস্ত কেন? দাঁড়াও। বেচারী ভয় পাবে যে? কি গো বাছা! তোমার নাম কি? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এখন কোথায় আছ সব বলতো?

উর্মিলা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সব কথা বলিল। যখন উর্মিলা ললিত বাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তখন অজিৎ আগ্রহের সঙ্গে কানপাতিয়া সব কথাগুলি শুনিতেছিল। আর এক এক বার আহ্লাদে অস্থির হইয়া যাইতেছিল। এখন উর্মিলা অজিতের কে পাঠক পাঠিকা তোমরা কি তাহা শুনিতে চাও? তবে শোন। উর্মিলা আর কেহই নহে অজিতের দিদী। অজিৎ একথা জানিতে পারিয়া কি করিল, তাহাও বোধ হয় জানিবার জন্য তোমরা উৎসুক হইয়াছ। তোমরা হলে কি করিতে ভাব দেখি। যাহা সকলেই করে থাকে অজিৎ তাহাই করিল। অজিৎ ছুটিয়া গিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে বার বার চুম্বন করিল। উর্মিলা অবাক হইল রহিল। আজ আর তার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। আজ তার মন বিশ্বাস করিতে চায় না, যে তাহার শুভ দিন আসিয়াছে। আজ তার দুটি চোখ দিয়া কে জানে কেন দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।—উঃ দুঃখিনী কি এত সুখ সহ্য করিতে পারে? কি ঘোর পরিবর্তন! সে এক দৃষ্টে ভাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অজিৎ যে এত আদর করিল, তার আর কি প্রতিশোধ দিবে? তার প্রাণ আজ পরিপূর্ণ। আজ তার পৃথিবীতে আপনার লোক হইল। উর্মিলা তোমার ও প্রাণখানি কি এত সহ্য করিতে পারিবে? উর্মিলার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একি সামান্য সুখের কথা যে এমন সুন্দর ছেলেটী তাহার ভাই। উর্মিলা অধীর হইয়া মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য

আর একটীও কথা সরিল না। পরে উর্ম্মিলা কিছু সুস্থির হইলে ভাইকে লইয়া আপন ঘর দেখাইল। কত দুঃখের কথা বলিল।

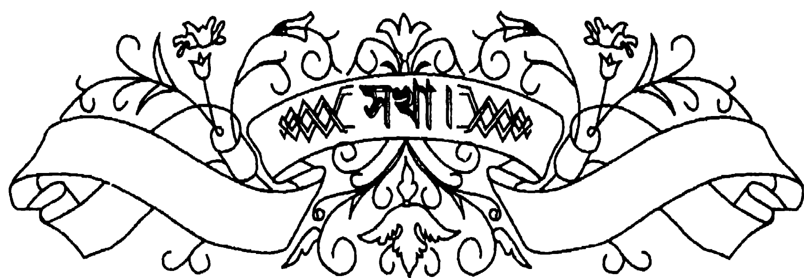
তৎক্ষণাৎ ললিত বাবু গিয়াই রাজকুমার বাবুর কাছে টেলিগ্রাম করিলেন। রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সেই দিনই ইটের চকে আসিলেন। তারা উর্ম্মিলাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া উর্ম্মিলাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কি আশ্চর্য্য মিলন! কি সুন্দর দৃশ্য!—আজ হতে উর্ম্মিলার সুখের দিন আসিল। মামা মামীর আদরে ভাইয়ের স্নেহে অতি সুখে তাহার দিন যাইতে লাগিল। জ্ঞান, ধর্ম্মে, গুণে উর্ম্মিলা শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিল।

অজিতের সুখের দিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। উর্ম্মিলারও সুখের দিন আসিল, দয়াময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কাহারও চিরদিন কি দুঃখে যায়?

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯০-৯১। ২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৯৯-১০৩। ২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১১৯-১২১। ২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২১-১২২। ২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৪১-১৪২। ২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৪২-১৪৩। ২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ ১৫৬-১৫৭। ২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১৫৭-১৫৯। ২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৭০-১৭২। ২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৮৩-১৮৮।





গল্প/নিবন্ধ/জীবনী

আমাদের দেশের বড়লোক

প্রমদাচরণ সেন

দ্বারকানাথ ঠাকুর

তবৎসর আমরা অনেক সাহেবের কথা লিখিয়াছি, কারণ তাঁহাদের চরিত্রে এমন গুণ ছিল, যাহা বালকবালিকাদিগের থাকা উচিত। কিন্তু সাহেবদের কথা লিখিয়াছি বলিয়া যে আমাদের দেশে বড়লোক নাই, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। সকল দেশেই ভাল লোক আছেন ; পরমেশ্বর যে এক দেশেই ভাললোকদের বাড়ী করিয়া দিয়াছেন সে দেশের বাহিরে যে আর ভাললোক হইতে পারে না, একথা মনে করা বড় অন্যায়। কেন? আমাদের দেশে কি ভাল লোক নাই? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা অতি গরিব অবস্থা হইতে কেবল নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের যত্নে ও পরিশ্রমে, নিজেদের ভাল চরিত্রের গুণে বড় লোক হইয়াছেন? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা যে কাজটীকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া সেই কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন? আমাদের দেশে কি এমন লোক নাই যাঁহারা বড় লোকের ঘরে জন্মিয়া সৎকার্য করিবার জন্য নিজেদের টাকা কড়ি দুই হাতে দেশময় ছড়াইয়া দিতেছেন? আমাদের দেশে অনেক ভাল লোক, অনেক বড় লোক আছেন। তবে সাহেবদের দেশে যেমন একজন বড়লোক হইলে দশজনে তাহার জীবনচরিত লেখে, সে কখন কোন্ কাজটী করিল, কখন কি কথা বলিল, তাহা সাবধানে টুকিয়া রাখে, আমাদের দেশে সেরূপ নাই। তাই আমাদের দেশের অনেক ভাল লোকের কথা সময়ে মুছিয়া গিয়াছে, অথবা কেবল দুই চারিজন সেকেলে লোকের মুখেই শুনা যায়।

আমরা গতবৎসর বলিয়াছি, আমাদের দেশের বড়লোকদের জীবন চরিত লিখিব, তাই আমরা আজ একজন বড়লোকের জীবনের একটা গল্প বলিতেছি। লম্বা চৌড়া জীবনচরিত লিখিতে আমরা ইচ্ছা করি না, কারণ যে সকল কাজে কোন লোকের চরিত্রের গুণ বাহির হয় সেই সকল কাজের কথা ছাড়া তিনি কেমন করিয়া চলিতেন, দেখিতে কিরূপ ছিলেন, কি দিয়া ভাত খাইতেন, এ সকল কথা জানিয়া আমাদের কি প্রয়োজন?

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাদের সময়ে কলিকাতার একজন বড়লোক ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস আছে টাকায় বড়লোক হইলেই বুঝি স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে ছোট লোক হইতে হয়। অনেককে দেখিতে পাই তাঁহারা বড়লোকের নাম শুনিলেই "বাপরে! বড়লোক!" বলিয়া চমকিয়া উঠেন, সাপের নিকট যাইতে হইলে মানুষ যেমন ভয়ে ভয়ে যায়, অনেকে বড়-লোকের নিকট যাইতে হইলে সেইরূপ ভয়ে ভয়ে যান, দরজায় ভোজপুরী দ্বারবান পাহারা দিতেছে, নোংরা কাপড় দেখিলে এখনই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে, এই ভয়ে অনেক লোক সাধ্য থাকিতে বড়লোকের বাড়ীর ছায়াতে যান না। কিন্তু আমরা জানি এরূপ বড়লোক অনেক আছেন, যাঁহারা টাকা পাইয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠেন নাই, যাঁহারা অত্যন্ত দয়ার সহিত দুঃখীকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

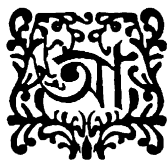
দ্বারকানাথ ঠাকুর এইরূপ বড়লোকদিগের মধ্যে একজন। ইহাঁর মন কত উঁচু ছিল, একটী

গল্প বলিলেই বুঝা যাইবে। একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর এই কলিকাতায় অনেক টাকার একটী বাড়ী কিনিয়া ছিলেন।—বাড়ীটী ইহার পূর্বে যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা পাওনা টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়া বাড়ীটা বিক্রি হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই বাড়ী দখল করিতে অর্থাৎ নিজের হাতে আনিতে গেলেন। তিনি যখন সেই বাড়ীতে গেলেন, তখন গিয়া শুনিলেন উপরে জানালায় একটী বালক তাহার মায়ের সহিত কথা কহিতেছে ; মাকে মুখ ভার করিয়া থাকিতে দেখিয়া বালক বলিতেছে, "কিমা! তুমি অমন করে আছ কেন?" মা বলিলেন "বাবা! আমাদিগের এই বাড়ী দেনার জন্য বিক্রি হয়ে গেছে ; যিনি কিনেছেন তিনি আমাদের তুলে দেবেন।" বালক মায়ের দুঃখের কথা শুনিয়া বলিল, "কোথায় যাব মা, তা হলে?" মা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "বাছা! ভগবান যেখানে রাখের সেইখানে থাকিব।" বালক আর কিছু বলিল না।—যাঁহার বাড়ী, তিনি বাঁচিয়া নাই, তাঁহার বিধবা স্ত্রী একটী ছেলেকে লইয়া এমন কষ্টে পড়িয়াছেন, শুনিয়া দয়াবান দ্বারকানাথের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বালকটীকে তাঁহার নিকটে আনাইলেন। তাহার পর তাহাকে কোলে লইয়া মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল্‌ছিলে? বাবা!" বালক একটু থত মত খাইয়া বলিল। দ্বারকানাথ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "না! না! তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। এটা তোমাদেরই বাড়ী।" এই বলিয়া সেই বালকের হাতে কিছু টাকা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই তিনি একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই বালককে বাড়ীটী লিখিয়া দিলেন। বলতো কত উচু মনের কাজ?

২ : ১ : জানুযাবী ১৮৮৪, পৃ. ১০-১১।

কেশবচন্দ্র সেন



মরা ছেলেবেলা দেখিতাম যে, যে সকল লোক সাধারণ লোকের মত নয়, খাওয়া পরার ঠিক নাই, যে পোষাক দাও তাই পরে, মাছ মাংস ছাড়া আর যা দাও, তাই খায়, নেহাত ভাল মানুষ অথচ কোন চলিত কাজ করিতে লেলেই 'ফোঁষ' করিয়া উঠে, মুর্খ বামনপণ্ডিতদের মানেনা, চলিত 'আচার বিচার' গ্রাহ্য করে না, মাঝে মাঝে চোখ বোজে, আর যাতে মন নাই এমন কাজ করিতে বলিলেই আগুণ হইয়া উঠে, এই রকম লোককে সকলেই বলিত "এঃ! একেবারে মাটী হয়ে গেছে। কেশবস্যানের দলে ঢুকেছে।" আমরা তখন ভাবিতাম, 'কেশব স্যানে'র দলে যাওয়া বুঝি একটা সখের কাজ। যেখানে যাত্রার দল, থিয়েটারের দল, বা কোন নেশার দল, সেইরূপ কেশব বাবুর 'দল'। কেশব বাবুর দলে গেলে বড় একটা খারাপ কাজ হইল, মনে ভাবিতাম। এইরূপ ভাবিতাম বটে, কিন্তু দেখিতাম 'কেশব স্যানের' দলে যারা যাইত, তাদের এদিকে "কাছা কোচার" ঠিক নাই বটে, কিন্তু দেশের সমস্ত ভাল কাজে প্রাণের টান, যে ভাল কাজে লাগাইয়া দাও, আগুণের মত পড়িয়া, দেখিতে দেখিতে কাজ শেষ করিয়া তোলে। 'দেবতা ব্রাহ্মণ' আচার ব্যবহার মানে না বটে, কিন্তু প্রাণ দিয়ে দেশের জন্য খাটে, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, এবং গুরুজনকে মান্য করিয়া চলে। একি আশ্চর্য! কেশব বাবুর দলে গিয়া একি হয়? আচার ব্যবহার, 'রকম সকম,' চলাফেরা, এ কেমন হইয়া যায় কেন? ভাবিলাম

কেশব বাবু বুঝি কি ভেলকী করে তাঁহার দলের লোকদিগকে বাঁধিয়া রাখেন, তাঁর যাদুমন্ত্রে বুঝি লোকগুলা বিগড়ে যায়!

বড় হইলাম। কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারি, এমন বয়স হইল। একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গেলাম, একদিন শুনিয়া আর এক দিন শুনিতে ইচ্ছা হইল, ক্রমে আর একদিন, এই রূপে অনেক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম ; তাঁহার অনেক ছোট খাট উপদেশও শুনিলাম। তখন বুঝিলাম কেশব বাবু কি যাদু করে! তখন দেখিলাম কেশব বাবুর ভেলকী করার শক্তি আছে বটে। আমরা কে? কোথা হইতে এসেছি? কোথায় যাব? আমাদের ঈশ্বর কে? তিনি কিরূপ? তিনি আমাদের কত দয়া করেন? আমরা কত পাপী? আমরা আমাদের দেশের ও সকল লোকের নিকট কি কি কাজ করিতে বাধ্য আছি?— এই সকল কথা কেশব বাবুর কাছে এমন করিয়া শুনিলাম, শুনিয়া এমন করিয়া বুঝিলাম, যে আর মন থেকে নাড়িতে পারিলাম না, আমি কেশব বাবুর গুণের কাছে, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের কাছে যেন চিরদিনের মত কেনা হইয়া পড়িলাম।



আজ আর কেশব বাবু নাই। পৃথিবীতে তাঁহার শরীরটী নাই, কিন্তু তিনি আমাদের মনে চির-কাল থাকিবেন। কেশব বাবুর অনেক মতের সঙ্গে আমাদের মত মেলে না, তবুও তাঁকে এত ভক্তি করি কেন? যে কেশব বাবু সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য পূজা পাইয়াছেন, স্বয়ং মহারাণী যে কেশব বাবুর সহিত এক যায়গায় বসিয়া আহার করিয়া সুখী হইয়াছেন, বড় বড় রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, লাট বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, দেশ দেশান্তর হতে বেড়াতে এসে যাঁর সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ হয়ে গিয়াছেন, তাঁকে ভক্তি করি কেন, একথা কি আর বলিতে হইবে? আমাদের দেশে তাঁর মত লোক একশত বছরের মধ্যে হয় নাই, এর পরে যে দুই একশ বছরের মধ্যে হ'বে, তাও বোধ হয় না। এখন কথা এই, কেশব বাবু কেমন করে এত বড় লোক হ'লেন? তাহাই বলিতেছি, বালকবালিকাগণ। মনোযোগ দিয়া শোন :—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ১৯এ নভেম্বর কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মেন, তাহাতে যেমন লক্ষ্মীর দৃষ্টি ছিল, তেমনি সরস্বতীর ও দয়া ছিল। কেশব বাবুর পিতা প্যারীমোহন সেন দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতিতেও তেমনি অলঙ্কৃত ছিলেন। কেশব বাবুর মা আজিও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার গুণের কথা এখন বলা ভাল নয়, তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেশব বাবু মরিবার সময় মায়ের পায়ের ধুলো লইয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার মত মা সকলের হয় না। আমি তোমারই গুণগুলি পাইয়া মানুষ হইয়াছি।" এমন বাপমায়ের যে ছেলে সে কেন ভাল হইবে না? কেশববাবু ছেলেবেলা ভক্তের মত সাজিতে ভাল বাসিতেন অর্থাৎ সকাল সকাল স্নান করিয়া, গরদের কাপড় পরিয়া, সমুদায় শরীরে চন্দন মাখিতেন। কি বাড়ীতে, কি পাঠশালে,

কেশব বাবু নূতন কিছু না করিয়া কোথাও ছাড়িতেন না। অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন ঘুমাইয়া থাকে, কোন কিছু জানিলে বা কোন কিছু পড়িলে, তাহারা যেমন কেবল শুনিয়াই বা পড়িয়াই চুপ করিয়া থাকে, নূতন কিছু ভাবিবার, জানিবার যা শিখিবার বিষয় খুঁজিয়া পায় না, কেশব বাবুর বুদ্ধি সেরূপ ছিল না। তিনি সর্বদাই নূতন বুদ্ধি খাটাইয়া নূতন ফিকির, নূতন কার্য, নূতন পথ সকল বাহির করিতেন, এবং এই গুণেই সমবয়সী ছেলের মহলে রাজার মত মান পাইতেন। তোমার আমার বুদ্ধির চালনা হয় না, কাজেই অকেজো অস্ত্রের মত মরিচা ধরিয়া যায়, আর আমরা বড়লোক হইতে পারি না, কিন্তু কেশব বাবুর বুদ্ধি সর্বদাই ঘুরিত, সর্বদাই কাজে লাগিত, তাই তিনি পরজীবনে বড়লোক হইতে পারিয়া ছিলেন।

একবার টাউনহলে এক সাহেব বাজি দেখাইতে আসিয়াছিল ; কেশব বাবু সেই বাজি দেখিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া সাহেব সাজিয়া সেই বাজিগুলি তিনি নিজে করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনি সাহেবী সুরে কথা বলিলেন যে দুজন সাহেব যাঁহারা কেশব বাবুর বাজি দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা পর্যন্ত মনে করিয়াছিলেন যে সত্যসত্যই একজন সাহেব বাজি দেখাইতেছে। কেবল বাজি দেখান লইয়া নহে, নাটক অভিনয়েও তিনি খুব পরিপক্ক ছিলেন। বাঙ্গালী বালক ইংরাজী নাটক বুঝিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? এতদ্ভিন্ন প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া উদ্‌যোগ করিয়া কেশববাবু "বিধবা বিবাহ নাটক" নামে একখানি নাটক অভিনয় করেন। বিধবাদিগের দুঃখ লোককে জানাইবার জন্যই এই অভিনয়টী করা হইয়াছিল। কেশব বাবুর একজন জীবনচরিত লেখক বলেন, এই অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল, যে দেখিয়াছে সেই বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে। বলিতে কি,—সেই দিন হইতেই বিধবার জন্য দুটো কথা কহিবার লোক যুটিয়াছে।

কেশববাবু যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন প্রত্যেক বারেই পুরস্কার পাইতেন। তাঁহার এমন প্রকৃতি ছিল, তিনি যাহা নূতন শিখিতেন, দশজনকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্কুলে যাহা শিখিতেন, বাড়ীর মেয়েদের, পাড়ার ছেলেদের তাহা শিখাইতেন। যে কাজটী ভাল বলিয়া মনে হইত, তিনি তাহা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। দরিদ্রদিগের জন্য রাত্রিতে স্কুল করিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরকাল কেশব বাবু গরিবের ছেলেদিগকে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু শেষে নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে স্কুলটী থাকিল না। ইহা ছাড়া তিনি ধর্ম ও নীতির আলোচনার জন্য গুডউইল ফ্রে টার্ণিটী বা "সদিচ্ছা ভ্রাতৃবৃন্দ" নামে একটা সভা স্থাপন করেন, এবং ভাল লিখিতে পড়িতে এবং বলিতে শিক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটী বা "ব্রিটিশ ভারত সমাজ" নামে একটা সভা সংস্থাপন করেন। এই সকল কাজ করিয়া, অনেক পড়িয়া, অনেক ভাবিয়া ধর্মের দিকে তাঁহার মন গেল। বাড়ীর কর্তাদের কথায় চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু চাকরী করিয়া যে সময়টুকু পাইতেন, সেই "আফীসে" বসিয়াই, সেই সময়টুকু নানারূপ ভালকথা লিখিয়া কাটাইতেন। এই সকল উপদেশ তিনি ছাপাইয়া সকলকে দিতেন ; লোকে তাঁহার নূতন রকমের মত দেখিয়া আশ্চর্য হইত। তাঁহার আফীসের বড় সাহেবেরা কেশব বাবুর সহিত আলাপ করিয়া দেখিতেন, তাঁহার মন ধর্মের জন্য আগুণের মত 'হূ হূ' করিয়া জ্বলিতেছে। কেশব বাবু কর্ম ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী আসিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সম্প্রতি বাড়ীর লোকের তাড়নায় স্ত্রীকে লইয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

কেশব বাবুর বাল্য জীবন এইখানেই একরূপ শেষ হইল এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার বড়লোক হইবার সূচনা হইল। ইহাঁর পরজীবনের কথা আমরা আর বলিব না, কেবল এই বলি যে, যে ব্যক্তি—

(১) সর্বদা আপনার বুদ্ধি ঘুরাইয়া কাজ করে, পরের মুখ চায় না,

(২) যে কার্য ভাল বলিয়া বুঝে তাহাই করে, কাহার ও ভয়ে টলে না,

(৩) ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া ধর্মকে সত্য বলিয়া মনে করে।

সে নিশ্চয়ই বড়লোক হইতে পারে। লোকে তাহাকে কেশব বাবুর মতন দেখুক আর নাই দেখুক, ঈশ্বরের চক্ষে সে যে বড়, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

২ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১৬-২৮।

আমাদের দেশের বড়লোক

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়


জ কালি "ব্রাহ্ম" নামে যে একদল লোক ধর্ম লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছে, এ দেশে, বিলাতে, আমেরিকায়, সর্বত্র যে দরে লোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের গোড়া কে জান? আগে যে আমাদের দেশের বিধবা স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মৃত স্বামীর চিতাতে পুড়িয়া মরিতেন, সেই ভয়ানক "সহমরণ" প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া আমাদের দেশের মহা উপকার করিয়া গিয়াছেন কে জান? আর এই যে আজ কাল হাজার হাজার ছেলে এন্ট্রান্স্, এলে, বিয়ে, এমে সব পাশ হইতেছে, আর ইংরাজী লেখা পড়া যে চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার গোড়া কে জান?—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। অনেক বৎসর গত হইল, অনেক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত বড়লোক আমাদের দেশে জন্মে না। অদ্য আমরা তাঁহার দুটী চারিটী কথা লিখিব, বালক বন্ধুগণ! মন দিয়া পড় এবং বুঝিয়া দেখ, তোমরাও মনে করিলে ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। খালি একটা ভয়ানক "ইচ্ছা" দরকার, আর রীতিমত যত্ন।

এই মহাপুরুষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা খুব বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা ছিলেন। অল্প বয়সে ইনি গ্রামের পাঠশালাতেই পড়িতেন। তখন বাঙ্গালা ভাষা এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। দু-চারখানা বাঙ্গালা পদ্য বই ভিন্ন আর বই ছিল না। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করেন, বলিলেও ভুল হয় না। তার পরে পারশী ও আরবী শিখেন। তার পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আরবী, পারশী ও সংস্কৃত তিনটী ভাষা—অতি কঠিন কঠিন তিনটী ভাষা—উৎকৃষ্টরূপ শিখিলেন ;—কিন্তু শুনিয়া অবাক হও যে এখনও তাঁহার বয়স ১৬ বছর হয় নি!! তিনটী কঠিন ভাষায় যত প্রধান প্রধান বই তা সব পড়িলেন, ধর্মবিষয়ে যা যা বই ছিল সব পড়িলেন, বই লিখিলেন পর্যন্ত, তবু এখনও ১৬ বছর! হবে না কেন? তিনি ত আর আমাদের মত পড়িতেন না? স্কুলে গিয়া ঝগড়া, বাড়ীতে খেলা ধূলা, বৈএর সঙ্গে সম্পর্ক নাই. তা ত আর তাঁর ছিল না? লেখা পড়া শিখিব, বড় বড় কাজ করিব, এই সব ইচ্ছা তাঁর মনের ভিতরে

সদা সর্বক্ষণ জ্বলিত। দিন রাত খালি পড়িতেন, কেবল পড়াতে যখন ক্লান্ত হইতেন তখনি বাহিরে যাইয়া খুব খেলিতেন, সে খেলাতে তাঁহার শরীরে এত তেজ হইয়াছিল যে একটা পাঁঠার যতটা মাংস হয় সমস্ত একা খাইতে পারিতেন, আর ৫০ বৎসর ক্রমাগত অসুরের মত খাটিয়াও একদিনের জন্য কাতর হন নাই। আমরা কেবল খাই আর গল্প করি বৈ ত নয়, আর দুষ্টমি! সমস্ত দিন আম গাছের তলায়। এমন করে সময়ের গলায় পা দিলে কি আর রামমোহন রায়ের মত বড় লোক হওয়া যায়, না লেখা পড়া শেখা যায়? ছি! ভাই বালকগণ! তোমরা যে যে বড়লোক হবে, যে যে খুব লেখা পড়া শিখিতে চাও, এখনি প্রতিজ্ঞা কর, সময় নষ্ট করিবে না; খুব পড় দিন রাত পড়, আর খুব খেল; ২।১ ঘণ্টা খুব ছুটে বেড়াও, না হলে শরীর দুর্বল হবে। খালি স্কুলের দুখানি বৈ পড়া হইলেই হবে না, রাশি রাশি বৈ পড়িতে হবে। আশ্চর্য নহে, দেখ ১৬ বছরের মধ্যে বাঙ্গালা আরবী, পারশী ও সংস্কৃত ভাষার বড় বড় সব বৈ রামমোহন রায় পড়িয়াছিলেন, তোমরা পারিবেনা কেন?

তখন ইংরাজী শিক্ষা এত চলিত ছিল না, কদাচ কোথাও কেহ ২।৪টা ইংরাজী কথা কহিতে জানিত। সেই সবে মাত্র সাহেবেরা বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব আরম্ভ করিতেছেন বৈ ত নয়? তখন নবাবের আমল। কেবল পারশী আর আরবীই চলিত ছিল। এজন্য তখন তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। অনেক বয়সে, চাকরী করিতে করিতে ইংরাজী শিখেন; তাও এমন শিখিলেন যে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, বক্তৃতাও দিতে পারিতেন। তার পরে শুনে অবাক্ হবে। কি ক্ষমতা? ইংরেজীতে বাইবেল পড়িলেন, কিন্তু সে কেবল তরজমা করা এজন্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তখনই উহার মূল বাইবেল পড়িবেন বলিয়া "গ্রীক্" ভাষা "হীব্রু" ভাষা শিখিলেন। এ দুটীও ভয়ানক শক্ত ভাষা। তবু তাঁহার ভয় নাই, খুব পরিশ্রম করিয়া অল্প দিনেই ঐ দুটী ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন ও তারপর আদি মূল বাইবেল পড়িয়া তবে ছাড়িলেন। ধন্য সাহস! ধন্য চেষ্টা! ধন্য পরিশ্রম! ধন্য মহত্ত্ব!

দেখ তোমরা একটা অঙ্ক কষিতে একবার না পারিলেই বুঝাইয়া লও, আর তিনি এতগুলি কঠিন ভাষা আপনি নিজের বলে শিখিয়া ফেলিলেন। তোমরা হয়ত এতগুলি ভাষার নামও জাননা। দেখ দেখি, কেবল চেষ্টা ও ইচ্ছার জন্য মানুষে মানুষে কত প্রভেদ হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা ও ছিল তিনি সকলের উপরে মস্ত লোক হইয়া গেলেন, আর তোমাদের ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও চেষ্টা নাই, তাই—তোমরা বড়লোক হইতে পারিতেছনা, কেবল বৃথা পথে পথে বাগানে বাগানে যত নীচ প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াইয়া তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছ। হায় হায়! ভাই, বুঝিয়া চল, এখনও মন দিয়া পড়, আপনার কাজে সময় দাও। যদি না জান, কিরূপে সময়ের সৎ ব্যবহার করা চাই, তবে এখনই তোমার গ্রামে যে উৎকৃষ্ট বালক বা যুবক, তাহার নিকট গিয়া বল কি করিবে জিজ্ঞাসা কর। পরে তাহার কথা মত চলিয়া দেখ, কি আছ আর কি হও।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আরও অনেক অনেক চমৎকার বিষয় আছে, ক্রমে ক্রমে প্রিয় পাঠকদিগকে আমরা শুনাইব। কিন্তু এমনতর হাজার কথা শুনিলেও কিছু হবে না যদি তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা না থাকে। যেমন কাচের পৃষ্ঠে পারা না থাকিলে তাহাতে চেহারা দেখা যায় না, তেমনি বালকের মধ্যে ইচ্ছা না থাকিলে তাহার বড় হওয়া অসম্ভব। বুঝিলে?

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ ৮৬-৮৮।

আমাদের মহারাণী

কুমারী * দেবী



মাদের দেশের রাজা ইংরাজেরা। তাই বলিয়া যে সকল ইংরাজই আমাদের রাজা তাহা নহে। আমাদের রাজা যিনি, তিনি ইংলণ্ডে থাকেন। অনেক যায়গাতেই তাঁহার রাজত্ব। তিনি ইংরাজদেরও রাজা, আমাদেরও রাজা। এখন যিনি আমাদের রাজা তিনি স্ত্রীলোক। ইহাঁর নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়া। মহারাণী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াই যে সকল ইংরাজ আমাদের রাজা বা আমাদের কর্তা তাহা নয়। মহারানীর চক্ষে আমরাও যেমন, সাদা ইংরাজেরাও তেমনি। তবে কেন যে সে ইংরাজ আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইবে? আমাদের রাজা বলিয়া অত্যাচার করিবে? আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে? আমরা উহাদের ভ্রুকুটিতে ভয় পাইব না। যে সে ফিরিঙ্গী, যে সে চুনাগলির পচা সাহেব আসিয়াই যে আমাদের দেশের রাজা বলিয়া অহঙ্কার করিবে, অত্যাচার করিবে তাহা আমরা কখনও সহ্য করিব না। যার তার ভ্রুকুটিতে কেন ভয় পাইব? কেন উহাদের অত্যাচার সহ্য করিব? ওরা আমাদের রাজা বলিবার কে? উহারাও মহারাণীর প্রজা আমরাও তাঁহার প্রজা; তাঁহার চক্ষে উহারাও যেমন আমরাও তেমন।

মহারাণী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এড্ওয়ার্ক ডিউক অফ্ কেন্টের একমাত্র সন্তান। ইঁহার মাতার নামও ভিক্টোরিয়া। ইনি যখন এক বৎসরের বালিকা তখন ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন হইতেই সকলে মনে করিয়া আসিতেছিলেন যে ভবিষ্যতে ইনি আমাদের মহারাণী হইবেন। তখন হইতেই ইহাঁর মাতা ইঁহাকে রানী হইবার মতন নানা গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মহারাণী এমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগের মহারাণী হইয়াও অহঙ্কার করেন না; মহারাণী বড় বিনয়ী। তিনি অতুল ধনের অধিকারিণী হইয়াও নানা বিদ্যায় বিভূষিতা। চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইহাঁর বেশ ভাল জানা আছে। আমাদের দেশের যে সকল লোক পিতার বিষয় কিংবা একরাশ টাকা হাতে পান তাঁহারা প্রায়ই আজন্ম লেখা পড়া করেন না। গণ্ডমুর্খ থাকিয়া পিতার ধনে বাবুগিরি করেন, আর কত সব অসৎকার্যে ব্যবহার করেন; সৎব্যবহার ছাড়িয়া ধনের অপব্যয় করিয়া দুদিনে সমস্ত টাকা উড়াইয়া দেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ইঁহারা কি মহারাণীর চেয়েও বড় মানুষ; তাই তাঁদের লেখা পড়ায় কাজ নাই? লজ্জাও করে না! বিদ্যা কি কেবল ধনের জন্যই? না, বিদ্যার আরও সৎব্যবহার আছে? মুর্খের ধন বানরের হাতের মুক্তার হারের মত। বানর যেমন মুক্তার গুণ জানেনা, ব্যবহার জানেনা, মূর্খ ধনীও সেই রূপ। যে দেশের পুরুষের এই দশা, যে কিছু টাকা থাকিলে লেখা পড়া করে না, সে দেশের মেয়েদের কথাত ছেড়েই দাও। কিন্তু মহারাণী মেয়ে হয়েও, অতুল ধনের অধিকারিণী, প্রকাণ্ড দেশের মহারাণী হয়েও অতি যত্নে নানা বিদ্যা শিখিয়াছেন। আমাদের মহারাণী বড় গুণবতী; তার মন খানি দয়ায় মাখা। আমাদের রাণী বড়ই ভাল। লোকে অনেক ভাগ্য করিলে এমন রাণী পায়। যে দেশের রাজা কি রাণী এমন ভাল সে দেশের সৌভাগ্য অনেক।

পাঠক পাঠিকা! আমরা তোমাদিগকে মহারাণীর বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা বলিব ; তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে মহারাণীর মন কত বড়, এবং তিনি কেমন লোক।

(১) একদিন মহারাণী জানিলেন যে এক জন দুঃখিনী বৃদ্ধা মরিয়া যাইতেছে। নিকটে এমন কেহ্ নাই যে সেখানে গিয়া বৃদ্ধাকে মরিবার সময় দুটো ধর্মের কথা শোনায়। শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কুটীরে গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিলেন এবং উপাসনা করিয়া তাহাকে বাইবেল পড়িয়া শুনাইলেন।



(২) এক নৈতিক বিদ্যালয়ে মহারাণীর ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলায় পড়িতেন। একদিন এক জন লোক মহারাণীর ছেলে মেয়েদিগকে ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা সবগুলিরই খুব ভাল উত্তর দিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তোমাদের শিক্ষক খুব ভাল শিখাইয়াছেন।" তাহাতে তাহারা বলিল "আমাদের মা শিখাইয়াছেন, শিক্ষক শিখান নাই।"

(৩) রাণী যখন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেন, তখন তিনি প্রায়ই সামান্য লোকের মত পোষাক পরিয়া গরিবের ঘরে গিয়া তাদের উপকার করিতেন, তাদের দুঃখের কথা শুনিতেন, আরও কত সময় ছদ্মবেশে যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন তাহার ঠিক কি?

(৪) একদিন মহারাণী ছদ্মবেশে এক জহুরীর দোকানে গিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলেন এক জন স্ত্রীলোক একছড়া মুক্তামালায় দর করিতেছেন। সে সময়কার বিবিরা স্বামীর অবস্থা না বুঝিয়া অনেক দামী জিনিষ পত্র কিনিতেন এবং স্বামীর নামে খাতায় বাকী লিখাইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিতেন। এ দিকে মাসের শেষে স্বামীর নামে হিসাব গেলে বেচারা স্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। এইতো ব্যাপার। মহারাণী আসিয়া দেখিতে লাগিলেন এই স্ত্রীলোকটী সেই রকম কি না। কিন্তু তিনি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন যে স্ত্রীলোকটী হারের দর শুনিয়া "অত টাকা দর দিবার মত আমার অবস্থা নয়," এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকের এরূপ সুবিবেচনার পুরস্কার হওয়া উচিত, ইহা ভাবিয়া মহারাণী সেই মালাছড়া পরে কিনিয়া লইলেন, এবং সেই বিবিটীর নিকট নিজের নামে পাঠাইয়া দিলেন।

(৫) একদিন এক যায়গায় সাহেব বিবিদের নাচ হয়, নাচের উদ্যোগীরা অনেক করে মহারাণীকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে লইয়া যান। কিন্তু মহারাণী ঘরের মধ্যে কিছুকাল থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি

ফিরিয়া যান কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "এখানে মেয়েরা এমন বেহায়া পোষাক পরিয়া আসিবে তাহা জানিলে আমি আসিতামই না?" মহারাণীর এই এক কথায় সেই দিন হতে পোষাকের শ্রী বদলিয়া গেল।

(৬) একবার একজন লোক মহারাণীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহারাণী বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একটী মেয়ে তার বাবার কাছে এই কথা শুনিয়া মহারাণীকে এই মর্মে পত্র লেখে যে "আমি বাবার কাছে শুনিয়াছি আপনাকে একজন লোক গুলি করিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আপনি এত ভাল তবে কেন আপনাকে লোকে মারিতে আসে। আমি আপনাকে বড় ভালোবাসি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই—যে আপনি বেঁচেছেন।" রাণী এত বড় লোক, তবুও এই সামান্য পত্র পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। আর মেয়েটীকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৭) একদিন রাণী গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন, রাস্তায় একজন মুটে কাঠ লইয়া যাইতেছিল, সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কাঠ নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। তাহা দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া কাঠগুলি গাড়ীর উপর উঠাইয়া তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া তাহার যাইবার যায়গায় পৌঁছিয়া দিলেন। দেখ! মহারাণী কত মহৎ।

আমাদের এমন মহারাণীর বয়স এখন ৬৫ বৎসর। আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের দেশের উপকার করুন, ইহাই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ ১০৫-১০৮।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)

শিবনাথ শাস্ত্রী



ই যাঁহার ছবি দেখিতেছ, উনি আমাদের দেশের একজন ভাল লোক, সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। নিতান্ত গরিব অবস্থাতে জন্মিয়া নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও চরিত্রের গুণে এ জগতে যত লোক বড় হইয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহাঁর অনেক সদ্‌গুণ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

অনুমান ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ১১ বৎসর বয়সের সময় ইহাঁর পিতার কাল হয়; তখন ইহাঁদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, এ সংসারে গরিব বিধবার সন্তানকে কত কষ্টে মানুষ হইতে হয় তাহা সকলেই জানেন। শ্যামাচরণকেও সেই কষ্টে মানুষ হইতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইহাঁর জননী ইহাঁকে ও ইহাঁর ছোট ভাইকে লইয়া কলিকাতার পটল-ডাঙ্গায় একখানি অতি সামান্য বাটীতে অতিকষ্টে বাস করিতেন। মায়ের মনে এমন আশা ছিল না যে পুত্র দুইটীকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিবেন। বিধবার সন্তানের প্রতি কে দয়া করিবে, কে দুঃখী বলিয়া চাহিয়া দেখিবে? এ সময়ে তাঁহাদিগের দিন চলা ভার ছিল, এমন কি এই সময়ের উল্লেখ করিয়া মৃত শ্যামবাবু তাঁহার সন্তানদিগকে সর্বদা বলিতেন, "বাপু

তোরা ত রাজার হালে মানুষ হইতেছিস, আমার বালককালে খ্যাংরাকাটি দিয়া ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিয়া পরিয়াছি।" এই কষ্টে তাঁহার মা তাঁহাদের দুই ভাইকে লইয়া দিন কাটাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া একটী সদুপায় করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশের পরম বন্ধু চিরস্মরণীয় হেয়ার সাহেব সেই সময়ে তাঁহার স্কুল খুলিলেন, এবং কলিকাতায় পথে পথে যে সব বালক ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং আলস্যে দিন কাটাইত তাহাদিগকে ধরিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাচরণের মাতা তাঁহাকে এই স্কুলে পাঠাইলেন। শ্যামাচরম অতিশয় বুদ্ধিমান ও মনোযোগী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল ছেলে বলিয়া সুখ্যাতি পাইলেন। তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। এরূপ শুনা যায় যে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে কেবল শিক্ষা দিতেন না কিন্তু, তাঁহাকে আরও অনেক রকমে সাহায্য করিতেন, অতি নিকট সম্পর্কীয় লোকের মত সর্বদা তাঁহাদের পরিবারের বিষয় খবর লইতেন এবং তাঁহার জ্বর কি অন্য কোন অসুখ হইলে, সেই সামান্য কুটীরে গিয়া দেখিতেন ও চিকিৎসা করাইতেন। এইরূপে শ্যামাচরণ লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন।



সচরাচর বিধবার সন্তানদিগকে দেখিবার কেহ থাকে না, সুতরাং তাহারা কুসঙ্গীদের সঙ্গে পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শ্যামাচরণ অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, যেই তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল অমনি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার উপর হতভাগিনী মায়ের আশা ভরসা নির্ভয় করিতেছে, তিনি বিপথে গেলে আর রক্ষা নাই। এই সময় হইতে তিনি সর্বদা সুপথে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। বিশেষ কলিকাতায় আরো। তখন একটী বালকের ভাল পথে চলা কঠিন ছিল। এখন যত প্রকার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের উপায় হইয়াছে, তাহার কিছুই ছিল না। কলিকাতার বালকেরা মাথায় চাদর বাঁধিয়া কেবল যাত্রা, কবি, হাপ্-আক্ড়াই শুনিয়া বেড়াইত। মদ প্রভৃতি কোন একটা নেশা করিত না এমন বালক অল্প ছিল। কুসঙ্গ কুদৃষ্টান্তের অপ্রতুল ছিল না। শ্যামাচরণ আপনার প্রতিজ্ঞায় এই সকল কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও ভাল থাকিলেন। তাঁহাকে কোন দোয স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক লোক এক কালে খারাপ থাকিয়া পরে ভাল হইয়াছেন, কিন্তু শ্যামাচরণের নামে কখনও কোন প্রকার কলঙ্ক শোনা যায় নাই।

এইরূপে পরিশ্রম ও সচ্চরিত্রতার গুণে শ্যামাচরণ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছেন এমন সময়ে একটী আপীষের কর্তা কেরাণীগিরি কাজ করিবার জন্য হেয়ার সাহেবের নিকট একটী বুদ্ধিমান বালক চাহিলেন। হেয়ার সাহেব শ্যামাচরণকে পাঠাইলেন।

শ্যামাচরণ প্রথম ৪০৲টাকা মাসিক বেতনে কর্ম পাইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার সাংসারিক খরচের উন্নতি আরম্ভ হইল। তাঁহাকে যখন যে কার্যের ভার দেওয়া হইত তখন তাহা এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন যে তাঁহার প্রতি আপীষের কর্তাদের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ৪০৲টাকাতে কর্ম আরম্ভ করিয়া ১০০০৲এক হাজার টাকা মাসিক বেতন পর্যন্ত উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার এত দূর দক্ষতা ছিল যে তিনি বড় বড় ইংরাজ কর্তাদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছিল। এমন কি, ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট মহাসভায় একবার ভারতবর্ষের রাজস্বের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটী বসে, তাহাতে এই প্রকাশ পাইল যে শ্যামাচরণকে লইয়া যাইতে না পারিলে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে না ; তদনুসারে উক্ত কমিটী শ্যামাচরণকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নানা কারণে যাইতে পারিলেন না।

ক্রমে অনেক বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া অবশেষে তিনি পেন্সন লইয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ভাল করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আবার ১০০০৲এক হাজার টাকার বেতনের একটী কর্ম লইতে হইল। এই সময়ে তিনি সর্বসমেত ১৫০০৲পনরশত টাকা উপার্জন করিতেন। কেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়াও সুখে বিশ্রাম করিতে পারিলেন না, তাহা পাঠকদিগকে বলা আবশ্যক হইতেছে। এইটী দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, স্বর্গীয় শ্যামারচণ বিশ্বাস মহাশয় কত বড় দরের লোক ছিলেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার ও মহৎ ছিল। আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ঐ ভ্রাতা একটী সওদাগরের আপীষে বড় কর্ম পাইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে অনেক টাকা লাগাইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার অনেক হাজার টাকা ঋণ হয়। তাঁহার ভ্রাতা আপনাকে ধার শোধ দিতে অক্ষম জানাইয়া আদালত হইতে ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি পান। ইহার পর লোকের আর ঋণ আদায় করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় অতিশয় ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভ্রাতার সমস্ত ঋণ নিজ মস্তকে লইয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করিবার ভার লইলেন। তিনি ২৫/৩০ বৎসর ধরিয়া এই ঋণ শোধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এত উপার্জন করিয়াও নিজের বাড়ীটীতে বালি ধরাইতে পারিলেন না ; এই কারণেই বৃদ্ধবয়সে পেন্সন পাইয়াও তাঁহাকে আবার কর্ম করিতে হইল। ইহা ভিন্ন তিনি গোপনে অনেক পারোপকার করিতেন। তাঁহার স্বভাবই এমনি ছিল যে তাঁহার কোন বিষয়ের প্রকাশ ছিল না। ইংরাজীতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল, অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি ছিল, দুই হস্তে পরোপকার করা ছিল, কিন্তু জগতের লোক তাহা জানিতে পারিত না। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতেন এবং বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতেন, তাঁহারই জানিতে পারিতেন। এ সংসারে পরের জন্য যাঁহারা কষ্ট পান তাঁহারাই সাধু। শ্যামাচরণ বাবু সেই দরের লোক ছিলেন।

তিনি যে চল্লিশ টাকা বেতন হইতে পনর শত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি বড় নন ; এজন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না, কিন্তু যে পরিশ্রম, যে সৎ প্রতিজ্ঞা, ও যে ধর্মভীরুতার গুণে তিনি এত দরিদ্রাবস্থায় জন্মিয়াও এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এতপ্রকার কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও আপনাকে সৎপথে রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা তাহারই

প্রশংসা করিতেছি। তিনি যতকাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে সর্বদাই কলিকাতা সহরের বিখ্যাত পণ্ডিত লোকদিগের সমাগম হইত। ইনি সকল প্রকার সৎ কার্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল দলের লোক ইহাঁর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইনি যাহাকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে না পারিতেন সৎপরামর্শ দ্বারা উপকার করিতেন। এইরূপে ইহাঁর জীবন পরোকারেই কাটিয়া গিয়াছে। আজ সমুদায় বাঙ্গালার লোক ইহাঁর জন্য শোক করিতেছে।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১১৫-১১৭।

৬ কৃষ্ণদাস পাল

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



কটা কথা আমাদের বড় মনে হয় ; সেটা আজ তোমাদিগকে বলিব। যখন শ্মশানে যাই, বা যে কোন স্থানে বসিয়া থাকি, বা যখন গঙ্গা তীরের দিকে বেড়াইতে যাই, তখনই কত শত শত লোকের মৃত্যু দেখি, শুনি ও বলি। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য দেখি যে এই শত শত লোক রোজ মরিতেছে, এত লোক প্রতিদিন এ সুখময় পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহারও খবর কেউ রাখে না, কাহারও কথা লইয়া কেহ নাড়াচাড়া করে না, কাহারও মৃত্যু বিষয়ে কেহ দুঃখ করে না, কেহ "হায় হায়" করে না। রামধন, হরিধন, গোপাল, মাধব—কত লোকই না রোজ মরিতেছে ; কত লোকই না রোজ ইহলোক ছাড়িয়া যাইতেছে,—কে তার খোঁজ লয়? কেহই না। হয়ত তাহার আপনার জন কেউ ছিল,—মা বাপ, ভাই বোন,—তারাই ২/৪ দিন কাঁদিল। হয়ত তাহার পাড়াপ্রতিবাসী জনকতক লোক তার মৃত্যুতে দুঃখিত হয়। আবার নয়ত পাড়ার লোক "আঃ! বাঁচলেম, হাড় জুড়াল" বলে তাহার মরণে খুসী হইয়া ঠাকুরদের তুলসী দেয়। আর এক দিকে যে দেখি একজন কেশব সেন মরিলেন, আর অমনি দেশ বিদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্তও হাহাকারধ্বনি পড়িয়া গেল ; একজন শ্যাম বিশ্বাস প্রাণত্যাগ করিলেন, আর বাঙ্গালা দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার অপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহের গান গাইয়া মহা শোক করিতে লাগিল ; একজন কৃষ্ণদাস পাল ৪৫ বছর বয়সে মরিলেন, আর অমনি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ,—সর্বত্র,—"হায় কি হইল!" শব্দে পুরিয়া গেল!—এর মানে কি জান? এ রকমটা হয় কেন? এই যে শত লোক রোজ মরিতেছে, ইহারা কি মানুষ নয়? তবে এদের মরণের সংবাদ কেহ দেয় না কেন? আর ঐ সব লোক গুলিরই বা মৃত্যুতে মানুষ কাঁদে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ।—এঁরা বুদ্ধি, চরিত্র বা ধর্মের গুণে পৃথিবীর বিস্তর উপকার করিয়াছেন, তাই আজ এঁদের মরণে দেশশুদ্ধ লোক কাঁদিতেছে। "সখা"র পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি দেশেব লোক নও? তোমরা কি এ দুঃখের দিনে চক্ষের জল ফেলিবে না? তোমাদের জননী-স্বরূপ দেশের ভাল ভাল, বাছা বাছা, বড় বড় ছেলেরা সব মরে যাচ্ছেন দেখে কি তোমাদের প্রাণে দুঃখ হবে না? কেন হবে না? কে বলে হবে না? তবে তোমরা শিশু, সকলে জাননা এঁরা কেন বড় লোক ছিলেন। তাই এঁদের না জানাতেই তোমরা দুঃখও করিতেছ না। তবে এস, কেশব বাবু ও শ্যামাচরণ বাবুর জীবনের অনেক কথা তোমরা পড়িয়াছ ; আজ মহামান্য অনরেব্‌ল্ রায়

কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি, আই, ঈ, মহাশয়ের জীবনের গুটিকতক কথা বলিয়া দিব।

এই মহাত্মা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র পাল। আহা! দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা উভয়েই এই নিদারুণ শোকের জ্বালা সহ্য করিবার জন্য এ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। কৃষ্ণদাস বাবু বালক কালে পাঠশালে পড়িতেন, পরে ওরিএন্টাল্ সেমিনারী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ক্লাশে ভর্তি হন। তখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র, কিন্তু ঝাঁ ঝাঁ করিয়া 'ডবল্ প্রোমোশন্' পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র খুব শিখিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রম করিয়া পড়িতেন, এজন্য প্রায় সর্বদাই ক্লাশে প্রথম থাকিতেন। এ স্কুলে ছয় বছর পড়িয়াই তথাকার ইংরাজী পড়া ভাল হয় না বোধ হওয়ায় স্কুল ছাড়িয়া একজন সাহেবের কাছে ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। ভাল ইংরাজী শিখিব, এ ইচ্ছাটা তাঁর বরাবর ছিল। এজন্য দিনকতক এইরূপে শিখিয়া শেষে "হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ" নামক তখনকার একটা বড় কলেজে তিনি বছর খুব মন দিয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার খুব উন্নতি হইয়াছিল। উনিশ বছর বয়সের সময় তাঁহার এ কলেজের পড়াও শেষ হইল, তখন তিনি বাড়ীতে, সাধারণ পুস্তকাগারে ও ঐ কলেজে বসিয়া বসিয়া দিন রাত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আহা! পড়াশুনা যে কি মধুময় জিনিষ, তা যারা বেশী পড়ে তারাই বুঝিতে পারে। পড়িয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না, এতও পড়িতে পারিতেন! কত বৈই যে পড়িয়া ফেলিয়াছেন তা বলা যায় না! কবে আমরা সকলে পড়াশুনার এই সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করিয়া অন্য সব বৃথা আমোদকে নীচ মনে করিতে শিখিব? হায়! কবে সমস্ত বালক বালিকাগণ প্রাণ মন, সুখ ঐশ্বর্য, সব পণ করিয়া, জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জন করিয়া মানুষ হইবার জন্য যত্ন করিবে? উঃ! যখন এখনকার সব ছেলেদের পড়াতে আলস্য দেখি, তখন আপনার আঙ্গুল, আপনি কামড়াইতে ইচ্ছা করে, যে হায় রে! ইহারা চেষ্টা ও যত্ন করিলেই বড়লোক হইতে পারিত, ইচ্ছা করিয়া নীচ কেরাণীগিরি করিবে, সাহেবের জুতা খাইবে, এজন্য পড়াশুনায় হেলা করিয়া বৃথা আমোদে সময় কাটাইতেছে!! এখন বাবা খেতে পরতে দিচ্ছেন, স্কুলের মাহিনাও দিচ্ছেন, এর পর যে কি দশা হবে একটীবারও ভাবে না! হায়! হায়! আর সহ্য হয় না। বালকগণ! তোমাদের প্রত্যেককেই বলি, হাতে ধরে বলি, বৃথা সময় নষ্ট আর কোরোনা। পড়, পড়, পড় ;—বড়লোক হবার উদ্যোগ আয়োজন কর, চেষ্টা কর, যত্ন কর, প্রতিজ্ঞা কর ;—দেখ দেখি হইতে পার কি না? সব বড়লোকই এই রকম ক'রে হন, তোমরাই বা কেন ইচ্ছা পূর্বক মূর্খ, নীচ, সামান্য লোক হইয়া থাকিবে? তার পর, সে যাহা হউক, কি বলিতেছিলাম—কৃষ্ণদাস বাবুর পড়ার কথা। অনবরত পরিশ্রম করিয়া তিনি পড়িতেন আর চেষ্টা করিতেন যেন তাঁহার ইংরাজী রচনা ভাল হয়। সর্বদাই সংবাদপত্রে



লিখিতেন, এবং তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য এমনি লিখিতেন যে, যে কাগজেই দিতেন সেই আদর করিয়া লইত। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি একজন সুলেখক ও খুব ভাল লোক বলিয়া জানিত হইলেন। হাঁ, ভাল কথা।—এই সময় হইতেই বিচারশক্তি ও বক্তৃতা করিবার শক্তির উন্নতি করিবার জন্য তিনি একটী ছোট "ক্লবের" স্থাপনা করিয়া সেখানে নানাপ্রকার ভাল ভাল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই ক্লবের প্রায় সব সভ্যই এখন বড়লোক। আমরা এই জন্য এই রকম "ক্লব", সভা প্রভৃতি বড় ভালবাসি। এগুলি যেন "বীজতলা" জমী, পরে যাঁহারা বড়লোক হন এখান হইতেই তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা পান।

এই অবিশ্রান্ত যত্ন পরিশ্রম ও চেষ্টায় কত বড় ফল হইল শুনিবে? শুনিলেই তোমরা অবাক হইবে। তাঁহার যখন বয়স কেবল মাত্র বাইশ বছর, যে বয়সে এখন অনেক ছেলে এন্ট্রেন্স্‌ও পাশ করিতে পারে না, এত কম বয়সেই তিনি সুবিখ্যাত, দেশের মধ্যে মান্য "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক প্রধান সংবাদপত্রে পূরো সম্পাদক হন!! কি আনন্দের কথা! বাইশ বছরের ছেলে এত বড় একটা প্রকাণ্ড কাজের ভার মাথায় লইলেন! তাঁহার হাতে কি এ ভার অন্যায় হইয়াছিল? তিনি কি এত বড় কাগজ ভাল চালাইতে পারেন নাই মনে কর? না, তা মনেও স্থান দিও না। বড় হইলে জানিতে পারিবে যে এই পেট্রিয়ট্ কাগজই—আজ কাল সমস্ত ভারতবর্ষে যত খবরের কাগজ আছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়াছিল—কেবল তাঁহারই দক্ষতায়!! তার পর এক ধাপ উঠিলেন এই যে—সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারের যত জমীদার আছেন তাঁদের একটা প্রকাণ্ড সভা আছে। কৃষ্ণদাস বাবুর ক্ষমতা ও সৎচরিত্র দেখিয়া ইহাঁরা তাঁহাকেই আপনাদের সব কার্যের ভার দিলেন। এটী বড় সহজ কথা নয়। একজন গরিব দুঃখীর ছেলেকে সমস্ত রাজা ও জমীদারগণ যে এত বিশ্বাস করিলেন, এ কি বড় সামান্য কথা? আরও শুন। ইহাঁর পদ ও সম্মান বৃদ্ধি এখানেই শেষ হইল না। কলিকাতায় যে মিউনিসিপালিটী আছে, ইনি তাহাঁর একজন অতি প্রধান মেম্বর হইলেন। কি আশ্চর্য! যেখানে যান, সেখানেই প্রধান, সেইখানেই সর্বেসর্বা, সেইখানেই সকলের উপর। হাঁ! ইহাই ত চাই। একেই ত বলে বড়লোক। আরও কথা আছে, কান পেতে শুন ; এখান থেকে তাঁহার পদ আরও কত বাড়িল একবার দেখ। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জাননা যে এদেশের গবর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট এবং লেপ্‌টেনেন্ট্ গবর্ণর বা ছোটলাট, দুজনেরই সহায়তার জন্য একটী করিয়া সভা আছে। প্রথম সভা থেকে বাঙ্গালা দেশের জন্য আইন তৈয়ার হয়। দ্বিতীয় সভা থেকে যে আইন হয় তা একেবারে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ; ইহাকেই ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্ট সভা বলা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমে কৃষ্ণদাস বাবু ছোটলাটের মন্ত্রীসভার মেম্বর হন ; সেখানে খুব দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তিনি যাহা বলতেন প্রায় তাহা আর কেউ কাট্‌তে পারত না। তার পরে গত বৎসর ইহাঁর সম্মানের চূড়ান্ত হইয়াছে,—বড়লাটের মন্ত্রীসভাতেও ইনি একজন সভ্য হন! দেখিলে শুনিলেও চক্ষু জুড়ায়! একজন গরিব দুঃখী সামান্য লোকের ছেলে হয়েও লেখাপড়া, বুদ্ধি ও চরিত্রের তেজে মানুষ যে কত বড় লোক হইতে পারে তাহা ইনি বেস্ দেখাইয়াছেন। চক্ষু যদি থাকে ত দেখ, আর ইচ্ছা যদি থাকে ত হও। যদি একতিল পদার্থ থাকে, যদি মানুষ হইবার বাসনা থাকে, তবে প্রাণপণে যত্ন কর।

বড়লোক দুই জাতীয় দেখা যায়, এক জাতীয় লোকেরা ঈশ্বরের দ্বারা বড় হইয়াই জন্মান। যেমন শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি। ইহাঁদের মত হওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করিলে অনেকটা যে না হওয়া যায় তাও নয়। কিন্তু আর এক জাতীয় বড় লোকেরা আপনিই হন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁহারা নিজের চেষ্টায়, নিজের যত্নে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষায়, নিয়ত পরিশ্রম করিয়া কি উন্নতিই করিয়া যান। ইহাঁদের মত হওয়া তত কঠিন নহে, সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেই সব বুদ্ধিমান বালক সেইরূপ মহৎ হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় এই রকম নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে আমাদের সখার প্রত্যেক পাঠক সেইরূপ বড়লোক হইয়া স্বদেশের ও জনক জননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া যাইতে পারেন। একদিন ছেলেবেলা "হিন্দুপেট্রিয়টের" লেখা দেখিয়া এই কৃষ্ণদাস বাবুই বলিয়াছিলেন "আহা! কবে আমি এইরূপ ইংরাজী লিখিতে শিখিব?" তার পর দেখ ২৩।২৪ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত সেই কাগজ খানিই তাঁহার হাতে পড়িয়া দেশের সর্বপ্রধান কাগজ হইয়া দাঁড়াইল। যথার্থই, একদিন যাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় আর একদিন তাহা সত্যই আসে। বালকগণ! তবে আর কেন? লেগে যাও, উঠে পড়ে—দিনরাত কেবল কিসে বড় হব, সৎ হব, ধার্মিক হব, সেই চেষ্টা কর। যে কৃষ্ণদাস একদিন দুঃখীর সন্তান ছিলেন, তিনি আজ মরিবার সময় তিন লক্ষ যাট হাজার টাকা রাখিয়া গেলেন! তাহার মধ্যে পিতা, মাতা, কন্যা ও গরিবদিগের জন্য ১০০০০্ দশ দশ হাজার করিয়া ৪০০০০্ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট তাঁহার পুত্রকে দিয়া গিয়াছেন। ধন্য কৃষ্ণদাস! তোমাকে আগে কেহ চিনিত না, আজ তুমি ছোটলাটেব সম্মানিত ও বড়লাটের ডান হাত! তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরিশ্রম, তোমার যত্ন ও তোমার চেষ্টা, যেন আমাদের দেশের সব বালকেরা শেখে।

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৩৭-১৪০।

এব্রাহাম লিঙ্কন্

প্রমদাচরণ সেন



মেরিকা-দেশে এক সময় দাসপ্রথার জ্বালায় কালো মানুষের বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। "দাস-প্রথা" বা দাস ব্যবসায়টা কি জিনিষ, ত'হা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না? আগে তাহার কথা একটু বলি শুন। এই যে ইংরাজদের আজ কাল দেখিতে পাও, ইহাঁরা যে কেবল আজ কালই কালো মানুষের উপর 'জোর জুলুম' আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক কাল আগে ইহাঁদের মনে মনে একটা স্থির বিশ্বাসই ছিল যে সাদা মানুষের চাকর—গোলাম—হইয়া থাকিবার জন্যই পরমেশ্বর কালো মানুষদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া ইহাঁরা আফ্রিকা দেশে গিয়া নানা ছলে, ছলে না পারিলে গায়ের বলে, কালো কাফ্রীদিগকে ধরিয়া আনিতেন, তাহাতে ছোট কচি ছেলে, অথবা অতি অতি বুড়ো, কেহই বাদ যাইত না। দেশে আনিয়া সাদা মহাশয়েরা কালোগুলোকে নিলামে বিক্রী করিতেন। যেমন গরু ছাগল বিক্রী করিতে লইয়া গেলে কিনিবার সময়, যাহারা খরিদ্দার, তাহারা বেশ করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট মোটা সোটা দেখিয়া বাছিয়া লয়, এই হতভাগা কাফ্রীদের বিক্রী করিবার সময় ঠিক সেইরূপ কাণ্ড হইত। কোন স্থানে বুড়ো বাপ

তাহার যুবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; খরিদ্দার বুড়োর আশার ধন ছেলেটীকে কিনিয়া লইয়া গেল, বুড়োর যে কি দশা হইবে, তাহা চাহিয়াও দেখিল না। তোমার মা বুড়ো হইয়াছেন, তাঁহার কাছ থেকে তোমাকে ছিনাইয়া যদি কেহ লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার এবং তোমার মার কি কষ্ট হয় বল দেখি? তখন কি ইচ্ছা করে না, যে যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে সেই পাষণ্ড ডাকাতের মাথাটা কেটে দু'খণ্ড করে ফেল কিন্তু আমেরিকাতে প্রতিদিন নিলাম ঘরে এইরূপ মানুষ বিক্রী হইত, যুবা পুত্রকে বুড়ো বাপের কাছ থেকে, ছোট ছেলেকে প্রিয় মায়ের কোল থেকে, ভগিনীকে ভাইয়ের পাশ থেকে, প্রতিদিনই নিষ্ঠুর সাদা লোকেরা কাড়িয়া লইয়া যাইত, সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া আপনাদের ক্ষেতে গরু ঘোড়ার মত কাজ করাইয়া লইত, এবং মনের মত কাজ করা না হইলে চাবুক মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিত, অথচ কালো লোক-দিগের সেই দুঃখের সময়ে তাহাদের হইয়া দুটো কথা বলিবে, এমন একটী লোক সমস্ত আমেরিকা দেশে ছিল না।



A. Lincoln

কিন্তু পরমেশ্বর চিরকাল কাহারও কষ্ট রাখেন না, কাফ্রীদেরও কষ্ট চিরকাল রহিল না। আজ আমেরিকা দেশে কাফ্রীরা কাহারও অধীন নয়, আজ তাহারা সাদা লোকের মত নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে ; কিন্তু কাফ্রীদের এই স্বাধীনতা দুই এক দিনে হয় নাই।

পরমেশ্বরের দয়ায় দুই একজন করিয়া সাদা লোক কাফ্রীদের পক্ষে হইতে লাগিল, ক্রমে এই দলের সঙ্গে কাফ্রীদলের শত্রুদের ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দুই দিকেই অনেক লোক মারা পড়িল, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া কিছু দিন পরে দাসব্যবসা উঠাইয়া দিলেন, হতভাগ্য কাফ্রীদের হাড়ে বাতাস লাগিল। আজ কাফ্রীরা স্বাধীন, কিন্তু ২০।৩০ বৎসর পূর্বেও কাফ্রীদের দিকে টানিয়া দুটো কথা বলিলে অনেক শত্রু যুটিত। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল কাফ্রীদের স্বপক্ষে কথা বলিতে গিয়া এবং কাফ্রীদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া আমেরিকার একজন সর্বপ্রধান লোকের প্রাণ গিয়াছে :—এই মহাত্মার নাম এব্রাহাম লিঙ্কন্।

যাঁহারা প্রথম হইতে 'সখা' পড়িয়া আসিতেছেন তাঁহারা জানেন (সখা প্রথম ভাগ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) মহাত্মা গারফীল্ড় কেমন সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টা ও যত্নে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট্ অর্থাৎ মহাসভার কর্তা হন। মহাত্মা লিঙ্কন্ গারফীল্ডের অনেক বৎসর পূর্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। কি আশ্চর্য! দুজনের জীবনচরিত ঠিক একরূপ। লিঙ্কন্ও অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন, এবং গারফীল্ডের ন্যায় মায়েব গুণে সৎ চরিত্র এবং সুবুদ্ধি, এই দুই গুণ পাইয়াছিলেন। গারফীল্ডের ন্যায় লিঙ্কন্ও তেলের অভাবে উনানের আগুনে পড়া করিতেন, এবং শীতের দিনে শুধু পায়ে দুক্রোশ, আড়াই ক্রোশ পথ হাটিয়া

স্কুলে পড়িতে যাইতেন। দুয়েরই পড়াতে এমন যত্ন ছিল, যে পড়িতে বসিলে আর জ্ঞান থাকিত না, একেবারে যেন নিজের পড়াতে ডুবিয়া থাকিতেন। একবার লিঙ্কনের বাপ তাঁহাকে কি কাজের জন্য ডাকিতেছিলেন ; তখন লিঙ্কন্ একখানা গল্পের বই পড়ায় নিযুক্ত, বাপের কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না ; "যাই, বাবা!" বলিয়া আবার পড়িতে বসিলেন। লিঙ্কনের বাপ লেখা পড়া জানিতেন না, পড়ার যে কি সুখ, তাহা তিনি বুঝিবেন কেন? ছেলের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে খুব তিরস্কার করিলেন।

বই কিনিবার সঙ্গতি নাই, অথচ পড়া চাই ; লিঙ্কন্ এক বড় লোকের বাড়ী চাকর হইয়া তাঁহার পুস্তক এবং সংবাদপত্র পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে সাহিত্য, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি যে কত পড়িয়া ফেলিলেন, তাহার সীমা কি? কখন সামান্য চাকরের কাজ করিয়া, কখন ছুতরের কাজ করিয়া, কখন কেরাণীগিরির ন্যায় কাজ করিয়া, কখনও জাহাজের মাঝির কাজ করিয়া কখনও বা সৈনিকের কাজ করিয়া লিঙ্কনের অনেক দিন কাটিয়া গেল। কি আশ্চর্য! কোন কাজেই আপত্তি নাই, কিছুতেই "না" বলা নাই, আর যাহা ধরেন, তাহাই ভালরূপ না করিয়া ছাড়েন না। আবার তাহার সঙ্গে পড়ার কাজ—সে কাজের বিশ্রাম নাই। এই রূপ চেষ্টা ও যত্ন যার, সে যে বড় লোক হবে, তাহাতে আর অবাক্ হইবার বিষয় কি? লিঙ্কন্ প্রথমতঃ তাঁদের দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং তাহার পর সমস্ত আমেরিকার মধ্যে সর্বপ্রধান অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হইলেন।

মহাত্মা গার্‌ফীল্ডের ন্যায় মহাত্মা লিঙ্কন্‌ও বড়ই দয়ালু ছিলেন। পশু পাখীদের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, লিঙ্কন্ তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। যদিও বাল্যকালে গরিব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পেটের দায়ে বুনো পাখী শিকার করিতে হইয়াছে, তথাপি নিষ্ঠুর ছেলেদের মত তিনি কখনই পশুপাখীদের যন্ত্রণা দিয়া মারেন নাই। এই দয়া বড় হইয়া, কেবল পশুপাখী নয়, সমস্ত দুর্বল প্রাণীকেই আশ্রয় দিল। যে দুর্বল, যে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারেনা, যে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারেনা, আহা! এমন অসহায় যে তাহাকে দয়া কর, ইহাতেওতো বাহাদুরী ; মহাত্মা লিঙ্কন্ এইরূপ মনে ভাবিতেন বলিয়াই তিনি কাফ্রীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সৎকাজ করিতে গিয়া তাঁহার প্রাণ গেল। কাফ্রীদের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনেক শত্রু যুঠিল এবং এক শত্রুর বন্দুকের গুলিতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রাণ গেল।

প্রাণ যাক, তাতে দুঃখ কি, কিন্তু একজন সৎলোক এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন, ইহাই কষ্টের কারণ। আর যদি মরিতে হয়, তবে এইরূপ সৎকাজ করিতে করিতে মরাইতো ভাল। কত লোক মদ খাইতে খাইতে মরিয়া যায়, কত লোক চুরি করিতে গিয়া মারা পড়েছে কতলোক পরের সর্বনাশ করিতে গিযা দাঙ্গা করিয়া মারা যায়, কত লোক টাকা রোজগার ও 'যক্ষের ধন" পুঁজি করিতে করিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মুখে রক্ত উঠিয়া পৃথিবী ছাড়ে—সেইসব মরার অপেক্ষা সৎকাজ করিতে গিয়া প্রাণ দেওয়া কত সুখের, কত সৌভাগ্যের কথা। আজ যদি মৃত্যু আসে, তাহা হইলে সে যেন আসিয়া এই দেখিতে পায় যে মহাত্মা লিঙ্কনের মত আমরা নিজে ভাল হইয়াছি বা নিজেদের উন্নতি করিতেছি এবং আমাদের চেষ্টায় আর দশ জন সুখী হইতেছে এবং ভাল হইতেছে।

২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১৭০-১৭২।

লর্ড রিপন

প্রমদাচরণ সেন



খন যিনি আমাদের গবর্ণর জেনেরেল বা বড় লাট সাহেব তাঁহার নাম লর্ড রিপন এ কথা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে তিনি আর আমাদের বড় লাট থাকিবেন না। তাঁহার যত বৎসর কাজ করিবার কথা, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসাতে, তিনি বড় লাটের কর্ম অন্য এক জনকে বুঝাইয়া দিয়া দেশে চলিয়া যাইতেছেন। আমরা এই দুঃখের সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদিগকে দুই একটী কথা বলিতে চাই।

দুঃখের সময় বলিলাম কেন, তাহার অর্থ আছে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে যত 'বড় লোক' হয়, সে তত গরিবদের কষ্ট দেয় ; অথবা গরিবদের কষ্ট দেখিয়াও সে তত কঠিন হইয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, জমীদার প্রজার দুঃখে কষ্ট পায় না, ধনী মহাজন গরিব চাষার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া আপনার পাঁওনা টাকা আদায় করিয়া লয় ; এবং যাহার ক্ষমতা বেশী সে দুর্বলকে চোখ রাঙ্গাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া কথা কয়। অথচ যদি ঠিক বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে ব্যক্তি বলবান সে দুর্বলকে সাহায্য করিবে, যাহার ধন আছে সে গরিবকে বিপদে রক্ষা করিবে, এবং যে রাজা সে আপনার প্রজাকে সুখে বাঁচাইয়া রাখিবে,—ইহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু লোকে এরূপ করে কই? আমরা কেবলি দেখিতে পাই যে, যে পারিতেছে, যার ক্ষমতা আছে, সেই আপনার আশ্রিত অধীন লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। যেখানে ক্ষমতা, তার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার। পরের উপকারের জন্য যে ক্ষমতা চালান যাইতে পারে, চারিদিকের ক্ষমতাশালী লোকের 'রকম সকম' দেখিয়া তাহা আর বিশ্বাস করিতে মন উঠে না।



আমাদের বড় লাট বাহাদুরের ভয়ানক ক্ষমতা ; তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হইয়া থাকেন, একথা বলিলে কিছু অধিক বলা হয় না। লর্ড রিপনের আগে যিনি বড় লাট ছিলেন, তিনি আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে আমরা মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে না পারি, তাহার জন্য আমাদের খবরের কাগজগুলোকে একটা কড়া আইনের দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়া চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন ; আমাদের বন্দুক, তরবারি, যাহা কিছু অস্ত্র শস্ত্র ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইলেন ; আরও কত কি কাণ্ড

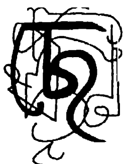
করিলেন, সে সব তোমাদের বলিয়া লাভ নাই। সেই লাট বাহাদুর কেবল মুখেই মিষ্ট কথা বলিতেন, আর কাজের বেলা প্রায়ই ইংরাজদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেন। আমরা হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' করিতেছিলাম, এমন সময় লর্ড রিপন আসিলেন। তিনি আসিয়াই এদেশের শ্রী ফিরাইয়া দিলেন। খবরের কাগজগুলির বাঁধন খুলিয়া দিলেন। ইংরাজেতে আর এদেশীয় লোকে কোন তফাৎ রহিল না। যে গুণী সেই সম্মান পাইবে, মুখ দেখিয়া কাহাকেও চাকরী দেওয়া হইবে না, এ কথা লর্ড রিপন সকলকে বলিলেন এবং কাজেও সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল ইংরাজ অত্যাচার করিয়াই দিন কাটায় লর্ড রিপনের এই সমান সমান ভাবটা তাহাদের চোখে সহিল না ; তাহারা তাঁহার ভয়ানক শত্রুতা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই না টলিয়া যাহাতে ইংরাজ এবং দেশীয় লোক সকলেরই উপকার হয়, অথচ ধর্ম এবং ন্যায় বজায় থাকে, এইরূপ কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আজ পর্যন্ত সেই ভাবেই কার্য করিয়া আসিতেছেন। তবে তিনি চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মত আর যে কেউ হবে, এ ভরসা আমাদের নাই বলিয়াই এ সময়টা বড় দুঃখের সময় বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি অনেক সৎকাজ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সেগুলির এক এক করিয়া নাম না করিয়া, এই বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, যে তিনি ধর্ম ও ন্যায়ের দ্বারা প্রত্যেক কার্যের পরিমাণ করিতেন, অর্থাৎ যে কার্য ধর্মের কার্য বা যে কার্য না করিলে অন্যায় হয় সে কার্য তিনি করিয়া তুলিতেন, যেখানে ধর্ম সেখানেই লর্ড রিপন থাকিতেন। যেখানে ন্যায় সেইখানেই লর্ড রিপনের কার্য দেখা যাইত ; তিনি ইংরাজ, বাঙ্গালী বুঝিতেন না, সাদা কালোর ধার ধারিতেন না, কেবল আপনার মনে, যাহা ধর্ম, যাহা ন্যায়, যাহা কর্তব্য, তাহাই করিয়া যাইতেন।

আমরা তাঁহার এইরূপ কার্যেই সুখী হইতে পারিয়াছি, কারণ আমরা বরাবরই জানি যে আমরাই কষ্ট পাই, আমরাই কালো বলিয়া গুণ থাকিলেও চাকরী পাই না, আমরাই অত্যাচারী ইংরাজদের লাথি কীল ঘুষা খাই ; কাজেই লর্ড রিপনের যাহা কিছু কার্য তাহা আমাদের উপকারের জন্যই হইয়াছে। আজ সেই লর্ড রিপন চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আমাদের মনে মনে কষ্ট হইতেছে, আজ আমরা মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেখানে থাকেন, যেন সেইখানেই সুখে থাকেন এবং গরিব ভারতবাসীদিগকে যেন তাঁহার ধার্মিক মনের একপাশে একটু স্থান দেন।

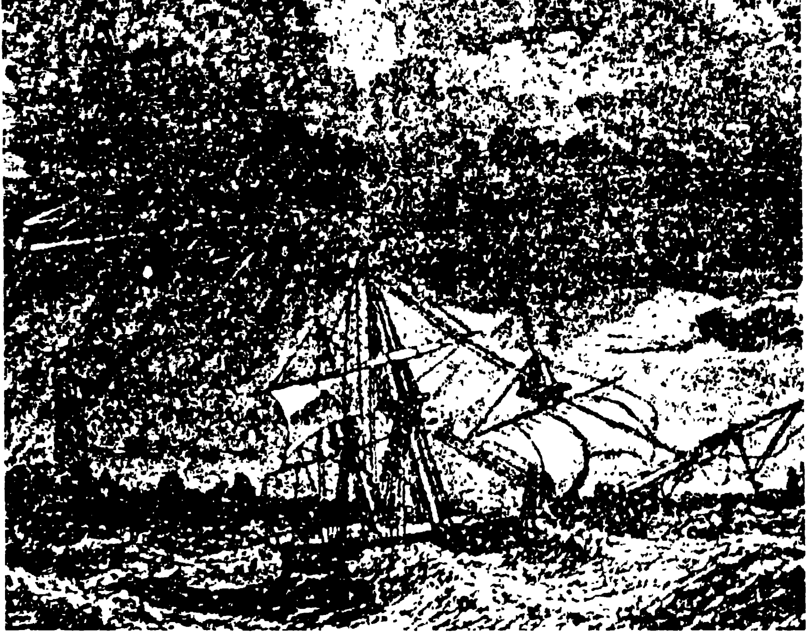
২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪ ; পৃ. ১৭৭-১৭৮

জাহাজ

প্রমদাচরণ সেন


লেবেলা গল্প শুনিয়াছিলাম একটা দৈত্য এক রাজার বাড়ী পিঠে করিয়া এক দেশ হইতে আর এক দেশে লইয়া গিয়াছিল। যদি জাহাজ না দেখিতাম, তাহা হইলে এই গল্পটা একেবারেই মিথ্যা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু একবার জাহাজের মধ্যে গিয়া দেখিয়াছি, জাহাজগুলি বাস্তবিকই রাজার বাড়ীর মত। যাঁহারা পান্সী নৌকায় চলিয়াছেন, নৌকার মধ্যে কুঁজো হইয়া যাঁহাদের প্রাণ গিয়াছে, এবং যাঁহারা বড় মহাজনী নৌকা ভিন্ন জল পথে যাইবার অন্য কোনরূপ ভাল আয়োজন দেখেন নাই,

জাহাজ কিরূপ জিনিশ, তাহা তাঁহারা আদবেই বুঝিবেন না। বড় বড় ঘরে সুন্দর বিছানা, পরিষ্কার খাট, বসিলে ডাবিয়া যায় এরূপ চৌকী, বাজাইবার পিয়ানোযন্ত্র, স্নান করিবার আলাদা ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ডাক্তারের ঘর, কাপ্তেন সাহেবের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ধোপা প্রভৃতির বন্দোবস্ত, গরু ছাগল প্রভৃতির থাকিবার যায়গা, জল পরিষ্কার করার কল, ইত্যাদি সকলরূপ বন্দোবস্তই এই জাহাজের মধ্যেও আছে। আর, সমুদ্র দৈত্যের মত এই জাহাজকে



পিঠে করিয়া দেশে বিদেশে লইয়া বেড়াইতেছে। গল্পে যে দৈত্য ও রাজবাড়ীর কথা শুনিয়াছি, সেই দৈত্যের পিঠে রাজার বাড়ীটা ঝাঁকুনি খাইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই, তবে সমুদ্রের পিঠে জাহাজ ভয়ানক ঝাঁকুনি খাইয়া থাকে, যাহারা প্রথম প্রথম জাহাজে উঠে, তাহাদের অনেকেরই এই ঝাঁকুনির চোটে বমি করিয়া প্রাণ যায়। জাহাজ কোন্ দিকে, কত বেগে, যাইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য জাহাজের উপরে নানারূপ কল আছে, কাপ্তেন সাহেব তাহার দ্বারা সমস্ত ঠিক করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে বেশ লেখা পড়া জানিতে হয়, আমাদের ছাবের মাঝি বা রহমতুল্লা মাল্লার ন্যায় নিরেট মূর্খ কাপ্তেন হইলে, জাহাজকে সমুদ্রের মধ্যে তিন পাও বাঁচিতে হয় না!

গত বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যক সখাতে আলোকমঞ্চের কথা বলিতে গিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে সমুদ্রের মধ্যে অনেক যায়গায় মৈনাক পাহাড়ের মত পাহাড় সকল জলের নীচে মাথা লুকাইয়া আছে, জাহাজ তাহাতে লাগিলেই ফাটিয়া যাইবে। যাঁহারা অনেক-কেলে কাপ্তেন, তাঁহারা জানেন এইরূপ পাহাড় কোন্ রাস্তায় কোন্ স্থানে আছে, কাজেই তাঁহারা খুব সাবধান হইয়া চলেন ;—তবুও কি জানি, যদি পাহাড়ে পড়িয়া জাহাজ মারা যায়, আরও কত বিপদ কত সময় হইতে পারে, এই জন্য জাহাজের উপরে কতকগুলি নৌকা (আমাদের

জেলে নৌকার মত ছোট) বাঁধা থাকে। দরকার হইলে, সেই নৌকাগুলিতে করিয়া জাহাজের লোকেরা বাঁচিতে পারে।

কতকগুলি জাহাজ কেবল মাল লইয়া দেশে বিদেশে যায়, অনেকগুলি লোক লইয়াও যায়। অনেক জাহাজ পাল দিয়া চলে, অনেকগুলি বাষ্পের জোরে যায়, অনেকগুলিতে পালও আছে, কলও আছে। এখন জাহাজে অনেক কাজ হয়, দেশে বিদেশে বেড়ান হয়, এ দেশ হইতে ও দেশে ডাক যায়, আবশ্যক হইলে সমুদ্রে যুদ্ধ হয়, বাণিজ্য দ্রব্য কেনা বেচার জন্য নানা দেশে জাহাজ যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, জাহাজ রাজার বাড়ীর মত ; কিন্তু মাটীর উপরে ভূমিকম্প হইলে যেমন রাজার বাড়ীতেও সুখ নাই, সেইরূপ ঝড় উঠিলে সমুদ্রের বুকে জাহাজে চড়িয়া রক্ষা পাওয়া যায় না। ওই দেখ, একখানা জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে। এ যাত্রা রক্ষা পাইবে কি না কে বলিতে পারে? এইরূপ বিপদে জাহাজকে মাঝে মাঝে পড়িতে হয়, তবু লোকে জাহাজ ফেলিয়া পালায় না। জাহাজে করিয়া লোকে দেশে বিদেশে ব্যবসায় করিয়া ফেরে, তাহাতে দেশের টাকা বাড়ে, এইজন্য সকল সভ্য দেশের লোকেই জাহাজ করিয়াছে। কেবল আমাদের দেশে নাই। আমরা কেবল টাকা পুঁতিয়া রাখিতে ভাল বাসি, এইরূপ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য কারবারে টাকা খাটাইতে চাই না, এই জন্য আমাদের দেশের টাকা বাড়ে না। এইরূপ দেশে বিদেশে কারবার করিয়া বেড়াইলে যে কেবল টাকা বাড়িবে তাহা নয়, অনেক নূতন জ্ঞান জন্মে, অনেক সাহস বাড়ে। আজকাল ইংরাজেরা যে এত বড় একটা জাতি, ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে ইহারা অনেককাল হইতেই এইরূপ দেশে বিদেশে কারবার করিয়া বেড়াইতেছে।

বালকদিগের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে যখন বড় হইব, হাতে টাকা হইবে তখন সাধ্যমত স্বাধীন ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করিব। পরের চাকর না হইয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারার চেয়ে আর কি সুখ আছে?

একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলাম ; গঙ্গায় সকল জাতিরই জাহাজ আছে, আমাদের নাই ; ইহা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল ; তাই আজ এত কথা লিখিলাম। সখার পাঠকদিগের মধ্যে জমিদারের ছেলে অনেক আছেন, তাঁহারা যেন বড় হইয়া এইকথাগুলি ভাবিয়া দেখেন।

২ : ১ : জানুযারী ১৮৮৪, পৃ. ৪-৬।

তাজমহল

শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু



লক বালিকাগণ! তোমরা অনেকেই আগ্রার সুবিখ্যাত তাজমহলের কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ। আগ্রা নগরী কলিকাতা হইতে ৪২১ ক্রোশ দূরে,—পূর্বে কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিত। লর্ড লরেন্স যখন আমাদের গবর্ণর ...রল ছিলেন, তখন তিনি অতি দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাক বসাইয়াও ১৫ দিনের পূর্বে আগ্রা হইতে কলিকাতায় সংবাদ আনাইতে পারেন নাই। এখন রেল গাড়ী হওয়াতে যাইবার খুঁব সুবিধা হইয়াছে। এখন আগ্রা যাইতে মোটে ত্রিশ ঘণ্টা লাগে।

তোমরা জান আমাদের দেশে পূর্বে মুসলমান বাদসাহরা রাজত্ব করিতেন। বাদসাহরা সকলেই খুব জাঁক জমক প্রিয় ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে আবার সাজাহান নামক একজন বাদসা বিশেষ সৌখীন ছিলেন ; তাঁহার সময়ে দিল্লীর শোভা সম্পদ খুব বৃদ্ধি পায় ; বড় বড় রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড মসজিদ, সুপ্রশস্ত রাজপথ, প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ইনি দিল্লীর শোভা বাড়াইয়া যান। যে ময়ূর-সিংহাসনের কথা তোমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ তাহা ইনিই সখ করিয়া নিজের জন্য তৈয়ার করেন। যে একটী কোহিনুর আমাদের মহারাণী মুকুটে পরিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেইরূপ কত কত মণি উক্ত সিংহাসনের শোভা বর্ধন করিত। আগ্রার তাজমহলও এই বাদসাহের আদেশে নির্মিত হয়। সাজাহান বাদসাহের মমতাজমহল নাম্নী এক প্রিয়তমা বেগম অর্থাৎ রাণী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে বাদসা তাঁহার গোরের উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বেগমের নামানুসারে এই প্রাসাদেরও একটী নাম মমতাজ মহল ছিল ; ক্রমে তাহা হইতেই তাজমহল হইয়াছে। আগ্রার অনধিক এক ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে এই অপূর্ব অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। যে তোরণ অর্থাৎ ফটক দ্বারা তাজমহলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা দেখিতে অত্যন্ত উচ্চ ও অতি সুন্দর। এই তোরণ রক্তবর্ণ পাথরে নির্মিত ; ইহার গাত্রে যে সকল শিল্পকার্য রহিয়াছে তাহারই বা শোভা কত। এইরূপ আরও তিনটী তোরণ অপর তিন দিকে শোভা পাইতেছে। তোরণ অতিক্রম করিলেই শ্বেতপাথর-নির্মিত একটী অত্যন্ত দীর্ঘ চৌবাচ্চা দেখিতে পাইবে, এই চৌবাচ্চার মধ্যে ৩।৪ হাত দূরে দূরে একটী ফোয়ারা আছে এই সকল ফোয়ারা হইতে এখনও মধ্যে মধ্যে জল-ক্রিয়া হইয়া থাকে। চৌবাচ্চার দুই পার্শ্বে যে সুপ্রশস্ত পথ আছে তাহা বৃক্ষাদিতে এরূপ ঢাকা যে অত্যন্ত রৌদ্রের সময়েও সেখানে রৌদ্রের তাপ লাগে না। তাজমহলের তিন দিক মনোহর বাগান দ্বারা বেষ্টিত, অপরদিকে যমুনা নদী। বাগানটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন প্রভৃতি অনেক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুবিস্তীর্ণ ত্রিতল ভিত্তির উপর তাজমহল স্থাপিত। যে সুন্দর শ্বেত পাথরের দুই একখানা বাসন পাইয়া আমরা কত সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ শ্বেত পাথর দ্বারা ইহার আগাগোড়া নির্মিত। তার চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ২২৫ ফিট। তাজমহলের উপর ও মধ্যভাগ নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত সুন্দর সুন্দর ফুলে সুশোভিত[১]। এক একটী ফুলের পাপড়ী নির্মাণে ৮।১০ প্রকার বিভিন্ন রঙ্গের ছোট ছোট পাথর লাগান হইয়াছে। যে রঙ্গের পর যেটী দিলে ঠিক স্বাভাবিক ফুলের মত দেখায়, সেই সেই রং ক্রমে সাজাইয়া এক একটী ফুল রচিত হইয়াছে। পাথরগুলি এরূপ দৃঢ় বদ্ধ যে দেখিলে পাথরের যোড়া বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। খুব ভাল করিয়া দেখিলেও বোধ হয় যেন কোন এক সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় এ সমস্ত চিত্রিত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন একটি প্রকাণ্ড পাথরের ক্ষেত্রে হাজার হাজার স্বর্গীয় ফুল ফুটিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। তাজমহলের দ্বারে উপরিভাগে পারস্য ভাষায় মুসলমানদের ধর্ম-পুস্তক কোরাণ হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতা সকল কৃষ্ণবর্ণ মার্বেল প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

১. এরূপ শুনা যায় যে এই কার্যে পূর্বে যে সকল বহুমূল্য পাথর লাগান হইয়াছিল, ইংরেজেরা সেগুলি খুলিয়া লইয়া তাহাব যাযগায় নকল-পাথর বসাইযা দিয়াছে। একথা সত্য কি না বলা যায় না। সখা-সম্পাদক।

সূর্য উদয় হইবার কিছু পূর্বে তাজ মন্দির ঈষৎ নীল, সূর্য উদয় হইবার পর গোলাপী এবং অস্ত যাইবার সময় লাল বর্ণ দেখা যায়। চন্দ্রের আলোকে তাজ সর্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়।

রাজ্ঞীর গোরস্থান প্রাসাদের সর্ব নিম্নতলে ; সে স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকারময়, এজন্য তথায় আলো লইয়া যাইতে হয়। সমাধি স্থান নানাবিধ বহুমূল্য মণি ও প্রস্তরের কারুকার্যে শোভিত। রাজ্ঞীর সমাধির পার্শ্বেই সম্রাট সাজাহানের সমাধি স্থান ;—সেটিও দেখিতে যারপর নাই মনোহর। তাজের দুটী রূপার কপাট ছিল ; উক্ত কপাটে দশ হাজারেরও অধিক প্রেক লাগান ছিল ; এবং প্রত্যেক প্রেকের উপরে এক একটী মোহর স্থাপিত ছিল কিন্তু এখন আর সে সকল কিছুই নাই। প্রায় আশি বৎসর গত হইল জাঠেরা তাহা লুঠ করিয়া লইয়া গলাইয়া ফেলে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাজমহল নির্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৭ বৎসর কেবল মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায় ; পরে বিশ হাজার লোক ১৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারটী সমাপ্ত করে। ইহা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তোমরা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে তাজমহলের বর্ণনা লেখা গেল, স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য কিছুই বুঝা যায়না ; ভাষাতে এমন কথা নাই যাহা দ্বারা তাজমহলের ঠিক বর্ণনা করা যাইতে পারে। একজন ভ্রমণকারী তাজ দেখিয়া লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে তাজের তুলনা করা যায় এমন কিছুই নাই, তাজই তাজের তুলনার স্থল।"

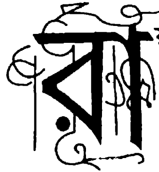
২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ৬-৭।

কার জিৎ

শ্রীমতী ** দেবী

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্-অসাধু সাধুনাজয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক, এবং সত্য দ্বাবা মিথ্যাকে জয় করিবেক।



রায়পুরের বাগানটির বড় শোভা হইয়াছে। গাছে গাছে লতা উঠিয়া, পাতায় পাতায় বিকালবেলার সূর্যের সোণার কিরণ ঝিকমিক করিতেছে, বকুল ও সিউলির তলায় ফুলের তারা ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাগানের মাঝে মাঝে দুর্বাদলের ঘন বনগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের জন্য বিছানা পাতিয়াছে। রায়পুরের যত বালিকা এ সময় এখানে খেলিতে আসিয়াছে। কেহবা ফুল কুড়াইতেছে, কেহবা খুটিম খেলিতেছে, কেহবা গাছের তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ঐখানে একটি বকুল গাছের তলায়—অমলা ও বিমলা ফুল কুড়াইতে মত্ত। টুপটাপ করিয়া একবার এখানে, একবার ওখানে, একবার অমলার মাথায়, একবার বিমলার গায়ে ফুল পড়িতেছে। তাহারা একটি তুলিতে গিয়া একটী মাড়াইতেছে, কতকগুলি আঁচলে রাখিবার সময় কতকগুলি ফেলিয়া দিতেছে।

ফুল আঁচলে রাখিতে বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝি তখন কাহাকে এইদিকে

আসিতে দেখিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওলো অমি, ঐদিকে চল ভাই, ঐ আসছে।" অমনি ভয়ে আঁচল হইতে ফুল পড়িয়া গেল, আর পা সরিল না, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী অন্য বালিকাদের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। সেই জন্য তাহাকে সকলে ভয় করে, তাহাকে সকলে যম মনে করে। কিন্তু লক্ষ্মীর পিতা গ্রামের মধ্যে ধনী সেই জন্য লক্ষ্মী যাহা ইচ্ছা করিলেও অন্য কেহ কথা কহিতে সাহস করে না। লক্ষ্মীও দেখে সে যাহাই করুক কিছুতেই তাহার শাস্তি হয় না, সে নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা করে।

লক্ষ্মী আসিয়া মুখ বেঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গা করিযা, অমলার হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে বলিল "হ্যাঁলো বিমলি, তোদের কি বুকের পাটা? সেদিন বারণ করেছি এগাছের তলায় তোরা কেউ ফুল কুড়াবি নে, আবার এসেছিস? এবার এখানে দেখ্‌তে পেলে হাড় ভেঙ্গে দেব।" অমলা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বিমলা আস্তে আস্তে অমলার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহাদের আঁচলের ফুল আপনার আঁচলে লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে কিছু দূরে কয়েকটি বালিকা ঘুটিম খেলিতেছিল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীকে দেখিয়া বালিকাগুলি একটু ভয়ে ভয়ে খেলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল "আমি খেলিব।" একজন আস্তে আস্তে বলিল "এ হাতটা আগে হার জিৎ হোক।" লক্ষ্মীর রাগ হইল, সে বলিল "কি আমাকে লইয়া খেলিবিনে? দেখিব তোদের এ হাত কে খেলিতে দেয়" বলিয়া সমস্ত ঘুটি গুলি চারিদিকে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া মাত্র তাহার পৃষ্ঠ দেশ লক্ষ্য করিয়া মারিবার ছলে সকল বালিকারা হাত উঠাইয়া আস্তে আস্তে গালি দিতে লাগিল, তাহার সাক্ষাতে ত ভয়ে কিছু বলিতে পারেনা, কাজেই সকলে তাহার পশ্চাতে এইরূপ শোধ তুলিয়া থাকে।

লক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া দেখিল কুসুম কুলগাছ হইতে কুল পাড়িতেছে। লক্ষ্মী একে রাগিয়া আছে, কুল পাড়িতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী জানে সেই বাগানের ফল লক্ষ্মী ভিন্ন আর কাহারো পাড়িবার অধিকার নাই, কিছু না কহিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়াই লক্ষ্মী কুসুমকে এক চড় বসাইয়া দিল, কিন্তু চড় মারিয়া হাত সরাইয়া যাইবার সময় তাহার হাতটি সেই কুল গাছের শাখায় পড়িয়া কাঁটায় বিঁধিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কুসুমের প্রাণে তাহাতে বড় বেদনা লাগিল, লক্ষ্মী যে তাহাকে মারিয়াছে, লক্ষ্মী যে তাহার প্রতি অত্যাচার করে সে তাহা ভুলিয়া গেল। কাছে পুষ্করিণী, কাঁদ কাঁদ চোখে কুসুম লক্ষ্মীকে ধরিয়া তাহার তীরে আনিয়া বসাইল, তাহার পর আপনার আঁচল ছিঁড়িয়া তাহা ভিজাইয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া তাহাতে বার বার জল দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কাহারো নিকট এরূপ প্রতিশোধ পায় নাই, লজ্জায় অনুতাপে সে মরিয়া গেল। কুসুমের ব্যবহারে তাহার হৃদয়ের একটি লুকান তারে আঘাত লাগিল, এতদিন তাহা কেহ জাগাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলিল "কুসুম আজ তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলে এ পর্যন্ত তাহারা আমাকে কেহ শিখায় নাই। তোমার এ উপকার আমি জন্মে ভুলিব না; এই কথা মনে করিয়া আমি তোমার মত হইতে চেষ্টা করিব।" সেই পর্যন্ত লক্ষ্মী একে-বারে বদলাইয়া গেল, আর লক্ষ্মীকে কাহারো প্রতি অত্যাচার করিতে দেখা যায় না। যখনি

অভ্যাস বশতঃ লক্ষ্মী কাহাকেও মারিতে যায় অমনি সেই দিন তার ঘটনাটি মনে পড়ে, অমনি তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠে, অন্যায় কর্ম হইতে বিরত হইতে বল পায়, কুসুমের মত ভাল হইতে সংকল্প করে।

এইরূপ প্রতি মন্দ কাজে কুসুমের ছবি আসিয়া তাহাকে তাহা হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল, লক্ষ্মী ক্রমে যথার্থ লক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল।

* * *

ইহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীর এখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কতদিন পরে লক্ষ্মী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। লক্ষ্মী এখন সকলকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, লক্ষ্মীকেও এখন সকলে ভাল বাসে। লক্ষ্মীর আগেকার যত সমবয়সী সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, কেবল কুসুম আসে নাই। কুসুম কোথায়? কুসুম বুঝি এপৃথিবীর মেয়ে নয়, স্বর্গে ফুটিতে গিয়াছে।

লক্ষ্মী বিকালে সেই ছেলেবেলার বাগানটিতে আসিল, বাগানের চারিদিকে বিষণ্ণ মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া দেখিল। ছেলেবেলা যেখানে যে গাছ গুলি দেখিয়াছিল সকলি তেমনি দেখিল, ছেলেবেলা যেখানে যার সহিত যেমন করিয়া খেলা করিয়াছিল, সকলেরি চিহ্ন যেন দেখিতে পাইল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে সেই কুল গাছটির তলায় আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানেই তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা। লক্ষ্মী সেখান হইতে সেই পুকুর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল,—এইখানেই কত যত্ন করিয়া কুসুম তাহার আহত হাত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিরূপ প্রতিশোধ দিয়া লক্ষ্মীকে সে ভাল করিয়াছে! অশ্রুজলে লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া গেল। লক্ষ্মী মনে মনে বলিল "কুসুম কোথায় তুমি! তোমাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পাইলাম না, তুমি এখন স্বর্গের দেবী!—কিন্তু লক্ষ্মীর হৃদয়ে তুমি চিরকালি ফুটিয়া থাকিবে!"

২ : ২ . ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১৭-১৯।

সুশীলা ও তাহার মা

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সুশীলার মা আজ পীড়িতা হইয়া শয্যায় শুইয়া আছেন, সুশীলা মার কাছে বসিয়া রহিয়াছে; তাহার আর জগতে কেহ নাই, কেবল তাহাদের দুঃখে দুঃখী যাদুমাসীই মধ্যে মধ্যে তাহাদের দেখিতে আসেন ও সাহায্য করেন। সমস্ত দিন বালিকার আহার হয় নাই, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না, মার অসুখে আর জগতে অন্য সুখ সে জানে না। এত রাত্রি হইয়াছে বালিকার চক্ষে নিদ্রা নাই, মা কতবার বলিতেছেন, সে শুনিতেছে না, সুশীলা চুপ করিয়া মার মাথায় হাত বুলাইতেছে ও ভাবিতেছে। আহা! জগৎ-শুদ্ধলোক আনন্দমনে নিদ্রা যাইতেছে, সুশীলার নিদ্রা নাই, ক্ষুধা নাই। যে, দিনে রাত্রিতে ৩ বার আহার করিত সেই-নবম-বর্ষীয়া বালিকার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই। সুশীলা অনেকক্ষণ পরে "ফোষ্" করিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "হা ঈশ্বর! বাছা আমার আহার নিদ্রাতেও বঞ্চিত হইল? তা মা তুমি তোমার মাসীর নিকট চাট্টী খেয়ে এলে না কেন?"

সুঃ—"না মা আমি খাওয়ার জন্য ভাবিতেছি না, তুমি এই যে প্রায় দু-দিন প্রায় কিছু খাওনি, মা?" জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি কি ভাবিতেছ?" "আমি ভাবিতেছি যে, তুমি বলিয়াছ, পরমেশ্বর পরম দয়ালু, আরও তুমি যে বলিতে তিনিই আমাদের সহায়? তা' মা! তিনি কেন আমাদের এমন কষ্টে ফেলেন? এই দেখ, কত লোকের কত আছে; দাদা, মামা, কাকা, বাবা, ঘোড়া, গাড়ী, চাকর, দাসী, তাত আমাদের নাইই। তুমি আমার ছিলে আমরা সমস্ত দিন একত্রে থাকিতাম, তাহাতেও কত সুখী ছিলাম, এতেও তিনি কেন বাধা দিলেন? তোমার আবার জ্বর হইল কেন? হাঁ মা! তুমি ত, অনেক কথা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছ, এবার কিন্তু এইটী বলিতে হইবে, আমাদের অসুখ হয় কেন? তিনি ত যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য। আচ্ছা রোগ কি আমাদের মঙ্গলের জন্য? তা যদি না হয়, তবে দয়ালু পরমেশ্বর কেন মানুষকে রোগ দিয়াছেন?"

ব্যামোয় পড়েও মার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কন্যার মুখে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তিনি রোগের জ্বালা ভুলিয়া গেলেন, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সুশীলাকে আজ আর একটী নুতন কথা শিক্ষা দিবেন এই আনন্দে তাঁহার শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ধীরে ধীরে দেয়ালে ঠেষ দিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন :—"পরমেশ্বর যথার্থই মঙ্গলময়, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার নিকট হইতে আসে না। অনেক লোক আছে তাহারা মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করে ও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে চায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখে না যে তাহারা যাহাকে অমঙ্গল মনে করে পৃথিবীতে তাহাতে কত মঙ্গল হয়, এবং তাহারা যাহাকে সুখ বলে তাহাই পৃথিবীতে কত অনিষ্ট করে। বড় মানুষেরা সুখী, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের যে কত দোষ তাহা কেহ দেখে না। সুখ বা দুঃখ কিছুই আমি বুঝি না; সুখ হয় হউক, দুঃখ পাই ভাল, কিছুতেই আমার ক্ষতি বোধ হয় না। এই তোমার কচি মুখ খানি দেখিতেছি, তাহাতেও যেরূপ আমার আহ্লাদ হয়, আমি মরিয়া গেলে আর দেখিতে পাইব না তাহাতেও দুঃখ নাই। পরমেশ্বর যাহা দিয়াছেন ভোগ করিব ; যাহা দেন নাই তাহার জন্য কেন দুঃখ করিব? বরং যাহা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুখ দুঃখ কিছু মানুষের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কারণ নয়, কিন্তু সততা ও অসততাতেই মানুষের ভাগ্যের পরীক্ষা। ঘোর দুঃখীও যদি ঈশ্বর ভক্ত হয় ও তাঁহার নাম করে, তবে সেও মহৎ লোক ; আবার লাখ টাকা পুঁজি করে, চারিতলা বাড়ীতে যে ব্যক্তি সুখে আছে, সেও যদি পাপী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় এবং তাঁহাকে না ডাকে, তবে সেও অতি নীচ ও হতভাগ্য। তুমি ত জান মা! যে সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, কোন দ্রব্যই চিরস্থায়ী নয়;—সুতরাং তুচ্ছ বস্তুতে কেহ কি সুখী হইতে পারে? দিনকতক মিথ্যা বস্তুতে সুখী হইয়া পরে চিরকাল কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা, এ জীবনে সাংসারিক ক্লেশ পাইয়া যদি পরকালে সুখ পাওয়া যায় সে ত খুবই ভাল। এই জন্যই এত কষ্টেও আমার কষ্ট বোধ হয় না, তোমার মুখ দেখিয়া কত খুশী হই, আর ঈশ্বরকে সর্বদা চিন্তা করিয়াই পরম আনন্দ লাভ করি।

"রোগে কষ্ট হয় সত্য, সাংসারিক ক্লেশেও দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এত প্রকৃতিরই নিয়ম, সকলেই সমান হইতে পারে না, কেহ দুঃখী কেহ সুখী হইবেই। আরও যদি স্থির হইয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে জানিতে পারি যে ইহাদের মধ্যেও মঙ্গল রহিয়াছে। মনে কর জগতে দুঃখ নাই, রোগ নাই ; তাহা হইলে কি কেহ ধার্মিক হইত? সকলেই সুখে মত্ত হইয়া দিন কাটাইত। ঈশ্বর, ধর্ম, পুণ্য, সৎকর্ম প্রভৃতির বিষয় চিন্তাও করিত না।

কিন্তু এখন যে কষ্টে পড়ে, রোগে শয্যাগত হয়, সে অসহায় অবস্থায় ঈশ্বরকে সহায় ভাবিয়া ধার্মিক হইতে চেষ্টা পায়, সুস্থ অবস্থায় কত অন্যায় কত পাপ করিয়াছে তাহা মনে হইয়া অনুতাপ করে, এবং ভবিষ্যতে আর কুকার্য করিবে না, স্থির করে। দেখদেখি রোগ কেমন দরকারী? এই মাত্র যে যুবা রূপ, যৌবন, বল, ধন-মান, প্রভৃতির অহঙ্কারে পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিয়া মদ্যপানে ও অন্যায় কাজে জীবন নষ্ট করিতেছিল, হঠাৎ কুকর্মের ফলে একটা উৎকট পীড়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল;—সেই গৌরবর্ণ শরীরটা মলিন হইয়া গেল, সেই বলশালী হাত দুখানি এখন আর নড়িতে পারে না, সেই অহঙ্কৃত যুবা আর এখন সেরূপ নাই। সে এবার বেশ শিক্ষা পাইয়াছে। এই অবধি প্রতিজ্ঞা করিল যে অন্যায় আর করিবে না, কারণ ঈশ্বর বৈ আর জীবের গতি নাই। সে একজন ধার্মিক সচ্চরিত্র লোক হইয়া উঠিল। কি চমৎকার ক্ষমতা রোগের? সংসার ও টাকাকড়ি বা বড়মান্‌ষির আমোদ যে বৃথা ও কিছুই নয় এ কথাটী শিক্ষা দিতে এমন আর কি আছে? চারদিকে ধূমধাম, আহ্লাদ আমোদ, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ, তার মধ্যে যখন একটী রোগীকে দেখিতে পাই, তখনই মনে হয় এ পৃথিবীতে এরূপ সুখে এরূপ সুস্থ শরীরে চিরকাল থাকিব না, কাজেই ধর্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন আপনিই ছুটিয়া যায়। রোগ শোকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে, যেমন সোণা অগ্নিতে পড়িতে তবে বিশুদ্ধ হয়, মানুষও তেমনি দুঃখে না পড়িলে সাধু ধার্মিক হইতে পায় না। দেখ দেখি দুঃখ, রোগ, শোক মানুষের কত মঙ্গলদায়ক।"

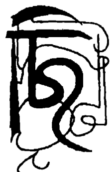
বুদ্ধিমতী বালিকা স্থির মনে সমস্ত শুনিল, সমস্ত বুঝিল, পরে বলিল, "ভাল মা, যাহারা পাপ ও মন্দ কর্ম করে, তাহারাই তবে কেন রোগে পড়ে না, তোমার মত লোক, যারা রাত্রিদিন পরমেশ্বরকে ডাকে, ধর্ম বৈ জানে না, তাহারা কেন কষ্ট পায়? তাহারা কেন রোগে পড়ে?" জননী সস্নেহে ক্ষণেক বালিকার মুখখানি দেখিয়া, একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা! জগদীশ্বর যে মহান, অবোধ্য, অসীম; তাহার বুদ্ধির কথা প্রকাশ করি এমন সাধ্য আমার কৈ! কিন্তু যতটুকু জানি তোমায় বলিব। রোগ শোক যখন মানুষকে পবিত্র করিবার জন্যই, তখন ধার্মিক লোকেরাই বা কেন রোগে পড়িবে না? মানুষ যতই উন্নত হউক, তাহার উন্নতির ত আর সীমা নাই, উহা যে অশেষ। সুতরাং যতই কেন ধার্মিক হও না আরও কষ্টে পড়িলে আরও ধার্মিক হইতে পারিবে। আমার কথা বলিতেছ, আমি ত কত পাপ করি, কত মন্দ চিন্তা মনে স্থান দিই, আমার ত অনেক দোষ আছে যাহা দূর করা আবশ্যক, আমার অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও সাধু, যাঁহারা ভ্রমেও পাপ জানেন না, ঈশ্বরই যাঁহাদের একমাত্র চিন্তার স্থল, এমন ধর্মগত-প্রাণ যাঁহারা, তাঁহারাও কত কষ্টে পড়েন, রোগে কত যন্ত্রণা পান, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার কারণ এই যে দুঃখে তাঁহাদেরও উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া জগতের লোক জানিতে পারে, যে সুখ বা দুঃখ কিছুই নয়, অবস্থার প্রভেদ মাত্র, ধর্মই সারবস্তু। আরও তাহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোকে শিক্ষা পায়, অশেষ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও সাধু ধার্মিক ব্যক্তিরা কেমন অচলভাবে ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন ও কেমন সন্তোষের সহিত দিন কাটান; তাহা দেখিয়া জগৎ-শুদ্ধ লোক অবাক হয়, এবং ধর্মই যে মানুষের রোগে, শোকে, দুঃখে যন্ত্রণায় একমাত্র সহায় ও সুখদাতা বন্ধু, তাহা জানিতে পারে। ধার্মিক লোকের নিকট রোগ শোক যে কিছুই করিতে পারে না, তাহা শিক্ষা পায়। সুতরাং রোগ প্রভৃতি সাংসারিক অমঙ্গল সর্বদাই অশেষ কল্যাণ করিয়া থাকে, ইহারা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার

ফল স্বরূপ। ইহাতে দুঃখ বোধ করিতে নাই, অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায়। যাঁহারা সৎ, পবিত্র, ও ঈশ্বর বিশ্বাসী তাঁহারা কিছুতেই কাতর হন না। মঙ্গলময় ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল, যে অবস্থায় আমাদিগকে রাখেন সেই সুখের অবস্থা। কেবল যদি তাঁহাকে আমরা মনে রাখিতে পারি তাহা হইলেই ঘোর দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে তাহারা অমূল্য ধন পাইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি-ছাড়া হইয়া কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। তাই মা! কখনও তাঁহার কার্যকে মন্দ বলে সন্দেহ করিও না। আজ এস নিদ্রা যাই।"

তৎপরে সুশীলা হাত দুটী যুড়িয়া জানুপাতিয়া মায়ের পার্শ্বে বসিল, এবং পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ডাকিয়া মাতৃপার্শ্বে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। আহা! ধন্যা সেই মা, যিনি এমন কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গবাস করেন। ধন্যা সেই বালিকা, যে এমন মাতা পাইয়াছে, তাহার কুড়ে ঘরও রাজার বাড়ীর মতন, এবং দুদিন না খাইলেও সে মধু খাইতেছে। ২ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ১৯-২১।

অবোধ ছেলে

প্রমদাচরণ সেন



ছি! ছি! ছি! ছি! প্রিয়! তোমাকে কতদিন বলেছি, যদি বনের পাখীকে ধরে নিয়ে এসেছ তবে তাকে সময়ে খেতে দিও। দেখদেখি, পাখী মরে গেছে! এখন কার দোষ দিই বল্‌তো?

মায়ের এই কথা শুনিয়া প্রিয়নাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি ঝিকে খাবার দিতে বলে মামার বাড়ীতে গেলাম; ঝি কেন খাবার দিলেনা? অ্যাঁ, অ্যাঁ, সে কেন খাবার দিলে না? আমার দোষ কি?"



মা বলিলেন—"ওরে মূর্খছেলে! ঝি কি তোমার কথা শুনতে পেয়েছিল? আর শুন্‌তে পেয়েও যদি না দিয়ে থাকে, তা'হলেই বা তার অপরাধ কি? তার অনেক কাজ, হাতের কাজ গুলো না শেষ করে অন্য কাজে যেতে পারেনা। ঝি কি বন থেকে পাখী কুড়িয়ে এনেছিল? আহা হা! বনে থাকিলে পাখীটা কত সুখে থাকিত। হাজার হাজার ঝাঁক বেঁধে কেমন মনের আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়াত। কত ভাল ভাল ফল খেত! তা এসব সুখ থেকে তাকে টেনে আন্‌তেই বা তোমায় কে বলেছিল; আর এমন করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেল্‌তেইবা কে বলেছিল?" বালক আর কোন কথা বলিতে পারিলনা; কেবল কাঁদিতে লাগিল।

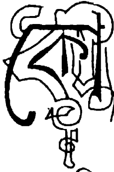
মা বলিলেন "দেখ বাছা! নিজের জন্য পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখেছিলে, এই তো এক অন্যায় কাজ, তারপরে যদি তাকে ভাল খেতে দিতে, যত্ন কর্‌তে, তাহলেও কতক সুখের কথা ছিল, কিন্তু তাতেও তোমার মন উঠলো না,—আবার না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌লে?

এ বড় অন্যায় কাজ হয়েছে, তা'বোধ হয় বুঝতে না পেরেই এরূপ করেছ। তা'যাক্, ভবিষ্যতে সাবধান হ'ও, নিজের সুখের জন্য কাহাকেও মিছামিছি ক্লেশ দিওনা। আরও বিশেষ, যারা কথা বলে মনের কষ্ট জানাতে পারেনা, কি নিজের দুঃখ দূর কর্‌তে পারেনা, কখনও তাদের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌না।"

২ : ২ : ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪, পৃ. ২২-২৩।

রামধনু

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ন একটী স্কুলে বিকালে ছুটী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া ছাত্ররা তখনও বাড়ী যায় নাই। কয়েকটা ছাত্র বৃষ্টি থামিবার পর বাড়ী যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল ; ইহার মধ্যে তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, 'দেখ, আকাশে কেমন সুন্দর রামধনুক উঠিয়াছে।' তাহা শুনিয়া কয়েকটী বালক সেই রাম ধনুকের দিকে তাকাইয়া নানারকম কথা বলিতে লাগিল ; কেহ বলিল 'দেখ ঐ রামধনুক কেমন সুন্দর লাল দেখা যাইতেছে!' কেহবা বলিল 'দেখ, ঐ রামধনুক কত লম্বা!' ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে গোপাল নামে একটী বালক বলিল 'আচ্ছা, বিপিন, ঐ রামধনুক কি জিনিষ বল দেখি।' বিপিন বলিল 'আমি শুনিয়াছি যে ত্রেতাযুগে রাম নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তিনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তাঁহার এক বৃহৎ ধনুক ছিল, সেই ধনুক সময় সময় দেখা যায়।' গোপাল তাহা শুনিয়া বলিল 'রামধনুক যদি বাস্তবিক ধনুকই হয়, তবে উহা কোন সময়ে দেখা যায় আর কোন সময়ে দেখা যায়না কেন? আকাশে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র বৎসরের সকল সময়েই ত দেখা যায়।' এইরূপে ক্রম ক্রমে রামধনুক বাস্তবিক কি জিনিষ তাহা লইয়া বালকদিগের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল ; তাহারা শেষে শিক্ষকের নিকট যাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষক বলিলেন 'আচ্ছা, গোপাল, প্রথম দেখ দেখি রামধনুকে কয়টা রং আছে।' গোপাল রাম ধনুকের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া গুণিয়া বলিল 'আন্দাজ ছয় সাতটী রং আছে।' তখন শিক্ষক অন্যান্য সকলকেও বলিলেন যে তাহারাও রামধনুকে কয়টী রং আছে ভাল করিয়া দেখুক। সকলে দেখিয়া সাব্যস্ত করিল যে রাম ধনুকে এই সাতটী রং আছে, লাল, অরেঞ্জ্ (কমলা লেবুর রঙ্গের ন্যায় রং), হরিদ্রা, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো (গাঢ় নীল), আর ভায়লেট (বেগুণে)। ক্রমে ক্রমে আকাশে রৌদ্র উঠিলে, শিক্ষক তখন রৌদ্রের মধ্যে একটা ছোট গাছের নিকট একখানা লম্বা তিন কোণা কাচ লম্বা করিয়া ধরিলেন, আর দেখা গেল যে ঐ গাছের ছায়ার উপর এক যায়গায় সুন্দর রঙ্গিন আলোক পড়িল। তখন সকল বালকই সেই আলোকের দিকে তাকাইল ; তাহারা দেখিতে পাইল যে রামধনুকে যে কয়টী রং দেখিয়াছিল ঐ আলোকেই ঠিক সেই কয়টী রং আছে, ঐ আলোকে আর রামধনুকে বিভেদ এই যে রামধনুক অত্যন্ত প্রশস্ত আর ঐ আলোক তিন চার অঙ্গুলির অধিক প্রশস্ত নহে! শিক্ষক তাঁহার হাতে যে কাচ লম্বা করিয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহা নামাইয়া রাখিলেন আর অমনি গাছের ছায়ার উপরে যে আলোক পড়িয়াছিল তাহা অদৃশ্য হইল। তিনি আবার কাচ খানি সোজা করিয়া ধরিলেন আবার সেই আলোক দেখা গেল ; আবার তাহা নামাইয়া

রাখিলেন, আবার আলোক অদৃশ্য হইল। এই রকমে যতবার তিনি কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন ততবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল, আর যতবার কাচখানি নামাইয়া রাখিলেন ততবার আলোক অদৃশ্য হইল। বালকেরা ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিল যে ঐ কাচ হইতেই ঐ আলোক বাহির হইয়া আসিতেছে। শিক্ষক ছায়ায় লইয়া গিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন, তখন আর ওরকম আলোক দেখা গেল না ; যতক্ষণ ছায়ায় রাখিলেন, ততক্ষণ রঙ্গিন আলোক দেখা গেল না। আবার যখন রৌদ্রে আনিয়া কাচখানি লম্বা করিয়া ধরিলেন তখন আবার রঙ্গিন আলোক দেখা গেল। এই রকমে যতবার রৌদ্রে কাচ ধরিলেন ততবারই রঙ্গিন আলোক দেখা গেল আর যতবার ছায়ায় কাচ ধরিলেন ততবার তাহা দেখা গেল না। ছাত্রেরা ইহাতে বুঝিতে পারিল যে সূর্যের আলোক ঐ কাচের উপর পড়িলে যখন বাহির হইয়া আইসে তখন বিবিধ বর্ণ ধারণ করে। সূর্যের আলোক সাদা, কিন্তু ঐ কাচের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা রামধনুকে যে সাতটী রং আছে সেই সাত রংঙের আলোকে বিভক্ত হইয়া বাহির হয়। ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল যে যাহাকে আমরা সাদা রং বলি, তাহা একটী রং নহে, তাহা সাতটী ভিন্ন ভিন্ন রং একত্র হইয়া হয়। শিক্ষক এখন বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা এখন বলিতে পার, আকাশে রামধনুক কেন দেখা যায়?' কেহই ভাল উত্তর করিতে পারিল না। তাহাতে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা' বলিতে পার, রামধনুক কখন দেখা যায়? গোপাল বলিল 'বর্ষাকালে।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন বর্ষাকালে আকাশের অবস্থা কেমন?' বিপিন বলিল 'আকাশে তখন খুব মেঘ থাকে?' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'রামধনুক দিনের বেলায় উঠে কি রাত্রে উঠে?' একটী বালক বলিল 'নিশ্চয়ই দিনের বেলায়।' শিক্ষক পুনরায় বলিলেন 'এখন তোমরা বলিতে পার, আকাশে রামধনু ওঠে কেন?' গোপাল বলিল 'আমি পারি।' শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল দেখি?' গোপাল বলিল 'সূর্যের আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হয়, মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিবিধ বর্ণের আলোকে বিভক্ত হইতে পারে।' শিক্ষক বলিলেন 'ঠিক বলিয়াছ। তিন কোণা কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্যের আলোক যেমন সাত রকমের আলোকে বিভক্ত হয়, সূর্যের আলোক মেঘের জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সেই রকম বিভক্ত হয়, ও তাহাতে আকাশে রামধনু দেখা যায়।' শিক্ষক তাহার পর এই উপলক্ষে বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে 'রামধনুকে যে সাতটী রং দেখা যায় তাহার মধ্যে লাল, সবুজ, আর ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, আর অন্য কয়টী বর্ণ ইহাদিগের হইতে উৎপন্ন। লালের মধ্যে লাল ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, সবুজের মধ্যে সবুজ ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, ভায়লেটের মধ্যে ভায়লেট্ ভিন্ন অন্য কোন রং নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা হরিদ্রা রং বলি তাহা লাল ও সবুজ এই দুই বর্ণ একত্র করিলে উৎপন্ন হয় : নীল রং, সবুজ রং, ভায়লেট এই দুই রং হইতে উৎপন্ন ;(সাদা রং লাল, সবুজ ও ভাললেট এই তিন হইতে উৎপন্ন।) যাহাকে আমরা কাল রং বলি তাহা বাস্তবিক রং নহে, তাহা রংএর অভাব মাত্র ;অর্থাৎ যেখানে আমরা কোন রংই দেখিতে পাই না তাহাকে আমরা কাল বলিয়া থাকি। আমরা চারিদিকে যে সকল নানাবর্ণের গাছ, ফুল, পাখী ইত্যাদি দেখিতে পাই তাহাদের রং কোথা হইতে আইসে? সূর্যের রং সাদা, তাহা সূর্যের আলোকেই আছে। কিন্তু গাছের পাতায় কোন আলোক নাই, অন্ধকার রাত্রে গাছের পাতা দেখা যায় না; যদি গাছের পাতায়

আলোক থাকিত তবে তাহা অন্ধকার রাত্রেও দেখা যাইত। সূর্যের আলোকে আমরা গাছের পাতা দিনের বেলায় দেখিতে পাই; সূর্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িয়া যখন তাহা হইতে আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা পাতা দেখিতে পাই। সূর্যের আলোক সাদা, তবে গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন? ইহার উত্তর এই যে সূর্যের আলোক গাছের পাতায় পড়িলে তাহার সবুজ অংশ টুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ ঐ পাতার মধ্যে থাকিয়া যায়। যদি সূর্যের আলোকের সমুদায় অংশ গাছের পাতা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তবে গাছের পাতাও সাদা দেখাইত। এই রূপে সূর্যের আলোকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে সূর্যের আলোকের যে যে প্রকারের অংশ ফিরিয়া বাহিরে আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। লাল গোলাপ ফুলের রং লাল, কারণ তাহার মধ্য হইতে সূর্যের লাল অংশটুকু বাহির হইয়া আইসে, অন্যান্য অংশ গোলাপ ফুলের মধ্যেই রহিয়া যায়। সাদা গোলাপের রং সাদা, কারণ সূর্যের আলোকের সমুদায় প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া বাহিরে আইসে। কালির রং কাল, কারণ সূর্যের আলোকের কোন প্রকার অংশই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না। শিক্ষক অবশেষে তাঁহার ছাত্রদিগকে এই বুঝাইয়া দিলেন যে আমরা যত রকম রং দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে, লাল, সবুজ ও ভায়লেট এই তিনটী মূলবর্ণ, অন্যান্য সমুদায় বর্ণ ইহাদের মধ্যে একটী হইতে কি দুই বা তিনের যোগে উৎপন্ন ; যে সকল বস্তুর নিজের আলোক আছে, তাহাদিগের অনেকের বর্ণই তাহাদিগের বর্ণ। আর যে সকল বস্তুর নিজের আলোক নাই, অন্য কোন বস্তুর আলোকে যাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগের বর্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে কি প্রকার আলোক বাহির হইয়া আসিতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

২ : ২ . ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ২৩-২৬।



শ্বেত ভল্লুক

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



উপরে যে জন্তুর নাম দেখিতেছ, তাহা কিরূপ জান কি? এই প্রাণী কি তোমরা কখন দেখিয়াছ? না দেখ নাই। ল্যাপ্‌ল্যান্ড, উত্তর রুসিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেই ইহারা বাস করে। আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় গরম দেশে ইহারা বাঁচে না। ইহারা খুব মোটা, আকারে এদেশি ভালুকেরই মত, কিছু বড়ও হয়। ইহাদের সর্ব শরীর বড় বড় সাদা লোমে ঢাকা। ইহাদের চক্ষু ছোট ছোট ও পায়ের তলায় এক এক গোছা বড় বড় পুরু লোম হয়। সচরাচর ইহারা নদী, হ্রদ বা সমুদ্র হইতে বড় বড় মাছ ধরিয়া খায়, আর যখন তারা না পায় তখন অন্যান্য জন্তু খাইয়াও বাঁচে। আর কিছু না পাইলে অবশেষে ছোট ছোট গাছপালাও খাইয়া থাকে।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কাহারও অসন্তোষের কারণ নাই। তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া কত বুদ্ধি দিয়াছেন, মানুষ সেই বুদ্ধিবলে সকল অভাব দূর করিতেছে ও কত নূতন নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায় বাহির করিতেছে। ঘোরতর গ্রীষ্ম, যেখানে রৌদ্রে মাটী ফাটিয়া যাইতেছে, মানুষ সেখানে ছাতা, পাখা, খসখসী, বরফ-জল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া গ্রীষ্মের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতেছে। আবার যেখানে ভয়ানক শীত, নদী হ্রদ সাগরাদি জমিয়া বরফের রাস্তা ও বরফের মাঠ হইয়া থাকে, সেই ভয়ানক স্থানেও বনার্ত, কম্বল, অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি উপায় করিয়া শীতের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে কমাইয়া নির্বিঘ্নে কাল কাটাইতেছে। কোথাও লাঙ্গল লাগাইয়াও বীজবপন করিয়া পৃথিবী হইতে শস্য জন্মাইয়া সুখে আহার করিতেছে, কোন স্থানে বা ধনুর্বাণ অথবা গুলি বারুদের সাহায্যে নানাবিধ পশু বধ করিয়া মাংস দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। স্থান বিশেষে বা ঋতু বিশেষে তাহাদের সুখের কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর তো ইতর জন্তুদিগকে এত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান করেন নাই। তিনি কি নিষ্ঠুর? কেবল কষ্ট দিবার জন্যই কি ইতর প্রাণীদিগকে সৃজন করিয়াছেন?

—ছি ছি!! বালকগণ! কখন এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়া অপরাধী হইও না। তাঁহার দয়ার চোখে সবাই সমান। তিনি ইতর জন্তুদিগকে মনুষ্যের ন্যায় এত বোধশক্তি দেন নাই সত্য, কিন্তু তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল এ প্রকার কৌশল ও দয়ার সহিত গঠিত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অপার করুণাময় না বলিয়া থাকা যায় না।

এই শ্বেত ভালুকেরা ভয়ানক শীতল দেশের নিবাসী, এই জন্যই পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব শরীর ঘন লোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগকে সর্বদা বরফের উপরেই চলিতে ফিরিতে হয়, এই জন্যই ইহাদের পায়ের তলায়ও এক এক গোছা লোম দিয়াছেন! আমাদের দেশীয় ভাল্লুকদিগের সেরূপ নাই। আরও দেখ ইহাদের বর্ণ যদি কাল হইত তাহা হইলে ইহারা কখন প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না। আপাততঃ একথাটা যেন ঠিক মনে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে কথাটী সত্য। উত্তর কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ দেশ সকলে ভয়ানক শীত। পূর্বেই বলিয়াছি তথায় বরফই প্রধান পদার্থ, এবং এই বরফের নিম্নস্থ জলের মধ্যে যে সকল মৎস্য বেড়ায় তাহারাই বাহিরে আসিয়া পড়িলে এই ভালুকের আহার হয়। সাদা রঙ্গের বরফ রাশি চারিদিকে স্তূপাকারে রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া মাছেদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহারা নির্ভয়ে মধ্যে মধ্যে এই বরফ স্তূপের উপরে বা পার্শ্বে রৌদ্র ও বায়ু সেবনের জন্য আসিয়া থাকে। ভল্লুকেরা এই বরফের মধ্যে আপনাদের শরীরের বর্ণ মিলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, মৎস্যাদি বাহির হইলেই অলক্ষিত ভাবে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও নষ্ট করে। যদি ইহাদের বর্ণ অন্যরূপ হইত তাহা হইলে শ্বেত বরফের গায়ে সুস্পষ্ট দেখা যাইত, সুতরাং মৎসেরাও তাহা দেখিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিত। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মাছ ধরিতে না পারিয়া কাল বা অন্য রঙ্গের ভল্লুককে অবশেষে অনাহারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই দয়াময় বিধাতা ইহাদিগকে শ্বেত বর্ণের করিয়া দিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণা অপার, মহিমা অতুল! তাঁহার ক্রিয়া কলাপ আমরা যতই পর্যালোচনা করি, ততই আশ্চর্য্যান্বিত হই, ততই তাঁহার অসীম বুদ্ধি কৌশল ও দয়ার প্রমাণ দেখিয়া মোহিত হই।

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ ৩৭-৩৯।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল

কুমারী * দেবী


কজন বড় মানুষের স্ত্রী ফুল বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু সমুদায় ফুলের মধ্যে আবার গোলাপ ফুলই অধিক ভাল বাসিতেন. নানা দেশের, নানা রকমের অতি সুন্দর সুন্দর গোলাপফুলের গাছ তাঁহার বাগানে ছিল। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে অতি মনোহর নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু এত শোভা, এত ফুলের বাহারের মধ্যেও হায়! হায়! তাঁহার রাজার ঘরে দুঃখ, পাপ ও যন্ত্রণা সর্বদাই বাস করিত। এক দিন এই সুন্দর গৃহের মধ্যে তিনি অতি সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় চিকিৎসকই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন তাঁহার জীবনের আশা করা বৃথা। তিনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন

না। তাঁহাদের মধ্যে একজন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক বলিলেন "এখনও ইঁহার জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে ফুল সুন্দর ও যাহা সর্বদাই পবিত্র ও উজ্জ্বল থাকে এমন ফুল যদি ইহার চক্ষের সম্মুখে ধরা যায় তাহা হইলে কখনই ইঁহার মৃত্যু হইবে না।" এই কথা শুনিয়া নানা দেশের নানা লোক আপন আপন বাগানের সুন্দর সুন্দর গোলাপ আনিল। কিন্তু কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। এ ফুল ভালবাসার বাগান হইতে তুলিতে হয় ; গোলাপটী যেন সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও উচ্চ ভালবাসায় গঠিত হয়। জ্ঞানী লোকটী অবশেষে বলিলেন, "কেহই যথার্থ ফুলের নামটী করেন নাই। কোথায় এ ফুল ফোটে তাহাও কেহ বলেন নাই। এ পুষ্প মহা ধার্মিক লোকদিগের শ্মশানে প্রস্ফুটিত হয়। এ ফুল কখন শুকায় না, কখন ঝরিয়া পড়ে না।" একজন মহিলা হাসিতে হাসিতে ফুলের মত আপনার সুন্দর ছেলেটার হাত ধরিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফুলের কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি জানি কোথায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ আছে—আমার এই বাছার লাল গালদুটী যেন গোলাপ ফুটিয়া আছে। যখন ললিত আমার শৈশবের পবিত্র ও নির্মল ভালবাসা দেখায়, আর যখন ঘুম থেকে ঐ সরলতা মাখা বড় বড় চক্ষু দুটী তুলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া শৈশবের পবিত্র হাসি হাসে, আমি তখনই দেখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল তাহাতেই ফুটেছে ;—এই আমার নির্মল ফুল।" তখন জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "হাঁ ইহাও একটি অতি মনোহর ফুল বটে ; কিন্তু আরও একটী ফুল আছে যাহা ইহা অপেক্ষাও সুন্দর।" আর একটী রমণী বলিলেন "আমি একটী ফুল দেখিয়াছি যাহা এই সুন্দর ফুলটীর চেয়ে আরও মনোহর, সেই ফুল এই।" এই বলিয়া শয্যাগতা রোগকাতরা স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়া দিলেন। "ইহা অপেক্ষা সুন্দর ফুল আর ফোটে না ; আমি দেখিয়াছি যখন ইনি আপনার সমুদায় সুন্দর সুন্দর বসনভূষণ খুলিয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের পীড়িত সন্তানকে বুকে ধরিয়া সমুদায় রাত্রি কেবল চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন, এবং ভগবানের নিকট "তুমি যা কর, ভগবান!" এই বলিয়া পুত্রের সুকোমল মুখখানি চুম্বন করিয়াছেন।—আমি তখনই দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল এই বাটীতেই ফুটিয়াছে।" "এই যে ফুল ইহাও চমৎকার কিন্তু বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ ফুল ইহাও নয়।" তখন একজন ধার্মিক, বৃদ্ধলোক বলিলেন, "এক গরিবের কুটীরে দেখিয়াছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বাস্তবিকই সেখানে ফুটিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যখন সেই পবিত্র ফুলটী প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হাত দুখানি যোড় করিয়া চক্ষু দুটী মুদিয়া ঈশ্বরের পূজাতে নিযুক্ত থাকে তখন সেই বালিকার পবিত্র মুখখানিতে স্বর্গের শোভা প্রস্ফুটিত হয় ; আমার তখনই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল বুঝি এই। সেই ফুলটী বাস্তবিকই নির্মল, পবিত্র প্রেমের ছবি। ঈশ্বর এই বালিকাকে আশীর্বাদ করুন। কিন্তু এখনও কেহই সেই ফুলটীর নাম করেন নাই।" সেই সময় গৃহের মধ্যে একটী সুন্দর বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বালকটীই পীড়িতা রমণীর রত্ন। সে ছলছল চক্ষে মাকে বলিল "মা, আমি তোমাকে এই সুন্দর বই হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।" এই বলিয়া সে একখানি পুস্তক হইতে করুণাময় পরমেশ্বরের মহিমা পড়িয়া শুনাইল। আর এই কথাগুলি শুনিবামাত্র তাহার মায়ের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সেই কথা গুলি এই—

"করুণাময় দেবতা আমাদের ইহকাল পরকালের এক মাত্র গতি, আর অন্য গতি নাই।"

তখন তাহার মাতা বলিলেন "আমি দেখিয়াছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল কোথায় ; এই কথা গুলির ভিতর সেই শ্রেষ্ঠ ফুল ফুটিয়াছে। যে এ ফুল দেখিয়াছে সেই অমর ; তাহার আর মৃত্যু নাই।"

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ ৩৯-৪০।

ঐতিহাসিক গল্প

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রথম গল্প



গীন বাবু বিকাল বেলা ছাদে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। সরলা, বিমলা, ভরলা, প্রমীলা, নরেন, সুরেন ও ব্রজেন আসিয়া "দাদা, দাদা" বলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবুর তিনটি বোন ও তিনটি ভাই বোনেদের মধ্যে সরলা সকলের বড়, তার বয়স ১৪ বৎসর। নরেন সরলার ছোট তার বয়স ১৩ বৎসর। প্রমীলা সকলের ছোট তার বয়স সাত বছর। ইহারা সকলেই দাদাকে বড় ভাল বাসে। দাদাও ভাই বোন সকলকে বড় ভাল বাসেন। প্রতিদিন বিকালবেলা যোগীন বাবু কলেজ হইতে আসিলেই ইহারা সকলে গিয়া তাঁহার মুখে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর গল্প শোনে। আজও গল্প শুনিবার জন্য সকলে গিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াল। সরলা দাদার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। বিমলা তাঁহার দাড়ি ধরিয়া আদর করিতে লাগলি, তরলা তাঁহার একপাশে দাঁড়াইয়া জামার হাতের বোতামটা একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমীলা তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য মনে খেলা করিতে লাগিল। নরেন, সুরেন ও ব্রজেন তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সকলেই "দাদা গল্প বল, গল্প বল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যোগীন বাবু হাসিয়া হাসিয়া সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন,—"কি গল্প শুনিবে বল দেখি?" প্রমীলা বলিয়া উঠিল,—"সেই বাঘের গল্প বল, দাদা।"

ভরলা বলিল,—"না" দাদা সেই জঙ্গলে একটা ছেলে পড়েছিল, ঐ গল্পটা বল।'

সরলা বলিল,—"না দাদা, একটা নূতন গল্প বল।"

তখন সুরেন, নরেন, ভরলা, বিমলা সকলেই বলিল,—"বেশ দাদা! আজ একটা নতুন গল্প বল।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তোমরা বসো।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই যোগীন বাবুর সমুখে গিয়া বসিল। কেবল সরলা দাদার অনুমতি লইয়া তাঁহার পাশে তাঁহার হাতটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন ;—"আচ্ছা বল দেখি এবাড়ী কার?"

সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের।" যোগীন,—"এ পাড়া কার?"

সকলে,—"আমাদের"।

যোগীন বাবু—"যেমন আমাদের বাড়ী আছে। যেমন আমাদের পাড়া আছে, তেমনি আমাদের একটা গ্রাম আছে ও তেমনি আমাদের একটা দেশও আছে। অনেক গুলি বাড়ীতে

একটা পাড়া হয়, আনেকগুলি পাড়াতে একটী গ্রাম হয়, অনেকগুলি গ্রামে একটা জেলা হয়, অনেকগুলি জেলাতে একটা ছোট দেশ হয়, তাহাকে প্রদেশ বলে। আর অনেকগুলি প্রদেশে একটা দেশ হয়। আমাদের দেশ খুব বড়। তাহার নাম তোমরা জান কি?"

নরেন বলিল,—"জানি বই কি? আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ।"

তখন বিমলা, ভরলা ও সুরেনও এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"ভারতবর্ষ জানি বই কি?"

যোগীন বাবু তখন আবার বলিতে লাগিলেন,—" এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আমাদের পাড়াকে, আমাদের গ্রামকে যেমন আমরা বেশী ভালবাসি, এই দেশকেও তেমনি আর আর দেশের চাইতে আমরা বেশী ভালবাসি। আমাদের বাড়ীর লোকেরা যেমন আমাদের আপনার লোক, তেমনি আমাদের যে দেশ সেই দেশেরে লোকেরাও আর আর দেশের লোকের চাইতে আমাদের বেশী আপনার লোক। যে ভারতবর্ষের লোক সেই আমাদের ভাই, তাহাকেই আমাদের আপনার ভাইয়ের মত আদর করা উচিত।"

"এই ভারতবর্ষ এখন আমাদের আপনার দেশ হইয়াছে, কিন্তু তিন চার হাজার বছর আগে ইহা আমাদের দেশ ছিল না। তখন এই দেশে আর এক জাতের লোক ছিল। তারা বড় অসভ্য ছিল। কাঁচা মাংস খাইত, বনে বনে থাকিত। তারা ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না, কাপড় পরিতে জানিত না, চাষ করিতে জানিত না, তারা অতি অসভ্য ছিল। আজ কাল আর এ দেশে সে জাতের লোক বেশী নাই। কেবল কোনও কোনও পাহাড়ে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নাগা, কুকী, সাঁওতাল, ভিল, এই যে সকল অসভ্য জাতি পাহাড়ে আছে, ইহারাই সেই আগে কার অসভ্য লোকদিগের এক জাত।"

"হাজার হাজার বছর পূর্বে আমাদের জাতের লোকেরা আর এক দেশে বাস করিতেন। সে দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে, অনেক দূরে। এক বাড়ীতে খুব বেশী লোক হইলে যেমন বাড়ীর লোকেরা দুভাগ হইয়া দুটো বাড়ী করে, তেমনি, একই দেশে যদি কখনও খুব বেশী লোক হয়, তখন সেই দেশের লোকেরা দলে দলে আর আর দেশে, যাইতে আরম্ভ করে। আমাদের আগেকার দেশের লোকরাও এই জন্য দলে দলে আর আর দেশে যাইতে লাগিলেন। একদল পশ্চিম মুখো গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধিলেন। সাহেবেরা এই দলেরই বংশের লোক। আর এক দল পারস্য দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশের অসভ্য লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই দেশ দখল করিলেন।"

সরলা বলিল,—"তবে দাদা, এ দেশ ত আমাদের নয়। আমরা আর এক জাতের দেশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি বইত নয়?"

যোগীন,—"হ্যাঁ, প্রথম প্রথম, এ দেশ আমাদের, এ কথা বল্লা যাইত না বটে, কিন্তু এখন এটা আমাদেরই হইয়াছে।"

সরলা—"হ্যাঁ দাদা, জোর করে আর এক জনের জিনিষ কেড়ে নিলে তা কি কখনও আমার হতে পারে?"

যোগীন,—"প্রথম প্রথম এ দেশ আমাদের ছিল না সত্য, কিন্তু যখন আমরা ও দেশে ঘর বাড়ী বাঁধিলাম, তখন আমরাও সেই আগেকার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশেরই লোক হইলাম। এই দেশ তাহাদের ও আমাদেরও ; এখন আমরা সকলেই এই দেশের লোক।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা দাদা, সাহেবেরাও কি এই দেশের লোক?"

যোগীন,—"না সাহেবেরা আমাদের দেশের লোক নন ; তাঁরা এ দেশে যদি ঘর বাড়ী বাঁধিয়া চিরকালের জন্য বসতি করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের লোক হইতেন। এখন তাঁরা এ দেশে কাজ করিতে আসেন, কাজ শেষ হইলেই আবার আপনার দেশে চলিয়া যান, কাজেই সাহেবেরা আমাদের আপনার দেশের লোক নন-আজ আমাদের এই গল্পটা এখানেই শেষ হউক ; রাত হয়েছে। তোমারাও এখন একটুকু পড়া শুনা কর গিয়ে।"

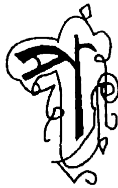
সকলেই তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি আজ কি শিখিলে?" নরেন বলিল—"আমি বলিব কি, দাদা?" বিমলা ও সরলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমি বলিব, দাদা।"

যোগীন বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা সরলা তুমি বল দেখি আজ কি গল্প হলো?" সরলা বলিল, "এই ভারতবর্ষ আমাদের আপনার দেশ, এদেশের লোকদিগকে আমাদের ভালবাসা উচিত, তাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। এই ভারতবর্ষ এখন আমাদেরই দেশ কিন্তু হাজার হাজার বছর অগে এদেশে নানা অসভ্য জাতের বাস ছিল। ভীল, সাওতাল, খাসিয়া, এরা সেই সকল জঙ্গলী জাতের সন্তান সন্ততি। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অনেক দূরে এক দেশে বাস করিতেন। সেখানে জায়গার অকুলান হওয়াতে তাঁরা দলে দলে সেই দেশ ছাড়িয়া আর আর দেশে যান। প্রথমে একদল পশ্চিম দিকে গিয়া ইউরোপে ঘর বাড়ী বাঁধেন। তাঁহারাই সাহেবদের পূর্ব পুরুষ। তার কিছুদিন পরে আর একদল পারস্যদেশে যান। ও একদল ভারতবর্ষে ঢুকেন। ইহাঁরাই আমাদের পূর্ব পুরুষ।" যোগীন বাবু বলিলেন,—"বেশ হয়েছে, সকলে এসব কথা মনে রেখো। এখন পড়া শুনা কর গিয়ে।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় করিয়া আপনার পড়িবার ঘরে গেলেন।

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৪০-৪২।

দ্বিতীয় গল্প



পরদিন বিকাল বেলা আবার তাঁহার ভাই বোন সকলে গল্প শুনিবার জন্য একত্রিত হইলে, যোগীনবাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে এক জাতীয় বড় কাল, বড় অসভ্য লোক এই সুন্দর দেশ দখল করিয়া রহিয়াছে। বহুকাল ব্যাপিয়া এই সকল অসভ্য লোকের সঙ্গে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের যুদ্ধ হইল। বার বার যুদ্ধে হারিয়া গিয়াও এই অসভ্য জাতেরা আর্যদিগকে বিরক্ত করিতে ছাড়িল না। যখনই সুবিধা বুঝিত তখনই আসিয়া তাহাদিগের উপর উৎপাত করিত। ইহাঁদের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিত, জিনিষ পত্র লুটপাট করিত, ও ইহাঁরা যে সকল যাগ যজ্ঞ করিতেন তাহার ব্যাঘাত জন্মাইত। এই সকল অসভ্য জাতিকে পূর্ব পুরুষেরা রাক্ষস বলিয়া ডাকিতেন। বহুদিন ধরিয়া রাক্ষসদিগের সঙ্গে আর্যদিগের যুদ্ধ হইল পরে রাক্ষসেরা যুদ্ধে একেবারে হারিয়া গেল। ও তখন আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা পাঞ্জাব দেশে আপনাদের রাজ্য স্থাপন করিলেন।"

বিমলা,—"দাদা, পাঞ্জাব দেশ কোথায়?"

যোগীন,—"ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে যে দেশ তাহাকেই পাঞ্জাব বলে। আর্য্যগণ নাকি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, সুতরাং সেই দেশেই সকলের প্রথমে তাঁহাদের দখলে আসে।"

একটুকু পরে যোগীন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন—"আজ কাল তোমরা এদেশে নানা জাতির লোক দেখ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইংরাজ, ইহুদি, এই যে নানা জাতি আছে তাহার কথা বলিতেছি না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এই রূপ নানা জাতি দেখিতেছ। এক জাতির লোক আর এক জাতির লোকের হাতে খায় না, এক জাতির লোক অপর জাতির লোককে ঘৃণা করে, এই সকল দেখিতেছ। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যখন সর্ব প্রথমে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জাতিভেদ ছিল না। তখন সকলেই এক জাতি ছিল। আবার এখন যেমন বৈষ্ণব শাক্ত এইরূপ নানা ধর্মের লোকও হিন্দুদের ভিতর দেখিতে পাও, তাহাও ছিল না। তখন সকলেই এক ধর্ম মানিত। মুরুব্বি যিনি তিনিই পরিবারের সকলের মঙ্গলের জন্য দেবপূজা যাগ যজ্ঞ সকল করিতেন। পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই দেবতার পূজা করিতে পারিত। সকলেই যখন আপন আপন ঘরে দেব পূজা করিত, তখন আর আলাদা দেব মন্দিরেরও দরকার ছিল না। তখন সকলেই চাষ করিত, আপন আপন গো মহিষাদি প্রতিপালন ও রক্ষণ করিত, এবং আদিম অসভ্য জাতিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সকলেই তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে বাহির হইত।"

তার পর যখন ক্রমে লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন সমাজের কাজও বাড়িয়া উঠিল; এবং ক্রমে এক একদল লোক এক একটা আলা'দা কাজ ভাল করিয়া শিখিতে লাগিল। এই সময়ে যত লোক বাড়িতে লাগিল, ততই নূতন জায়গার দরকার হইল, কাজে কাজেই অসভ্য জাতিদের সঙ্গে আবার ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। তখন একদল লোক যুদ্ধ কার্যেই একেবারে নিযুক্ত হইল। কিন্তু ইহাদের পরিবারের দেবপূজা চলে কিসে? ইহাঁরা যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া অপর কতকগুলি লোককে তাঁহাদের হইয়া তাঁহাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য দেব পূজা করিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে যারা যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিল তারা আর তাহা ছাড়িল না,—তাহারা ক্ষত্রিয় নাম লইয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। আর যাহারা দেবপূজার ভার লইয়াছিল তাহারাও ক্রমে ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। এইরূপে যাহারা চাষবাস করিত তাহাদেরও এক জাত হইল, ইহাদের নাম বৈশ্য হইল; এবং অপর যাহারা রহিল তাহারা সকলের নীচ জাত শূদ্র হইল। এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নানা জাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

"আজ কাল ইংরাজেরা আমাদের রাজা; তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক বিদ্যা শিখিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের শিক্ষক—আমাদের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর আগে যখন এদেশে আমাদের পূর্ব পুরুষদের রাজত্ব ছিল, তখন এরূপ ছিল না। তখন ইংরাজেরা অতি অসভ্য ছিল। কাচা মাংস খাইত, কাপড় পরিত না বিবাহ করিত না, ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না। বনের পশুর মত বনে থাকিয়া, বনের জন্তু মারিয়া, তাহার দ্বারাই প্রাণ বাঁচাইত। আজ কাল আমরা মূর্খ তাহারা বিদ্বান, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর

পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের মত এত সভ্য লোক পৃথিবীতে ছিল না। ইংরাজেরা আজ আমাদিগকে যে সকল বিদ্যা শিখাইতেছে, তার অধিকাংশই আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে আরব দেশের লোকেরা শিখিয়া নিয়াছিল, এবং এই আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপের লোকেরা ও তাহাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিখিয়া নেয়।"

"আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, আজও সেই অতি পুরাতনকালের অতি সুন্দর সুন্দর অনেক পুস্তক প্রচলিত আছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, এই সকলই আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের লিখিত অতি প্রাচীন বই। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভাল ইতিহাস একখানিও লিখিয়া যান নাই। তাই আমরা অতি প্রাচীন সময়ের অনেক কথা জানি না। কেবল এই মাত্র জানি আমাদের পূর্বপুরুষেরা অতি সুসভ্য, অতি বিদ্বান, অতিসাহসী, ও অতি ধার্মিক ছিলেন।"

সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিয়া বলেলেন,—"আজ এইখানে থাক্ কাল আবার বলিব।"

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৫৬-৫৭।

তৃতীয় গল্প



ছুদিন যোগীন বাবু নানা কারণে তাঁহার গল্প বলিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে পুনরায় ভ্রাতা ভগিনী সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন :—

"আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভাল ইতিহাস রাখিয়া যান নাই বলিয়া আমরা এদেশের অতি পুরাতন কথা বেশী জানি না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপরাপর দেশের লোক, কেহ বা হিন্দু রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে, আর কেহ বা কেবল বেড়াইবার জন্য এদেশে আসিতেন। তাঁহাদের দেশের ইতিহাসে ও তাঁহাদের লিখিত বইয়ে, ভারতের পুরাতন কথা কতকটা জানিতে পারা যায়। তার পর, আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস না থাকিলেও আর আর যে সকল সংস্কৃত কবিতা পুস্তক ও অপরাপর পুস্তক আছে তাহা হইতেও কতকটা এদেশের পুরাতন অবস্থা জানিতে পারা যায়। অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সকল পুস্তক হইতে ও ভিন্ন জাতির ইতিহাসে ও ভিন্ন দেশবাসী ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা হইতে পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন, যে দুই তিন হাজার বৎসর আগে এই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি সভ্য ছিল। এদেশের অনেক ধন ছিল। এদেশের লোকেরা খুব ধার্মিক ছিলেন। ইহাঁরা দেশবিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এবং বিদেশ হইতে অনেক লোক এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিত। তখন চাষ করা হিন্দুদিগের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহাদের আপন জাতীয় রাজকর্মচারী তখন দেশ শাসন করিতেন। তখন হিন্দু রাজার রাজত্বে হিন্দুগণ বাস করিতেন। তখন তাঁহারা বহুমূল্য পোষাক ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের গরু, গাড়ী, ঘোড়া, উট, সকলই ছিল। যে শহরে রাজার বাড়ী থাকিত। তাহার চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকিত। এই সকল বিবরণ পড়িয়া জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিতান্ত অসভ্য ছিল, তখনও আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা জগতে অতি সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এই দেশে চিরদিনই বড় বেশী ফসল হইত। নানা প্রকার বহুমূল্য ধাতু এদেশে জন্মাইত; এবং এই দেশের লোকেরা আগে বড় ধনী ছিল। ইহাদের ধনের লোভে নিকটবর্ত্তী রাজাগণ প্রায়াই সুযোগ পাইলে ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের উপর অশেষ উৎপাৎ করিতেন। তখন ভারতবর্ষ নাকি আবার একটা অতি বড় নামজাদা দেশ ছিল, তাই যখন যে দেশে কোনও বড় সাহসী রাজা জন্মিতেন, তিনিই ভারতবর্ষ জয় করিয়া আপনার ক্ষমতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক বিদেশী রাজা আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতের নাকি সম্পূর্ণ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই এই সমুদায় আক্রমণের বিবরণও সবটা জানা নাই। কেবল মাত্র অতি প্রসিদ্ধ যে দুই তিনটা আক্রমণের বিবরণ অপর দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাই আমরা জানি।"

"আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর গত হইল পারস্য দেশের রাজা দারায়াস্ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুরা হারিয়া যান। দারায়াস্ তখন সিন্ধুনদের তীরে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার একজন কর্মচারীর হাতে ইহার শাসনের ভার দিয়া দেশে চলিয়া যান। কিন্তু দারায়াস্ ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্দেশে আসিয়াও সমুদায় দেশ জয় করিতে পারেন নাই, যাহা সামান্য একটু জয় করিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া যায়।

ইহার পর আজ প্রায় দুই হাজার তিন শত বৎসর হইল, আর একজন খুব বড় বিদেশী রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে আসেন। ইউরোপে মাসদেন নামে একটা দেশ ছিল,—ইনি সেই দেশের রাজা। ইহাঁর নাম সেকেন্দর। সেকেন্দর খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার মত যোদ্ধা সেই সময়ে এই পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না, এই কথা তাঁহার দেশের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকও তিনি অতি বীরপুরুষ ছিলেন। সমুদায় পৃথিবী জয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হয়। তিনি বহু সংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া দেশবিদেশ জয় করিতে বাহির হন ; এবং তখনকার অনেক দেশ জয়ও করেন। সেকেন্দর ক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন পঞ্জাব দেশে পুরু নামে রাজা ছিলেন। পঞ্জাবের নিকটবর্তী যে সকল দেশ ছিল, তাহার হিন্দু রাজাগণ পুরু রাজাকে সাহায্য করিতে যান। সেকেন্দরের সঙ্গে হিন্দু রাজাগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। অবশেষে অতি কষ্টে সেকেন্দর হিন্দুদিগকে পরাজয় করেন। কিন্তু পুরু রাজার সাহস, বিক্রম, ও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সেকেন্দর বড়ই আশ্চর্য হন। পুরু-রাজকে জয় করিয়া সেকেন্দর ভারতবর্ষের অপরাপর রাজা গণকে জয় করিবার জন্য দেশের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহার সৈন্য-সামন্ত বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাধ তাঁহাদিগের মিটিয়াছিল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিল না। সেকেন্দরসাহা অগত্যা দেশে ফিরিয়া চলিলেন।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু সেদিনকার মত ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিলেন।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১১৩-১১৫।



পাহারা ওয়ালার ভেল্কী

বিপিনচন্দ্র পাল



কদিন একজন দারোগা ২৪ জন সিপাহি সঙ্গে করিয়া একটা বড় বাড়ী পাহারা দিতে গেলেন। বাড়ীটাতে ৯টী কামরা, দারোগা সাহেব একবার সব কামরাগুলি ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার সিপাহি দিগকে ডাকিয়া প্রত্যেক পাশের কামারায় তিন জন করিয়া লোক রাখিয়া মাঝখানের কামরায় আপনি নিজে গিয়া বসিলেন। তাহার মনে এই বন্দোবস্তে বড়ই আনন্দ হইল। প্রতি দিকেই নয় জন করিয়া সিপাহি আর তিনি আপনি মাঝখানে,—বাড়ী রক্ষা করিবার আর ভাবনা কি? প্রাণের স্ফূর্তিতে দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, কিন্তু চোর ডাকাতের কোনও সাড়া শব্দ নাই; চুপটী করিয়া বসিয়া বসিয়া সিপাহিদিগের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দারোগা সাহেবকে জাগাইয়া গিয়া বলিল,—"মহাশয়, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদরে পা ধরিয়া গিয়াছে, আপনি যদি হুকুম দেন তবে আমরা একবার স্থান পরিবর্তন করি।" ঘুমের ঘোরে থাকিয়াই দারোগা সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া লোক থাকা চাই।" দারোগার হুকুম পাইয়া সিপাহিরা বাহিরে আসিলে তাহাদের একজন বলিল, "ভাই যদি এইরূপ দাঁড়াইয়াই পাহারা দিতে হয় তবে আর জায়গা বদল করিয়া লাভ কি? চল আমরা চার জন বাহিরে যাই, আর আমি প্রত্যেক দিকে নয় জন করিয়া সাজাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে এইরূপ করিয়া লোক গুলাকে দাঁড় করাইল :—ইহাতে প্রতি দিকে নয় জন করিয়া রহিল, অথচ সর্বশুদ্ধ চারি জন লোক কমিয়া গেল। দারোগা সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া লোক গণতি করিলেন। সব দিকেই নয় জন আছে দেখিয়া তাঁর বড়ই আনন্দ হইল। প্রাণের স্ফূর্তিতে আবার আপনার কামরায় গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইলেন।

৩	দারোগা	৩
	৩	

৪	১	৪
১		১
৪	১	৪

কিছুকাল পরে যে চারি জন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিল, তারা আরো চার জন লোক সঙ্গে করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং ২৮ জন মিলিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ঘণ্টা খানিক পরে দারোগা সাহেব আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন লোকগুলি এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে :—

২	৫	২
৫		৫
২	৫	২

প্রত্যেক দিকেই নয়নজন লোক আছে দেখিয়া দারোগার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'আহা আমার কি ভাগ্য'! প্রত্যেক দিকেই নয়জন লোক আছে। এমন বিশ্বস্ত সিপাহি আমার অধীনে পাইয়াছি!" এই ভাবিয়া দারোগা সাহেব আবার প্রাণের আহ্লাদে আপনার কামরায় গিয়া'

দারোগা সাহেব আপনার কামরায় গেলে পরে সহর হইতে আরো চারি জন সিপাহি আসিয়া যুঠিল—২৪ জনার স্থানে ৩২ জনা হইল, কিন্তু এখন প্রত্যেক দিকে নয় জনাই রহিল :—

১	৭	১
৭		৭
১	৭	১

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দারোগা সাহেব বাহিরে আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া গেলেন, কিন্তু চবিবশ জনার স্থানে যে ৩২ জনা হইয়াছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যেক দিকেই নয় জনা আছে, আর ভাবনা কি?

কিছুকাল পরে আরো চারি জনা সিপাহি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবারও তাহারা এমন ভাবে দাঁড়াইল, যে প্রত্যেক দিকে ঠিক নয় জনাই রহিল :—

এই রূপে বার বার দারোগা সাহেবকে ঠকাইতে পারিতেছে দেখিয়া, সিপাহিদিগের সাহস বাড়িল। তখন এক জন বলিল "চল ভাই এখন আমরা অর্ধেক শহরে বেড়াইতে যাই।" এই বলিয়া আঠার জন শহরে চলিয়া গেল। যে আঠারো জন সেই বাড়ীতে রহিল—তারা এইরূপ ভাব দাঁড়াইল, কাজেই প্রত্যেক দিকে নয় জনাই রহিল :—

০	৯	০
৯		৯
০	৯	০

দারোগা সাহেব ভোরবেলা আর একবার উঠিয়া তাঁহার লোক গণতি করিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সন্ধ্যাবেলা তিনি যেমন প্রত্যেক দিকে নয় জনা করিয়া সাজাইয়া ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই প্রত্যেক দিকে নয় জনা আছে! তাঁহার ২৪ জনার মধ্যে যে ছয় জন নাই দারোগা সাহেব এটি বুঝিতে পারিলেন না।

৫	০	৪
০		০
৪	০	৫

কি করিয়া পাহারাওয়ালাগণ দারোগাকে ঠকাইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? কোণের ঘরগুলিতে যারা থাকে তাদের দুইবার করিয়া গণনা হয়। সুতরাং এই ঘরগুলিতে যত বেশী লোক থাকে সমস্ত বাড়ীতে তত কম লোক থাকে, আর এই ঘরগুলিতে কম লোক থাকিলে সমস্ত বাড়ীতে লোক সংখ্যা বেশী হয়।

এই গল্প হইতে আমরা কি শিখিলাম?—যাহা করিতে হয় খুব ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সবদিক দেখিয়া করিবে। নতুবা ভাসা ভাসা ভাবে কাজ করিলে দারোগা সাহেবের মত ঠকিতে হইবে।*

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৪২-৪৪।

এইটী ইংরাজী হইতে গৃহীত।

দাদাবাবুর খোস গল্প

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



মি এক দিন চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিলাম,—প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; খোলা জানালা দিয়া সূর্যের লাল কিরণ একটু একটু ঘরে ঢুকিতেছে,—আমি তাহাই দেখিতেছিলাম, আর ছাই পাঁশ কত কি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, কুমুদিনী, যতীন ও চারু দৌড়িয়া আমার ঘরে আসিল। আমার ভাই বোনগুলি আমাকে বড় ভালবাসে। গল্প শুনিবার দরকার হইলেই "দাদা বাবু" "দাদা বাবু" করিয়া আমার নিকটে আসিয়া যোঠে। আমিও যতদূর পারি নূতন নূতন গল্প বলিয়া সকলকে খুসী করি। আজ তাহারা হুড়মুড় করিয়া হঠাৎ আমার নিকট আসাতে আমি চমকিয়া উঠিলাম।

স্বর্ণ বলিল, "দাদা বাবু! তুমি মাথায় হাত দিয়া কি ভাব?"

কুমুদিনী বলিল—কি আর ভাব্‌বেন? ভাবেন আমরা এলে কি গল্প বল্‌বেন ; তাই মনে মনে তোয়ের করে রাখেন?"

দেবেন্দ্র বড় তেজাল ছেলে ; সে বলিল "দাদা বাবু সাহেবদের মারবার কথা ভাবেন।"

যতীন বলিল—"দাদা বাবু বিলাতে গিয়ে নানা রকম কল তোয়ের কর্‌তে শিখে আস্‌বেন, তাই ভাবেন।"

চারু ছোট ছেলে,—সে কিছুই বলিল না, কেবল বলিতে লাগিল—"গল্প বল না, ও—দাদা বাবু!"

আমি সকলের কথাতেই হাসিলাম ; পরে সকলকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের গল্প বলিব?"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "যা হয় নতুন একটা কিছু বল।" কেবল আমার "কুমুদিদী" বলিলেন—"তোমার বাঘা কুকুরের কোন একটা নতুন কাণ্ডের কথা বল না?"

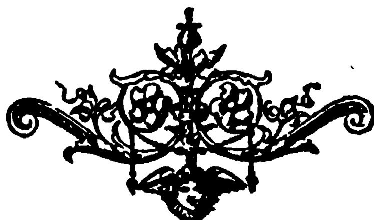
আমি তাহাতেই রাজি হইয়া বলিতে লাগিলাম :—"দেখ, আমি এর পূর্বেই তোমাদের বলেছি আমার বাঘা কুকুরটীর খুব বুদ্ধি আছে, এবং এর অনেক গল্পও বলেছি। কেবল দুটী গল্প এখনও বলা হয় নাই। আজ তার একটী বলিতেছি। আমি এক দিন আমাদের গ্রাম ছাড়াইয়া আর এক গ্রামের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, বাঘা আমার সঙ্গেই ছিল। বিকাল বেলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় বাঘা রাস্তা দিয়া আগে আগে ছুটিতে লাগিল। বাঘা প্রায়ই এইরূপ করিত, কাজেই আমি সে দিকে বেশী মন দিলাম না। আমি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম, এমন সময় ছোট ছেলের কান্নার মত একটা শব্দ আমার কানে আসিল। তখন দৌড়িয়া গিয়া দেখি বাঘা এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াছে ; সেই বাড়ীতে একটী ৩।৪ বছরের ছেলে একটী কাচের বাটিতে করিয়া দুধ খাইতে ছিল, এবং এক হাতে একটী "ঝুন্‌ঝুনি" বাজাইতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম তাহার কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ছোট ছেলে বলিতেছে "দুষ্টু কুকুল! বাঁদল কুকুল! তোকে ঝুনঝুনি মাল্‌ব অকন্‌!" আমি গিয়া বাঘাকে ফিরাইয়া আনিতেছিলাম, এমন সময় সেই ছেলেটীর

মা ঘরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া ভাঙ্গা কাচের বাটি ও দুধের দাম দিয়া চলিয়া আসিলাম। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ বাঘা দুধ কাড়িয়া খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু বাঘা সে রকম "লোক" নয়। বাঘা ছোট ছেলেটীকে দেখিয়া তার সঙ্গে "ভাব" করিতে গিয়াছিল; তাহাকে আদর দেখাইতে গিয়া তাহার গায়ে লাফাইয়া উঠাতেই ভয়ে ছেলেটীর হাত হইতে কাচের বাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ছিল।

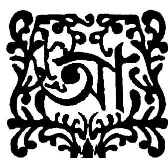
এই ঘটনার পরে অনেক দিন গেল। একদিন আমি বাঘাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে যুঠিয়াছিল। বাঘাকে দেখিয়া অনেকে আদর করিতে লাগিল, কেহ কেহ ত্যক্ত করিতেও ছাড়িল না। যাহারা আদর করে, বাঘা তাহাদিগকে দেখিয়া লেজ নাড়িল, আর যাহারা ত্যক্ত করে বাঘা তাহাদিগকে দাঁত দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় কি একটা গোলমাল হইয়া উঠিল—শুনিলাম একটী ছোট ছেলে জলে পড়িয়াছে। আমি দৌড়িয়া সেই দিকে গেলাম, বাঘাও সঙ্গে ছুটিল। বাস্তবিকই একটী ছেলে নদীর স্রোতে হাবুডুবু খাইতে ছিল। আমি আঙ্গুলের দ্বারা বাঘাকে দেখাইয়া দিলাম। বাঘা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তখনই ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল, এবং ছেলেটীর দিকে যাইতে লাগিল, আমিও জামা ও জুতো রাখিয়া বাঘার পেছনে পেছনে সাঁতার দিলাম। আমরা দুজনে ছেলেটীকে তীরে আনিয়া তুলিলাম। তখন দেখি ছেলেটী আর কেহই নয়, কিছুকাল আগে বাঘা যাহার কাচের বাটি ভাঙ্গিয়া ছিল, এ সেই ছেলে। তখন বাঘার আনন্দ দেখে কে? লাফাইয়া লাফাইয়া বাঘা ছেলেটীর চারধারে ঘুরিতে লাগিল। ছেলেটী চোখ খুলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া বাঘাকে দেখিল, দেখিয়া চিনিতে পারিল, এবং বলিল "আল্ আমি তোমায় ঝুন্‌ঝুনি মাল্‌বনা।" বাঘা ছেলেটীর হাত চাটিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জমিয়া গেল; ছেলেটীর মাও খবর পাইয়া আসিলেন। বাঘা হাত চাটিতে লাগিল এবং এত আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল যে তার অর্দ্ধেক শরীরটা লেজের সঙ্গে নড়িতে লাগিল। বোধ হয় সে মনে মনে এই বলিতেছিল—"আহা! তুমি যে আমাকে মার্‌তে চেয়েছিলে, আমি কি তা মনে করে রেখেছি! পরমেশ্বর যদি আমাকে ছেলে করে দিতেন, তা'হলে আমি দিন দিন ভাল হ'তাম, লোককে ভাল বাসিতাম, কারও মনে কষ্ট দিতাম না, এবং কেউ কোন দোষ করিলে সহজে ভুলে যেতাম।"

ছেলে বাঁচিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদে মায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল। আনন্দে দলশুদ্ধ ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়া উঠিল। আমি মনের সুখে বাঘাকে লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৪৪-৪৫।



২

জ আবার কুমুদিনী, স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, প্রভৃতি সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে। ছেলে মেয়েদের যে কি গল্প শোনা রোগ, এত বুড়ো হইয়াছি, কৈ এ পর্যন্ত একটী ছেলেকেও বিশেষতঃ একটী মেয়েকেও গল্প বলিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিলাম না। যত শোনে, তত চায়, "আর না" একথা বলিতে চায় না। ভাইদের চাইতে বোনেরা এবিষয়ে আরও পাকা। বরং ভাইদের দুটোর যায়গায় তিনটা গল্প বলিলেই তারা খুসী হইয়া চুপ করে, কিন্তু আমি এ পর্যন্ত বোনেদের এক জনকেও খুসী করিতে পারিলাম না। যেমন আগুণে ঘি ঢালিয়া দিলে আগুণ আরো জ্বলিয়া উঠে, 'দুষ্টু' মেয়েগুলো সেই রকম একটা গল্প শুনিলে আর একটা শুনিতে চায়, আরও চায়, আরও চায় ; বলিতে বলিতে আমার মুখে গাঁজা উঠে, তবুও আমার পাল্লী বোনগুলি আমায় ছাড়ে না। "অ্যাঁ অ্যাঁ—আ-র একটা বল—বল! ও—দাদা বাবু!" এই রব ধরিয়াই আছে। আমায় এত ত্যক্ত করে, মা বিরক্ত হন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা ছাড়া অন্য কথা বলি না। যারা ভালবাসে, আমি যাদের ভালবাসি, তারা কষ্ট দিলেও মনে সুখ হয়। আমারই বোন, আমায় ত্যক্ত করিবে না ত কি রাস্তার লোককে ত্যক্ত করিবে? আমার কাছে গল্প শুনিতে আসিবে না ত কি পাড়ার লোকের কাছে গল্প শুনিতে যাবে? কি আশ্চর্য! এতে ত্যক্ত বিরক্ত হইলে চলিবে কেন?

আমার ভাই বোনেরা আসিল। কেহ কোলে, কেহ পাশে, কেহ সুমুখে, কেহ পেছনে দাঁড়াইয়া গেল। গল্প শোনার "সর্দ্দার" স্বর্ণ এবং কুমুদিনী ; সকলের আগে স্বর্ণ কথা তুলিল ;—

"দাদা বাবু! তোমার বাঘার কি আর একটা গল্প বলিবে বলেছিলে। বল! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলিতে হবে। হ্যাঁ, কক্ষনই ছাড়ব না।"

দেবেন্দ্র বলিল, "ও সব গল্পে কি হবে? সে দিন রেলের গাড়ীতে সেই একজন বাঙ্গালী কোন্ সাহেবকে মেরেছিলেন, সেই গল্পটা ভাল করে বল।"

কুমু বলিল, "নানা বাপু! মারামারির কথায় কাজ নাই, কুকুরের গল্পই ভাল।"

আমি গোলে পড়িলাম, কার কথা রাখি? আচ্ছা, দেখি কার কি মত? বলিলাম "কুকুরের গল্পে কার কার মত?" স্বর্ণ, কুমুদিনী, এবং চারু একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমার।" দেবেন্দ্র ও যতীন একদিকে, আর তিন জন অন্য দিকে, তাই কুকুরের গল্প বলাই ঠিক হইল। আমি বলিতে লাগিলাম ;—

অনেক দিন আগে আমাদের বাড়ীতে একবার গরু রাখিবার লোক ছিল না। ইহার পূর্বে কিছুকাল বাঘা রাখালের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গরু রাখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাদের গরুর রাখাল চলিয়া গেলে আমিই দিন কতক মাঠে গরু বাঁধিয়া দিয়া আসিতাম। অবশেষে একদিন কর্তা বলিলেন, "এখন বাঘাই গরু রাখিতে পারিবে।" তাহাই হইল। গরু ছাড়িয়া বাঘাকে সঙ্কেত করিলেই বাঘা গরুর সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা গরুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিত। বাঘা কেমন করিয়া গরুটীকে লইয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য একদিন বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি চুপি চুপি গরু এবং বাঘার পেছনে পেছনে চলিলাম। দেখিলাম গরুটা যাই পথ ছাড়িয়া কাহারও ধানের ক্ষেতে বা

বাগানে ঢুকিয়া যাইতে চেষ্টা করে, অমনি বাঘা তাহার মুখের কাছে গিয়া "খেউ"."খেউ" করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। মাঠে গিয়া গরু চরিতে আরম্ভ করিলে, বাঘা গাছের ছায়ায় শুইয়া থাকে।

এইরূপে অনেক দিন যায়, একদিন আর গরু ঘরে আসে না, বাঘারও খোঁজ পাওয়া যায় না। আমাদের বড় ভয় হইল। তাইতো কি হবে, কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে, কে সন্ধান বলে দেবে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময় বাঘা সেইখানে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু গরু কোথায়? এদিকে বাঘার রকম সকম দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল;—সে একবার খেউ খেউ করিয়া কাছে আসে, আবার ছুটিয়া যায়, একবার আসিয়া পা আঁচড়ায়, আবার দৌড়িয়া যায়। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোথাও যাইতে বলিতেছে। আমি উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। বাঘা আগে আগে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে আমরা এক বাড়ীতে আসিলাম এবং দেখিলাম আমাদের গরুটা সেইখানে বাঁধা রহিয়াছে। আমার গলার স্বর এবং বাঘার খেউ খেউ শব্দ শুনিয়া সেই বাড়ীর কর্তা বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের ফুলের গাছ নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বাঁধিয়াছি।" আমি শুনিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। তিনি আমাকে লজ্জিত দেখিয়া বলিলেন "যাক্! আপনাদের গরু লইয়া যান। কিন্তু আপনাদের কুকুরটী আচ্ছা পাহারাওয়ালা। আমরা গরু বাঁধিলে খেউ খেউ করিয়া আমাদিগকে অনেক ত্যক্ত করিয়াছে, এক দিক দিয়া তাড়া দিলে আর এক দিক দিয়া খেউ, খেউ করিয়া আসিয়াছে; যেন গরুটা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে। শেষে, যখন কোন মতেই ছাড়িলাম না, তখন চলিয়া গিয়াছে।" আমি বুঝিলাম বাঘা একটু অমনোযোগী হওয়াতেই গরুটীর এই বিপদ; কিন্তু গরুটীকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বাঘা বিস্তর ঝগড়া করিয়াছিল। অবশেষে যখন দেখিল, তাহার চেষ্টায় কিছুই হয় না, তখন আমাদিগকে ডাকিতে গিয়াছিল।

আমি বাঘার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে, সেই বাড়ীর কর্তাকে ধন্যবাদ দিয়া, গরু লইয়া ঘরে আসিলাম।

স্বর্ণ এবং কুমুদিনী এতক্ষণ 'হাঁ' করিয়া গল্প শুনিতেছিল, হঠাৎ গল্প শেষ হওয়াতে যেন কিছু বিরক্ত হইল। কুমুদিনী বলিল, "মোটে এই—আরও বল।" এমন সময় মা খাবার খাইতে ডাকিলেন। আমি বলিলাম "আজ তবে এই পর্যন্ত থাক্,—আর এক দিন বলিব।"

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৬০-৬১।



৩

জ এই মাত্র পক্ষীদিগের বুদ্ধির বিষয় পড়িয়া একটু ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেছি, আর কোথা হইতে সন্ধান পাইয়া স্বর্ণ, কুমু, চারু, যতীন ও দেবেন আসিয়া উপস্থিত। আমি যেন ভয় পাইয়া একটু খেলা করিবার জন্য আলিশার আড়ালে লুকাইলাম, তা সে হবে কেন? তারা ঝাঁ করিয়া ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল। সকলে ধরাধরি করিয়া ছাতের মাঝখানে আনিয়া ফেলিল। "গল্প বলনা দাদাবাবু! হ্যাঁ তোমার কেমন দুষ্টমি! পালিয়ে লুকিয়ে কোথা থাক্‌বে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসের গল্প?" আজ সকলে এক কথায় বলিয়া উঠিল "পাখীর"। আমি অবাক হইলাম। বলিতে লাগিলাম :—

আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলিব, তাহাতে কিন্তু দু একটা ইংরাজী কথা থাক্‌বে বুঝে নিতে হবে। 'প্যারট্" নামে এক প্রকার পাখী আছে, তাহারা ঠিক আমাদের যেমন তোতা পাখী তেমনি সমস্ত কথা মানুষের মত কয়। এক বিবির একটী প্যারট্ ছিল, তিনি তাহার কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। (সকলে :—"বলনা দাদা বল বল") সে পাখীটা আছে আছে, ঘরের লোক যদি একটু হাসির কথা বলিত অমনি হেসে গড়িয়ে যেত "হাঃ হাঃ হাঃ!!" সে হাসি আর থামে না, ঠিক মানুষের মত। আবার তার মধ্যে মধ্যে বলা হইত "অতো কোরে হাসিও না, মোরে যাব, মোরে যাব।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল "ক্ষক্ ক্ষক্";—সে কাশির ধুম কি? বাহিরে থেকে মনে হবে ঠিক যেন কে কাশ্‌ছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আঃ! বড় শর্দি, বড় শর্দি!" আবার একটু কাশিয়া "ফোঁশ" করিয়া একটা নিশ্বাস টানিয়া বলিত "আঃ! বাচ্‌লাম একটু ভাল হয়েছে"। এই বলেই হাসির ধুম।

বাড়ীর দাসীটিকে সে বড়ই ভাল বাসিত। সে যখন ঘর থেকে বাহিরে যেত ওটা ডাকিত "পেন্! পেন্! আমার বড় অসুখ কোর্চ্ছে, শীঘ্র আয়!" আর বাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে খুন। যেই পেন্ ঘরে এল, অম্নি নাচিতে লাগিল, আর হাসি। দাসী যদি বলিত "তোমায় মারিব," অমনি একটু নরম হইয়া বলিত "না, না, মারিবে না"! ঘরে বিড়ালটী ঢুকিলেই সে ডাকিত "পুশ্ পুশ্," অম্নি তার পরেই আবার আপনিই বলিত "মিউ"। ঘরে কেহ যদি "পুশ্ পুশ্" বলিত, তবে সে বলিবে "মিউ"। আর ঘরে কেহ যদি "মিউ" বলিবে, সে কবিবে "পুশ্ পুশ্।" কি চমৎকার!

কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক ঘরে এলে খানিক তাঁহার দিকে চাহিয়া যেন চিনিয়াছে এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিত "তুমি কেমন আছ মা?" এক দিনকার কথা বড়ই আশ্চর্য্য। দাসী ঘরে নাই, তাই বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখী, পেন্ কোথা গেছে? অম্নি পাখীটা বলিয়া উঠিল "নীচে।" বিবি অবাক্!!

এক দিন কোন ভদ্রলোক নদী পার হইবেন বলিয়া তীরে আসিয়া নৌকা খুঁজিতেছিলেন। এক জনও মাঝিকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কোথা হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে :—"পারে, পারে, বাবু পারে যাবেন্?" তিনি হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, এদিক ওদিক কোথাও লোক দেখিতে পান না, অথচ ঐ "পারে, পারে, বাবু পারে যাবেন?"

শব্দ তাঁহার কাণ ঝালা পালা করিতেছিল। তখন তিনি দেখেন যে রাস্তার ধারে একটী বাড়ীর জানালাতে এক প্যারট্ ঝুলিতেছে আর ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রীর একটা প্যারট্ ছিল, তাহাকে তিনি টেম্‌স্ নদীর উপর রাজবাড়ীর জানালায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। সে এক দিন দাঁড়ে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ নদীর জলে পড়িয়া গেল। যেমন পড়িয়াছে, অমনি চীৎকার করিতে লাগিল "A boat ! a boat ! twenty pounds for a boat !"—"একখানা নৌকা নিয়ে আয়! একখানা নৌকা নিয়ে আয়! দুশো টাকা দেবো একখানা নৌকা!" একজন মাঝি তাহা শুনিয়া দাঁড় বাহিয়া তাহাকে তুলিল, আর তার পরে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ ২০০্ টাকা চাহিল ; পাখী নিজ মুখে যাহা দিতে চাহিয়াছে তাহাই দিতে প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন "বেশ, পাখী যাহা বলিবে তাহাই দিব।" দুষ্ট প্যারট অমনি বলিয়া উঠিল "Give the knave a groat"—অর্থাৎ "দাও মিন্সেকে একটা দোয়ানী।" কি আশ্চর্য!!

বাস্তবিক এক একটা পাখীর কেমন ক্ষমতা, কি বুদ্ধি, কি মুখস্থ করিবার শক্তি, দেখিলে অবাক হইতে হয়।

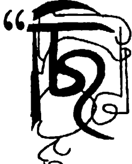
স্বর্ণ:—দাদা বাবু এমন গল্প তো আমি আর কখন শুনি নাই। এটী সক্কোলকে গিয়ে আমি বলিব।—কুমু, চারু প্রভৃতি সকলে পরম আনন্দিত হইয়া আমার আঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া গেল।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৯৭-৯৮।



ছি দাদা! এমন ঘুম!!

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



"ছি দাদা! এমন ঘুম!! এই মা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া গেলেন, আর অমনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলে, এখনও যে নটা বাজেনি?"

অবিনাশেরও ভ্রূক্ষেপই নাই, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন। গিরিবালা দুতিন বার ডাকিয়া বলিতে চেতনা হইল, বড় বিরক্তও হইলেন, ছোট বোনটীকে খুব বকিয়া উঠিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করা হইল। গিরিবালা আপন মনে বৈ দেখিয়া অর্থ লিখিতেছিল, ১টা পর্যন্ত লিখিয়া বৈ টৈ গুছাইয়া রাখিল, এবং মার নিকটে গিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা যাইবার পূর্বে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ধীর ভাবে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আবার প্রার্থনা করিয়া গিরিবালা পড়িতে বসিল। কিন্তু বেলা ৮টার সময়ে অবিনাশ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া ঘরে কেদারায় ধূপ করিয়া বসিল, এবং খানিক পরে আবার কেদারার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। গিরি বারবার ডাকিল, কিন্তু অবিনাশ তাহা শুনিল না ; তখন গিরি অগত্যা মাকে ডাকিয়া আনিব বলিয়া ভয় দেখাইল ; তখন মার বকুনির ভয়ে অবিনাশ মুখ ধুইতে গেল, কিন্তু তখন প্রায় বেলা ৯টা, সুতরাং স্কুলে যাইবার সময় হইল, সকলে স্নানের জন্য ব্যস্ত হইল, অবিনাশের আজ আর পড়া তৈয়ার হইল না।

এইরূপ রোজই হয়, কাজেই একদিন ও তাহার পড়া তৈয়ার হয়না। মাষ্টার মহাশয় এত বলেন, বকেন কিছুতেই কিছু হয়না। বালকটীর মুখ দেখিলেই তাহাকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঘুম ও অলসতার জন্য তাহার পড়া শুনা কিছুই হয়না। সব ছেলেরা তাহার ঘুমের জন্য তাহাকে তামাসা করে। সে স্কুলে গিয়া ক্লাশে বসিয়াও ঘুমায়!! তাই তাহারা সকলে তাহার নাম রাখিয়াছে "কুম্ভকর্ণ"। এ বৎসর গিরি কত পুরস্কার পাইয়াছে, কত রকম রকম খেলানা, একটা পোষাক, একটা ঘড়ী, আরও কত জিনিশ। কিন্তু দাদা তার কোন কাজেই নয়। পারিতোষিক বিতরণের দিন সকলে উঠিয়া গিয়া পুরস্কার লইয়া হাসি মুখে আসিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিতেছে অবিনাশের মনটা বড়ই খারাপ হইল, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে যে কি ক্লেশ হইতেছে তা বরং তোমরা বুঝিয়া লও, আমি লিখিতে পারি না। হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, যিনি পারিতোষিক বিতরণ করিতেছিলেন, তাহাকে ডাকিলেন। আস্তে আস্তে ম্লান মুখে অবিনাশ তাঁহার নিকটে গেল। সাহেব তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছিলেন,—তাই আশ্চর্যও হইয়াছিলেন যে এমন বুদ্ধিমান বালক কেন ভাল পড়ে না? ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পারিতোষিক পাইলে না কেন?" একেত তাহার মনে ঐ ঘোর দুঃখ ছিল ; তার পরে সকলের মধ্যে ডাকিয়া যেই সাহেব ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি অবিনাশ "ভ্যাক' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুই বলিতে পারিল না। সাহেব কাছে আনিয়া রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া ভাল বাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বড় দুঃখের সহিত বলিল "ঘুমের জন্য"। তিনি তখন দুঃখিত হইয়া তাহাকে একখানি বৈ দিবেন বলিলেন, তাহা মন দিয়া পড়িতে বলিলেন।

সে দিনের দুঃখ লজ্জা, অপমান, অবিনাশ আর ভুলিল না ! সেদিন হইতে সে ঘুম ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতে এই বহুদিনের কুঅভ্যাস ছাড়িতে পারিলনা। কিছুদিন এইরূপে যায়, পরে গিরি ও তাহার দুঃখে কাতর হইয়া বলিল "দাদা তুমি অত কষ্ট কর কেন মিছামিছি !! পরমেশ্বরের নিকট রোজ প্রার্থনা করিলেই তোমার ঘুম সারিয়া যাইবে।" সে তখন অবধি তাহাই করিতে লাগিল। এমন সময়ে সাহেবের সেই বৈ খানি আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিনাশ তাহা আগাগোড়া পড়িল। তখন তাহার মন স্থির হইল, যেন কি অমূল্য ধন লাভ করিল ; ক্রমে চেষ্টা করিয়া ও ঐ বৈ এর কথামত কাজ করিয়া সে এখন ঘুমকে পরাজয় করিয়াছে। অবিনাশ একদিন পারিতোষিক পায় নাই বলিয়া কত কাঁদিয়াছিল, সে আজ খুব ভাল করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, ক্লাশে সর্বদাই প্রথম থাকে এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রতি বৎসর ঐ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যেও হয়ত অনেকে আছেন যাঁহারা অবিনাশের মত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপকারের জন্য সেই বইখানি হইতে গোটাকতক কথা তুলিয়া দিব, তাঁহারা মন দিয়া পড়িয়া প্রার্থনা ও যত্নের সহিত চেষ্টা করিলেই শীঘ্র ঘুমকে বশে আনিতে পারিবেন।

(১) পড়িতে বসিবার সময়ে, যে যে বইগুলি পড়িতে হইবে সে গুলিকে সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে কাজটাকে একবার বেশ করিয়া বুঝিয়া লইবে, এবং "সমস্ত করিবই" বলিয়া মনে করিবে।

(২) যে সকল বই বেশ সহজ ও পড়িতে ভাল লাগে সেই গুলিই রাত্রে পড়িবে। অঙ্ক কষাও মন্দ নহে। যাহাতে সহজে ঘুম পায়না এমন বই পড়িবে। একখানা পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইলে আর একখানা লইবে ও গা ঝাড়া দিয়া বসিবে।

(৩) মুখে জোয়ান বা লবঙ্গ থাকিলে ভাল হয়। ঠিক সোজা হইয়া বসিবে ও হস্তে বই লইয়া উঁচু করিয়া ধরিবে। পেন্সিল বা আর কিছু লইয়া টেবিলে "ঠক ঠক' শব্দ করিলেও অনেক সময় ঘুম যায়। ঘুম পাইলে পা দুটী নাড়া দিলেও ভাল হয়। কিন্তু সাবধান ! যেন ঘুম তাড়াইতে গিয়া এই অভ্যাস না হইয়া যায়, তা হলে বড় দোষ।

(৪) আহার করিবার পূর্বেই পড়া শেষ করা উচিত। পড়া হইয়া গেলে আহার করিয়া একুট বাহিরে ছাতে টাতে বেড়াইয়া ধীর মনে প্রার্থনা করিয়া বা সৎবিষয়ের কথা কহিয়া, কিম্বা সমস্ত দিন কিরূপে কাটাইয়াছি ও কিরূপে কাটান উচিত, এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া পরে শয়ন করা উচিত। খাওয়ার পরেই প্রায় ঘুম পায়,—এ জন্য যদি খাওয়ার পরে পড়িতে হয় তবে যেন এই প্রথম ধুমের তেজটাতে পরাস্ত না হও, দৈখিবে। কোন রকমে এই প্রথম ধাক্কাটী সামলাইতে পারিলে আর ভয় থাকেনা। ইহাকে "ভাতঘুম" বলে ; ইহার হাত এড়াইতে পারিলে আর প্রায় ঘুম পায় না।

(৫) ইহাতেও ঘুম না গেলে, একটু বাহিরে বেড়াইয়া পরে টেবিলের উপর উচ্চ আলো রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়া উচিত। দাঁড়াইলে ঘুম পায় না। পরে ঘুম গেলে বসিবে। কিন্তু এটী ইচ্ছা পূর্বক করিবে, কেহ করিতে বলিলে অভিমানে ও দুঃখ হইবে, সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান।

(৬) প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে নিয়মিত ব্যায়াম, করিবে ; তাহা হইলে শরীর বেশ কর্মঠ,

অনলস, ও সবল থাকিবে এবং ক্ষীণ ও অলসের প্রধান দোষ যে নিদ্রা, তাহা ঘুচিয়া যাইবে। অনেকের ভ্রম আছে যে পরিশ্রম করিলে বড় ঘুম পায়, সেটী ঠিক নহে, তবে এই হয় যে, যে টুকু ঘুম হয় তা অতি প্রগাঢ়। সেত ভালই, সুস্থতার চিহ্ন।

(৭) ঘুম পেলে যদি ঘুমকে আস্কারা দেও তবে আরও ঘুম পাবে, সুতরাং আজি যদি ৭ টার সময় ঘুম পায় তবে ৭৷৷০ টার সময় শুইবে, কালি আবার ৮টার সময় শুইবে, তার পর এইরূপ ক্রমে ঘুমকে পিছাইয়া দিলে তোমার কার্য সিদ্ধ হবে।

(৮) অনেকে রাত্রের ঘুম বন্ধ করিবার জন্য স্কুল হইতে আসিয়া একবার ঘুমাইয়া লয়, সেটী বড় অনিষ্টকর। কেহ কদাচ সেরূপ করিও না, তাহাতে আলস্য বৃদ্ধি হয় এবং যে সময়টী খেলায় কাটান উচিত, তাহা নিদ্রাতে যাওয়ায় শরীর অকর্মণ্য হইয়া যায়। খুব সাবধান! কখনও এরূপ মন্দ কাজ করিও না।

(৯) দিনের বেলায় বসিয়া যদি ঘুম পায়, তবে বসিবে না, কখন না, কদাচ না। যে দিনে ঘুমায় তাহার শরীর একেবারে যায়, ছাই হইয়া যায়। অতএব সাবধান! চলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পড়িবে। বাগানে গাছ তলায় বসিয়া, কি নদীর ধারে বসিয়া, কি নূতন ইটের পাঁজা বা পাহাড়ের উপর বসিয়া পড়া উচিত—যেখানে স্বভাবের শোভাতে মনকে আকৃষ্ট রাখিবে, পড়িতে বেশ ইচ্ছা হবে, নির্জনে সুবিধাও হবে। আর ওরূপ স্থানে একা বসিয়া একটু ভয়ও হবে তাহাতে ঘুম অসম্ভব। অতএব এ সম্বন্ধে যাহার যেরূপ সুবিধা হইবে সেইরূপই করিবে।

(১০) রাত্রি ৯টার অধিক বালক বালিকাদিগকে যেন জাগাইয়া না রাখা হয়। ইহার অধিক হইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। আর ওদিকে ৫টার সময়ে ভোরে উঠা অভ্যাস করা বড় ভাল। প্রথম উঠিয়াই হাত মুখ পরিষ্কার করি একটু প্রার্থনাদি করিবে, পরে একটু বাহিরে বেড়াইয়া পড়িতে বসিবে। সর্বশুদ্ধ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা চাই।

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৪৯-৫১।



লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

কুঞ্জবিহারী ঘোষ



আমাদের দেশে শিয়ালের বড়ই উৎপাত। শিয়ালের জ্বালায় ঘরের ভিতরে পর্যন্ত কোন বস্তু নির্বিঘ্নে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান শিয়ালগণ এমনি কৌশলে দরজা খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি খায় এবং নষ্ট করে যে তাহা টের পাওয়া যায় না। একদিন রাত্রে আমাদের বড় ঘরের বারান্দায় ভুল ক্রমে একটা গুড়ের হাঁড়ি পড়িয়াছিল। হাঁড়ির মধ্যে গুড় অতি অল্পই ছিল। শিয়াল রাত্রিতে আহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া হাঁড়িতে গুড় আছে বুঝিতে পারিল। অনেকেরই খাদ্য দ্রব্য দেখিলে লোভ সম্বরণ করা দায়। শিয়াল প্রথমেই হাঁড়িটার মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। হাঁড়ির মুখ খুব ছোট ছিল, সুতরাং মাথা ঢুকাইতে না পারিয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও পারিল না, তখন খুব জোরের সহিত হাঁড়ির মুখে মুখ দিয়া ঠেলিতে লাগিল। ইহাতে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়া গেল, আর শিয়াল স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া গুড় খাইতে লাগিল। এমন সময় আমাদের বাড়ীর কুকুরটা টের পাইয়া শিয়ালকে তাড়া করিল। শিয়াল পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল বটে কিন্তু মাথা আর হাঁড়ির মধ্য হইতে বাহির হয় না। পলাইতে একটু বিলম্ব হইলেই কুকুর আসিয়া তেড়ে ধরিবে, কাজেই প্রাণ ভয়ে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি লইয়াই দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হাঁড়িও ভাঙ্গে না, মাথাও খুলে না, এদিকে কুকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া আসিতেছে। ভয়ানক বিপদে পড়িয়া শিয়াল কোন্ স্থান দিয়া কোন্ দিকে যাইবে তাহা ঠিক পাইতেছে না। আবার হাঁড়ির মধ্যে মাথা থাকাতে চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না। যাহা হউক, সেই হাঁড়ি-মুখো শিয়াল এই অবস্থাতেই রাস্তার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার পাশেই ছোট একটা পুকুর ছিল। হঠাৎ হাঁড়ি লইয়া শিয়াল সেই পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেল। সাঁতরাইয়া পারে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুকুরটী পানায় পোরা ছিল সুতরাং পথ এগোবার পক্ষে হাঁড়ি পানায় বাধিয়া অত্যন্ত বাধা জন্মাইতে লাগিল। শিয়াল এইরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আর কি করে? অগত্যা হাঁড়ির মধ্যে মাথা রাখিয়া সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিল। যতক্ষণ বায়ু ছিল বহু কষ্টে ভয়ানক যাতনায় ছটফট করিয়াও

বাঁচিয়া ছিল। পরে বায়ু অভাবে জলের মধ্যেই মরিয়া গেল। সকাল বেলা আমরা পুকুর হইতে তুলিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলাম। এই জন্যই লিখিয়াছি "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৫১-৫২।

প্রার্থনা ও সাবধানতা

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



ল্যকালে রাজকুমার ও কেশবের বড় ভাব ছিল। খুব ছেলেবেলা দুজনেই সমান দুরন্ত ছিল, পরামর্শ করিয়া দুষ্টুমি করিত, পথ দিয়া লোক গেলে গায়ে ধুলো দিত, গালাগালি দিত, একত্রে মাঠে ফড়িং ধরিতে যাইত ও পাখীর বাসা সন্ধান পাইলেই ভাঙ্গিয়া ছানা আনিয়া মারিয়া ফেলিত। স্কুলে গিয়া দুজনে যুক্তি করিয়া পলাইয়া আসিত, আসিয়া পথে ঘাটে দাণ্ডাগুলি খেলাইত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিষ্কার মিছা কথা কহিয়া দোষ কাটাইত। ভয়ানক দুরন্ত ছেলে দুটী, পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়াছিল। রাজকুমারের পিতা সন্তানের চরিত্র দূষিত হইতেছে দেখিয়া তাহাকে পশ্চিমে লইয়া গেলেন। সেখানে দু বৎসর থাকিয়া এখন সে কি সৎ ও শান্ত সুবোধ হইয়াছে! এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ; কেশবেরও এই বয়স, কিন্তু সে এমন ভয়ানক বদমায়েস হইয়াছে যে তাহার আর কথা নাই। তামাক, চুরট, সিদ্ধি প্রভৃতি নেসায় চুরচুরে, লেখাপড়ার নামও নাই। স্কুলের বেতন লইয়া চড়াইভাতী করা হয়, এক এক দিন মদও পান করা আছে। রক্ত উঠা, জ্বর, প্লীহা রোগে ধরিয়াছে, মধ্যে এক দিন নাকি 'ফীট্' ও হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতা হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে অঞ্চলে সে বিখ্যাত ছোকরা।

রাজকুমার বাড়ী আসিলে তাহার শান্ত সুশীল ভাব, বিনয় ও সুমিষ্ট ব্যবহার, বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা ও সৎকার্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক অবাক হইয়া তাহার পিতার বড় প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এই কথা—"এমন বদ ছেলে কেমন করে এত ভাল হইল?" সব লোক তাহার তুলনা দিয়া কেশবকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রাজকুমারের পূর্বচরিত্র ও এখনকার স্বভাব স্মরণ করিয়া কেশব বড় লজ্জিত হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও সে তাহার সহিত দেখা করিতে গেল না। দিন রাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবে, ভাবিয়া এক রকম কেমন হইতে লাগিল? মধ্যে এক একবার ইচ্ছা হইত একেবারে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া সৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু অভ্যাস ও চক্ষু লজ্জাতে ভাল হইতে দিত না। মা কাছে আসিলেই কেমন যে গালাগালি দেওয়া অভ্যাস,—পূর্বে থেকে ঠিক করিয়া রাখিলেও সেই "পোড়ার মুখী" বৈ অন্য কথা বাহির হইত না। মহা বিপদ! মনে আর কাজে এই ঘোর বিবাদের জন্য বেচারা ক্রমে খুব রোগা হইতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিল যে রাজকুমার তাহাকে যেন মেঘের ভিতর হইতে কি সৎপরামর্শ দিতেছে। সে যেন শুনিতে চাহিতেছে না। হঠাৎ অমনি রাজকুমার রাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর মেঘের ভিতর থেকে "কড় কড় কড় কড়" করিয়া ভয়ানক একটা বাজ তাহার মাথায় পড়িল। ভয়ে সে ঘুমন্ত অবস্থায় খুব চীৎকার করিয়া উঠিল, গা হাত পা কাঁপিতে লাগিল, এবং বুক দুর দুর করিতে লাগিল। মা ভীতা হইয়া বলিলেন "কি? কি?" সে মাকে সব বলিল। তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন "তবে বুঝিয়াছি, তুমি কা'ল রাজুর কাছে গিয়া তাহার কথা শুনিও, তাই ঈশ্বর তোমাকে বলিলেন।" ভয়ে, চিন্তায়, হতাশ্বাসে কেশব অবশেষে স্বীকৃত হইল।

তারপর দিন অনেক কষ্টে মনকে বুঝাইয়া রাজুর কাছে গেল। রাজু পূর্বেই সব শুনিয়াছিল ; অনেক কথার পর কেশবের অসুখের কথা পাড়িল। তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল, আর বলিল "ভাই রাজু! বলিতে লজ্জা করে এক সময়ে তুমিও আমার মত দুষ্ট ছিলে, ভাগ্যে তোমরা বাবা তোমায় লইয়া গেলেন, তাই। তা ভাই আমারত দশা দেখিতেছ, কি করিলে এখন আমি বাঁচি তা বলিয়া দাও। কিরূপে পাপ দুশ্চরিত্রতা দূর করিতে পারিব তাহা ভাই তোমায় বলিতেই হইবে। আমি মরিতে বসিয়াছি। আর না। খুব শিখিয়াছি, আর না। আমার আজ লজ্জা দূর হোক, আর আমার অভিমান নাই, এখন কিসে আমি বাঁচি, কিসে আমার চরিত্র ভাল হয় তা' তোমায় করিতেই হইবে।" এই বলিয়া রাজুর হাত ধরিয়া তাহার উপর কপাল রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, চক্ষের জলে দুজনেরই হাত ভিজিয়া গেল। রাজুও খুব কাঁদিতে লাগিল।

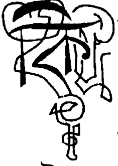
খানিকক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। পরে রাজকুমার কেশবের চক্ষের জল কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিয়া তাহাকে শান্ত করিল ও বলিল, "দেখ ভাই, আমি গিয়াছিলাম কেবল ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি, তুমিও তাঁহাকে ডাক, তিনিই রক্ষাকর্তা।" কেশব বলিল "তাঁহাকে কিরূপে ডাকিতে হয় জানি না ত?" রাজকুমার বলিয়া দিল, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্তা, সব দেখিতেছেন, সব জায়গায় আছেন, সকলি করিতে পারেন, তিনি মহান্ ও পরম দয়াবান। তৎপরে বলিল "দেখ ভাই! তুমি সর্বদা দুটী কাজ করিবে, মন দিয়া শুন :— (১মতঃ) সদা সর্বক্ষণ যেখানেই থাক, কাজই কর, আর যাই কর, সকল সময়েই সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের দিকে মন দিয়া ভাল হইবার জন্য কাতর মনে প্রার্থনা করিবে। তাঁহার দিকে মন থাকিলে আর কুকর্মে ইচ্ছাই হইবে না। (২য়তঃ) যখনই কোন মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা হবে, মন্দ কাজ করিবার সুযোগ হবে, বা কোন কুকর্ম প্রায় কর কর, এমন হবে, অমনি ঝাঁ করে মনে করবে যে এটা করা অন্যায়। তখনই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আপনার হাত, পা, বা জিহ্বাকে হুকুম করিবে যেন তাহারা আর সে কাজ না করে। তাহারা ত আমারই চাকরের মতন? এই আমি হাত রাখিয়াছি, মনে করিয়া হুকুম করিলেই নড়িল। বুঝিলে? মন্দ কাজ না করা ও ভাল কাজ করা, মন্দ কথা না কহা ও ভাল কথা কহা, এবং মন্দ বিষয় চিন্তা না করিয়া ভাল বিষয় চিন্তা করাকেই সৎচরিত্র কহে। না হইলে সৎ চরিত্র ত আর গাছের ফল নয়? দেখিও, প্রথম প্রথম তোমার মনের বিরুদ্ধে কাজ করিতে কষ্ট হবে, খুব লজ্জা হবে, কিন্তু সে জন্য যেন পেছিও না। স্থির অটল প্রতিজ্ঞা কর, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ কর দেখি, ঠিক সফল হইবেই হইবে, আমি এই বকমে ভাল হইয়াছি। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তখন মন্দ কাজ করা অসম্ভব হবে এবং ভাল কাজেই সুখ হবে"।

কেশব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল। সেই কথা দুটী ও রাত্রের বাজ পড়া মনে করিতে করিতে বাড়ি আসিল। আসিয়া অবধি কেশব ধীর ভাবে সেই কথা মত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আজ প্রায়এক মাসের কথা। ইহারই মধ্যে সে খুব ভাল হইযাছে। নেশা ত্যাগ, মিথ্যা কথা ত্যাগ, গালি ত্যাগ, এগুলি হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা ও সাবধানতা দ্বারা সবই হইতে পারে।

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪. পৃ. ৫২-৫৪।

এলাইচ

বিপিনচন্দ্র পাল


বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেই ছোট ছোট, সাদা, শুকনো, গুজরাটী এলাইচগুলিকে বড় ভাল বাসেন। যত প্রকার মসলা আছে, এলাইচ সকলের শ্রেষ্ঠ। এলাইচের মত এমন সুন্দর গন্ধ আর কোনও মসলায় নাই। এলাইচ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, এলাইচ যে এক রকমের ফল তাও অবশ্য জান। কিন্তু এলাইচের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি?

গুজরাটে এলাইচ খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে তাই আমরা ছোট ছোট এলাইচগুলিকে গুজরাটী এলাইচ বলি। কিন্তু গুজরাট ভিন্ন আর আর দেশেও এলাইচ জন্মিয়া থাকে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের কোনও কোনও পার্বতীয় প্রদেশে, নীলগিরিতে, ও কুর্গের পাহাড়েও প্রচুর পরিমাণে এলাইচ জন্মিয়া থাকে। আমরা একবার মান্দ্রাজ দেশে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল মান্দ্রাজী এলাইচের গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। আদা, হলুদ, বা শুঁটের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি? ছোট এলাইচের গাছও ঠিক তাহারই মতন। তবে আদা ও হলুদের গাছ সোজা ভাবে বাড়িয়া উঠে, আদার ক্ষেতের গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া একটার গায় আর একটী লাগিয়া সারি সারি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু এলাইচ গাছের অতটুকু শক্তি নাই। গাছগুলি একটু বড় হইলেই মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, লতার মত মাটির উপর ভর করিয়া মাঝে মাঝে শিকড় গাঁথিয়া ঘূরিয়া বেড়ায়। কিন্তু এলাইচ গাছের পাতা ও ডালপালা সবই ঠিক আদা হলুদের গাছের মত।

আদার পাতায় আদার গন্ধ পাওয়া যায়, হলুদের পাতায় হলুদের গন্ধ পাওয়া যায়, শুঁটের পাতা হাতে লইয়া রগড়াইলে তাহা হইতে ঠিক শুঁটের গন্ধ বাহির হয়। এলাইচের পাতাতেও কি এলাইচের গন্ধ পাওয়া যায়? না। এলাইচ বড় মানুষ, সে কি আর যাতে তাতে তার গন্ধ মাখিয়া দিতে পারে? এলাইচের পাতা রগড়াইলে তাহা হইতে কেমন এক প্রকার বুনো গন্ধ বাহির হয়; এ যে এলাইচের পাতা ইহা ঠিক করা অসাধ্য। এলাইচের গন্ধ কেবল তার আপনার ভিতরেই বন্ধ থাকে, পাতা বা মূলে সে গন্ধ পাওয়া যায় না।

এলাইচ এত দরের জিনিষ, এমন ভাল জিনিষ, এমন গন্ধ, এলাইচের চাষ করিতে কতই না যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়! কত ভাল উর্বরা, মোলাম মাটীর দরকার! প্রতিদিন কত জল দিতে হয়! তোমরা ভাবিতেছ এলাইচের ক্ষেত করা কতই না কষ্ট-সাধ্য! কিন্তু বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। এলাইচের ক্ষেত করিতে হয় না, এলাইচ রোপণ করিতে হয় না, তার নীচে 'সার' দিতে হয় না, জল দিতে হয় না, এমন কি এলাইচের ক্ষেতের চারি ধারে কোনও বেড়া দেওয়া পর্যন্ত আবশ্যকীয় নহে। গুজরাট অঞ্চলে এলাইচের ফসল কি করিয়া হয় আমরা জানি না, কিন্তু নীলগিরি ও কুর্গ প্রদেশে এলাইচের রীতি মত চাষ বা ক্ষেত কিছুই করিতে হয় না। জঙ্গলে এলাইচের গাছ আপনি হয়, এবং এলাইচ ব্যবসায়ীগণ জঙ্গল হইতে কাঁচা এলাইচ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে।

কুর্গ প্রভৃতি মান্দ্রাজের যে সকল স্থানে এলাইচ জন্মায়, সেখানকার কৃষকেরা কোন্

সময়ে এলাইচের ফুল হয় তাহা জানে, ফুল বাহির হইবার কিছুদিন পূর্বে তাহারা একবার যে যে জঙ্গলে এলাইচের গাছ আছে সেখানে যায়। আগেই বলিয়াছি এলাইচের গাছ মাটীর উপর ভর করিয়া 'লতাইয়া' বেড়ায়, ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেও যদি গাছগুলি মাটীতেই পড়িয়া থাকে, তবে ফুলগুলি ভিজা মাটীর গ্যায় লাগিয়া পচিয়া যাইবে। এই জন্য এলাইচ ব্যবসায়ীগণ ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্বে এলাইচের জঙ্গলে গিয়া লতা গুলিকে বড় বড় পাথরের উপর রাখিয়া আসে। ইহার পর প্রায় দুই মাস কাল আর কিছুই করিতে হয় না। তার পর ক্রমে যখন ফুল হইতে ফল বাহির হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তখন আর একবার ইহারা জঙ্গলে গিয়া যত এলাইচ পায়, সব কুড়াইয়া লইয়া আইসে। তার পর যত্ন করিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে। আমাদের এ দেশের জমি এলাইচের ফসলের উপযুক্ত নহে।

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৫৭-৫৮।

'যতনে রতন মেলে'

প্রমদাচরণ সেন


ণীকণ্ঠ বাবু একজন প্রাচীন লোক। অনেককাল ধরিয়া স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি যেখানে চাকুরী করেন, সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। প্রথমে তিনি স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন, ক্রমে তিনিই এখন সে স্কুলের কর্তা। কেবল যে ছেলেদের সঙ্গেই তাঁর ভাব, তাহা নহে ; ছেলের বাড়ীর লোকেরাও তাঁকে বেশ আদর করিয়া থাকেন। বাড়ীর ছোট বড় কোন মেয়েই তাঁকে দেখিয়া ঘোমটা দেন না ; আর লজ্জাই বা কি? একে বুড়ো মানুষ, তাতে দেবতার মত চরিত্র। বাণীবাবু হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি জানিতেন, স্কুল দেখিয়া সময় পাইলেই বাড়ীতে যে সকল রোগী আসিত, তাহাদিগকে দেখিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর বাটীতে গিয়া, রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন।

একদিন বাণী বাবু গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একজন বিধবা স্ত্রীলোক তাঁর একটিমাত্র ছেলেকে লইয়া সেই বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেটীর বয়স ৯ বৎসর মাত্র, কিন্তু গরিব বলিয়া ছেলেটী কোন স্কুলে পড়িতে পাইত না। বালকটীর নাম পশুপতি নাথ। পশুপতির পিতা মরিবার সময় কিছু টাকা রাখিয়া যান, তাহারই সুদে এবং দুধ যোগান দিয়া ও তরকারি বেচিয়া বিধবা একটী ছেলেকে লইয়া কোন মতে দিন চালান। পশুপতির মা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "ছেলে একটু বড় হইলে কাহারও চাকর হইয়া যদি দুপয়সা আনিতে পারে, তাহার উপায় দেখিব।" কিন্তু বেচারা কোথায় গিয়া কাহার চাকর হইবে, সেখানে সে সুখে থাকিবে কি না, মায়ের প্রাণে এই সব কথা বড়ই নড়াচড়া করিতে ছিল। বাণীকণ্ঠ বাবু বেড়াইতে আসিলে, বিধবা তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া, একথা ও কথার পর ছেলের কথা তুলিলেন।

"আমার ছেলের কি হবে? সে মাটীতে অক্ষর লেখে, বড় বেশী খেলা টেলা করে না! তাই দেখে পাড়ার লোকেরা বড় ঠাট্টা করে।"

বাণী বাবু বলিলেন—"পাড়ার লোকের আর বুঝি খেয়ে খেয়ে কাজ নাই? এ ছেলের এত শেখ্‌বার ইচ্ছা? আপনার কপাল ভাল মা! লোকের ঠাট্টা শুন্‌বেন না।"

পশুপতির মা উত্তর করিলেন—"ভগবান কি আমার ভাল কর্‌বেন? আপনি তো বুঝ্‌তেই পারেন, আমার সবে একটী ছেলে; লোকে 'পণ্ডিত চাষা' বলে তাকে ঠাট্টা করে, আর বাছা আমার সমস্ত দিন মুখ ভার করে বসে থাকে, কেমন করে সহ্য করি?"

বাণী বাবু—"তাইতো! তাইতো! ছেলেমানুষ, মনে কষ্ট হয়। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? ছেলেটীর বেশ বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শেখবার উদ্যোগ আছে; আপনি ছেলেটীকে স্কুলে পাঠিয়ে দিন না কেন? সেখানে তো আর কেউ ত্যক্ত কর্‌তে যাবে না? আমি আপনার অবস্থা জানি। আমার স্কুলে দিন, ওকে স্কুলের বেতন দিতে হবে না। কি বলেন? এতে বোধ হয় রাজি আছেন?"

বিধবা বড়ই সুখী হইলেন, বলিলেন—"আঃ এ হলে আপনি আমাকে বাঁচান। কিন্তু এর একটু অসুবিধা দেখ্‌ছি।"

বুড়ো ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"বটে? বটে? কি অসুবিধা, বল্‌বেন কি?"

পশুর মা বলিলেন,—"আমি রোজ দুবেলা বাবুদের বাড়ীতে দুধ দিতে যাই; কিন্তু আমি তো গরুটীর কাছে যেতে পারি না। গরু কেবল পশুপতিকেই চেনে, আর কেউ তার দুধ দুইতে পারে না।"

বাণীকণ্ঠ বাবু বলিলেন—"দশটা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্কুল, দুধ দোহা বন্ধ হইতেছে না তো!"

বিধবা আবার বলিলেন,—"আলুর ক্ষেত রোজই খুঁড়ে দিতে হয়, আমি মেয়ে মানুষ একলা পার্‌বো কেন?"

বাণী বাবুর কি দয়ার মন, যেন পরের উপকার করিতেই হইবে, তাই তিনি বলিলেন "ভোরবেলা একটু একটু অন্ধকার থাকিতে উঠিয়াই একাজ করা হয়। এতে শরীরের চালনাতে শরীরও ভাল থাক্‌বে আর বাড়ীর কাজটীও হবে। বেলা সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই হয়ে যাবে, তার পরে দুধ দুহিয়া পড়িতে বসিলেই চলিবে, কেমন আর কিছু আপত্তি আছে?"

আহ্লাদে পশুপতির মার চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বড়ই সুখ হইয়াছে।

পশুপতির কথা এই খানে একটু বলা আবশ্যক। অতি অল্প বয়সেই পশুপতির বাপ মরিয়া যান। তাহাদের দুই বিঘা চাষের জমি ছিল, তাহাতে আলু বেগুণ প্রভৃতি ফসল হইত, এবং একটা গরু ছিল, তাহার দুধ 'বাবু'র বাড়ীতে যোগান্ দেওয়া হইত। এ ছাড়া টাকার সুদ ছিল, এই পাঁচ রকমে তাদের দিন চলিত। পশুপতিকে জমি দেখিতে হইত, গরু দুহিতে হইত, এবং কখন কখন টাকার সুদ আনিতে যাইতে হইত। এই সকল কাজ করিয়া যে একজন ছেলে মানুষ আর পড়াশুনার দিকে মন দিবে, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? পশুপতির চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটী ছেলের সঙ্গে পশুপতির বড় ভাব। পাড়ার ছেলেরা পশুকে "পণ্ডিত চাষা" বলিয়া ঠাট্টা করে কিন্তু সেই ছেলেটী পশুপতিকে লেখা পড়া শিখাইত। নিজে খোঁড়া বলিয়া চলিয়া ফিরিয়া কাজ করিতে পারিত না, তাই ঘরে বসিয়া সময় কাটাইবার

জন্য একটু একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। তাহার যতটুকু বিদ্যা তাই শিখাইবার জন্য সে রোজই লাঠি ভর করিয়া পশুদের বাড়ীতে আসিত। যে দিন বাণী বাবু এই বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেদিনও "খোঁড়া দীননাথ" পশুপতিকে পড়াইতে আসিয়াছিল। দীননাথ বা পশুপতি কেহই জানিতনা যে বাড়ীতে আর কেহ আসিয়াছে। তাই তাহারা কিছু পরে একটু চেচাইয়া আলাপ করিতে লাগিল। দুটী গলার স্বর শুনিয়া বাণী বাবু বলিলেন "পশুপতি আর কে?" পশুর মা সমস্ত বলিলেন। বাণী বাবু কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন "কেমন শিক্ষক একবার দেখিতে হইল।" এই বলিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে উকী মারিলেন। দেখিলেন দীননাথ কয়লা দিয়া মেজেতে সুন্দর অক্ষরে, তিন-অক্ষর-যুক্ত কথা লিখিয়াছে, আর তার অর্থ পশুপতিকে বুঝাইয়া দিতেছে। বাণী বাবু দেখিলেন ছেলেটী কথাগুলির অর্থ বেশ বোঝে। মাঝে মাঝে গুরু ছাত্রে মিলিতেছে না। তখন দীননাথ বলিতেছে, "ঠিক বলেছ, পশু! তুমি ভাই যা বলেছ, তাই ঠিক্। যাক্, চিরকাল আমার মত মূর্খের কাছে পড়িতে হবে না? কিন্তু ভাই! তোমায় আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হবে? তুমি যখন বড় লোক হবে"—(পশুপতি মাথা নাড়িল)—"না ভাই! আমি ঠাট্টা করিতেছি না, তুমি নিশ্চয়ই বড় লোক হবে।"

পশুপতি বাধা দিয়া বলিল, "তুমি বড় লোকের কথা বলিও না। ওতে আমার মনে মনে অহঙ্কার হতে পারে? আর আমি যে গরিব দুঃখীর ছেলে, তা' ভেবে আমার মনে দুঃখ ও কষ্ট হতে পারে"।

দীননাথ বলিল, "বড় হওয়া তোমার কপালে আছে। সৎকার্যে যার এত যত্ন, তার তো কপাল খুলে রয়েছে। তা' ভাই! আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর, যখন তুমি একজন বড় লোক হবে, তখন ভুলবে না যে এক সময় তুমি বড় গরিব দুঃখী ছিলে, আর ভুলবে না যে তোমার মা তোমার মুখ চেয়ে-আছেন। আর ভাই দুটী কাজ ক'রো। যেখানেই থাক, কাণা, খোঁড়া, প্রভৃতি হতভাগাদিগকে, আমার কথা মনে ক'রে দয়া ক'রো—আর, পাপ মদটাকে বিষের মত জেনে, দুই হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিও। আমাদের দেশের অনেক বড় লোক এই বিষে গেল।"

বালক দিগের এই সকল কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। সেই ঘরে ঢুকিয়া দীননাথকে যথেষ্ট আদর করিলেন এবং পশুপতিকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আর অধিক বলিবার নাই। বাণী বাবুর স্কুলে যত টুকু শিখিবার ছিল, তাহা শিখিয়া পশুপতি হিন্দু কালেজে ঢুকিল এবং অল্প দিনের মধ্যে আপনার বিদ্যার তেজে সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

উপরে যাহা লেখা গেল, সমস্ত সত্য কথা, কেবল নাম ও স্থান গুলি আমরা গোপনে রাখিলাম। আজ পশুপতিনাথ আপন দেশের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত। যে বালক এক সময়ে গরু দুহিত এবং মাটীতে অক্ষর লিখিত, আজ তাহার কত সম্মান! যত্ন করিলেই সব হয়।

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৬, পৃ. ৬১-৬৩।

সুখী কে?

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



ঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি জান পৃথিবীতে খুব সুখী কোন্ লোক? তোমরা হয়ত বলিবে যাহার অনেক টাকা গাড়ী, ঘোড়া, শাল, জামিয়ার, সে খুব সুখে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, কোন ভাবনা নাই, কোন ভয় নাই, যা মনে করে তাই হয়, বেশ ত! সেই রকম লোকই বড় সুখী, কেমন? এই বলিবে না? তোমাদের মধ্যে যিনি ভাল ভাল পোষাক ভাল বাসেন, তিনি যাহার গায়ে খুব ভাল পোষাক দেখিবেন তাহাকেই সুখী মনে করিবেন। যিনি আবার পীড়িত, কেবলই ব্যামো হয়, তিনি প্রায় সুস্থ সবল লোক দেখিলে তাহাকেই সুখী বলিবেন। যাঁহাকে মাষ্টার ভালবাসে না, তিনি হয়ত ক্লাশের ভাল ছেলে যাহারা তাহাদিগকেই সুখী মনে করিবেন। বাস্তবিক আবার একটা মজা আছে, বালকেরা মনে করে "যুবারা বেশ সুখে থাকে। কেমন! তাদের বাপ মারে না, কেমন কলেজে পড়ে, আহা! বেশ আমরা কবে এরূপ হব?" যুবারা আবার মনে করে যে তাদের অপেক্ষা বড় যারা তারা কেমন সুখী, কেন না তাদের ত আর কারো অধীনে থাকিতে হয় না, কেমন চাকরি বাকরি করিতেছে, যা ইচ্ছা করিতেছে, বেশ। আবার বুড়োরা চিরকাল বলে "আহা! বাল্যকালে কি সুখের দিনই গিয়াছে? সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না; বাবা খেতে পোর্‌তে দিতেন। মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, সে এক দিনই গেছে!" আমি এক জন ছেলেকে চিনি যে কাটবেরালিদের পর্যন্ত হিংসা করে, "আহা! ওরা কি সুখী, ওদের পড়া কর্ত্তে হয় না, কেবল দিন রাত্রি খেলা করে, বাঃ!"

এ দিকে আবার যিনি খুব ধনী তিনি বলেন "যদি গরিব হ'তাম তা হলে এত ঝঞ্ঝাট থাকিত না, মিছামিছি কেবল হাজার হাঙ্গামায় রাত পোহাতে হোত না। বাবা রে! রাত্রে ঘুম হয় না, পাছে টাকা চুরি যায়, আর কত যে ভাবনা, কত যে মান সম্ভ্রমের চিন্তা, কত যে বিপদের আশঙ্কা, এর চাইতে গরিব দুঃখী হইয়া পাতার কুঁড়েতেও সুখী হওয়া যায়।" গরিব যিনি তিনি আবার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন, দুঃখ সহিতে পারেন না, ক্ষুধায় অন্ন যোটে না, শীতে কাপড় পান না, নানা কষ্টে শরীর মৃতপ্রায়—কেবল বিধাতাকে নিন্দা করেন।

জগৎ শুদ্ধ লোকের ত এই দশা। কেহই আর আপনার অবস্থাতে সুখী বোধ করেন না, সকলেই পরস্পরের অবস্থাকে সুখের মনে করে। একি আশ্চর্য ভাই! তবে কি সুখ কোথাও নাই? আবার সুখ সব অবস্থাতেই আছে! হ্যাঁ বাস্তবিকই তাই। সুখ মনে, সুখ সন্তোষে, সুখ নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নিজে যদি মনে করি আমি পরম সুখী, তবে ঘোর দারিদ্র্যে, খুব কষ্টেও আমি সুখী হইব। নহিলে সংসারে সুখ নাই। হাজার সুখের জিনিয থাকুক, আর তার সঙ্গে যদি একটু অসুখের কারণ থাকে,—এক ফোঁটা, এক তিলমাত্র,—অমনি আমার সব সুখ গেল। লাখ্ টাকার মধ্যে, ধুম ধাম আমোদের মধ্যে, একশতটা গাড়ী ঘোড়ার মধ্যে হয়ত আমার একটু রোগ আছে, কাজেই আমি সুখী নই,—অম্নি বলি "আহা যদি এই রোগটী যায় আর আমাকে ফকির হইতে হয় তাতেও আমি সুখী।" গেল আমার রোগ, ফকির হলাম। তখন আবার বাবুর কথা বদ্‌লে যাবে। "আহা! এ আমার কি হ'লো, একটুখানি

অসুখ ছিল বৈত নয় তাও কত ডাক্তারের কত ঔষধ দিতাম, কিন্তু তা ছাড়া কত সুখে ছিলাম, এখন আমার দুঃখ দেখে কে। হায়! হায়! আমার কি হলো?" এই রকম স্বভাব যে সকল লোকের, "সুখ সুখ" ক'রে যারা হাহাকার করে, তাহারা সুখী হয় না। তবে কে হয়?—

যে শান্ত মনে পরম পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুখে দুঃখে, ভালতে মন্দতে, কোন সময়েই যে মনে করে না "আমি দুঃখী", কেন না, ঈশ্বর তাহার অপেক্ষা অনেক জানেন, কোন্ অবস্থা তাহার ভাল তাহা তিনি বেশ জানেন, জানিয়াও যখন তিনি ঐ দশায় তাহাকে রাখিয়াছেন তখন উহাই তাহার সুখের অবস্থা। এই ভাবিয়া যে প্রতিদিন সেই মঙ্গলময় দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কর্তব্য কার্য প্রতিপালন করিয়া দিন কাটায়, বাস্তবিক সেই যথার্থ সুখী, তা না হ'লে জগতে কোথাও সুখ নাই।

ছোট ছোট ভাই বোন! তোমরা যদি সুখী হবার ইচ্ছা কর, তবে এই রকমে পরম ধন ধর্ম ও সন্তোষের বলে সুখী হইতে চেষ্টা কর, তা না করিলে আর কোথাও সুখ পাবে না, কেবল "হা সুখ যো সুখ" ক'রে ক'রে,—দুঃখ ভোগেই জীবন কাটিয়া যাইবে।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৬৫-৬৬।

অভয়ের সুশিক্ষা

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



অভয়, রমণী, বিজয়, যোগীন, প্যারী প্রভৃতি অনেকগুলি বালক এক সঙ্গে খেলা করে; খুব ভাব। রোজ বিকালে বাবুদের বাগানে খেলাধূলা, কুস্তি, জীম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি করে, গায়ে বেশ জোর আছে, মনেও খুব্ ভরসা। অভয় বড় মানুষের ছেলে, তার খুব রাগ বেশী, মন বড় চঞ্চল। আজ এক কথা বলে কাল তা বদ্‌লে যায়, মতের একটুও ঠিক নাই। মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে "আমি বড় মান্‌ষের ছেলে, আমার গায়ে এত জোর!" ক্রমে আরও একটি অহঙ্কারের কারণ যুঠিল। তাহাদের একটি ছোট সভা আছে, তাহাতে অভয় একজন প্রধান, সে জানে যে সে একজন সৎ ও ধার্মিক বালক! অহঙ্কার যে মানুষের কি সর্বনাশ করে তাহা একবার দেখাইব।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছেলেদের সব কি গালাগালি দেয়, তারা এসে সকলের কাছে নালিস করে। ছোট লোক দরওয়ান বৈত নয়! তাকে কি সব বলেছে, সে চড়া মেজাজ, বেশ কোরে গাল দিয়েছে। তা তার মনিবকে বলিয়া দিলেই ঠিক হইত, তাহা না করিয়া রোকা বালক বাবুদের বুদ্ধিতে স্থির হইল দরওয়ান বেটাকে মারিতে হইবে। এত বড় আস্পর্দা! আমরা বড়লোক, আমরা কুস্তি টুস্তি করি, আমাদের কি না গালি দিয়া যাইবে? তার কিছু সাজা হবে না? রমণী ত রাগে উন্মত্ত! যেমন ডালকুত্তা গর্জায় এমনি ফুলিতে লাগিল, সমস্ত দিন খেলে না, রাগে একেবার জ্ঞান হীন!! তার রাগ দেখিয়া ও একজন লোককে মারিবার সুযোগ পাইয়া দুরন্ত ছেলেদের মহা আহ্লাদ। বিজয় ত মহা উৎসাহী। সব প্রস্তুত, ঠিক ঠাক। সন্ধ্যার সময় যখন দরওয়ানটা রাস্তা দিয়া যাবে তখন মারা হইবে। দু একজন শান্ত স্বভাব বালক বারণ করিলে বিজয় বাবু বলিয়া উঠিলেন—"কি ভীরু"! ছি ছি!!

আমাদের এক সঙ্গে যিনি যিনি না থাকিবেন তাহাদের লইয়া আর আমরা খেলিব না আর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিব না।" কাজেই সকলে একত্রে যুঠিয়া দরওয়ানটীকে লাঠী মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইল। পরে সকলে প্রস্থান!! সেদিন বাবুদের রোক্ কি? তেজে ধরণী ফাটিতেছে। অভয়ের ও বিজয়েরই উদ্যোগ বেশী। বিজয়ই লাঠী যোগাড় করিয়া দিল আর অভয়ই সজোরে মাথা ফাটাইলেন। ধন্য বীরত্ব! খুব বাহাদুর!!

দরওয়ান ত নালিশ করিল। এইবার আমার ইচ্ছা করিতেছে, পাঠক পাঠিকাগণ একবার দেখিতেন যদি ছেলেমহলে কি রকম মজা হইতে লাগিল!! সে কথা আর কি বলিব? প্রধান চাঁই অভয় ত ভয়ে আকুল। আহার নিদ্রা বন্ধ ; কেবলই দিন রাত ঐ ভাবনা। কি হবে? কেহ বলিল তাহার জেলে যাইতে হইবে, কেহ বলিল তাহারা বেশী দাবী দিবে, হয়ত দ্বীপান্তরিত হইতে হবে, কেহ বলিতেছে "নানা! ঘা কতক বেত।" কেহবা বলিল জরিমানা। মহা দুর্ভাবনা। অভয় রমণী ও যোগীন এই তিন জনকে চিনিতে পারিয়া আসামী করিয়াছিল। ইহাদের পক্ষের লোকেরা যুক্তি করিয়া স্থির করিল যে "সটান মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিতে হইবে, নইলে রক্ষা নাই।" সেও মহা বিপদ। অভয়ের বিপদের সীমা নাই, উভয় সঙ্কট। সত্য বলিলে মেয়াদ হইবে। মিথ্যা বলিলেও সভায় বন্ধুগণের কাছে অপমান মহা বিপদ! অভয় ত মৃত প্রায়। শেষ নিরুপায় হইয়া রফা করিবার চেষ্টা করিল। তাহাও হইল না। আহা! সেই অহঙ্কার কোথা? পাঠক পাঠিকা তোমাদের হাসি পাচ্ছে না? আমার ত পাচ্ছে। সেই বুক ফোলান কোথা? সেই সত্য কথার গর্ব কোথা? সেই ধন ও বলের গর্ব এখন চূর্ণ। এক জন সামান্য দরওয়ানকে মারিয়া জেল!! কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! অভয় যে কতবার নাক কান মলিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ১০০ বার হবে! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! কেমন মজা! ঈশ্বর এই রকমেই অহঙ্কারীকে শাস্তি দেন।

আবার এক আশ্চর্য দেখ। এক দল ছেলেতে মারিল। তার পর যাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে "আমিত ছিলাম না। হ্যাঁ! আমাকেও বুঝি জড়াইবে?" যে বিজয় সে রূপ তেজের সঙ্গে বলিয়াছিল "যে আমাদের সঙ্গে যোগ না দেবে তার সঙ্গে কথা কহিব না," যে বিজয়ই অভয়ের হাতে লাঠী তুলিয়া দিল, যে বিজয় শত শত গালাগাল ও কটূক্তি করিয়া দরওয়ানকে চটাইয়া দিল—সেই "পালের গোদা" বিজয়ই এখন আবার গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন "যেমন কর্ম তেম্নি ফল, মার্‌লে অভয়, সাজা পাবেই ত!! অভয় বড় গোঁয়ার নির্বোধ, ইত্যাদি।" এম্‌নি কালই বটে! যাহোক্ বিজয়, তোমাকে খুব চেনা গেল। তুমিই না লাঠী বাড়াইয়া দিয়াছিলে আর সেই "কথা কবোনা" বলেছিলে? এমনি বন্ধুই বটে? বিপদের অংশ কেহই লইতে চাহে না। বেশ, বেশ!

মকদ্দমার দিন আসিল। সমস্ত ঠিক ঠাক। মিথ্যা কথা বলিয়া সব উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিচার হইতেছে। যোগীন ও রমণী সমস্ত মিথ্যা বলিয়াছে। কিন্তু মিছা কথা কতক্ষণ থাকে? উকীলের জিজ্ঞাসার মুখে সব সত্য প্রকাশ হইয়া গেল। সাহেব রাগে পেন্সিল মুখে দিয়া কামড়াইতে লাগিলেন। অভয়ের এইবার বলিবার পালা আসিল। অভয় দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। একটীও মিথ্যা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সমস্ত সত্য বলিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "সাহেব, আমি অপরাধ বাস্তবিক করিয়াছি, আমাকে আজ দশ দিন ধরিয়া মিথ্যা শিখাইতেছে, কিন্তু একবার অপরাধ করিয়া আবার আর

একটা বড় দোষে উহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে আমি পারিলাম না। আমি বড় অহঙ্কারী ছিলাম। আমার সাজা হওয়াই উচিত। আপনার বিচারে যাহা হয় তাহাই আজ্ঞা করুন। আমার মনের ভিতর এ কয়দিন যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা অপেক্ষা জেলের কষ্ট হাজার গুণে ভাল।” এই বলিতে বলিতে চাদরে চক্ষু রাখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। আদালতদ শুদ্ধ লোক বালকের সরলতা, সত্য কথা বলিতে সাহস, মিথ্যা বলাতে ঘৃণা ও দোষ করিয়া অনুতাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। অনেকের চক্ষে জলও আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও ক্রোধ দূর হইল।

অবশেষে তিনি এই হুকুম করিলেন যে “রমণী ও যোগীন যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা তাদের দোষ নয়, সে কেবল তাহাদের কর্তাদের দোষ। সুতরাং আমি তাহাদিগকে বেত বা জেল দিব না। কিন্তু মিথ্যা বলা যে দোষ ইহা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। আর অভয় বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইল, আমার বিশ্বাস যে সে আর কখন এরূপ অন্যায় কার্য করিবে না।”

অভয় উত্তম শিক্ষা পাইল। সে ভাল হইয়া গেল, সে শিখিল যে

(১ম) কোন বিষয়েই অহঙ্কার করা উচিত নয়।

(২য়) মানুষ যতই গরিব হউক, দরওয়ানেই হউক আর যেই হউক, তাহাকে বিনা দোষে বা অল্প দোষে মারা উচিত নয়। মানুষ সবই সমান।

(৩য়) যে কোন মন্দ বিষয়ে সহায় হয় সে কখন বন্ধু নহে, বিপদের সময়ে সে নিশ্চিতই ফেলিয়া পলাইবে।

(৪র্থ) দোষ করিলেই তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(৫ম) একটী দোষ করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিলে বাঁচা যায় না, বরং বিপরীত হয়। কেননা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা থাকে না। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। কখনও মিছা কথা কওয়া উচিত নয়।

(৬ষ্ঠ) পাপের জন্য যে অনুতাপ হয়, শরীরের শাস্তি তাহার কাছে কিছুই নয়।

(৭ম) ধর্মের দিকে যাহার দৃষ্টি জগতের সমস্ত লোক তাহার সহায় হয়।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৬৬-৬৮।

নববর্ষের নূতন গল্প

ভুবনমোহন রায়


রেন্দ্র বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে, এখন তাহার বয়স এগারো বারো বৎসর হইবে। মরিবার সময় নরেন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রকে চন্দ্রনাথ বাবু নামক কোন আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া যান ; ইহাঁর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, নরেন্দ্রকে পাইয়া তিনি অতি যত্নে তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া নরেন্দ্র প্রথমতঃ মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকিল না। নরেন্দ্র মন্দ বালকদিগের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিল, কুসঙ্গে পড়িয়া দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল; লেখা পড়ায় অমনোযোগ হইল ; ক্রমে শিক্ষকের অবাধ্য হইয়া উঠিল, দুষ্ট বালকদিগের

সহিত মিশিয়া সর্বদাই খেলা করিয়া বেড়াইত, কাহারই কথা শুনিত না। কিন্তু এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের একটি গুণ ছিল,—সে চন্দ্রনাথবাবুকে বেশ ভালবাসিত এবং প্রায়ই তাঁহার অবাধ্য হইতনা। একদিন চন্দ্রনাথ বাবু শুনিতে পাইলেন যে নরেন্দ্র কতকগুলি দুষ্ট বালকের সঙ্গে মিলিয়া অন্য কতকগুলি বালকের সহিত মারামারি করিয়াছে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই জন্য গালাগালি দেওয়াতে নরেন্দ্র শিক্ষককে অমান্য করিয়া বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন ; যাহার পিতা অত্যন্ত সৎ এবং ধার্মিক ছিলেন তাঁহার সন্তান এরূপ হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি নরেন্দ্রকে ডাকিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, বলিলেন "নরেন্দ্র! তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছি, তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছি, যাহাতে তুমি তোমার ধার্মিক পিতার ন্যায় হইতে পার তার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা মাটী হইয়া যাইতেছে, তুমি দিন দিন খারাপ হইতেছ, তোমার পিতার নাম ডুবাইতে চলিয়াছ, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।" পূর্বেই বলিয়াছি নরেন্দ্র চন্দ্রনাথ বাবুকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, কাজেই সে মাথা হেঁট করিয়া এ সমস্ত শুনিল, তাহার চক্ষে জল আসিল, নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল নরেন্দ্র বাপ মাকে হারাইয়াছে, সে এক প্রকার তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ চন্দ্রনাথ বাবুর তিরস্কারে পিতামাতার কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল ; সে নানা প্রকার চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া পড়িল, অবশেষে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই ভাবে অনেক রাত্রি হইল, নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রাযোগে নরেন্দ্র এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিল ;—দেখিল যেন অতি উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সে আলোকের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ আকাশ হইতে ধীরে ধীরে, তাহার দিকে উড়িয়া উড়িয়া নামিয়া আসিতেছেন, নরেন্দ্র দেখিয়া ভীত অথচ আশ্চর্য হইল ; ক্রমে সেই পুরুষ নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?" নরেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের মুখে নিজের নাম শুনিয়া অবাক্ হইল, পরে বলিল "আমি আমার পিতার জন্য কাঁদিতে ছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে একবার তাঁহার নিকট যাই এবং তাঁহাকে দেখি।" তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! আমি তোমাকে যে কার্য করিতে বলিব, যদি তুমি তাহা করিবেই করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" নরেন্দ্র পিতার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, সে তখনই এই কথাতে সম্মত হইল। তখন সেই পুরুষ নরেন্দ্রকে এক মনোহর বাগানে লইয়া গেলেন ; নরেন্দ্র দেখিল বাগানটি অতি সুন্দর, নানা প্রকার সুন্দর বৃক্ষ লতার বাহারে পোরা, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও ফলের ভরে গাছগুলি নোয়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা ঝরণা হইতে জল উঠিয়া মিষ্ট শব্দে চারিদিক পূর্ণ করিতেছে, কোথাও পাখীরা সুমিষ্ট গানে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে ; নরেন্দ্র সে মনোহর শোভা দেখিয়া মোহিত হইল। তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ নরেন্দ্রকে সেই উদ্যানের মধ্যের একটি সুন্দর সাজান গৃহে লইয়া

গেলেন, এবং বলিলেন "নরেন্দ্র! এই ঘর তোমারই জন্য, এই ঘরে দাস দাসী রহিয়াছে তাহারা তোমার কথা শুনিয়া চলিবে, এই উদ্যান মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতে পার—ইহা তোমারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।" স্বর্গীয় পুরুষ পুনরায় আর এক স্থানে নরেন্দ্রকে লইয়া গেলেন ; নরেন্দ্র দেখিল একটু ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ফুটন্ত পদ্মে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; স্বর্গীয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"নরেন্দ্র! কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র বলিল "হাজার হাজার সুকোমল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাই দেখিতেছি।" তখন আবার প্রশ্ন হইল "আর কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র দেখিল এক একটি পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ রহিয়াছে,—বলিল "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাগাছ।" স্বর্গীয় পুরুষ বলিলেন এই ফুলগুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এই পদ্ম গুলিকে তিনি বড় ভালবাসেন, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষগুলি দেখিতেছ, উহারা ঐ পদ্মগুলির মহাশত্রু। কণ্টকবৃক্ষ গুলিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই বর্ধিত হইয়া সমুদায় পদ্ম গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে ; পূর্বেই বলিয়াছি এই পদ্ম গুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এগুলি নষ্ট হইলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইবে, অতএব প্রত্যহ তুমি এক একটি কণ্টক তুলিয়া ফেলিবে, দেখিও যেন এগুলি বর্ধিত হইয়া পদ্মগুলি নষ্ট না করে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিও না, তুমি কার্যে নিযুক্ত থাক, সময় হইলে আমি আসিয়া তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র সম্মত হইল ; তখন সেই পুরুষ বলিলেন "সম্মুখে চাহিয়া দেখ।" নরেন্দ্র দেখিল কিছু দূরে অতি উজ্জ্বল সোনার দরজা ; ফিরিয়া দেখিল সেই স্বর্গীয় পুরুষ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, নরেন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল। নরেন্দ্র প্রত্যহ এক একটি কণ্টক বৃক্ষ তুলিয়া ফেলিত এবং সেই বাগানের মধ্যে আপনার মনের আনন্দে দিন কাটাইত। এইরূপে কয়েকদিন গেল, একদিন নরেন্দ্র দেখিল যে সম্মুখে বৃক্ষ ডালে একটি অতি সুন্দর পক্ষী বসিয়া গান করিতেছে. বড় ইচ্ছা হইল পক্ষীটিকে ধরিয়া আনে। ধরিবার জন্য সে বৃক্ষে উঠিতে লাগিল ; কিন্তু কতক দূর উঠিতেই পাখীটি উড়িয়া আর এক বৃক্ষে গিয়া বসিল, নরেন্দ্র আবার সেই বৃক্ষে উঠিতে গেল, পক্ষীও আর এক বৃক্ষে উড়িয়া গেল, এই রূপে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে নরেন্দ্র পক্ষী ধরিবার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল ; অবশেষে পক্ষী উড়িয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল, নরেন্দ্র আর দেখিতে পাইল না। অতিশয় ক্লান্ত হইয়া নরেন্দ্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল যে সেদিন কণ্টক বৃক্ষ তোলা হয় নাই, ভাবিল অদ্য বড় ক্লান্ত হইয়াছি। কল্য একেবারে দুইটি বৃক্ষ তুলিব তাহা হইলেই হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল পূর্বদিনের শ্রমের জন্য শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে, তখন মনে করিল আজ অসুখ বোধ করিতেছি, আজ থাক্, কাল অনেকগুলি তুলিয়া ফেলিব। দিনের পর দিন আসে এদিকে নরেন্দ্রেরও এক একটি বাধা উপস্থিত হইয়া কার্য বন্ধ থাকে। এই রূপে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই কার্যে অবহেলা হইতে লাগিল, অবশেষে একদিন দেখিল সেই ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষগুলি বর্ধিত হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আর সেগুলি ছোট নয়, বড় বড় বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর পদ্মফুল গুলি শুকাইয়া গিয়াছে, সে পুষ্করিণীর আর সে শোভা নাই। দেখিয়া তাহার মনে বড়ই ভয় হইল। মনে ভাবিতে লাগিল আমি কি অন্যায় কার্যই করিয়াছি, পিতার প্রিয় জিনিষগুলি অমনোযোগ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার প্রিয়পদ্ম গুলি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কণ্টক বৃক্ষগুলি বাড়িয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে,

এখন আমি কি উপায় করিব, ক্ষুদ্র থাকিতে যদি তুলিয়া ফেলিতাম তাহা হইলে এগুলি এত বড় হইতে পারিত না। এত বড় বৃক্ষ কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলিব, হায়! আমি কি দুষ্কর্মই করিয়াছি! এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে নরেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল ; তখন দেখিল তাহার সম্মুখে সেই স্বর্গীয় পুরুষ এক ধারাল কুঠার হস্তে উপস্থিত, দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, তাহার মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল ; নরেন্দ্র ভাবিল পিতার কথা শুনি নাই, সেই জন্য বুঝি আমায় মারিয়া ফেলিবে। এখনই বুঝি এই কুঠার দ্বারা আমার শরীরটা দুখণ্ড করিয়া ফেলিবে; এইরূপ ভাবিতেছে তখন সেই পুরুষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "নরেন্দ্র! তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, ভাবিয়া দেখ তুমি কি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, তোমার পিতার অতি প্রিয় পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এই কণ্টক বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র থাকিতে তুলিয়া ফেলিলে এত বড় বৃক্ষ হইতে পারিত না এবং এই সুন্দর পদ্মবন একেবারে ছারখার হইয়া যাইত না, আর দেখদেখি সেই স্বর্ণময় দ্বার আর দেখিতে পাও কি না।" নরেন্দ্র সভয়ে দেখিল আর সে দ্বার দেখা যাইতেছে না, চারিদিকে কণ্টকবৃক্ষ মাথা তুলিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! এখনও আশা আছে, এখনও যত্ন করিলে তোমার পিতাকে খুসী করিতে পার ; এবং তাঁহার নিকটে যাইতে পার।" আশার কথা শুনিয়া নরেন্দ্র এক দৃষ্টে সেই পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন "এই লও, এই কুঠার লইয়া এই বনের মধ্যে যাও, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এক একটি করিয়া বৃক্ষ কাটিতে থাক, যে দিন তোমার এই কার্য শেষ হইবে সেই দিন তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া উৎসাহের সহিত কুঠার হস্তে লইল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্যে নিযুক্ত হইল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে সেই শুভদিন উপস্থিত হইল। পূর্বদিকে সূর্য উদিত হইয়াছে, চারিদিক যেন সোণার রঙে চিত্রিত, পক্ষীগণ সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা ফল ফুলে শোভা পাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথের কার্য শেষ হইল, সেই সরোবর আবার সহস্র পদ্মে পূর্ণ হইয়া গেল আবার পূর্বের শোভা ধারণ করিল, নরেন্দ্র আবার সেই স্বর্ণময় দ্বার দেখিতে পাইল। হাসিতে হাসিতে সেই স্বর্গীয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিলেন, সযতনে তাহাকে দুটি ডানা পরাইয়া দিলেন। তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! তবে চল তোমার পিতার কাছে যাই।" এই বলিয়া সেই স্বর্গীয় পুরুষ আকাশ পথে সেই স্বর্ণময় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পথে চলিতে লাগিল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সেই পুরুষ দ্বারে হাত দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল, নরেন্দ্র দেখিল এক সুন্দর দেশ, সেখানে চিরসুখ বিরাজ করিতেছে, চতুর্দিকে শোভাময়, সেখানে বিবাদ কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নরেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে যতই যাইতে লাগিল ততই আনন্দ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য এবং অত্যুজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে পড়িল।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। জানালা দিয়া সূর্যের কিরণ তাহার চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্বরাত্রের আশ্চর্য স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ; তাঁহার নিকটে সমস্ত ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইহার অর্থ কি?" চন্দ্রনাথ বাবু অবাক্ হইয়া

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে খানিকক্ষণ মনস্থির করিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! অতি সুস্বপ্ন দেখিয়াছ, স্বপ্নটি অতি গভীর উপদেশে পূর্ণ, ইহা তোমার জীবনের একটি বড় সুখের ঘটনা বলিতে হইবে ; এই স্বপ্নে যে গভীর উপদেশ রহিয়াছে তাহার মত কার্য করিলে চিরকাল সুখী হইতে পারিবে, ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।" চন্দ্রনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেন্দ্র! সেই যে স্বর্গীয় পুরুষ দেখিয়াছ, উহা বিবেক অর্থাৎ আমাদের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার শক্তি, মানুষ যখন অসৎ পথে যায়, পাপ কার্য করে তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ মানুষকে সেই পথ হইতে ফিরাইয়া আনে এবং সৎপথে লইয়া যায়, মানুষ যখন এই পুরুষের কথা না শুনে তখন নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু ইহার বাধ্য হইয়া থাকিলে ইহার সৎপরামর্শ শুনিলে, মানুষকে স্বর্গের দিকে লইয়া যায়,—ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। সেই যে মনোহর বাগানটী দেখিয়াছ উহা মানুষের মন, তাহাতে যে সমস্ত সুন্দর ফুল এবং মনোহর ফুটন্ত পদ্ম দেখিয়াছ, সেগুলি আমাদের মনের সদ্‌গুণ ; এই গুলি ঈশ্বরের অতি প্রিয়, আর সেই যে কাঁটাগাছ দেখিয়াছ, সে গুলি পাপ এবং খারাপ প্রবৃত্তি, এই গুলি বাড়িয়া উঠিলে সমস্ত সদ্‌গুণ, ভাল ভাব, ও পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যের মনের বাগান বিশ্রী হইয়া যায়, পাপ ও খারাপ ভাব সকল বর্ধিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে, মানুষ আর স্বর্গের দ্বার দেখিতে পায় না, ধর্মের রাজ্য হইতে দূরে পড়িয়া থাকে ; নরেন্দ্র! এই গভীর উপদেশ সর্বদা মনে রাখিও, জীবনে কখনও ইহা ভুলিও না।"

নরেন্দ্র সমস্ত ধীর ভাবে শুনিল, সেই দিন হইতে এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং জীবনে সুখী হইল। পাঠক পাঠিকা! আমাদের গল্প শেষ হইল, ইহাতে যে গভীর উপদেশ রহিয়াছে তোমরাও তাহা কখনও ভুলিও না ; জীবনে এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিও, তোমরাও সুখী হইবে।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৬৮-৭২।

আয় যাদু কোলে আয়!

কুমারী * দেবী



য় যাদু কোলে আয়! তোকে বুকে করে রাখি। তোর ঐ চাঁদমুখ খানি আমার বড় ভাললাগে। তোর মুখে কি সুধা মাখান আছে তাই আমার এত ভাল লাগে? ও সোণার মুখ খানি দেখি। দেখি ও চাঁদ-মুখখানি দেখি। ইচ্ছা হয় তোর ঐ নির্মল পবিত্র মুখখানি দিন রাত দেখি। একটী চুমু খাই! আমার এই চাঁদ মুখ খানিতে—সোণার মুখ খানিতে—একবার চুমু খাইলে হবে না। তোর হাসি মাখা মুখ খানিতে সমস্ত দিন চুমু খাই। আমায় একটী চুমু দাও, যাদু! দাও! দেবেনা? দাওনা সোণার ভাই! আমি তোমায় কত খেলাম, একটিও ফিরাইয়া দিবে না। না দাও যাদু! আমি আবার খাই। তোরে যে আমার কি করিতে ইচ্ছা করে! ইচ্ছা করে তোরে আমার



বুকের হার করে রাখি। আমাদের বাড়ীর আলো! আমাদের সর্বস্বধন। আমাদের রতন। এ আলো যাদের বাড়ী আছে তাহাদের বাড়ীতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? তুমি আমাদের সাধের ফুল!

আমাদের সোণার ফুল। তুই আমাদের বাড়ীতে ফুটেছিস্। আহা কে এ ফুল ফোটালে! তুই চিরকাল আমাদের বাড়ীতে ফুটে থাক্। ঘর আলো করে থাক্!

ধন! ধন! ধন! অমূল্য রতন!
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন!
তোকে নাচাই। নাচ! নাচ! নাচ!
খোকা নাচে কোন্ খানে ; শতদলের মাঝখানে ;
সেখানে খোকা কি করে?
ডুব দিয়ে দিয়ে মাচ ধরে।"

এই বলিয়া একজন দিদী ছোট ভাইকে আদর করিতেছে ; দেখিলে কি চোক্ জুড়ায় না?

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৭৫-৭৬।

*এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আমরা পরিবর্তন করিয়াছি। স. স.

সরোজবাসিনী ও সুশীলা

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সরোজবাসিনী বড় লোকের মেয়ে। তার বয়েস প্রায় বার বৎসর শেষ হইতে চলিল তবু স্বভাব ভাল করিতে পারিল না। এক বয়সীদের সঙ্গে বড় একটী মিল নাই ; সর্বদাই পাড়ার লোকদের নিন্দা—কনকের ভাল অলঙ্কার নাই, কুমুদের কাপড় বড় কম দামের, বিন্দুবাসিনীর বর্ণ কালো—এ সমুদয় কথা মুখে লেগেই আছে। ঘৃণা করিয়া অন্যান্য বলিকাদের সঙ্গে কথা কয় না, এই সকল কারণে গ্রামে যত লোক সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, অনাবিষ্ট বলিয়া বড় কেউ আদর করে না। এক বয়সী এক সঙ্গে খেলা করে না, এই জন্য সরোজ মধ্যে মধ্যে একটু দুঃখিত হইত। বালিকারা বলিত "না ভাই! তুমি বড় লোকের মেয়ে আমরা তোমার সঙ্গে খেলাবার যোগ্য নই্।" নির্বোধ সরোজ মনে ভাবিত উহারা যথার্থ কথাই বলিতেছে। কাহার সঙ্গে খেলা করিবে, কাহার কাছে দুটী কথা বলিবে, সময় সময় সরোজ ইহা ভাবিয়া মনে অনেক কষ্ট পাইত। ফলতঃ সরোজ সুন্দর অলঙ্কার, নূতন কাপড়—বহুমূল্য শাড়ী উৎকৃষ্ট জামা ইত্যাদি পাইয়া মনে যেমন সুখ পাইত, তাহার প্রতি একবয়সীদিগের কেমন এক প্রকার ভাব, গ্রামের অন্যান্য বড় লোকদিগের বিরক্তি তাহাকে আবার তেমনি লজ্জিত এবং দুঃখিত করিত। সে ভাল পোষাক, মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা সুন্দর সাজ করিয়া বিকালে বেড়াইতে যাইত বটে, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখ খানিতে একবারও হাসি দেখা যাইত না। যাহার মনে আমোদ আহ্লাদ নাই সে আবার হাসিবে কি প্রকারে? সরোজের পিতা তাহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বাড়ীতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন ; গ্রামের অন্যান্য বালিকারাও ঐ স্কুলে পড়িতে যাইত। সরোজ পড়ায় বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু সেই শ্রেণীতেই সুশীলা নামে একটী বালিকা

বড়ই চমৎকার পড়া বলিতে পারিত। সে পড়ায় যেমন সমুদায়ের উপরে থাকিত চরিত্রেও সেই রূপ সকলের প্রধান ছিল। সুশীলা পড়ায় উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে পাড়ার সকলে ভালবাসিত—প্রশংসা করিত ; চরিত্রে সব চাইতে উত্তম বলিয়া সকলেই তাহাকে আদর করিত, যত্ন করিত। সুশীলা বুদ্ধিমতী বালিকা, সে বুঝিতে পারিত এ ভালবাসা তার শিক্ষার, এ আদর তার চরিত্রের। সুশীলাকে সকলই ভালবাসে, আদর করে, দেখিয়া সরোজের নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিল তার সঙ্গে খুব আত্মীয়তা করে। নির্বোধ বালিকা এই সৎ ইচ্ছার মত কাজ করিতে গিয়া অহঙ্কারের জন্য পারিয়া উঠিল না। সে মনে করিতে লাগিল আমি এত বড় লোকের মেয়ে, আমার এত ভাল ভাল পোষাক, এত উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ; এ সমস্ত দেখিলেই সুশীলা ভুলিয়া যাইবে। সরোজ মনে মনে স্থির করিল তার যত উৎকৃষ্ট পোষাক এবং মূল্যবান অলঙ্কার আছে তা সব গায়ে জড়াইয়া সুশীলাকে অবাক্ করিয়া ফেলিবে। একদিন স্কুলের ছুটীর পর সরোজ খুব ঘটা করে সাজগোজ করিয়া সুশীলার বাড়ীতে গেল ; গিয়া দেখিল সুশীলা একলা এক স্থানে বসিয়া 'সখা'র "ঠাকুর দাদার গল্প"টী পাঠ করিতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে বসিয়া অনেক কথাবার্তার পর বলিল "সুশীলা! দেখ দেখি বোন! আমার কেমন সুন্দর পোষাক। দেখতো কেমন ভাল ভাল অলঙ্কার—এ সব অনেক দামী জিনিষ; বাবা বিদেশী কামার দ্বারা গড়াইয়া দিয়াছেন।" সুশীলা অনেকক্ষণ কিছু কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল ; পরে বলিল "দেখ সরোজ! তোমাকে আমার বলা যদিও ভাল দেখায়না, তবু আমি যাহা ভাল বুঝি তাহা তোমাকে বলিব তাতে দোষ কি? মা এক দিবস বলিয়াছেন পোষাকের জাঁক জমক কিছু নয়। পোষাক দুদিন ব্যবহার কর অমনি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, অলঙ্কার দশ দিন ঘরে রাখিয়া দাও, অমনি মর্চে ধরিবে, ময়লা হইয়া যাইবে। অহঙ্কার করিবার জিনিষ এ সব নয়। সৌন্দর্য যদি জাঁক করিবার জিনিষ হইত তবে ময়ূর প্রভৃতি কত সুন্দর প্রাণী এ পৃথিবীতে আছে, তাদের নিকট আমাদের এ কোন্ ছার জিনিষ? শিক্ষা, সদ্বুদ্ধি, দয়া এবং ধর্ম্মভাব এই কয়টী গুণই মানুষকে দেবতার ন্যায় করে। এসমুদায় ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়না বরং যত ব্যবহার করিবে ততই উন্নত হইবে ; ইহা কখনো ছিন্ন হয় না বা মর্চে ধরিয়া ময়লা হইতে পারে না। তুমি যাহাতে এই সমুদায় ভাব মনে প্রবল করিতে পার তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কর। পরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ এ সমুদায় কুভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। দেখিবে তোমাকে লোকে কত ভালবাসে কত যত্ন করে। প্রশংসা করে।" সরোজ এত দিনে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কাপড় বা অলঙ্কার, শিক্ষা এবং চরিত্রের নিকট কিছুই নয়। বলিল—"সুশীলা! তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, ভাই! আমি আজ হতে তোমার উপদেশ মত চলিব।"

বালক বালিকাগণ! তোমরাও যদি লোকের ভালবাসা, স্নেহ, ও আদর পাইতে চাও তাহা হইলে সুশীলার উপদেশ মত চল।

২ : ৫ : মে ১৮৮৬, পৃ. ৭৪-৭৫।



বালকের বিশ্বাস

প্রমদাচরণ সেন



হারা সৈনিকের কাজ করে, তাহাদের যে কত সময় কত বিপদাপদের মধ্যে পড়িতে হয় তাহা তোমরা বোধ হয় জান না। যুদ্ধ করিতে গিয়া হয়ত প্রাণ গেল, না হয় এমন একটা শক্ত আঘাত লাগিল, যে চিরকালের মত অকর্মণ্য হইয়া থাকিতে হইল; এই তো সৈনিকের দশা। তার মধ্যে যে বিবাহ করে নাই, বা বুড়ো মা বাপ নাই, তার তবু মরিয়াও সুখ, কিন্তু যার পরিবারে বুড়ো মা বাপ, কি স্ত্রীপুত্র আছেন, যে মরিয়া গেলে ইহাঁদের কি দশা হইবে, তাহা ভাবিবার লোক নাই, তাহার কত কষ্টের অবস্থা ভাবিয়া দেখ দেখি। কয়েক বৎসর গত হইল, কোন দেশে এইরূপ একজন সৈনিকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী একটী ছেলে এবং একটী মেয়েকে লইয়া যে কি কষ্টে পড়িলেন, তাহা বলিতে দুঃখ হয়। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ! নিজে না খাইয়াও সৈনিকের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতেন, কিন্তু তাহাতেও বাছাদের পেট ভরিয়া খাওয়া যুটিত না। বালিকার বয়স ৮ বৎসর এবং ছেলেটির বয়স ৬ বৎসর মাত্র, সুতরাং তারাই বা তাদের দুঃখিনী মায়ের কি সাহায্য করিবে? অতি সামান্য অবস্থায়, গৃহস্থ বাড়ীতে চাকরাণীর মত থাকিয়া দুঃখিনী মা কিছু কিছু রোজগার করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সামান্য টাকায় কি তিনটী প্রাণীর দিন চলে? মা ছেলেদের লুকাইয়া কখনও উপোষ করিতেন, কখনও বা ছেলেরা "মা তুমি খাও না!" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলে আধপেটা খাইতেন। এরূপ কষ্টে শরীর কদিন থাকে? অভাগিনী অল্প দিনের মধ্যেই ভয়ানক ব্যারামে পড়িলেন। তখন ছেলেটী মেয়েটীর কি কষ্ট! যে গৃহস্থ বাড়ীতে তাহাদের মা চাকরী করিতেন, বালিকাটী তাহার ভাইকে লইয়া মাঝে মাঝে সেই বাড়ীতে যাইত, তখন বাড়ীর গৃহস্থ প্রায়ই তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন। কিন্তু সব দিনতো আর এরূপ যুঠিত না! কাজেই তাহারাও উপোষ করিতে শিখিতে লাগিল।

এ দিকে মা বিছানায় পড়িয়াও মেয়েটীকে শান্ত করিতেন; একদিন তিনি বলিলেন—"ভয় কি বাছা! আমি যদি মরি, ঈশ্বর তোমাদের দেখিবেন।"

বালিকা বলিল—"মা! তিনি কোথায়? তিনি কি আমাদের কোন কথা শুনিতে পান?"

মা উপর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ মা! তিনি স্বর্গে। তাঁর কাছে কষ্টে পড়িয়া যে যা চায়, তিনি তাই দেন। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তিনি তা নিশ্চয়ই করিবেন।"

বালিকা চুপ করিয়া শুনিল; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; মায়ের কথায় তার মন বসিল না—মা মরিয়া গেলে কি হবে, পরমেশ্বর দুঃখ দূর করিবেন কি না, এই ভাবনায় তার মন বড় অস্থির হইল।

এ দিকে বালকটী ঈশ্বরের কথা শুনিয়া শুনিয়া মনে ভাবিল—"বাঃ, তবে কেন ঈশ্বরকে বলে পাঠাই না, যে আমাদের বড় কষ্ট।" কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কে খবর লইয়া যাইবে? বালক তাহাও ঠিক করিল। ঈশ্বর অনেক উঁচুতে থাকেন, সেখানে মানুষ যাইতে পারে না, কিন্তু একখানি ঘুড়িতে আমাদের কষ্টের কথা লিখিয়া কেন পাঠাইয়া দিই না! বালক তাহাই করিল।

আপনার ঘুড়ি বাহির করিয়া বালক তাহাতে এই কথাগুলি লিখিল—

"পরমেশ্বর! মা বলেছে লোকে কষ্টে পড়লে, তার যা দরকার, তুমি তাকে তা দিয়ে থাক। মা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্ছে, আর আমরা খেতে পাই না। মায়ের জন্য ওষুধ পাঠিয়ে দিও, আর আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য টাকা দিও।"

বালক এই ঘুড়ি লইয়া মাঠে গেল। লম্বা সূতো যুড়িয়া সুন্দর বাতাসে ছাড়িয়া দিতে দিতে ঘুড়ি সমস্ত সূতো লইয়া অনেক উপরে উঠিয়া গেল। তখন বালক একটা গাছের সঙ্গে সূতো বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে ছুটিল। বালকের এই ভাবিয়া মনে আনন্দ হইল যে যখন ঈশ্বরের কাছে কষ্টের কথা জানাইয়াছি, তখন আমাদের আর কষ্ট থাকিবে না!

যখন বালক বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল, তখন একজন ধর্মপ্রচারক অর্থাৎ পাদ্রী সেই দিকে যাইতেছিলেন। তিনি বালকটীকে ঘুড়ি বাঁধিয়া ছুটিতে দেখিয়া, তাহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে! তুমি গাছে সূতো বাঁধিয়া কোথায় ছুটিতেছ? তোমাদের বাড়ী কোথায়?" বালক বলিল,—"আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। ঘুড়িতে কি আছে তা বল'ব না।" এই বলিয়াই বালক ছুটিল। ধর্মপ্রচারক কিছু আশ্চর্য হইয়া গাছের তলায় গেলেন এবং ঘুড়ি নামাইয়া তাহাতে কি লেখা আছে, তাহা পড়িয়া দেখিলেন। লেখাগুলি পড়িয়া ভদ্রলোকের মনে যে কি ভাব হইল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বালকের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন ; তাঁহার মনে হইল যেন এ বালকের দুঃখ ভগবান রাখিবেন না। ইহার পর ঘুড়িখানি হাতে করিয়া তিনি আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

পাদ্রী প্রায় রোজই অনেকগুলি লোককে একত্র করিয়া উপদেশ দিতেন ; এই লোকগুলি তাঁহার নিতান্ত বাধ্য ছিল। যে দিন তিনি এই ঘুড়ির কাণ্ড দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরের দিনই সকলের নিকট এই আশ্চর্য কথা বলিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। "আহা! এমন বিশ্বাসী যে বালক তাহার যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়"—এই কথাগুলি যেন পরমেশ্বর নিজে সকলের মনে তুলিয়া দিলেন। তখনি সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোক ও তাঁহার ছেলে মেয়ের জন্য টাকা উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাদ্রীর নিকট শত শত টাকা জমিয়া গেল। বিকাল বেলা সেই টাকা লইয়া তিনি নিজে বালকের বাড়ীতে গেলেন।

এ দিকে বালক বাড়ীতে আসিয়া, মায়ের কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে অথচ পরমেশ্বর কষ্ট দূর করিবেন, এই ভাবনায় হাসিতে হাসিতে, হাসি কান্নায় মিশাইয়া মাকে বলিল,—"মা! পরমেশ্বরকে ব'লে পাঠিয়েছি ; তিনি সব দেবেন।" মা বালকের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। সে রাত্রি গেল, পরের দিনও শেষ হয় হয়, এমন সময় ধর্মপ্রচারক টাকা লইয়া সেইখানে আসিলেন। বালক ঠিক বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল পরমেশ্বর নিশ্চয়ই সাহায্য পাঠাইবেন, পাদ্রীকে দেখিয়া বুঝিল ঐ সাহায্য আসিয়াছে। পাদ্রী নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা! তোমার কথা পরমেশ্বর শুনেছেন; তিনি আমাকে দিয়ে এই টাকা পাঠিয়েছেন ; আর তোমাদের কোন কষ্ট থাক্‌বে না। এখনই তোমার মায়ের জন্য ওষুধ আসিবে।" এই বলিয়া ধর্মপ্রচারক একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাইয়া, তাহার মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বালক বালিকাদিগের খাওয়া পরা ও লেখা পড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। অভাগিনী মা ভাল চিকিৎসার গুণে শীঘ্রই ভাল হইলেন ; বালক বালিকারাও বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। এ দিকে দেশের রাজাও তাঁহারই

একজন মৃত সৈনিকের পরিবারের এরূপ দুর্দশার কথা শুনিয়া, হুকুম করিলেন যে প্রত্যেক মাসে যেন কিছু কিছু টাকা তাঁহাদের দেওয়া হয়। সকল দিকেই সুবিধা হইয়া গেল। ধর্মপথে থাকিলে, ঈশ্বর কখনও মন্দ করিবেন না, এই ভাবনাটী প্রাণে গাঁথিয়া, সেই পরিবারের দুঃখ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল।

২ : ৫ : মে ১৮৮৩, পৃ. ৭৬-৭৮।

বাঁদরের বাঁদরামি

প্রমদাচরণ সেন

১


কজন বড় লোকের একটী ভয়ানক তেজাল ঘোড়া ছিল। সেটা কাকেও পিঠে চড়িতে দিত না। কর্তা ঘোড়াটীকে লইয়া কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "পোষা বাঁদরটার হাতে চাবুক দিয়া ঘোড়ার উপরে তুলে দাও।" তাহাই করা হইল। ঘোড়াটা প্রথমে বড়ই অপমান বোধ করিয়া একবার সুমুখের পা, একবার পেছনের পা তুলিয়া বাঁদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। এদিকে হনুমানের পো শক্ত হয়ে বসিয়া সপাং সপাং করিয়া চাবুক মারিতে লাগিল। মার খাইয়া ঘোড়াটা নক্ষত্রের মত ছুটিল, একবার মাঠে, একবার রাস্তায়, একবার বাগানে, একবার জঙ্গলে, কখন শুইয়া পড়িয়া, কখন হঠাৎ দাঁড়াইয়া, কখন গাছের সহিত গা ঘসিয়া, নানা রকম ফিকিরে বাদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বাঁদর কি যে আসন লইয়া বসিয়াছে, কোন মতেই পড়ে না। এদিকে দৌড়িয়া দৌড়িয়া ঘোড়ার মুখে গাঁজা উঠিতে লাগিল, জিব বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি করে, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আপনার আস্তাবলে ঢুকিয়া গেল। বানর তখন পিঠ হইতে লাফাইয়া পলাইল। সেই অবধি সে আস্তাবলে এই ঘোড়ার মত ঠাণ্ডা শান্ত ঘোড়া আর ছিল না।

২

একবার এক জাহাজে দুটী বাঁদর ছিল। তাহার মধ্যে একটা পুরুষ, আর একটী মাদী। জাহাজের লোকেরা পুরুষটাকে খুব যত্ন করিত, কিন্তু যেই মাদীটাকে কেহ কেহ একটু আদর করিত, অমনি পুরুষটা মাদীটার উপর অত্যাচার করিত। এইরূপে অনেক দিন মাদীটা চুপ করিয়া আছে—(আর কিই বা করিবে? সব জাতিতেই মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হয়, আর সবার সঙ্গেই বেচারিরা চুপ করিয়া সহ্য করে)—এমন সময় একদিন পুরুষ বাঁদরটার একেবারে ভয়ানক "চোখ টাটাইয়া" উঠিল। সে মাদীটাকে ডাকিয়া অনেক আদর করিয়া জাহাজের মাস্তুলের উপরে লইয়া গেল, এবং যেন কতই ভাল বাসে, এই ভাবে আদর করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নানারূপ জিনিষ দেখাইতে লাগিল। অবশেষে, যাই মাদীটা একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, পুরুষটা অমনি তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বেচারী ডুবিয়া মরিল ; আর পুরুষটা, জাহাজের সমস্ত লোকের আদর একলা পাইবে, এই আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসিল।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৭৮-৭৯।

ভাল লাগে না!

প্রমদাচরণ সেন


ল লাগে না, এ রোগের ঔষধ কি তোমরা কেউ জান? কি আশ্চর্য কথা! "ভাল লাগে না" বলে কি একটা ব্যারাম আছে নাকি? তবেতো তার পরিচয়টা ভাল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সকলেরই এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষ মুখ ভার করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকে অথবা ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন কাজ করিতে ভাল লাগে না। কি যে ভাবে, তার ঠিক নাই, কি যে চায়, তার খোঁজ নাই, অথচ কিছু চাই। এই সময়ে পড়িতে ভাল লাগে না, কাজ করিতে ভাল লাগে না। পাঠক পাঠিকাগণ! এ রকম "ভাল লাগে না" ব্যারাম কি কখনও কাহারও হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিয়া থাকিবেন, এ কেমন বিশ্রী ব্যারাম।

একটী বালক অথবা বালিকা দিব্যি পড়া শুনা করিতেছিল, দিব্যি কাজ কর্ম করিতেছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে তাহাকে "ভাল লাগে না" ব্যারামে ধরিল। আর সে বালক বা বালিকা হাসে না, আর সে কাজ কর্ম বা লেখা পড়ার দিকে মন দিতে চায় না, মুখ ফুলাইয়া কামারের হাপরের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে বসিয়া গেল। কে যেন হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। একি দায়? ডাক্তার, কবিরাজ, কেহই এ রোগের ঔষধ বলিতে পারিল না।

তবে কি এ রোগের কোন ঔষধ নাই? অবশ্যই আছে। যাক্, সে ঔষধের কথা বলিবার আগে ব্যারামের পরিচয়টা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। যেমন জ্বর কাহারও অল্প হয়, কাহারও বা ভয়ানক হয়, তেমনি এই ব্যারাম কাহারও অল্প হয়, কারো বা খুব বেশী হয়। "কোন একটা বিষয় ভাল লাগে না" এই হ'ল অল্প ব্যারাম, এবং "কিছুই ভাল লাগে না" এটা শক্ত ব্যারাম। এই দুই রকম ব্যারামই ছেলেমেদের হইয়া থাকে। এখন ওষুধ কোথায় পাই?

ছোট ব্যারামটার ঔষধ "চেষ্টা ও যত্ন"। যদি মনে মনে ঠিক মনস্থ করিয়া থাকি, যাহা ভাল লাগে না, তাহাকে ভাল লাগাইতেই হইবে, যাহার দিকে মন যাইতে চায় না, সেই দিকেই মনকে চালাইতে হইবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের দয়ায় এ ব্যারাম আরাম হইতে পারে। শক্ত ব্যারামটা আরাম করা সহজও বটে, শক্তও বটে ; যে রকম ওষুধ দেওয়া হয়, তারি উপরে নির্ভর করে। যদি ঠিক ঔষধটী পড়িল দেখিতে দেখিতে আরাম হইয়া গেল ; তাহা না হইলে কেবল কষ্টই সার। "কিছুই ভাল লাগে না" ব্যারামে বালক বা বালিকা এক পাশে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় কর্তা বা গৃহিণী আসিয়া তাড়া দিলেন, অথবা মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন—ও রোগের এ ঔষধ নয়, ব্যারাম আরাম না হইয়া বরং বাড়িয়া চলিল। কিন্তু ঔষধ কোথায়? "প্রফুল্লতা এবং লোক সহবাস" এই রোগের চমৎকার ঔষধ। "লোক সহবাস" কাকে বলে জান কি? একলা থাকিলেই এ ব্যারামে ধরিয়া থাকে; সুতরাং ব্যারামে ধরিলে রোগীকে দশজনের মধ্যে লইয়া যাইবে—সেখানে দশজনের মুখে দশ রকম কথা শুনিয়া এবং দশ জনের সহিত কথা কহিয়া মন প্রফুল্ল হইবে, এবং

কিছুকালের মধ্যেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। চুপি চুপি বসিয়া হিজি বিজি ছাই পাঁশ ভাবিলে, এ ব্যারাম খুব হইয়া থাকে ; এ জন্য সাবধানে থাকিবে, মনকে কখন কাজের কথা ছাড়া অন্য বাজে কথা ভাবিতে দিও না, নিজের বশে রাখিয়া, তাহাকে এদিকে ওদিকে লাফাইয়া বেড়াইতে দিও না। এইরূপ করিলেই এ ব্যারামের ভয় কমিয়া যাইবে, মনে বল হইবে এবং সকল কাজেই উৎসাহ জন্মিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৮৩-৮৪।

বিড়ালের বুদ্ধি

প্রমদাচরণ সেন



ড়ালের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, বুদ্ধিটী খুব আছে। আবার অন্য কোন কাজের বেলায় এই বুদ্ধি যত দেখান না হয়, আহারের বেলা খুব প্রকাশ পায়। কেবল বিড়াল কেন, খাবার খুঁজিয়া খাইতে সকলেই বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে।—ইন্দুরেরা কেমন ফিকিরে জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলে, দাঁড়কাক কেমন করিয়া পাথরের নুড়ি ফেলিয়া কুজোর জল খাইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। এক একটী ছেলে বাবাজি, এক একটী মেয়ে ঠাকরুণও এমন আছেন, যাঁরা পড়াশুনার বেলা, কি ঘরের কাজ কর্ম করিবার বেলা পাথরের মত নিরেট বোকা, কিন্তু খাবার সময়—ওঃ—কেমন বুদ্ধি খুলে যায়!

কিন্তু বিড়ালের যে বুদ্ধি আছে, তাহা ও পাড়ার কুন্দ স্বীকার করিত না। সে বলিত—“হ্যাঁ, ওরা ভারী বোকা, ভারী মূর্খ। তা না হলে, থালার কাছে এসে, একবার ভয়ানক মার খেয়ে গেল,—খানিকক্ষণ বাদে আবার ফিরে আসে কেন?”—আমি ভাবিলাম কুন্দ ছোট মেয়ে, বুঝাইলে বুঝিবে না ; এক দিন হাতে হাতে দেখাইয়া দিব। এক দিন বলিলাম, “কুন্দ! এক কাজ করতো, লক্ষ্মী দিদিটী! তোমাদের ঐ সরুমুখো জাগ্‌টাতে খানিকটা দুধ রাখিয়া দাওতো।”



কুন্দ বলিল “কেন, বলুন না?”

আমি বলিলাম—“রাখ না, তার পরে দেখ্‌বে এখন!” কুন্দ তাহাই করিল। তখন সেই জাগ্‌টাকে ঘরের মেজেতে রাখিয়া কুন্দেতে আমাতে একটা দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া গেল, তার পর দেখি কি, বাড়ীর ষণ্ডা বিড়ালটা সেই দিকে আসিতেছে। আমি কুন্দের গা টিপিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিলাম, এবং বিড়ালটা কি করে দুজনে মিলিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বিড়ালটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইল, একবার দরজার কাছে আসিল, আবার ফিরিয়া জাগ্‌টার কাছে গেল। অন্য দিন ষণ্ডাটার ম্যাও ম্যাও শব্দে মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত

হইয়া যায় ;—আজ ভালমানুষের মত, মুখে শব্দটী নাই! বিড়াল জাগ্‌টার কাছে গিয়া মুখ ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, জাগের সরু মুখে তার তেলোহাঁড়ির মত মুখ খানি ঢুকিবে কেন? আমি কুন্দের কানে কানে বলিলাম—"এইবার দেখ্‌বে বিড়ালের বুদ্ধি আছে কি না।" যখন বিড়াল দেখিল, মুখ ঢুকিতেছেনা, তখন সে কিছু গোলে পড়িল। খানিক্ষণ জাগ্‌টার চারিপাশে ঘুরিয়া যেন বুদ্ধি স্থির করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইয়া বসিয়া জাগ্‌টার ভিতরে একটা পা চালাইয়া দিল। সেই পাটা দুধে ভিজিলে, উঠাইয়া তাহাই চাটিয়া খাইল, এবং আবার পাটা ঢুকাইয়া দিল। এইরূপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইয়া বিড়ালটা গোঁপ মুছিয়া, ম্যাও, ম্যাও, করিতে করিতে চলিয়া গেল। কুন্দ আর আমি জাগের কাছে গিয়া দেখি, প্রায় সমস্ত দুধ খাইয়া গিয়াছে। তখন আমি কুন্দের দিকে চাহিয়া, জিতিয়াছি ভাবিয়া, বলিলাম "কেমন গো, কুন্দুনি! এখন কেমন হ'ল?" কুন্দ আর কি বলিবে?—বলিল "ওমা! এমন? তাইতো!"

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯২-৯৩।

অপূর্ব বৃক্ষ

প্রমদাচরণ সেন



গদীশ্বর আমাদের কত দয়া করিতেছেন, তাহা একবার আমাদের চারিদিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। ওই সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, সুমিষ্ট ফল সকল পাকিয়া উঠিতেছে, লোকে মনের আনন্দে কাজ-কর্ম করিতেছে ; ওই চন্দ্র আকাশে উঠিয়া, চারিদিকে আপনার শীতল কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া তপ্ত শরীরকে জুড়াইয়া ফেলিতেছে ; ওই কত ফল ফুলের গাছে আমাদের বাগান পূরিয়া গিয়াছে, একবার তাহাতে বেড়াইলে প্রাণ আনন্দে ছাইয়া পড়ে ; এ সকল কি ঈশ্বরের দয়া নয়? কিন্তু তাঁহার দয়া কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। যাঁহারা অনেক দেশে গিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলেন "হে ঈশ্বর! তোমার দয়ার শেষ নাই, মানুষের জন্য তুমি কত সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছ, তাহা আর ফুরায় না।"

পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে ; এমন কত শত ক্রোশ পর্যন্ত কোথাও এক ফোটা জল পাবার যো নাই, একটী গাছের মুখ দেখিবার উপায় নাই, যে দিকে চাও, কেবলই বালি। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে কেবলই বন, বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া, সার বাঁধিয়া, দেশ দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে। সে গুলোকে কেহই কখনও কাটিয়া পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে নাই, কাজেই ভয়ানক জঙ্গল হইয়া বুনো জন্তুদের থাকিবার যায়গা হইয়াছে। কিন্তু মরুভূমিই বল, আর এইরূপ বন জঙ্গলই বল, মানুষকে সকল যায়গাতেই চলিতে হয়। পৃথিবীতে এমন যায়গা প্রায় কোথাও নাই, যেখানে মানুষকে যাইতে হয় না। কিন্তু দশ বার দিন ক্রমাগত বনের ভিতর দিয়া যাইতেছি বা এমন স্থান দিয়া যাইতেছি যেখানে জল নাই বা খাবার কিছুই নাই,—সেখানে মানুষ বাঁচে কিরূপে? আহা! জগদীশ্বরের কি দয়া! তিনি তাহার চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

তোমরা 'পান্থপাদপ' নামক গাছের নাম শুনিয়াছ? এই পান্থপাদপে ঘা দিলেই অতি চমৎকার পরিষ্কার জল বাহির হয়। পথ চলিয়া ক্লান্ত হইলে পথিক এই গাছের নিকটে জল পায়। আশ্চর্য দেখ! যেখানে বেশ জল পাওয়া যায়, সেখানে এ গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেখানে জল নাই, যেখানে জল না পাইলে পথিক তৃষ্ণায় মরিয়া যাইবে, আমাদের দয়াময় ঈশ্বর যেন মায়ের মত, ছেলের কষ্ট বুঝিয়া আগে থাক্‌তেই সেই খানে জল লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। এই বৃক্ষ আফ্রিকার নিকটে মাডাগাস্কর দ্বীপে এবং অন্য কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।



কেবল জল রাখিয়াই পরমেশ্বর ক্ষান্ত হন নাই, পথ কষ্টে বনের মধ্যে চলিয়া চলিয়া পথিকের যখন বড় ক্ষুধা পাইবে, তখন সে কি খাইবে, ঈশ্বর তাহারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বড় বড় জঙ্গলে 'গো-পাদপ' নামে আর একরূপ বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে চমৎকার দুধ বাহির হয়। এ সব কথা শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু ঐশ্বরের দয়ার কি শেষ আছে? তিনি মানুষের সুবিধার জন্য কত যে আয়োজন করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? আমরা নীচে গোপাদপের একটী ছবি দিলাম।

এই গোপাদপ হইতে যে দুধ বাহির হয়, তাহা গরুর দুধেরই মত সুমিষ্ট এবং উপকারী।



এইসব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, ঈশ্বর কোন গাছকেই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রাস্তার দুপাশে যে জঙ্গল হয়, তাহার ভিতরের সামান্য লতাটারও কাজ আছে, আমরা জানিনা বলিয়াই আদর করি না। কে বলিতে পারে, যে আমেরিকা বা আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর-যোড়া বন জঙ্গলে, এমন গাছ নাই, যাহার ফল খাইলে আর দুধ, ঘি, ভাত, ডা'ল, রুটী খাইবার প্রয়োজন হবে না, এক ফলেতেই শরীর রক্ষা হবে? কে বলিতে পারে? আমরা অতি মূর্খ, আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির কিছুই জানি না। আমরা কেবল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি, আর বলি "হে ঈশ্বর! তোমার কত দয়া! তোমার কত দয়া!"

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯৩-৯৪।



পশুর প্রতি দয়া

প্রমদাচরণ সেন



দিন পটলডাঙ্গা গোলদীঘির পূবধারে দেখিলাম একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয়ানক রদ্দুর—মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, গাড়ীর গাড়োয়ান কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না ; কিন্তু একটী ছোট ছেলে সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিলাম। আমি দেখিলাম ছেলেটী ঘোড়াটীকে ঘাস দিয়াছে, এবং ঘোড়াটীর মাথায় ছাতা ধরিয়াছে। আমি প্রথমে ভাবিলাম বুঝি ছেলেটী নিজের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে, তাই ঘোড়ার মুখেও ছায়া পড়িতেছে। একটু দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম ঘোড়াটা একটু সরিয়া যাওয়াতে আবার তাহার মুখে রদ্দুর পড়িল, এদিকে ছেলেটীও সরিয়া গিয়া তাহার মুখে ছাতা ধরিল। আমি দেখিয়া কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যে বালক বা বালিকা পশুর প্রতি দয়া করে, সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও দয়া করে ; আর যে ছেলে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করে, সেতো বড় হইয়া আরও কত নিষ্ঠুরতা, কত কি করিতে পারে!

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯৫।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!!

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



মজা কোরবে? এই বেলা এসো। কিন্তু সে সব ছেলে আমি চাই না, যারা পড়ে না, তারা সব মন্দ ছেলে, আমার সঙ্গে তাদের ভাব নাই, বরং আড়ি। যারা ভাল ছেলে, যারা পড়্‌তে ভালবাসে, অনেকটা সময় পড়ার কার্যে ব্যস্ত থাকে, তারাই খানিকটা আমার সঙ্গে বসে গল্প সল্প কর্‌বার যোগ্য ছেলে। যথার্থ, আমি ভাল ছেলেদের বড় ভালবাসি, তাহাদের সঙ্গে নানান্ রকম গল্প করি, কত সব রাজা রুজির কথা, ভাজাভুজির কথা বলি, কত আহ্লাদ-আমোদের কথা বলি, কত আশা ভরসার কথা বলি, কতো কি! আর মন্দ দুষ্ট ছেলে যারা, আমার দেখাই পায় না তারা। কেবল লজ্জায় মুখ নীচু কোরে গুম্ হোয়ে বোসে থাকে। না হয়ত আমার বৈমাত্রভাই—নীচআমোদ শর্মা, তারই সঙ্গে বেড়ায়। আরে ছিঃ! তার কাছেও যায়! সে ছেলেদের মাথা খায়, আমি কি তাই করি?

আমার নাম জান্‌বার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোচ্চো? আমার ভারী মস্তো নামঃ—শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পবিত্র-আমোদ-হৃদয়-বিনোদ-সুখা-লঙ্কার-গল্প-বাচস্পতি। আহা!! কেমন সুললিত নামটী!! না হবে কেন? কত ভট্টাচার্য, কত তার্কিক, ন্যায়বাগীশ সব একত্র হোয়ে তবে এই নামটী হোয়েছে! অমনি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ!

আমার কাছে চুরোট নেই, তামাক নেই, লাল-চোকো সিদ্ধি নেই, মারোদ্দম্ গাঁজা নাই, বোতলপোরা মাতলামো নেই, কোন রকমের বকামি নেই ; সেই জন্যে অনেকেই আমায়

পছন্দ করে না। আবার আমার নানা দোষ—আমি ছাই পাঁশ পরনিন্দা টিন্দা করি না, সে জন্যও অনেকে আমায় দুচোখে দেখ্‌তে পারেন না। তা হোলে কি হয়? আমি যার জন্যে সৃজন হোয়েছি তাই কোরবো। কেমন ভাল ছেলেরা! তোমরা কি বল? যখন তোমরা পোড়ে শুনে ব্যস্ত হবে, ক্লান্ত হবে, একটী বার আমার বাসায় গিয়ে ডেকো, আমি বাহিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা দেবো। তার মধ্যে একটু কথা আছে, আমার গতি বিধি অনেক দূর। আহা! পৃথিবীর বালক বালিকারা অনেকেই আমার শিষ্য যজমান, এজন্যে প্রায়ই আমাকে বাহিরে থাকিতে হয়, তাই বাড়ীতে আমার অনেক ছেলে পুলেদের রেখে যাই। তাদের দেখা পেলেই আমার দেখা হবে, তারা আর আমি কিছু প্রভেদ নাই। তাদের মধ্যে জন কতকের নাম আমি তোমাদের বলিয়া দিই। সকলের মধ্যে প্রিয় ছেলে আমার একটী, তাহার নাম "শ্রীমান পরোপকার পরদুঃখ-দূরীকরণাচার্য" তার চেয়ে আর কাকেও আমি এত ভাল বাসি না। তার পরে আমার ১০১ এক শ এক পুত্র, তাদের সকলেরই নাম "শ্রীখেলাপ্রসাদ-শরীরচালন-বিদ্যাভূষণ।" তাহলে তো বুঝতেই পাচ্চো যে, তাস, পাসা, দাবাবোড়ে, অষ্টাকোষ্টে, প্রভৃতি কুড়ের ইষ্টি সর্বনাশের মূল খেলারা আমার বংশধর নয়। তার পর আমার আর কতকগুলি প্রিয় সন্তান আছে, তাদের মধ্যে প্রধানঃ—"শ্রীমতী চিত্রবিদ্যা-পরমানন্দসরস্বতী"। আর একটী মেয়ের নাম "শ্রীমতী জীবেদয়া পালিত" ইহাঁর কাজ হোচ্চে—ভাল ভাল পায়রা, হাঁস, গাভী, ছাগ, ময়ুর, হরিণ, খরগোষ, বেজী, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীব জন্তুদিগকে যত্নপূর্বক আদর ও স্নেহ করা, আহার দেওয়া, ঘুমুর পরাইয়া নাচান, ইত্যাদি ; —এসব জন্তুর মধ্যে আবার সর্বোপরি ভাল কুকুর। আর একজন ছেলে "শ্রীমান্ উদ্যান-সংস্কার শ্রমানন্দ"—ইহাঁর কার্য কেবল শুষ্ককে সরস করা, পতিতকে আবাদ করা, মাঠকে ফুলবাগান করা, মাটী ও জলকে স্বর্গের পদার্থ করা। ইনি দেবতাদেরও প্রিয়, কাজেই আমার বড় আদরের বস্তু।

ভাই ভাল ছেলেরা! তোমাদের কাছে আমি অনেকক্ষণ রহিলাম, এইবার পালাবো। কি জানি কে আবার বোক্‌বে! আর আমার ভাই অবকাশ বড় কম। তোমরা আজ অবধি দেখ দেখি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া একবার দেখদেখি, কেমন পড়া ভাল তৈয়ের হবে, সুখে স্বচ্ছন্দে দিনটী কাট্‌বে, শরীর মন ভাল থাক্‌বে, পৃথিবীতেই তোমাদের আমি স্বর্গ এনে দেবো। আর যারা কুড়ে, বা আমার সৎমার ছেলের সেবা করে, কু-আমাদে দিন কাটায়, তারা উচ্ছন্ন যায়। খবরদার! ভাই, তার কথা শুনোনা। আমার কথা বুঝে দেখো। আজ আসি। তোমাদের সঙ্গে এখন এই পর্যন্ত। আসি ভাই! হাঃ হাঃ হাঃ হা!!

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৯৫-৯৬।



কুকুরে কুকুরে ভাব

প্রমদাচরণ সেন

বড় বড় সহরের কোলে, নদী বা সমুদ্রের ধারে, যেখানে জাহাজ আসিয়া লাগে, সেখানে অনেকটা যায়গা, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে খানিক দূর পর্যন্ত ইট বা কাঠ দিয়া বাঁধান থাকে। এইরূপ স্থানকে "জেটি" বলে। জাহাজগুলি নাকি কূলে খুব কাছে আসিতে পারে না, কাজেই এইরূপ "জেটির" দরকার।

কোন এক সহরে এইরূপ এক জেটির শেষভাগে দুটী কুকুর রোজই শুইয়া থাকিত। নীচে তড়াক্ তড়াক্ করিয়া ঢেউ লাগিতেছে, বোধ হয় কুকুরগুলি তাহার শব্দে আমোদ পাইত বলিয়া সেখানে 'আড্ডা' করিয়াছিল। কিন্তু দুটী কুকুরের মধ্যে একটুও ভাব ছিল না। একই যায়গায় শুইবার জন্য দুটোতে ঝগড়া করিত, এবং ষণ্ডাটা রোগাটাকে তাড়াইয়া দিয়া সেই যায়গাটা প্রায়ই দখল করিয়া লইত। বেচারা রোগা কুকুর কি করে, চুপ করিয়া আর এক পাশে পড়িয়া থাকিত।

এইরূপে অনেক দিন যায়, এক দিন ঝগড়া করিতে করিতে দুটোই জলে পড়িয়া গেল। তখন খুব ঢেউ উঠিতেছিল ; তাহার মধ্যে পড়িয়াও রোগাটা সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাছাধন ষণ্ডার জল খাইয়া প্রাণ যাইতে লাগিল। সে ভাল সাঁতার জানিত না, ঢেউ কাটিয়া যে তীরে উঠিতে পারিবে, এরূপ আশা রহিল না। এদিকে রোগা কুকুরটী উপরে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল ; সে দেখিল তার শত্রু ডুবিয়া মরিতেছে। কুকুরেরা মনে মনে ভাল মন্দ ভাবে কি না, জানি না ; কিন্তু এই রোগা কুকুরটী শত্রুর এই দশা দেখিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল এবং নিজে বিলক্ষণ সাঁতার জানিত বলিয়া সহজেই ষণ্ডাটার গলাতে ধরিয়া তাহাকে তীরে আনিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে দুটী কুকুরের রাগারাগি চলিয়া গেল ; তাহাদের মধ্যে খুব ভাব হইল।



যাহা বলিলাম ইহার এক চুলও মিথ্যা নয়। একটা সামান্য কুকুর কেমন করিয়া আপনার শত্রুর সঙ্গে ভাব করিয়া লইল, আমরা বুদ্ধিমান হয়েও অনেকে তাহা বুঝি না। যে শত্রু, তাকে যদি খুব নাকাল, খুব জব্দ করিতে চাও, তাহা হইলে যতক্ষণ সে তোমার অপকার করিবে, ততক্ষণ তুমি তাহার উপকার কর দেখি, দেখিবে তাতে কি হয়! আমরা জানি, ইহা খুব শক্ত, কিন্তু চেষ্টায় সবই হয়, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ?

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৯৮-৯৯।

"এই সুখই বুঝি স্বর্গ"?

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

নলিনকে আজ বাড়ী শুদ্ধ সকলে খুঁজিতেছে, কোথাও পাইতেছে না, বালক আজ নিজের পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া করযোড়ে কি করিতেছে আর কাঁদিতেছে। মা টের পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বাছা, কি হইয়াছে? কেহ কি মারিয়াছে, না গালি দিয়াছে?" নলিন মার কোলে উঠিয়া বলিল "না মা কেহ আমায় কিছু বলে নাই। আমি আজ খেলিতে খেলিতে ও পাড়ায় গিয়াছিলাম, গিয়া নারাণদের বাড়ীতে একটু বসেছি আর দেখি নারাণের মা, আহা! সে বোল্‌তে পারি না! বুড়ো রোগা, যেন মড়ার মতন ঠিক মা! একটা লাটী হাতে কোথা থেকে এলেন। দেখে আমার এমনি দুঃখ হ'ল তা আর বলা যায় না। তা আমি জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলাম, যে তিনি ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। হাতে একটী ছোট ধামী, তাহাতে দুটীখানি চাল আর কোঁচড়ে দুটো আঁব। সেগুলি ঘরে রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর সেই চালগুলি সিদ্ধ করিয়া দুজনে সেই দুটী আঁব দিয়ে ভাত খেলেন, তখন বেলা ৫ পাঁচটা, মা। আমার তখন দুবার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। মা, আমি শুনিলাম তাঁরা রোজ অমনি কোরে দিন কাটান। মা, তাঁদের এত কষ্ট, আর আমি কত সুখে, কত তরকারী, ডাল, ঝোল, দুধ, কত কি দিয়ে দুবার ভাত খাই। আর কত খাবার খাই। আর আমি তা খাব না। এখন অবধি আমার খাবার থেকে অর্ধেক আর তোমার খাবারের অর্ধেক মা! নারাণকে আর তার মাকে দিতেই হবে, এ না হ'লে আর আমি শুনবো না।" এই বলিয়া মার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পরের দুঃখে দুঃখ দেখিয়া মাও থাকিতে পারিলেন না। তিনিও খুব কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যার সময় চাকরকে দিয়া এক ধামা চা'ল এক হাঁড়ি ডা'ল ও অন্যান্য কত সামগ্রী এবং প্রায় ৫০টী আম্র এই সকল লইয়া নলিন ও তাঁহার মা নারাণদের কুঁড়ে ঘরে এসে বসিলেন। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া কোথায় বসাবেন, কি কোর্‌বেন, কিছু ভেবে ঠিক কোর্তে পারেন না। নলিনের মা নারাণকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন, তাহার দুঃখিনী জননী তাহা দেখিয়া আনন্দে ও উপকারে মোহিত হইয়া যেন কি হইয়া গেলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দের জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভক্তি ভরে নলিনের মার পায়ের তলায় আসিয়া পড়িলেন :—"মা তুমি কি দেবী না মানবী? কখনই মানুষ নও, নিশ্চিত তুমি দেবতা ; মানুষের মনে তো এমন দয়া কখন দেখি নাই। ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন।" নলিন নারাণের গলা ধরিয়া তাহার বুকে আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল :—"ভাই নারাণ! তুমি আমার ভাই, আমার মায়ের পেটের ভাই! আর তোমার কষ্ট কোর্তে হবে না। কাল থেকে তুমি আমাদের পাঠশালে যেও, আমি বাবাকে বোলে তোমার মাহিনা দিব।"

এইরূপে অনেক রাত্রি অবধি নারাণের মাকে শান্ত করিয়া সেই সব সামগ্রী তাহাদের ঘরে রাখিয়া নারাণকে কোলে লইয়া মুখমুম্বন করিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন। আহা! সে রাত্রি গরিব নারাণ ও তাহার মার কি আনন্দ! সেদিন আবার নলিন ও তাহার মার আরও কত

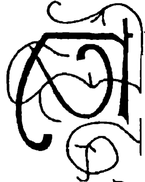
বেশী আনন্দ! বাস্তবিক বলিতে কি, যে উপকার করে, যে দুঃখীর দুঃখ দূর করে, সে অসহায়ের সহায় হয়, যে অনাহারীকে আহার দেয়, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? যে উপকার পায় তাহার যে সুখ, তাহার অপেক্ষা হাজার গুণে সুখী সে যে উপকার করে।

সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে যাইতে নলিন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহারা খুব গরিব হইয়া গিয়াছে, খেতে পায় না, পথে শুইয়া রাত্রি কাটায়। আর নারাণ খুব বড় মানুষ হইয়াছে, একদিন সে পথে নলিনকে কাঙ্গাল বেশে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে লইয়া বড়ী গেল এবং তাহার সমস্ত টাকা, সিন্দুক পোরা পোরা মোহর, রাশি রাশি সোণার গহনা, অগণ্য দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী সমস্ত নলিনকে দিয়া বলিল "ভাই! বাল্যকালে তুমি যে পরম উপকার করিয়াছ তাহার শেষ নাই। এক্ষনে তোমারই এ সব ; আমি তোমার ছোট ভাই, আজ্ঞার অধীন। আমাকে যা বলিবে তাই শুনিব। তুমি ও তোমার মা এ বাটীর প্রভু, আমরা তোমাদের দাস দাসী।" আহ্লাদে নলিনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে ভাবিল "ইহাই বুঝি সৎকর্মের পুরস্কার, এই সুখই বুঝি স্বর্গ!"

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ১০৩-১০৫।

জ্ঞানই সূর্য

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



মরা কি কখন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছ? কখন কি ভোরে ঘোর ঘোর থাকিতে বাহির হইয়াছ? তাহা হইলে অবশ্য দেখিয়া থাকিবে যে যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণ যেন আকাশের ও পৃথিবীর কেমন কেমন ভাব। ঝোপে ঝোপে, গাছতলায় অন্ধকার, যাইতে ভয় করে, কি জানি যদি তথায় সাপ টাপ থাকে ত কামড়াবে? পাছে কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সে সময় কোথাও যাওয়া যায় না, কোন কায কথা যায় না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয়। যেন আমরা চলিতে জানি না, যেন পৃথিবী আমাদের বেড়াবার স্থান নহে, যেন ঘরে থাকিবার জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। আর যেমন ক্রমে ক্রমে পূর্বদিক ফরসা হয়, যেমন ক্রমে ক্রমে সূর্য উঠিতে থাকে, অমনি অন্ধকার পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়। আকাশের নক্ষত্রগুলি আর দেখা যায় না, সূর্যের উজ্জ্বল আলোকের অভাবে যাহারা, যে অগুন্তি নক্ষত্রগুলো মিট্ মিট্ কোরে জ্বল্‌ছিলো, তাহারা আর এখন সূর্যের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর তখন তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। এদিকে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আলোক পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। কাজেই যে সকল গাছতলায় এতক্ষণ যাইতে পারিতেছিলাম না সেখানে যাইতে আর ভয় হয় না। যে সব স্থানে এতক্ষণ অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছিল, সে সকল স্থানে এখন দিব্বি আলো ফুট্ ফুট্ করিতে লাগিল। কেমন সুন্দর! এই ত গেল, একদিকে অন্ধকার দুর হইল ; আবার আর একদিকে যেখানে কিছু নাই বোধ হইতেছিল, সেখানেও কত সামগ্রী দেখা দিল। কেমন সুন্দর শ্যামল বৃক্ষের পাতাগুলি—তাহাতে সূর্যের কিরণ পড়িয়া চিক চিক করিতেছে, কেমন সবুজ মখমলের বিছানার মত দূর্বাঘাস গুলি ভূমিতল ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কেমন ছোট ছোট রাঙ্গা, সাদা, হলুদ, নীল নানা প্রকার বর্ণের

ফুল সকল ফুটিয়াছে তাহাতে আবার গুণগুণ করিয়া মৌমাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বসিয়া ছোট শুঁড়টী দিয়া মধু চুষিয়া লইতেছে। কত শত পাখী, তারা সব এতক্ষণ বাসায় নিদ্রিত ছিল, এখন মহা আনন্দে বাহির হইয়া গান করিতে করিতে কচি কচি ছানাদের জন্য খাবার দ্রব্য আনিয়া ঠোঁটে করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ঠোঁটের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এক শ, এক হাজার, কত জিনিষ সব দেখা যায়—যখন সূর্যটী আকাশে উঠে। আর যতক্ষণ তা হয়নি ততক্ষণ রাত্রি, অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

মানুষের মনে জ্ঞানও ঠিক এইরূপ সূর্য্যের মত। যতদিন তাহার মনরূপ আকাশে জ্ঞান সূর্যের উদয় না হয়, যতদিন মনে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন মন অন্ধকার থাকে, কিছু দেখা যায় না, কোন বস্তুর গুণাগুণ জানা যায় না। কাজেই মনে নানা প্রকার ভয় হয়। যে জানে না, যাহার কোন জ্ঞান নাই, সে ত মানুষই নয়। আবার যতদিন না জ্ঞান-সূর্য উঠে ততদিন মানুষের মনে নানা প্রকার কুচিন্তা, কুভাবনা, অনেক রকম কু-আশা, কত প্রকার লোভ, অসংখ্য নক্ষত্রের মত মনের আকাশকে ছাইয়া রাখে। যেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় অমনি ঐ সকল নক্ষত্র আর জ্ঞানের জ্যোতি সহিতে না পারিয়া পলায়ন করে। তাই দেখা যায় অজ্ঞানাবস্থায় যাহারা দুষ্ট থাকে বড় হইয়া জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা ভাল হয়। অজ্ঞানে যাহারা অসচ্চিত্র থাকে জ্ঞান পাইলে তাহারা পণ্ডিত, বিবেচক ও সাহসী হয়। যত দিন মানুষের জ্ঞান থাকে না ততদিন কত জিনিষ মানুষ দেখিতে পায়না। মেঘ হয় কেন? পৃথিবী কি? গ্রহ উপগ্রহ কি? সূর্য কি? এ সকল বিষয় কিছুই না জানিয়া মূর্খ স্ত্রীলোকদের মতন কত কি ভুল ভ্রম লইয়া থাকে; তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া এ সকল বিষয় ঠিক বুঝিতে পারিয়া কত সুখ, কত আমোদ, কত আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

তাই বলি "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য।" জ্ঞান না হইলে মানুষই হওয়া যায় না, জ্ঞান না হইলে মানুষ পশু দুইই সমান। জ্ঞান না পাইলে চরিত্র ভাল করা যায় না, কখনও সৎ হওয়া যায় না। জ্ঞান না পাইলে কোন কার্যই করা যায়না, কোন পথ চেনা যায় না। অতএব তোমরা সকল সুখ, সকল আহ্লাদ আমোদ, সকল আশা আকাঙক্ষা, সকল বিষয় অপেক্ষা এই সর্ব সুখের মূল, সকল কার্যের আদি, জ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হও। আলোক না থাকিলে, সূর্য না থাকিলে পৃথিবী যেমন, জ্ঞান অভাবে মনুষ্যও ঠিক তেমনি হয়। শিশুগণ! প্রাণপণে জ্ঞান লাভের জন্য মন দাও। "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য"।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, ১০৮-১০৯।



কোন জীবকে ক্লেশ দিও না।

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



গাছ তলায় অত লোকের ভীড় কেন? এত গোলমালই বা কিসের জন্য?—ঐ যে দেবন ছুটে আসছে? "কি হোয়েছে দেবন?"

দেবন :—"আর কি হবে? গুণধর ছেলে পাখীর ছানা ধর্তে গিয়ে নিজে ধরা পড়েছেন? আমাদের নগেন গাছ থেকে পড়িয়া হাত পা ভেঙ্গে বসেছেন, আর কি।" ছুটিয়া গিয়া দেখি যে নগেন চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষু বুজান, বুক ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, মুখে জল দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৫০ জন লোক চারিধারে ঘিরিয়া "হায় হায়" করিতেছে। ডাক্তার আসিলেন, আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন ;—আশা বড় কম।

ও আবার কি? চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আলুথালু কেশে, কে ও স্ত্রীলোকটী ছুটিয়া আসিতেছে? আহা! এই হতভাগিনী নগেনের জননী। মা আসিয়া যেই মৃতপ্রায় পুত্রের শরীর দেখিলেন অমনি মূর্ছিতা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে চেতন করিবার জন্য সকলে ধাবমান হইল। এসব কি ব্যাপার? কিসের জন্য এত কাণ্ড? নগেন কি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? সে কি তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গিয়া আঘাত পাইয়াছে? সে কি গরিবের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের প্রাণকে হারাইতে বসিয়াছে? তাহা হইলেত বুঝিতাম যে মরণ সার্থক, তাহা হইলে এত দুঃখ হইত না। তা ত নয়, সে যে নিরীহ পক্ষীর ছানাদিগকে ধরিয়া বৃথা কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে দুঃখিনী পক্ষিনীর স্নেহের ধন ছানাগুলিকে ডাকাতী করিয়া আনিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে জননীর কোল শূন্য করিয়া জননীর নয়নতারা বাচ্ছা ধন চুরী করিতে গিয়াছিল। তাই আজ তাহার জননী নিজ হৃদয়ের ধন নগেনকে হারাইতে বসিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার স্নেহের ধন পুত্রটীকে চিরদিনের তরে বিসর্জন দিতেছেন। অন্যায় করিয়া কাহারও সর্বনাশ করিতে গেলে প্রায় আপনারই সেই দশা উপস্থিত হয়। আহা! একটা কি? কত শতটা পক্ষীর বাসাই যে নগেন ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এত গুলি পক্ষীর হাহাকার রবে, এতগুলি নিরীহ জীবের যাতনায়, এতগুলি জননীর অভিশাপে, এতগুলি দীন হীন অসহায় পক্ষী শাবকের মৃত্যু সময়ের রোদনধবনি ঈশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাই, সেই মহাপাপের শাস্তি এতদিনের পর হইতেছে। ছি! ছি!! নগেনের আর দিবসে অন্য কর্ম ছিল না, কেবল টো টো করিয়া ঘূরিয়া পক্ষীর বাসা খুঁজিত। হৃদয়ে এক তিলও দয়া হইত না।

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় নগেনের এ যাত্রা প্রাণ গেলনা কিন্তু একটী হাত ও একখানি পা চিরকাল ভাঙ্গিয়া রহিল। বেশ শিক্ষা পাইয়া বাছাধন এখন এমনি শান্ত হইয়াছেন যে যেন আর সে নগেন নাই। এখন যেখানে দেখে কোন বালক বা বালিকা কোন জীবকে ক্লেশ দিতেছে, যেখানে দেখে কোন লোক পুষিবার জন্য পাখী লইয়া যাইতেছে, যেখানে দেখে কেহ পক্ষী পুষিতেছে, সেইখানে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার হাত

ও পায়ের গল্প করে ও সকলকে ঐ নিষ্ঠুর কার্য হইতে থামাইতে চেষ্টা পায়। সর্বদাই বলে :— "আমাদের যেমন প্রাণ আছে, পশু পক্ষীদেরও ঠিক তেমনি আছে ; আমরা যেমন কষ্ট হইলে কাঁদি ও যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও তেমনি করে ; আমাদিগকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সমস্ত জন্তুকেই তিনি সৃজন করিয়াছেন ও নিয়ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগকেও প্রতিপালন করিতেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর যাহাদিগকে মা হইয়া সর্বদা রক্ষা করিতেছেন, আমি কে—যে সেই বেচারা পক্ষী বা পশু শাবকদিগকে কষ্ট দিই?" নিজের গত জীবনের নিষ্ঠুরতা উল্লেখ করিয়া সর্বদাই আক্ষেপ করে ও বলে "হায়! হায়! কত যে বৃথা নিষ্ঠুরতা করিয়া জীব সকলকে ক্লেশ দিয়াছি। অনর্থক কত যে পাখীর প্রাণে যাতনা দিয়া বিনাশ করিয়াছি, তাহা বলা যায় না! এখন সমস্ত জীবন পশু পক্ষীদের কষ্ট দূর করিবার জন্য উৎসর্গ করিলেও এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যাহা হউক আমি কত দিন বাঁচিব, অসহায় পশু পক্ষী ও সমস্ত জীবের যাহাতে দুঃখের নাশ হয় তাহা করিব।" এইরূপে অতিশয় কাতর হইয়া দুঃখ করে ও রোদন করিতে থাকে। প্রতিদিন আহারের পর নিজ অন্নের প্রায় সমান ভাগ পশু পক্ষীদের জন্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে আহার করায়। আহা! প্রাতঃকালে যখন তাহার খাবারের টুকরাগুলি পাইবার জন্য ৫০।৬০-টী কাক ও শালিক প্রভৃতি পাখী জমা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ;—যেই নগেন বাহির হয়, অমনি সকলে মহা আনন্দে কলরব করিয়া যখন উড়িয়া তাহার নিকটে আসে, ও তাহার নিকট হইতে টুকরাগুলি তুলিয়া লইয়া আহ্লাদে আহার করে, তখন তাহা দেখিলে কতই না সুখ হয়! যখন বাড়ীর ছাগ ও বাছুরগুলির গলা ধরিয়া "যাদু, ধন, বাছা" প্রভৃতি কথা বলিয়া আদর করে, যখন সে পথে ঘাটে সর্ব স্থানে পশুপক্ষীদিগের দিকে চাহিয়া যত্ন করে, যেন সে তাহাদের কথা বুঝিতে পারে,—তখন যাহারা দেখে তাহাদের মনে বড় আশ্চর্য ভাব হয়।

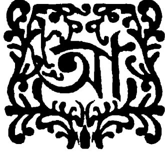
মহা দুরন্ত দস্যু রত্নাকর কিরূপে পরম যোগী ঋষি বাল্মীকি হইয়াছিল তাহা তোমরা "সখাতে"ই পড়িয়াছ। এই আর একটা অদ্ভুত কাণ্ডও দেখিলে, সেই নিষ্ঠুর নগেন এখন প্রাণপণে পক্ষী ও পশুদিগের কষ্ট দূর করিতে ব্যস্ত। বাস্তবিক সে যে-সকল কথা বলে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। যথার্থই অবলা জীবদিগকে ক্লেশ দেওয়া মহাপাপ। আমরা ভরসা করি আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ এরূপ নিষ্ঠুর নাই, যদি কেহও থাকেন তবে যেন নগেনের পরিবর্তন দেখিয়া শিক্ষা পান। আমরা শুনিলে পরম আনন্দিত হইব যে একটী পাঠকও তাঁহার নিষ্ঠুর অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১১৭-১১৯।



খুকুর সাধ

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



মাদের খুকু বড় আদরের ধন। অনেক লোক আমাদের বাড়ীতে আসেন, সকলেরই সঙ্গে তার খুব ভাব। খুকু সকলের সহিতই মহা আনন্দে মনের সুখে দিন কাটায়। তার ভাল নাম আছে, খুবই ভাল নাম, তবু কি জানি আমরা সকলে কেমন তাকে "খুকু খুকু" বলিয়া ডাকিতে ভালবাসি। আহা! অমন মিষ্ট কথা বুঝি আর নাই! খুকুর বয়স এই সবে মাত্র তিন বছর। কিন্তু এরই মধ্যে সে এত কথা কয়, এত গল্প করে, এত আমোদ করে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। গায়ে একটুও গয়না নাই, পরে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ত বলে "ও সব সোণার গয়না আমি প'রব না, বাবা আমাকে আকাশের তারাগুলোকে পেড়ে কণ্ঠমালা কোরে দেবে, আর মা বলেছে যে খুব বড় গোল পানা যে দিন চাঁদটী উঠিবে, সেই দিন সে খানাকে ছিঁড়ে এনে আমার জন্যে বাজু গড়িয়ে দেবে!"

খুকু এমনি ভাল লোক যে বাড়ীতে কোন লোক এলে অমনি তাঁহার সঙ্গে নানা রকম কথাবার্তা কহিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। বাবার আসিতে যদি দেরী থাকে তবে সে লোকের কোন কষ্টই দেয় না। যদি তিনি বলেন "আমি যাই, তোমার বাবার দেরী হচ্ছে" তবে খুকু মহা দুঃখিত হইয়া বলে "না যেতে দেবোনা। আর একটু থাকুন না বাবু! থাকুন।" এই বলিয়া হয় একটা পান, নয় একখানা সাবান কি অন্য কিছু বাড়ীর ভিতর থেকে নিয়ে ছুটে আসে আর বলে "এইবার থাকুন আর একটু বাদেই বাবা আ'সবেন।" আরও বলে "দেখুন! ঐ যে নীচু গাছটী দেখ্‌ছেন ওটা আমি পুতেছি, আর ঐ গাছটীতে নিচু হোলে আপনাকে দেবো। আর আমি আপনাদের বাড়ী যাবো, গিয়ে আপনাদের, খুকীদের বেশ কোরে আমার কাপড়, গয়না, সব পরিয়ে দিয়ে আস্‌বো। কেমন?" এইরূপ কি চমৎকার যে তাহার কথাবার্তা, কি সুন্দর কি মনোহর তা আর বল্‌তে পারি না। আহা! যদি দেখবার হোতো তাহ'লে পাঠক পাঠিকা! তোমাদের সকলকে দেখাতুম কি মেয়ে! আবার এদিকে এমনি স্মরণ শক্তি যে "সখা"র পায়রামণি প্রভৃতি অনেক পদ্য মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সে বলে আমি বড় হ'য়ে এ রকম গান লিখ্‌বো।"

তোমরা আর্শীবাদ কর ঈশ্বর কৃপায় খুকু আমাদের বেঁচে থাক্ ও বড়লোক হোয়ে দেশের বালকবালিকাদের উপকার করুক।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৫।



চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা?

উপেন্দ্রকিশোর রায়



কোনারাম সম্মুখের লোকটীকে দেখাইতেছেন! তাঁর নিজের পীঠের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে হইত। নিজের দোষগুলিকে সকলেই পেছনে ফেলিয়া দিতে চায়। আমি চেঁচিয়া বলিলাম লোকনাথ বড় রাগী, আমি তাহাকে ভালবাসি না; বল দেখি ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি কিরূপ মনে করিতেছ? অন্যের ছেঁড়া মোজা দেখিয়া বিরক্ত হওয়ার আগে নিজের জুতার ভিতর চাহিয়া দেখা ভাল। আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিব, ততক্ষণ তুমি হাঁটিতেছ না বলিয়া আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার কি? আর যদি এমন হয় যে আমি হাঁটিতেছি, তাহাতেই বা কি হইল?

অন্যের তিলটীকে তাল করিবার পূর্বে নিজের তালটী ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল। গম্ভীর ভাবে বক্তৃতা করিলে কি হয়, পরক্ষণেই যদি বক্তা নিজের অসারত্ব হাতে কলমে বুঝাইয়া দেন, তবে লাভ কি হইল?—লাভ হইল যে, অন্য কেহ ঐ বিষয় নিয়া আমাকে কিছু বলিলে, আমি তাহাকে বলিব "আরও একজন একবার বলিয়াছিলেন।" আমার দোষ দেখিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে?—ভাল। কিন্তু কষ্ট পাইয়া যদি তুমি আসিয়া মুরুব্বী লোকের মতন আমাকে বকিতে থাক, তবে হয়তো লাভের মধ্যে এই হবে যে তোমাতে আমাতে যে ভালবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকিবে না। ক্লাশে একটী নূতন ছেলে আসিল—বেচারাকে যেন খেলার সামগ্রী পাইলে; অত বোকা বুঝি আর কেহ কখনও দেখে নাই! কিন্তু মনে পড়ে কি? তোমাকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া ইস্কুলে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে দিয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তুমিও একটী জানোয়ারের মতন ছিলে কি না? অন্যের ত্রুটী নিয়া

হাসি তামাসা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় মেজাজটী বড় উগ্র— কথা কয় না। ইহাঁরা যদি অন্যের উপর ঢিল ছুড়িবার সময় নিজের গায় মারিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। না হয় প্রতিপক্ষের পাটকেলটীর সময় যেন মুখ বিকৃত না করেন। বাস্তবিক ওরূপ লোকের ঐ ঔষধ—আমি বলিলাম "খক" তুমি বলিলে "থুঃ"। বেশ সমানে সমানে গেল। এরূপ বার কয়েক হইলেই দেখিবে আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভাল মানুষ হইয়াছি।

ভাল ঠাট্টা কয়জন করিতে পারে? কথা শুনিয়া হাসিলাম উপকারও হইল ; এরূপ কথা কয়জন বলিতে পারে? প্রায়ইতো দেখি, তুমি বলিলে, আমি হাসিলাম, আর যদু চটিল। আমাদের দেশের একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়াছেন—"কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ, লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।" তুমি তো এক কথা বলিয়া মজা করিলে ; আমি বেচারা যে তা হাড়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। ঠাট্টা মাঝে মাঝে ভাল লাগে, কিন্তু বিদ্রূপকে বড় ভয় করি। যিনি স্বভাবতঃ কাহারও মনে ক্লেশ না দিয়া নির্দোষ কথা বলিয়া আমোদ দেন, তিনি বড় ভাল লোক। আর যাহাদের দোষ সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল বিদ্রূপ করিবার জন্য অন্যের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেবেলা পড়িয়াছি "খলেরা কেবল পরের দোষই অন্বেষণ করে"—।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৬-১২৭।

রাগ

উপেন্দ্রকিশোর রায়



বা! কি রাগ গো! বাবুর মুখের উপর রাগ হইয়াছে। তাইতো, মুখ ব্যাটার জ্বালায় বাবু এখন আর আর্‌শীর সম্মুখে চাইতে পারেন না। অমন মুখের আকার বাবু লোকের থাকে?—তাই বাবু রাগ করিয়া মুখকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মুখের নাকটা কাটিয়া ফেলিতেছেন এবারে মুখ একাকার হইয়া যাইবেন।



রাগ হইলে বিচার শক্তি একটু কমিয়া যায়। আমরা কোন ফকিরের কথা শুনিয়াছি। ফকিরের এক শত্রু ছিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজের ছেলেকে বলিল "তুই আমাকে মারিয়া ওদের দরজায় ফেলিয়া রাখ"। ছেলে তাহাই করিল। বল দেখি জব্দ হইল কে? ছেলে বাবুদের অনেককে দেখিয়াছি, মার উপর রাগ হইয়াছে, সুতরাং সে দিনের মত আহার পরিত্যাগ করিলেন। পাকা লোক হইলে পাছে মা বিরক্ত করিতে আসেন, তাই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন! এই হইল মার শাস্তি। ক্ষুধা কিন্তু রাগ বোঝেনা, তাহার সময় হইলে সে হাজির হইবেই। রাগের ফল হইল ক্লেশ ; ক্লেশের ফল অনুতাপ।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যায় করিয়া বলিয়া থাকেন, "রাগের মাথায় করিয়াছি।" বলি, রাগের মাথাটা কি?—অর্থাৎ তখন বিচারশক্তি ছিলনা। ততক্ষণ আমি পাগল, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ!! খুনটা নিজের উপর দিয়াই অনেক সময় হইয়া যায়। রাগের মাথায় যত কম কাজ করা যায় ততই ভাল। যদুর ছোট বোন তাহার ছবির বইএর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, যদু "রাগের মাথায়" তৎক্ষণাৎ বইখানাকে উনুনের ভিতর রাখিয়া আসিল! এ রোগ অনেকেরই আছে।

রাগ হইলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন, অন্যের তাতে কিছু বলিবার অধিকার নাই। রাগ হইলে অনেকে নিজেকেই কষ্ট দেন—আহা বেচারা!!

শেষে একটা কথা বলি। ভাই, রাগকে বিশ্বাস করিও না। রাগ যখন তোমার ভিতরে আসিবেন তখন খুঁজিলে দেখিবে যে বুদ্ধিটী পলায়ন করিয়াছে। রাগ আসিয়া তোমাকে তাঁহার করিয়া লইবেন। তখন আমি গাধা, গরু, ষাঁড়, মহিষ, যা কিছু হইনা কেন, তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই।

তাই আজ বাবুর নাকের উপর চোট!!

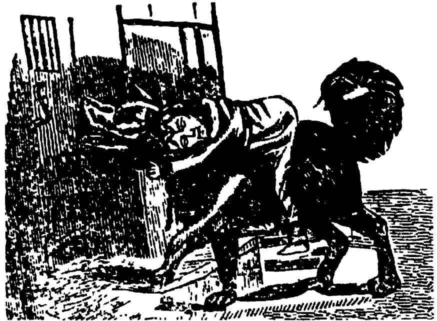
২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৭।

জীবন রক্ষক কুকুর

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



ঠক! ছবি দেখিয়া ও উপরের লেখা পড়ায় আমাদের মনের কথা বুঝিয়াছ কি? যদি না বুঝিয়া থাক, তবে বলি শুন। সুইজারলাণ্ড্ দেশে কেবলই পর্বত—যেমন আমাদের দার্জিলিং অমনি। তবে প্রভেদ এই যে সেখানকার অবস্থা বড় ভয়ানক। সেই প্রকাণ্ড আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর চূড়া, দিন রাতই ভয়ানক শীত, অধিবাসীরা সদাই কাতর। তাহাতে আবার সেখানকার ঋতুর কিছুই ঠিক নাই। হয়ত দিব্য পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর নীল আকাশে একখানিও মেঘ নাই, মনোহর বনফুলগুলি শোভা পাইতেছে, যেন কখনই নষ্ট হইবার নহে;—প্রফুল্ল মনে পথিক গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ও হরি! কোথা থেকে হঠাৎ বোঁ বোঁ গোঁ গোঁ শব্দে একেবারে ঝড়!! শুধু কি ঝড়?



তার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের চূড়ার মত কি শাল গাছের ঝাঁকের মত ভয়ানক বরফরাশি আকাশকে ছাইয়া ছুটিতেছে, তাহার সম্মুখে কি বড় বড় বৃক্ষ, কি পর্বত-শৃঙ্গ কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। ভারি বন্যা এলে যেমন ঘর বাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায়, একেবারে কুড়ি হাজার গোলা কামান থেকে সারবন্দি ছুড়িলে সুমুখে যেমন কিছুই থাকে না, সব ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়, তেমনি সেই

ভয়ানক ঘূর্ণিবায়ুর সম্মুখে পড়িলে পাহাড়ের ধারও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ভয়ানক প্রতাপ! এমন ভয়ানক স্থান দিয়ে ঐ দেশের পথিকদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হয়।

সেইখানে বার্ণার্ড্ নামক একজন ধার্মিক সাহেবের আশ্রম আছে, সেই আশ্রমের ধার্মিক পুরুষেরা এইরূপে বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা ও আহারাদি দিয়া সর্বদাই সাহায্য করিতেন। ঐ ধার্মিক ব্যক্তিরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে করিলেন হয়ত কত লোক তাঁহাদের কথা না জানিতে পারিয়া বিপদে মারা যায়, এজন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক কুকুর পুষিয়াছিলেন। উহারা বেস শিক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘূরিয়া বেড়াইত এবং যেখানে কোন বিপদাপন্ন লোক দেখিত তাহাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিত। তাহাদের কাহারও কাহারও গলায় একটা করিয়া ঔষধের শিশি বাঁধা থাকিত, যদি কেহ চাহিত তবে উহা পান করিয়া বেস সবল হইয়া চলিয়া যাইতে পারিত। এই কুকুরগুলি এমন চমৎকার শিক্ষা পাইয়াছিল যে শুনিলে আশ্চর্য ও অবাক হইতে হয়। যদি কোন লোক মৃত প্রায় হইয়া এমন কি ৮ হাত কি দশ হাত তুষারে (গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ) আবৃত হইয়া যাইত, ইহারা বুদ্ধি ও ঘ্রাণশক্তির বলে তাহাও বুঝিতে পারিত এবং দুইদিকের পা দিয়া ঘন ঘন বরফ আঁচড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দিত ও শেষে সেই মৃত প্রায় দেহ বাহির করিয়া মনিবদের নিকট পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইত।

একদা একজন স্ত্রীলোক তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়ায় আর কোথায় স্থানআদি না জানায় তিনি ঐ স্থানের একটী কোণে পুত্রটীকে লইয়া শয়ন করেন। সুইজার্লাণ্ডের রাত্রি—একেবারে অসহ্য শীত, দুজনে ঘোর কষ্ট পাইতেছেন, মাঝে মাঝে পুত্রটী বলিতেছে—"মা! এখানে আমাদের সাহায্য করিতে কি কেউ নাই?" মা কি বলিবেন, আপনার যাতনায় ও মনে হতাশ হইয়া ভাবিতেছেন। মা হঠাৎ যেই একটু সরিয়া যাবেন অমনি সেই মহা উচ্চ পর্বতের উপর থেকে ভয়ানক এক গহ্বরে পড়ে গেলেন!! কেহই জানিতে পারিল না। হা দুর্ভাগ্য শিশু! মাও হারাইলে? শিশু কিছুই জানে না ; তখনও বলিতেছে—"মা! এখানে কি কেউ আমাদিগকে সাহায্য করিবে না?" আবার জিজ্ঞাসা করিল। কে উত্তর দিবে? শিশুটী তখন উঠিল, খুঁজিয়া দেখিল সে একা। উঃ! সেই পর্বতে, সেই অন্ধকারে, সেই শীতে, সেই তুষাররাশির মধ্যে সেই ভয়ানক স্থানে—সে একা!! দয়ালু পাঠক! স্নেহবতী পাঠিকা! তোমরা ভাবিয়া দেখ। সে বলিল "মা!—মা কোথা?" চীৎকার করিয়া ডাকিল "মা! মা গো!" পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেড়াইয়া আঘাত লাগিয়া কথা তাহারই কাণে ফিরিয়া আসিল—"আ—ও"। সে আরও চেঁচাইয়া ডাকিল "ওগো মা!" দূরে, আরও দূরে তাহার ডাক বায়ুতে ভাসিয়া গেল, আর পর্বতের গা হইতে শব্দ আসিল "ও—আ"। পার্বতীয় বালক শেষে বুঝিল তাহার মা নাই, ও শব্দটা তালি মাত্র। তখন যে তাহার প্রাণ কি হ'ল সে কি লেখা যায়?

অসহায় বালক তখন আস্তে আস্তে সেই এক হাঁটু তুষারের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে আবার রাস্তায় আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—যদি সেখানে কোন পথিক তাহাকে দেখিয়া সাহায্য করে। কিন্তু সে রজনীতে, সে অন্ধকারে, কে সে ভয়ানক পথে চলে? শীতে কাঁপিতে সে আর পারে না, সমস্ত দিনের পর ক্ষুধায় প্রাণ আকুল ; মাকে হারাইয়া মন তাহার দুঃখে পোরা, তাহার উপর আবার সহায়হীন। হতাশ হইয়া সে সেই খানে হাঁটু পাতিয়া বসিল, হাত দুখানি

জোড় করিয়া বুকে ধরিল, চক্ষু দুটী,—আহা! জলে ভেসে যাচ্ছে এমন চক্ষু দুটী,—উপর দিকে তুলিল ; আর অতি কাতর স্বরে, সরল প্রাণে, ব্যাকুল হয়ে বলিল "পরমেশ্বর! তুমি দয়াময়! এই দীন হীন, অসহায় বালকের আর তোমা বৈ কে আছে? আমার চেষ্টায় যা আছে করিলাম, পিতাগো! ওগো বিপদভঞ্জন! এইবার আমার সব বল চলে গেছে, এখন তুমি আমায় হাত ধরে রক্ষা কর! আমি দেখিছি, মা যখনই বড় বিপদে পড়্তেন, তিনি ত তোমাকে ছাড়া আর কাকেও ডাকেননি। আর তুমিও তাঁহার সব বিপদই দূর কর্তে। এখন পিতাগো! আমাকে রক্ষা কর।!"

এদিকে খুব তুষার পড়িতেছিল, ক্রমে তাহার প্রায়কোমর অবধি ডুবিয়া গেল। আমাদের দেশে যেমন কুয়াশা হয়, তুষারও তাই, তবে কুয়াশা সব জলকণা মাত্র। তুষার বরফকণা; কাজেই ভয়ানক শীতল। শীতে তাঁহার অঙ্গ সকল ক্রমে অবশ হইয়া এল। এমন সময়ে হঠাৎ বোঁ বোঁ রবে সেই পূর্বে বলা হইয়াছে যা, সেই রকম ঝড় ভয়ানক বেগে এসে পড়্ল। বেচারা ভয়ে শীতে নির্জীব হয়েছিল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে যেন বল পেলে, অমনি তাড়াতাড়ি একটা ছোট গুহায় গিয়া লুকাইল। ঝড় সমস্ত তুষারগুলকে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, এই রকম নেড়ে নেড়ে নিয়ে বেড়াইতে লাগিল। আর মড় মড় ক'রে গাছ সব ভাঙ্গিতে লাগিল, পর্বতের কোণগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু শিশুটীর কিছুই করিতে পারিল না। তবে বড়ই শীত বৃদ্ধি হইল। শীতে প্রায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে তাহার মুখে যেন কাহার গরম নিশ্বাস লাগিল। অমনি চক্ষু খুলিয়া দেখে যে ভয়ানক একটা কুকুর! কুকুরটী কিন্তু খুব স্নেহভাবে তাহার গা হাত সব চাটিয়া আদর করিতে লাগিল ; দেখিয়া সে ভীত না হইয়া বরং সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিল ও পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিল। ক্রমে একটু সুস্থ হইলে কুকুরটা দাঁড়াইল। বালকও চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তখন সেই স্নেহপূর্ণ জীব উপুড় হইয়া শুইয়া এমন ভাব দেখাইল যেন সে বালককে আপন পৃষ্ঠে উঠিতে বলিতেছে। বালক তাহাই করিল, তখন হৃষ্টমনে পথ চিনিয়া কুকুর আপনাদের সেই আশ্রমের দিকে চলিল। ঝড়ও অনেকটা থামিয়াছিল। সে স্বচ্ছন্দে ঐ দেখ বালককে পিঠে করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া চীৎকার করিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। ধন্য বুদ্ধি কুকুরের!! ধন্য দয়া ঈশ্বরের!!!

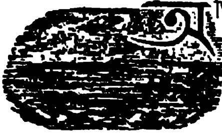
এই বালককে একজন ভদ্রলোক পরে ভরণপোষণ করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কখনও মাকে ভুলে নাই।

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, ১২৯-১৩১।



ঘড়ি

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়


অতি প্রাচীণতম কাল হইতে ঘড়ি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তোমরা মনে করিও না যে ঘড়ি তোমাদের ইংরাজ বাহাদুরেরাই নির্মাণ করিয়াছেন। যখন ইংরাজ নাম পর্যন্ত কেহ জানিত না, এদেশেতে ত নয়ই, কোন স্থানেই যখন ইংরাজ হয় নাই, তখনও এই দেশে ঘড়ি ছিল, এ দেশ সকলের চেয়ে পুরাতন, এবং আগে যখন সব দেশ, এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা—সমস্ত অজ্ঞান ছিল, অসভ্য বনের পশুর মত ছিল, তখনও আমাদের দেশের লোকেরা সুসভ্য ও মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। তখন তাঁহারা সময় নিরূপণ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি ঘড়ি বলা যায়, তবে তখনও নিশ্চয় ঘড়ি ছিল।

সে যাহা হউক, আসল কথা এই যে সময়টা দেখা নাকি চিরকালই দরকার, সময় দেখিবার জন্য তেমনি চিরকালই একটা না একটা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বিলাতের প্রাচীন রাজা 'আলফ্রেড় দি গ্রেট্' এক রকম বাতী ব্যবহার করিতেন সেই বাতী পুড়িতে যে সময় লাগিত সেই অনুসারে তিনি ঘণ্টা নিরূপণ করিতেন। আমাদের দেশে তিন রকম উপায় দেখা যায়। (১ম) কোন পরিষ্কার স্থানে একটা কাটী সোজা করিয়া পুতিয়া রাখা হয়, এবং প্রতিদিন সূর্যের গতি বুঝিয়া ঐ কাটীর ছায়া যখন যেখানে যেখানে পড়ে সেইখানে সেইখানে দাগ দিয়া রাখা হয়। তা হলেই এক বছর বাদে কাটীর ছায়া আবার ঘূরিয়া ঠিক প্রথম দিনের দাগে আসে। তার পর থেকে আবার ঘূরিতে আরম্ভ করে। কাজেই বেশ এক রকম মোটা মুটী সময় ঠিক করিবার উপায় হয়। ইহাকে সূর্য-ঘড়ি বা Sun-dial বলে। কিন্তু এতে সুবিধা হয় না, কেন না, যেদিন সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন, ও রোজ রাত্রে সময় দেখার উপায় থাকে না। আর একটা উপায় আছে তাহার নাম 'বালির ঘড়ি'। একটা ফুটো ওয়ালা বাক্সে ঝুরো বালি রাখা হয়, ঐ বালি ঝুর ঝুর ক'রে পড়িতে থাকে, যতক্ষণে সমস্ত প'ড়ে যায় ততক্ষণে এক ঘণ্টা হয়। আবার সমস্ত বালি কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে পূরিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এও সুবিধা নয়। আরও এক রকম আছে তাহাকে জলঘড়ি বলে। একটা পাত্রে খানিকটা জল রাখা হয়, তাহাতে একটা পাৎলা বাটী ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহার তলায় একটী ছোট ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া একটু একটু করিয়া জল উঠিতে থাকে। বাটীর ভিতর দিকে বা বাহির দিকে কয়টী দাগ করা থাকে। ক্রমে যত অধিক জল বাটীর ভিতর উঠে ততই বাটী ভারী হইয়া ডুবিয়া যাইতে থাকে। এবং ঐ এক একটী দাগ পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি বুঝায়। পলের দাগ অবধি ডুবিলে এক পল্ হইল বুঝা যায়, দণ্ডের দাগ অবধি ডুবিলে দণ্ড হইল বুঝা যায়। আবার ৭৷৷০ দণ্ডে একটা প্রহরের দাগ থাকে, ঐ দাগে জল উঠিলে এক প্রহর হয় বুঝা যায়। সাধারণতঃ এক প্রহর হইলে বাটীটি ডুবিয়া যায়। অমনি একজন লোক যে পাহারা থাকে, সে সে-বাটীটি আবার ভাসাইয়া দেয় ;আবার, জল উঠিতে থাকে। এইরূপে দিন রাত্রি পাহারা রাখিয়া এই জল-ঘড়ির দ্বারা বেস এক রকম সময় নিরূপণ হয়।

এই দুই তিন জাতীয় ঘড়ি এখনও অনেক প্রাচীন মন্দিরে ও দেবালয়ে আমরা দেখিতে

পাই। কাশীতে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড মান মন্দির আছে, সেখানে একটী বড় সুন্দর সূর্য-ঘড়ি আছে। অনেক বড় বড় জ্যোতির্বেত্তা সাহেব ইহা দেখিতে যান। আরও অন্যান্য অনেক স্থলে বালির ও জলের ঘড়ি দেখা যায়। কিন্তু প্রায় সকল স্থলেই এখন বিলাতী ঘড়ি ব্যবহার হয়; ইহাই এখন সর্বাপেক্ষা সুবিধার জিনিষ। ইহাতে দিন রাত্রি পাহারা দিতে হয় না; কোন গোলই নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার দম দিলেই হইল। তাহাও আবার বড় বড় ঘড়িগুলার কেবল ৭ দিন অন্তর একদিন। মাসে একদিন, বৎসরে একদিন দম এমন ঘড়িও আছে শুনিয়াছি। দেখ দেখি কেমন সুবিধা! এই সব ঘড়ির ভিতর ত সাধারণেই কত কৌশল, এক একটাতে আবার এমনি আশ্চর্য ব্যাপার যে শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। কোন কোনটার ১৫ মিনিট বাজে, কোনটার ঘণ্টা বাজিবার সময় একটা পরী আসিয়া নাচিয়া গাইয়া তারপর একটা দণ্ড দ্বারা একটা ঘণ্টা বাজাইয়া আবার নাচিতে নাচিতে যায়। কোনটায় ফি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে একজন কুলী দাঁড়াইয়া একটা মুগুরের দ্বারা একটা চাঁই-এর উপর ঠক্ ঠক্ ক'রে মারে আর যারা দেখে তাদের মুখ পানে চায়। কোনটার বা ঘণ্টা বাজার সময় একটা কোকিল পাখী বাহির হইয়া 'কু' 'কু' ক'রে শব্দ করে, তাই ঘণ্টা বাজান হয়। আর কত লিখিব? এক রকম ঘড়ি আছে তাহাদিগকে 'এলার্মিং' ক্লক বলে; এগুলো বড় উপকারী। দম দিয়ে ঠিক ক'রে রাখিয়া শোও, ঠিক যটার সময় তুমি মনে করিবে তটার সময় রাত্রে এমনি 'ঘন্ ঘন্' শব্দ করিবে যে তুমি অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে না পড়ে থাকতে পার্‌বে না। বাঙ্গালায় এদের বলে ঘুম ভাঙ্গানে ঘড়ি। ছাত্রদের এটা ভারী উপকারী। দামও বেশী নয়। আজ কাল এ রকম একটা ভাল ঘড়ি ১০।১৫ টাকায় পাওয়া যায়, ৫৲ টাকাতেও ছোট রকম পাওয়া যায়। 'ওয়াচ্' অর্থাৎ ট্যাক ঘড়িও আজ কাল যে কতরকম তার ঠিক নাই। তাদের মধ্যে দু-দল, কতকগুলোর বেশ ঢাকনি আছে, তাদের বলে "হন্টিং," আর যাদের ঢাকনি নেই তাদের বলে "ওপ্‌ন্ ফেস্।" শেষের গুলিতে বেশ সুবিধা, পকেট থেকে বাহির করিলেই দেখা যায় কটা বেজেছে। খুব দাম দিয়ে কিনিলে এক রকম ওয়াচ্ আছে তারা বেস বাজে। যখন ইচ্ছা, রাত্রে অন্ধকারে ঘুম ভাঙ্গিলে একটা স্থানে একটু টিপিয়া ধরিলেই কটা বেজেছে, কত মিনিট হয়েছে তা পর্যন্ত বলে দেয়। মানুষের বুদ্ধির যথার্থই সীমা নেই। তোমরা বড় হ'য়ে যদি এ বিষয়ে বুদ্ধি খরচ কর তা'হলে হয়ত আরও কত শত আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল যে বাহির ক'রবে তার ঠিক কি? পারবে?

সে যাহা হউক, কিন্তু আজিকার এত কথার পর একটী কথা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা করে—যে, সময় বড় দরকারী, এত দরকারী যে সে বিষয় এখানে বলাই অনাবশ্যক। এমন যে দরকারী সময় তাহার দিকে সর্বদাই খুব সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক, যেন একটুও ফাঁকি দিয়ে চলে যায় না। যে টুকু যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না এমন যে দরকারী জিনিষ, আমাদের মতে যার চেয়ে আর দামী জিনিষ নাই—তার জন্য যদি কিছু খরচ করা দরকার হয়, তাও সন্তুষ্ট মনে করা উচিত। আজ কাল যারা শ্রেষ্ঠ জাতি সেই ইংরেজদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গাড়োয়ান, কি মুটেমজুর, এমন কি সামান্য জুতোসেলাইওয়ালারও প্রায় ঘড়ি থাকে। তারা জানে যে সময়ই তাদের জীবন, আবার সময়ই তাদের জীবন ধারণ অর্থের উপায়। ২৪ ঘণ্টায় যাদের এত খরচ, তার ফি ঘণ্টায় অত টাকা আয় হচ্ছে কি না দেখা চাই। এই জন্যেই তারা এত বড় জাত। তাই আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের দেশের বালক বালিকারা

সকলেই ঘড়ির এ মহৎ গুণ জানিয়া এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করেন। অনেক ছেলে দেখি প্রায়ই দেরী করিয়া স্কুলে আসেন, আবার অনেকে ৯টার সময় অবধি এসে বসে থাকেন। কাজেই,—ঘড়ি নেই কি করেন, সময় ঠাওরাইতে পারেন না। রেলের গাড়ীতে যাইতে অনেকেই দেখিয়াছি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যান না ; কাজেই তাঁহাদিগকে 'ট্রেণ মিস্' করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অনাহারে হয়ত ষ্টেসনে বসিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হয়। ঘড়ি থাকিলে এ সব হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা যখন সকলে ঘড়ি ব্যবহার করিতে শিখিয়া সময়ের মূল্য বুঝিবে, তখনই বাস্তবিক দেশের উন্নতি হইবে। ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে আবশ্যক। ৪ খানি বই পড়িতে হইবে, এত টুকু সময় আছে, তাহার মধ্যে ঠিক ভাগ করিয়া পড়িলে তবে পড়া ঠিক হইবে নহিলে হয় না। এই সব নানা কারণে ছাত্রদের ঘড়ি নিতান্ত আবশ্যক। আজ কাল দামও খুব কম। আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করিবেন। কিন্তু সাবধান! যেন নষ্ট না হয়। আরও সাবধান! যেন ঘড়ি আছে বলিয়া কারো অহঙ্কার না হয়।

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৩১-১৩৩।

আমি দুখী কেন

খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



পাড়ার ভূষণ ভারি গরিবের মেয়ে। তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। সে যখন খুব ছেলে মানুষ তখন তার পিতার মৃত্যু হয়। গ্রামের এক ধারে একখানি কুঁড়ে ঘর আছে, তাইতে দুজনে থাকে; আর ভরণ পোষণের ভার তার মার উপর। ভূষণ বাড়ীতে বসিয়া খেলা করে, কি ঘরের কোন কাজ কর্ম করে, আর তার মা ভিক্ষা করিতে যায়। একদিন তাহার বড় ইচ্ছা হইল যে, সে ওপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বিকালে খেলা করিতে যাইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যাওয়াই স্থির করিল। গ্রামের ওপাড়াতে অনেক বড় মানুষের বাস, আর তাদের আদরের ছেলে মেয়েরা খেলা করে। ভূষণ সেদিন বৈকালে তাদের কাছে যাইতে যাইতে দূর হইতে তাদের খেলা হইতেছে দেখিতে পাইল, ও তাহার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এমন সময়ে তাদের একজন ছেলে যেমন তাহার দিকে তাকাইতেছে ভূষণ অমনি তাহার মুখ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এমন সময় সে ছেলেটী বলিয়া উঠিল "ওরে ভাই ওপাড়ার ভিখারীর মেয়ে ভূষী আমাদের সঙ্গে খেলা করতে আস্‌ছে।" আর সব ছেলেরা অমনি উচ্চৈস্বরে হাসিয়া বলিয়া উঠিল "কি? ভিখারীর মেয়ে হয়ে আমাদের সঙ্গে কোন্ লজ্জায় খেলা কর্‌তে আস্‌ছে রে!—আ মরণ! পর্তেও একখান কাপড় যোটে নি!—ও ভাই! দেখ্ দেখ্ একখানা ছেঁড়া নেকড়া, প'রে এসেছে।" এই বলিয়া কতকগুলা ছেলে তার পিছে পিছে তাড়া করিল। আর—আহা!—বেচারী ভূষণ প্রাণপণে ছুটিল। তার কাণ, মুখ, লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোক দিয়া ঝর ঝর করে জল পড়্‌ছে, আর দুঃখিনী ভূষণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে!—পাঠক পাঠিকাগণ! ইহাকে দেখিয়া তোমাদের কি একটুও দুঃখ হয় না? যাহা হউক সে এই প্রকারে ছুটিতে ছুটিতে ঘোষালদের দীঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত

হইল, ও সেইখানে বসিয়া হাঁটু দুখানির উপর মাথাটী রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার বুক তখন কেমন করিতেছে তা সেই জানে, আহা! তার আর কেউ নাই, কেবল শোক দুঃখে সান্ত্বনা পাইবার এক মা আছে, তিনিও আবার নিকটে নাই। সে মনের এত কষ্ট কাকেই বা বলিয়া একটু সুখী হয়?—সে বোধ হয় মনে করিতেছিল যে "আমি মার কোলে বসিয়া আছি"।—কাঁদিতে-কাঁদিতে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। দিব্যি চাঁদ উঠিয়াছে ; আকাশে মেঘ নাই। আর সেই দীঘির ধারে বসিয়া ভূষণ কাঁদিতেছে, আর কেহ কোথাও নাই। সে কিন্তু রাত্রি হইয়াছে জানিতে পারে নাই। এদিকে ভূষণের মা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া বাটী আসিয়া দেখেন ভূষণ অন্য দিনের ন্যায় বাড়ী নাই। তখন তিনি তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। অনেক যায়গা খুঁজিয়া কোথাও পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার মনে পড়িল, যে ভূষণ মাঝে মাঝে ঘোষালদের দীঘির ধারে বেড়াতে যায়। অতএব সেই দিকেই খুঁজিতে লাগিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, ভূষণ হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে ; তিনি কিছু না বলিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

ভূষণ এইরূপে কাঁদিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল—"আমি দুঃখী কেন?" অমনি তার কান্না থামিয়া গেল, সে পূর্বের সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেল, আর আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—"আমি দুঃখী কেন? আমি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আছি, আর তারা না হয় ভাল ভাল কাপড় পরিয়া আছে ; এইজন্য কি আমি দুখী? কেন? এতে ত আমার কোন কষ্ট নাই। যখন শীত করিবে তখন আমাদের সেই ছেঁড়া কাঁথা খানি গায়ে দিব। তবে ছেঁড়া কাপড়ে আমার দুঃখ কিসের? তাদের না হয় বড় বড় বাড়ী আছে তা থাকিলেই বা! আমাদের ত বেশ কুঁড়ে ঘর খানি আছে। অতো বড় বাড়ী আমাদের কাজ কি? কেবল মা আর আমি বইত নয়? তবে আর কি? আমরা কুঁড়ে ঘরখানিতে ত বেস্ থাকি? ওতে আমাদের কোন কষ্ট নাই। তাদের ভাল বিছানা আছে আমাদের তা নেই। তা হ'ক—আঃ! আমি শীত করলে মার বুকের ভিতর গিয়া শুয়ে থাকি! তার চেয়ে আবার ভাল বিছানা! আমার তায় কাজ নাই ; পরমেশ্বর আমার মা'কে বাঁচিয়ে রাখুন। তাঁর বুকই আমার সবচেয়ে ভাল বিছানা। তাদের টানা পাখা আছে। বেস্, আমার তা কাজ নাই। সন্ধ্যাকালে যখন মা আর আমি আমাদের ঘরের পাশে ঘাসের উপর বসে থাকি তখন কেমন বাতাস হয় ; তার কাছে আবার টানাপাখা? টানাপাখায় নাকি তেমন বাতাস হয়? তাদের অনেক টাকা আছে। তা থাক্ ; আমাদের টাকা নাই বটে—কিন্তু কেন? টাকায় কাজ কি? আমার মা সমস্ত দিন ভিক্ষা করে এনে রাখেন, আর সকালে ও সন্ধ্যাকালে আমায় রেঁধে দেন, বেস্ত খেতে পাই ; তবে টাকায় কাজ কি? তাদের সব ঝাড় লণ্ঠন আছে। তা ওসব আমাদের কাজ কি? আমাদের একখানি ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলে। আর যখন বাহিরে বসি তখন কেমন চাঁদের আলো হয়—আহা কেমন! ঝাড় লণ্ঠন নাকি অমন হয়? তাদের অনেক চাকর চাকরাণী আছে, গাড়ি ঘোড়া আছে। তা সে সব ত আমাদের দরকার নেই। মা যখন রাঁধেন আমি যা পারি তাঁহাকে সাহায্য করি। তার পর তিনি ভিক্ষা করিতে যান, আমি খেলা করিতে যাই। তবে আর কি? চাকর চাকরাণী ও সব আমাদের দরকার? তবে আর আমাদের কিসের অভাব? আচ্ছা, তাদের সব বাপ্ আছে, আমার বাবা নাই। এই বলিয়া ভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করে রহিল ; তাহার পর একটু উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি আমার বাপ্ নাই?—আমার পিতা পরমেশ্বর! আমার বাপ্ জগতের

রাজা !!" এই বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল, ও আহ্লাদে মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তবে নাকি আমি দুঃখী?—আমি রাজার মেয়ে।" তখন ভূষণ দেখিতে পাইল, তাহার মা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি সে লাফাইয়া তাঁহার কোলে উঠিল ও গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা! আমরা দুঃখী কিসে?" তাহার মা তখন তাহার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা! তুমি আজ এখানে এসব কথা ভাবিতেছিলে? ভূষণ বলিল "মা! আজ আমি ওপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছিলাম, তারা আমাকে দুঃখী বলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তা মা আমি দুঃখী কিসে? তারা না হয় ভাল কাপড় পরে, আর আমি ছেঁড়া কাপড় পরি ; তারা কোটা বাড়ীতে থাকে, আর আমি তোমার সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে থাকি ; তারা ভাল বিছানায় শুয়ে থাকে, আমি মা ছেঁড়া কাপড় প'রে তোমার বুকের ভিতর কেমন শুয়ে থাকি। মা! এতে যে আমার বড় সুখ হয়? আবার তাদের টানাপাখা আছে ; আমাদের তা নেই। তা নাই থাক্‌ল মা! বৈকালে কেমন তোমাতে আমাতে আমাদের ঘরের পাশে ঘাসের উপর বসে বাতাস খাই। তাদের টাকা আছে ; তা আমাদের টাকা কাজ কি মা? আমরা বেস্ খেতে পাই। তবে বড় মান্‌ষী ক'রে অহঙ্কার দেখাবার দরকার কি? সে কি ভাল? না সে আরও পাপ! ওপাড়ার ছেলেরা ত বড়মানুষ ; তাদের ব্যবহার দেখ্‌লে কি আর তাদের মত হ'তে ইচ্ছা যায় মা? আমাদের, তাদের মত চাকর চাকরাণী নেই। ঝাড় লণ্ঠন নেই, গাড়ী ঘোড়া নেই, তা নাই থাক্‌ল মা! চাকর, গাড়ী এ সব আমাদের কাজ কি? আর ঝাড় লণ্ঠনের বদলে দেখ দেখি কেমন চাঁদ রহিয়াছে। আহা কেমন! মা! ও চাঁদ ত আমাদের। তুমিই ত বলিয়াছ আমাদের পিতা পরমেশ্বর এ সব তৈয়ার করেছেন, সব মানুষ ত আমাদের ভাই বোন, বা! আমাদের এত ভাই এত বোন! তবে আমাদের কিসের দুঃখ মা?"

এত ছোট বালিকা ভূষণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়', তাঁহার আহ্লাদে বুকের ভিতর কি হইতে লাগিল ও চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল ; তিনি ভূষণকে বুকের উপর চাপিয়া লইলেন ও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর ভূষণের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "ভূষণ মা! তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ। আমরা কিসের দুঃখী? আমরা ত দুঃখী নই। টাকা থাকিলেই কেবল মানুষ সুখী হইতে পারে না। এক দলের লোক আছেন তাঁহারা খুব ধনী ও অনেক গাড়ী ঘোড়া, ফুল-বাগান, চাকর চাকরাণী, ঝাড় লণ্ঠন, গদি বিছানা, ইত্যাদি মহা ধূমধামের মধ্যে থাকেন। কিছুরই অভাব নাই, মহাসুখ। আর এদিকে দুঃখীদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ধন লইয়া আপনি সুখ ভোগ করেন আর থাকেন, আর কোন কাজ নাই। আর এক শ্রেণীর লোক, তাঁহারাও খুব ধনী, ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা এ সুখকে সুখ মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন "এ সুখ কত দিনের জন্য! যখন এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব, তখন সকলেই সমান হইব ; অতএব বাস্তবিকই "সকলে ভাই বোন।" কাজেই তাঁহারা সমস্ত ধন আপনারা ভোগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীর চারিদিকে যে সকল দরিদ্র লোক হাহাকার করিতেছে তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া নিজের সুখ ফেলে তাহাদেরি দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন"।

ওদিকে যাঁহারা খুব গরিব, আমাদের মত, কি আমাদের চেয়েও, তাঁহাদের মধ্যেও একদল ধন নাই বলিয়া দুঃখিত নন। তাঁহারা তোমার মতের লোক। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের পিতা ঈশ্বর এবং সকলেই তাঁহাদের ভাই বোন। তাঁহারা তাঁহাদের কিছুই অভাব দেখিতে

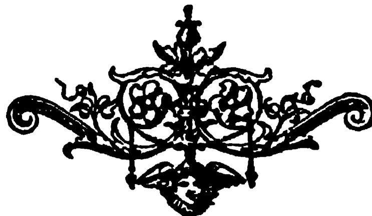
পান না। তাঁহাদের ছোট কুটীর খানিকেই রাজার বাড়ী মনে করেন। চন্দ্র তাঁহাদের ঝাড় লণ্ঠন হয়। বনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে ; তাঁহারা সেই গুলিকেই তাঁহাদের ফুল বাগান মনে করেন। তাঁহাদের নিজের পা দুটিই তাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া হয় ; তাঁহাদের হস্তই তাঁহাদের চাকরের কার্য করে। এইরূপে সেই কুঁড়েটীর মধ্যে যে সকল সুখভোগ করেন তাহাই রাজ-সুখ মনে করেন। আবার, যখন তাঁহারা ভাবেন যে জগতের রাজা পরমেশ্বর তাঁহাদের পিতা ও তাঁহারা রাজপুত্র ও রাজকন্যা তখন তাঁহাদের আর সুখের সীমা থাকে না।

আবার একদল লোকের কথা শুন ; তাহারাও ইহাদের মত গরিব কিন্তু তাঁহারা আর এক রকম। তাহারা টাকা নাই বলিয়া বড় দুঃখিত। সর্বদা টাকার অন্বেষণে বেড়ায় ও হয় ত তাহার নিমিত্ত কত পাপ কার্য পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত। তাহারা জানে না যে সুখ তাহাদের কুঁড়ে ঘরের মধ্যেই রহিয়াছে।

তবে এখানে চারি দলের লোক দেখা যাইতেছে। ১ম দল খুব বড় মানুষ, গরিব দুঃখীকে দয়া করে না, আপনাদের সুখের জন্যই ব্যস্ত ; আর মনে করে যে তাহাদের সকল ধনই তাহাদের নিজের সুখের নিমিত্ত। ২য় দলের লোকও খুব বড়, কিন্তু আপনাদের সুখের দিকে তত দৃষ্টি নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়াও সব মানুষকে ভাই বোন জানিয়া সকলের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। ৩য় দলের লোক আমাদের মত কিম্বা আমাদের চেয়ে গরিব, কিন্তু সর্বদাই সন্তুষ্ট। তাঁহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র ও রাজকন্যা মনে করেন এবং তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। ৪র্থ দলের লোকও খুব গরিব, কিন্তু সর্বদাই অসন্তুষ্ট ; আর কোথায় সুখ, কোথায় ধন করিয়া বেড়ায়। এই চারিদলের মধ্যে তুমি কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী মনে করিবে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের লোককে সুখী বলিবে। তবে বেস্ দেখা গেল যে, কেবল টাকা থাকিলে লোক সুখী হইতে পারে না—আরও কিছু চাই। আবার অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও দুঃখী হয় না, যদি তাহার সেই বস্তু থাকে।

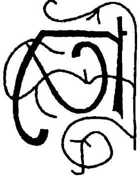
তবে সেই বস্তু কি? এমন কি বস্তু আছে যাহার অভাবে অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও লোক বাস্তবিক সুখ পায় না ; এবং অতি দরিদ্র হইলেও, যাহা থাকিলে মানুষ খুব সুখী হইতে পারে? সে বস্তুটী এই—ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া ও সকল মানুষকে ভাই বোন জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা, ও সকলকে ভালবাসা। ইহা যাহার আছে, অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও সে কেন দুঃখী হইবে? তখন ভূষণ মার কোলে বাড়ী যাইতে যাইতে ভাবিল "যথার্থই ত, আমি দুঃখী কেন?" আমরা বলি "না ভূষণ! তুমিই যথার্থ ধনী।" পাঠক পাঠিকাগণ! কি বল?

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৩৪-১৩৭।



"বাবা আমায় রেখে গেছেন"

কুমারী * দেবী



মরা বোধ হয় সকলেই জান যে, জাহাজে ঠিক বাড়ীরই মত তলা থাকে। বড় বড় বাড়ীতে কেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা থাকে তেমনি জাহাজেও একতলা, দুতলা, তিনতলা প্রভৃতি তলা থাকে। জাহাজে এমনও অনেক যায়গা আছে যেখানে কেহ বড় একটা যাওয়া আসা করে না। একবার একখানি জাহাজের এক কোণে ৮।৯ বৎসরের একটী ছোট ছেলে দুই তিন দিন ধরিয়া চুপ করিয়া । তার কাছে কিছু খাবার ছিল, সে ক্ষুধা পাইলেই তাহা বাহির করিয়া খাইত। দুই দিন তাহাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। তারপর চারিদিনের দিন যখন জাহাজ সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একজন তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাপ্তেনের কাছে গিয়া বলিল "মহাশয়! জাহাজের নীচের তলায় একটী ছেলে কোণে লুকাইয়া বসিয়া আছে, সে আমাদের জাহাজের লোক নয়। দেখিবেন আসুন।" কাপ্তেন এই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলেন ছেলেটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে বলিলেন। তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেনের অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। তিনি রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন "তুই কোথা থেকে এলি? তুই না ব'লে কেন এ জাহাজে চড়্‌লি? দুষ্ট ছেলে! বল্‌ কেন তুই এখানে লুকাইয়া রহিয়াছিস্‌? বল, শীঘ্র বল্‌ এখানে কেন?" বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "বাবা আমায় রেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। কি? মিথ্যা কথা! বাবা তোকে রেখে গেছেন? বল্‌ কেন এখানে এলি?

বালক। কাপ্তেন! বাবা আমায় রেখে গেছেন।

কাপ্তেন। ফের? ফের? "বাবা আমায় রেখে গেছে'? এবার ও কথা বলেছিস্‌ কি মেরেই ফেল্‌ব।

বালক। না কাপ্তেন! বাবা আমায় রেখে গেছেন।

কাপ্তেন রাগে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চোক্‌ কান দিয়া আগুণ বাহির হইতে লাগিল। রাগে মাথা হইতে পা পর্যন্ত থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সজোরে বালকের ছোট ছোট রোগা দুখানি হাত ধরিয়া অত্যন্ত ঝাঁক্‌ড়াইতে লাগিলেন, আর সিংহের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন "ফের ও কথা! আবার মর্‌তে সাধ গিয়েছে? আবার ও কথা বল্‌বি কি মেরেই ফেল্‌ব। বল্‌ হতভাগা, এলি কেন?"

বালক কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "আমি আসি নাই, বাবা রেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। তবে কি মর্‌বি? মর! নিয়ে এস দড়ী। আর এর মৃত্যু উপস্থিত। কে বারণ করে?

পার্শ্বের লোকেরা কাপ্তেনের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল ; কেহ তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইতে অগ্রসর হইল না। কাপ্তেন ফের চীৎকার করিয়া বলিলেন "তবে কেহ দিবে না? আমিই দিব।" এই বলিয়া যাই তাহার দুই হাত ধরিয়া উঁচু করিয়াছেন অমনি ছেলেটী বলিয়া উঠিল "কাপ্তেন! আমাকে মারবেন? আমি সত্যই বলিয়াছি, বাবা আমায় রেখে গেছেন। তা মরিবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। তবে আমি প্রার্থনা করি?"

কাপ্তেন। কর্।

বালক হাত দুখানি জুড়িয়া চক্ষু দুটী বন্ধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল "হে ঈশ্বর! আমি যে সত্য বলিতেছি তুমিত তা সব জান। আমি যদি মরি তবুও হে ঈশ্বর! সত্য কথাই বলিব। আমি জানি সত্য বলিলে তুমি ভালবাস। তবে আমি মরি। তুমিত আমায় ভালবাস, মরিলে তোমার কাছে যাব, তাহলে আমার কিসের দুঃখ?" প্রার্থনা শুনিয়াই কাপ্তেনের পাষাণ মন গলিয়া গেল। তাঁহার মনে এক আশ্চর্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁর কথা যেন কে বন্ধ করে দিল। বালকটী বাঁচিয়া গেল। তবে নাকি মিথ্যা কথা না হইলেও চলে না? তবে নাকি ভগবান প্রার্থনা শুনেন না? তবে নাকি ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন না? তবে নাকি সত্য কথার পুরস্কার নাই? নাই?? কে বলিল নাই? আছে! সত্য কথা বলি ত ভয় নাই! সত্যেরই জয় হয় জানিও। সত্যসত্যই এই ছেলেটীর পিতা তাহাকে এই জাহাজে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গরিব মানুষ, ছেলেকে খাইতে দিবার ভয়ে তাহাকে জাহাজে রাখিয়া যান; মনে করিয়াছিলেন যে জাহাজ সমুদ্রে বাহির হইয়া পড়িলে আর তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, কাজে কাজেই তাহাকে একটা কাজ দিয়া খাইতে দিবে। কাজেও তাহাই হইল। বালকের মৃত্যু হইল না।

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

খুঁতধরা ছেলে

উপেন্দ্রকিশোর রায়



বিলাতে চারিটী ভাই একদিন এক যায়গায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। তাহাদের আলাপের বিষয় কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের 'একটা কিছু তো আর একরকম হয় না। তাই চার ভাই চার রকম কথা বলিল।

একজন বলিল—"আমি ইটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইট দিয়া আমার একখান বাড়ী করিব।"

আর একজন বলিল—"দূর হ, তোর নেহাত ছোট নজর, আমি তোর চাইতে বেশী একটা কিছু হ'ব—আমি ইঞ্জিনিয়ার হ'ব। কত লোক আমার কাছে ঘরবাড়ীর নক্সা করিয়া নিতে আসিবে; কত লোকের বাড়ী-ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা "দশজনের একজন" হইব। বলিস্ কি, আমার নামে একটা স্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস।"

তৃতীয় ভ্রাতা—"বিল্ডার, কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক। তোরা হ'বি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস্। আমি অন্যের কাজ নিয়ে ছুটোছুটী করিতে যাইব কেন। সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ীঘর করিব। আমার সব এমন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই।"

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "তোরা যাহাই করিস্ ভাই, এমন কিছু করিতে পারিবি না যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল; দেখ্ দেখি। তোরা যাহা করিবি, আমি তাহার দোষ ধরিব। আমার কাজের আর অভাব কি?"

চারি ভা'য়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইট দিয়া তাহার একটী বাড়ী হইল। তা ছাড়া এক দুঃখিনী বুড়ীকে ঐ ইট দিয়া আর একটী ঘর করিয়া দিল। কন্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপালিটিকে খোঁচাইয়া নিজের নামে একটী স্ট্রীট পর্যন্ত কেমন করিয়া করিয়া লইয়াছেন। তিনিও একটা কিছু হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারা নূতন ধরণে বাড়ী করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁতধরা মহাশয়ের তো কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ও না। মরিবার সময় পর্যন্ত সে সন্তোষজনক রূপে প্রশংসার সহিত কর্তব্য কাজ করিয়া গেল।

একদিন স্বর্গের দরজায় দরোয়ান দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি। বুঝিতেই তো পার ; স্বয়ং বিশ্বকর্মা ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে আর কি বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগান। তাহার ভিতর দিয়া দরোয়ান ঠাকুর কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলেন না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না ; তাই আজ কাল কাজের ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যাণ্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোণার টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—

"অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি ভিতরে আসিতে প্রার্থনা করিতে পারি?—দরজা গুলিতো মন্দ নয় ; কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।"

"তুই কেরে, পৃথিবীর লোক ক্যাচ্ ম্যাচ্ করিয়া কথা কহিতেছিস্?"

"অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন?—আমি স্বর্গে যাইতে চাই।"

"বটে? তুই করিয়াছিস্ কি?"

"আমি খুঁতধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে তাহার সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইট পোড়াইয়াছিল সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকীওয়ালা সহজেই খোওয়া করিতে পারিত। যার নামে স্ট্রীট হইযাছে সে এত রোগা যে অত বড় স্ট্রীটে তাহার কিছু দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—"

"আরে থাম্ থাম ; ও সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্?"

"এই সব নোট লিখিয়াছি।"

"দূর হ ব্যাটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস্ নাই? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস?"

"আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।"

"যা, যা! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই। "আউ পচারির কাঙ্কু, জগনাথঙ্কু—" বলিয়া দরোয়ান দেবতা গান ধরিলেন। আমাদের সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খরচ, রেল-ভাড়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াও কোন ফল পাইলেন না। বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন যে কাগজে লেখা উচিত 'স্বর্গে ভাল অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত নাই'। গাড়ী পাইতে অনেক দেরী, সুতরাং ইত্যবসরে দরজার দোষগুলি টুকিয়া রাখিতে লাগিলেন। দরজার কথা শেষ হইলে সাহেব দ্বারী ঠাকুরের গানের এক মজার বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, যে বুড়ীকে তাঁহার ভাই ঘর করিয়া দিয়াছিল, সে আসিতেছে! তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও বুড়ী! তুই কেমন করিয়া আসিলি?"

"তাই তো বাপু, আমি তো কিছু জানি না। আমি গরিব দুঃখিনী বুড়ী, এমন তো কিছুই করি নাই যাহাতে এখানে আসিতে পারি।"

"তুই কি কোন কাজই করিস্ নাই? আমি তো সমালোচনা করিয়াছি।"

"আমার আর তো কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমার বাড়ীর কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে এক রকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদায় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ী পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তারপর কি হইল বিশেষ জানি না। কেবল মাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম "কার কিছু হয় নিতো?" একজন লোক বলিল 'না, আমরাও আসিয়াছি আর বরফ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তারপর আর কিছু জানিনা। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।"

বুড়ীর কথা শুনিয়া দরোয়ান দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া "এসো এসো বুড়ী এসো" বলিয়া আদর করিয়া বুড়ীকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ী সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল ; বলিল :—"ওর ভাই আমাকে বাড়ী করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার যায়গা ছিলনা। ও মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাবে।"

তখন দেবতারা সমালোচককে বলিলেন, "অলস! অপদার্থ! যা! বুড়ীর জন্য তোকে স্বর্গে নিয়া যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্বে স্বর্গে যায় নাই।"

দেবতারা তার পর বুড়ীর সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল। 'টানিয়া লওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি ক'রে বুঝি টানে?"

ঢেঁকি যেখানেই যাক্, তার ধান ভানা কাজ ঘোচেনা ; আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কিইবা করে, একটা কাজ তো চাই? কতকগুলি ছেলে আছে, তারা কেবলই খুঁত ধরে ; পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের দোষ শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।

২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১৪৫-১৪৭।



মার্কিন মহিষ

প্রমদাচরণ সেন

সুন্দরবনের বড় বড় জঙ্গলে, যেখানে সাপ বাঘের আড্ডা, যেখানে গাছের ডালে ডালে বুনোপাখীর মজলিশ, যেখানে নদীতে হাঙ্গর, কুমীর হাঁ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় ডাঙ্গা পর্যন্ত মানুষকে তাড়া করিয়া যায়,—সেইখানে বড় বড় বুনো মহিষের দল আপনার মনে চরিয়া বেড়ায়। দেখিতে কালো ভূতের মত, মস্ত ঢাকের মত মাথার মাঝে দুপাশে দুটো চোখ মিটির মিটির করিতেছে, দেড় হাত দু হাত লম্বা এক একটা শিং ;—সেই শিং নাড়িতে নাড়িতে মাঝে মাঝে এক একবার বাছুরের মত শব্দ করিতে করিতে, যমের মত জানোয়ারগুলো যখন গাছপালা ভাঙ্গিয়া, নদী খাল সাঁতরাইয়া ক্ষেত আবাদ নষ্ট করিয়া চলিতে থাকে, তখন বাঘেরও প্রাণ উড়িয়া যায়, কুমীরেরও মুখ কালো হইয়া যায়,—আর আশে পাশে যে সব মানুষ থাকে, তাদেরতো কথাই নাই! তারা যে কোথায় গিয়া রক্ষা পাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া



আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে মহিষ বাহন। না হবে কেন! দেবতাটীও যেমন, বাহনটীও তেমনি।

কিন্তু আমাদের দেশের গয়লারা যে মহিষ পোষে, তাহা দেখিয়া বুনো মহিষ যে কি তাহা বোঝা যায় না। আবার আমাদের দেশের বুনো মহিষ দেখিতে যেরূপ ভয়ানক, তাহা দেখিয়াও আমেরিকা বা মার্কিনদেশের মহিষের চেহারা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। ইংরাজীতে মার্কিন মহিষকে বাইসন্ বলে। সে বৎসর চিয়ারিণী সাহেবের সার্কস্ ব' ঘোড়ার নাচে একটা বাইসন্

আসিয়াছিল। আমরা সেটাকে দুবার দেখিয়াছি। সেটা দেখিতে আমাদের মহিষের মত উচু বটে, কিন্তু গায়ে এত জোর, যে সার্কসের প্রদর্শনী চক্র অর্থাৎ গোলাকার ঘেরা যায়গা হইতে প্রায় ১৫।১৬ জন লোককে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল, কেহই তাহাকে দড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

আমেরিকা দেশে এমন সকল স্থান আছে যেখানে কেবলই মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, এবং তাহাতে কেবলই লম্বা লম্বা ঘাস। ঘাসগুলি বুঝি কম লম্বা মনে ভাবিতেছ? বড় সোজা কথা নয় ; সে গুলো এত লম্বা যে মানুষ ডুবিয়া যায়, এবং একবার তাহার মধ্যে গিয়া পড়িলে, দিক ঠিক করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসা কষ্ট। এই ঘাসবনে ব্যাঘ্র, গোবাঘা, প্রভৃতি মহাশয়েরা সুখে বাস করিয়া থাকেন। আমাদের মার্কিন মহিষ মহাশয়ও এইখানে থাকিতে ভালবাসেন। পাহাড়ে বা কোন জঙ্গলে থাকিতেও তাঁহার আপত্তি নাই তবে তিনি কেবল এই চান যে স্থানটী এমন হইবে যেন মানুষগুলো গিয়ে তাঁহাকে বিরক্ত না করে। মানুষগুলো কি তা শোনে না বোঝে!

সেই ঘাসবনে, সেই পাহাড়ময় স্থানে, সেই ভয়ানক জঙ্গলে মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ ধরিতে যায়। মহিষ ধরিতে গিয়া মানুষও দু একবার ধরা পড়েন—কখনও প্রাণ যায়, কখনও হাত পা ভাঙ্গিয়া রক্ষা পান। মহিষ কি সহজে ধরা দেয়! দলে দলে শিকারী ঘোড়ায় চড়িয়া, দড়ী হাতে করিয়া আসিতেছে দেখিলেই মহিষেরা দলশুদ্ধ দৌড়িয়া পলাইতে থাকে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িয়া যাহারা আসিতেছে, তাহাদের সহিত দৌড়িয়া পারিবে কেন? শিকারীরা শীঘ্রই নিকটে আসিয়া পড়ে। তাহাদের হাতে যে দড়ী থাকে, তাহার এক পাশ ঘোড়ার গলায় বা শিকারীর কোমরে বা হাতে বাঁধা আর এক পাশে ফাঁসী করা ; শিকারীদের হাতের এমন কৌশল যে সময় বুঝিয়া যাই দড়ীটা ছুঁড়িয়া দেয়, অমনি তাহা মহিষের গলায় বা পায়ে জড়াইয়া ফাঁসী লাগিয়া যায়। এ দিকে দড়ীর আর এক দিক শিকারীর কাছে বা সচরাচর ঘোড়ার গলায় বাঁধা আছে। সেই দড়ী ধরিয়া ঘোড়া মহিষকে টানিয়া লইয়া যায়। মার্কিন মহিষ দেখিতে যত ভয়ানক, তত সাহসী নয়। দলছাড়া হইয়া সহজেই ভয় পেয়ে উঠে, কাজেই শিকারীরা যেমন টানিয়া লইতে থাকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে,—তবে দু একটা দু একবার ধস্তাধস্তি করিয়া, দু এক ঘা না খাইয়া ও না দিয়া মানুষের বশে আসে না। ফাঁসি দিয়া ধরিবার নিয়ম আজ কাল বড় একটা নাই ; এখন অসভ্যের তীর ধনুকে এবং সুসভ্যের গোলা গুলিতে অতি সহজেই মার্কিন মহিষের পশু-জন্ম শেষ হয়। মার্কিন মহিষের হাড়, মাংস, চামড়া প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জিনিষই কোন না কোন কাজে লাগে, এই জন্যই মানুষ অত কষ্ট করিয়া মহিষ শিকার করে।

মার্কিন মহিষ পরমেশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি, তিনি যে কত স্থানে কত চমৎকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সীমা কি। আমরা যে ছবি দিলাম তাহা দেখিলে ওরূপ জীব যে সত্য সত্যই আছে, তাহা কি সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সুন্দর, সকলই চমৎকার। আমরা যতই দেখিতে থাকি, ততই আশ্চর্য বোধ হইতে থাকে, আর মনে হয়, এ পৃথিবীতে কত কি আছে, আমরা তাহার কিছুই জানিনা।

২ : ১০ : অক্টোবব ১৮৮৪, পৃ ১৪৭-১৪৯।

মিছা কথা কহিও না

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়


ধন কখন মিছা কথা কয়না। তাহার অন্য অনেক দোষ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ তাহাকে মিছা কথা কহিতে শুনে নাই। সুতরাং তাহার সমস্ত দোষ থাকিলেও গ্রামের লোক তাহাকে একটু ভাল বাসে। তাহার পিতা দেশে থাকেন না, এজন্য বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায় ছেলেটী দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এবার তাহার বাপ বাড়ী আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া অনেক ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া দিলেন, আরও বলিলেন যে সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবেন যদি সে মন দিয়া পড়াশুনা করে ও তিনি যাহা বলিবেন তাহা শুনে। সাধন স্বীকার করিল। তিনি নূতন নূতন বেশ রঙ্গীন বৈ কিনিয়া দিলেন ও বাড়ীতে বসিয়া পড়িতে বলিলেন। গ্রামের ৪।৫ জন ভাল ছেলে ভিন্ন আর কাহারও সহিত খেলা করিতে নিষেধ করিলেন। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, সাধন মন দিয়া পড়ে, পড়া হইলে ঐ সকল ভাল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে ও উত্তম উত্তম কাপড় চোপড় পরে, উত্তম উত্তম খাবার খায়। মনে খুব আহ্লাদ। দুষ্ট ছেলেরা তার পিতার ভয়ে আর নিকটেও যায় না।

এক দিন তাহার পিতা কোথা যাইবেন, তাই যাইবার সময়ে বেশ্ করিয়া সাধনকে বলিয়া গেলেন। সমস্ত দিনে যে সকল কার্য করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন, বিশেষ করিয়া বলিলেন যেন সব কুচরিত্র বালকদের সঙ্গে খেলিতে না যায়। তিনি চলিয়া গেলে ঐ সকল দুষ্ট বালক সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতে উঁকী মারিতে লাগিল, শীস্ দিতে লাগিল ও নানা রূপে সাধনকে ডাকিতে লাগিল। সে প্রথম প্রথম শুনিয়াও শুনিল না, পিতার উপদেশ মনে করিয়া সে সকল ছেলেদের দিকে চাহিলও না। অনেক ক্ষণের পর একবার যেই সেদিকে ফিরিয়াছে, অমনি তাহারা সকলে বলিল "একবার নামিয়া আইস, একটা কথা শুনিয়া যাও।" সে যাইতে অস্বীকার করিল, তখন তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "কেবল একটী কথা শুনিয়া যাও।" এক শ বার এই কথা বলিতে বলিতে সাধনের মনে হইল, একবার ত যেতে হানি নাই। খেলিতেই নিষেধ, দেখা করিতে ত মানা নাই। এই মনে করিয়া সে বাহিরে আসিল। তখন ঐ সকল বালকেরা মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "কি ভাই! একেবারে আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে? একটীবারও কি আমাদের দেখা দিতে নাই? এতদিনের ভাব কি একেবারে চিরকালের জন্য গেল? তুমি পড় না, তাতে ত আমরা বারণ করি না, কিন্তু তুমি না হলে আমাদের খেলাই হয় না। আমরা তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" ইত্যাদি কত সব কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক সাধন মহা বিপদে পড়িল। তাহার এমন সাহস হইল না যে সে বলে "না ভাই তোমরা মন্দ, তোমাদের সঙ্গে খেলিব না, তোমরা ভাল হও, তার পরে খেলিব।" এ না বলিয়া সে বলিল "বাবা বকেন, তোমাদের সঙ্গে বেড়াইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন।" অমনি তাহারা বলিল "আজি ত আর তিনি বাড়ী নাই, চলনা কেন যাই। আজ আমরা চাটুর্য্যেদের বড় বাগানে চড়াইভাতী করিব, আজ তোমার নিমন্ত্রণ। সেখানে যেতেই হবে।" সাধন চুপ করিয়া রহিল। দুষ্ট বালকেরা সুবিধা বুঝিয়া "হৈ হৈ" শব্দে সকলে

চীৎকার করিয়া তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। সে অনেক বলিল "মাকে বলিয়া আসি", কিন্তু তাহার কথা ছেলেদের গোলে ডুবিয়া গেল।

বাগানে আজ মহা ধুম ধাম। ২০।২৫ জন ছেলে মহা আমোদে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেছে। এক দিকে জন কতক ছেলে কি বাটিতেছে, কোথাও কজন বেশ্ মনের আনন্দে বসিয়া গল্প করিতেছে, এক কোণে ৪ জন বালক দাঁড়াইয়া কাঠ ভাঙ্গিতেছে, কোথাও বা চাল ডাল সব ধুইতেছে। সব ব্যস্ত, সব আনন্দিত, সব খুসী। এত আমোদের ভিতরে পড়িয়া আর কতক্ষণ সাধন মলিন মুখে থাকিবে? তাহার ভয় ক্রমে দূর হইল ; "যা হবার তা হবে এখন, এখন ত আমোদ করা যাক।" সেও তাদের সঙ্গে মিশিয়া খুব মাতিয়া গেল। আর আর ছেলেরা তাকে খুকী করিয়া ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আরও বেশী যত্ন করিতে লাগিল। তাহার মনের তখন আর এক ভাব। এতদিন আলাদা থাকিয়া পিতার সৎকথায় যে কিছু উপকার হইয়াছিল, তাহা সব যেন বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। তাহার তখন ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তাহার বাপ আর বাড়ীতে না আসেন, আর সে মনের আনন্দে সঙ্গীদের সহিত খেলাধূলা করে। উঃ! কুসঙ্গের কি ভয়ানক ক্ষমতা! কুসঙ্গে কি সর্বনাশই হয়! পিতার এত সৎ উপদেশ, এত ভালবাসা, এত যত্ন, এত ভাল ভাল খাবার দেওয়া, সব ভাসিয়া গেল! দুষ্ট বালকদের সঙ্গে পড়িয়া সাধন আবার মজিল।

আমরা ছেলেবেলা একটা গল্প শুনিয়াছিলাম যে একজন ঘেসেড়া ঘাস কাটিতে গিয়া হঠাৎ একটা কেউটে সাপের ছানার সম্মুখে পড়ে, সাপটী তাহার আঙ্গুলে কামড়ায়। সে অমনি ঝাঁ ক'রে তাহার ঘাস কাটা খুর্পা দিয়া আঙ্গুলটী কাটিয়া ফেলিল, কাজেই বিষ আর না উঠিতে পারায় সে বাঁচিয়া গেল। আঙ্গুলটী বিষে জ্বরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিল। কদিন পরে আবার সেখানে আসিয়া দেখিল যে সেই আঙ্গুলটী তথায় রহিয়াছে ; নির্বোধ ঘেসেড়া মনে করিল এখন আঙ্গুলটী আবার জোড়া দিলে হয়। এই মনে করিয়া যেমন তাহা সেই কাটা যায়গায় জোড়া দিয়াছে, অমনি সেই বিষ উঠিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। হায়! হায়!! বুদ্ধির দোষে বেচারা মারা গেল, প্রাণটী হারাইল। অবোধ সাধনেরও ঠিক সেই দশা হইল। কুসঙ্গের বিষে তাহার সর্বনাশ হইত হঠাৎ সে সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাঁচিবার আশা হইল ; অমনি আবার লোভে পড়িয়া যেই সে কুসঙ্গে আসিয়া জুঠিল, আর তখনি আবার সেই পুরাণ বিষ তাহার মনে চড়িয়া সর্বনাশ করিল, সে আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল!!

খুব আমোদে দিন ত কাটিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। সকলে বাড়ী গেল। এইবার সাধনের মহাবিপদ। এতক্ষণের পর তাহার চৈতন্য হইল, এতক্ষণের পর তাহার পিতার স্নেহ মনে পড়িল, যাইবার সময় প্রাতে যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, তাহার বুক "ধপ্-ধপ্" করিতে লাগিল। মুখ শুকাইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে যে তাহার কি হইতে লাগিল, তাহা তোমরা বুঝিয়া লও। "যদি বাবা বাড়ী আসিয়া থাকেন, আমাকে খুঁজিয়া পান নাই। গিয়া কি বলিব? কি করিব? কি হইবে? হায়! হায়!! কেন গেলাম? কি ছাই আমোদ করিলাম? কেন গেলাম? কি করিলাম?" সে আর বাড়ীর দিকে যাইতে পারে না। পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাপড়ের এক কোণ লইয়া দাঁতে চিবাইতেছে আর মাটির দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে।

তাহার ছোট বোন্ বাহিরে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা বাড়ী এসেছেন?"

সে বলিল "না"; তখন অনেক ভরসা হইল। চক্ষু মুছিয়া চোরের মতন আস্তে আস্তে পড়িবার ঘরে গিয়া যে কার্য দিয়া গিয়াছেন তাহা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে হবে কেন? একদিনের কায কি কখন এক ঘণ্টায় হয়? হইল না।

একটী দুষ্কার্য করিলে আরও শত দুষ্কর্ম করিতে ইচ্ছা হয়। সাধনের তাহাই হইল। একে পড়া হয় নাই, তাহাতে আবার বদ্ ছেলেদের নিকট গিয়াছে, বাবা শুনিলে মহা রাগ করিবেন, হয়ত একেবারে সব কাড়িয়া লইয়া দূর করিয়া দিবেন। ভয়ানক রাগ হইবে। তাহার চেয়ে সাধন একটা সোজা উপায় দেখিল। যা হবার তা ত হইয়াছে। এখন আর কখন এমন করিবে না, কিন্তু আজিকার মত এখন বাঁচে কিরূপে? মিছা কথা। কি? মিছা কথা? যাহা কখন কহে নাই? যে দোষ কখন হয় নাই?—কাজে কাজেই!! সাধনের পাপের চূড়ান্ত হইল! সর্বনাশ পূর্ণ হইল!! পিতা আসিলে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ঢাকিয়া ফেলিল!

কিন্তু বলিবার সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল বুঝিতেই পারিতেছ? বুকের ভিতরে কে যেন ঢেকী পাড়িতেছিল, মনের মধ্যে যেন একটা নরক ঢাকা রহিল। সেদিন রাত্রে তাহার ঘুম হইল না, চক্ষের জলে বালিশ ভাসিয়া গেল, সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাটাইল। আর সাধনের মুখে হাসি নাই, আর তাহার মনে সুখ নাই। সে ঘটনা প্রায় এক মাস হইয়া গিয়াছে, আজিও সে এক বারও হাসে নাই, শরীর শুকাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সকলেই মনে করে, তাহার কি কঠিন রোগ হইয়াছে, সর্বদাই অন্য মন হইয়া ভাবে। কদিনের মধ্যে কি যেন হইয়া গেল। তাহার পিতা একদিন খুব আদর করিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে এরূপ হইতেছে? অনেক কষ্টে বালক সমস্ত বলিয়া ফেলিল। "হু হু" করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে একেবারে পিতার পদতলে পড়িল এবং সমস্ত বলিয়া শাস্তি চাহিল। পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবধি সাধনের জীবন নূতন হইয়া গেল। এখন সেই বালক একজন মান্যগণ্য দেশের বড়লোক। তাহার চরিত্রের গুণে সে অঞ্চলের অধিকাংশ লোক ধর্মের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। বালক বালিকাগণ! কি শিখিলে? কখন ভুলিও না।

২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১৪৯-১৫২।

একটী বালকের প্রয়োজন

প্রমদাচরণ সেন



মকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকান সহরের একটী বড় দোকান। দোকানের কর্তা রামকৃষ্ণ বাবু একজন খুব বড়লোক ; তাই যখনই তাঁহার দোকানের দরজায় দেখা গেল যে তাঁহার চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একজন বালকের প্রয়োজন, অমনি দলে দলে গরিবের ছেলেরা চাকরীর জন্য আসিতে লাগিল। যখনই কোন ছেলেকে চাকরী দেওয়া হয়, অমনি বিজ্ঞাপনটা তুলিয়া লওয়া হয়। রাস্তা দিয়া যত লোকজন যাতায়াত করে, তারা মনে করে, বুঝি লাহা কোম্পানীর লোক যুঠিয়াছে—ওমা! এক দিন, দেড় দিন, কখনও দুদিন পরে আবাব সেই বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে;—

"আমাদের দোকানের চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একটী বালকের প্রয়োজন, ভিতরে

অনুসন্ধান কর।"

লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বলাবলি করে "এদের কি রকম লোক চাই? এত দিনেও পাওয়া গেল না? তবে বুঝি একেবারে দেবতার মত লোক চায়—হুঁ—তা আর পেতে হয় না!" এদিকে রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব বুঝিয়া উঠা যায় না ; কেবল চিঠি বিলি করিতে এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি চাই, যে তাঁর লোক যোঠে না?—তবে বোধ হয় তাঁর আরও কিছু কাজ করাইয়া লইবার ইচ্ছা আছে!

কেদারনাথ ঘোষ নামক একটী বালক লাহা কোম্পানীর এই মতলব সকলের আগে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাকে প্রথম দিন চাকরী দেওয়া হইলে সে চিঠিপত্র বিলি করিতে লাগিল ; তাহার পরদিন সকাল বেলা, রামকৃষ্ণ বাবু ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ কেদার! তেতলার সিঁড়ীর নীচে আঁধার কামরাতে একটা খুব লম্বা বাক্স আছে ; সেই বাক্সটার মধ্যের জিনিশগুলো গুছিয়ে রাখগে তো।" কেদার মনে মনে চটিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া আঁধার কামরাতে গেল। ঘরটী বাস্তবিক আঁধার নয়, তবে কিছু আলো কম। কেদার গিয়া দেখে প্রকাণ্ড একটা লম্বা বাক্স, প্রায় দশ মণ বোঝা হবে, আর তার মধ্যে ভাঙ্গা প্রেক, মর্চেধরা স্ক্রু, বড় বড় গজাল, এই সব রহিয়াছে। কেদার দুই একবার নাড়িতে চাড়িতে তাহার ভিতর হইতে একটা ইঁদুরের বাচ্চা বাহির হইয়া পড়িল। "ই—মা গো! আমার কর্ম নয়"—বলিয়াই কেদার তিন লাফে সিঁড়ী পার হইয়া নীচে আফীশ-ঘরে গিয়া বসিয়া শিশ দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে! এর মধ্যেই হয়ে গেল।" কেদার বলিল "কিছু কর্‌বার নাই—সব ভাঙ্গা মর্চেধরা জিনিশ? আর ওসব করবার জন্যেতো আমায় রাখা হয়নি।" রামকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে যা ব'লব তাই ক'রবে। তা যাক্! এই চিঠিগুলো ডাকে দিয়ে এসো।"—কেদার চিঠি লইয়া ডাকে দিতে গেল। যাইতে যাইতে ভাবিল "উচিত কথায় সকলেই জব্দ ; বুড়োটাকে দুটো উচিত কথা বলেছি, আব অমনি সোজা ; হি! হি! এমন না কর্‌লে কি আর কাজ চলে?" সেইদিন বিকাল বেলা আফীশ বন্ধ করিয়া বাহির হইবার সময় রামকৃষ্ণ বাবু কেদারের মাহিনা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"কাল থেকে তুমি আর এসোনা।" কেদার অবাক্! কিছু বলিতেও পারিল না, কারণ রামকৃষ্ণ বাবু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে দোকানের দরজায় আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিল—"বালকের প্রয়োজন।"

আর একটী বালক আসিল, তাহার নাম দীননাথ দাস। সেও প্রথম দুই দিন বেশ চিঠিপত্র বিলি করিল ; তিন দিনের দিন রামকৃষ্ণ বাবু তাহাকে আঁধার ঘরে বাক্স গোছাইতে পাঠাইলেন। বালক খানিকক্ষণ বসিয়া গোটাকতক পরিষ্কার প্রেক, স্ক্রু, প্রভৃতি লইয়া নীচে আসিল এবং রামকৃষ্ণ বাবুকে বলিল—"মহাশয় এই কটা ভাল জিনিশ পাওয়া গেল—আর সব নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো কি গোছাব?"—রামকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "সেই গুলোইতো গোছাতে বলেছিলাম।" সেইদিন সন্ধ্যা বেলা দীননাথের চাকরী গেল। দীননাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার দোষ কি?" বাবু কিছুই উত্তর করিলেন না। তাইতো! পাঠক পাঠিকা হয়তো মনে করিতেছেন "এ কি রকম মজার লোক রে বাপু!" যাহা হউক, পর দিন প্রাতে রাস্তার লোক দেখিল আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে।

এইবারে আর একটী বালকের কপাল খুলিল, ইহার নাম যদুপতি ভট্টাচার্য্য। যদুপতি

আগের দুটী বালককেও চিনিত না এবং আঁধার ঘরের বাক্সের কথাও জানিত না। সে আসিয়া একদিন বেশ কাজ করিল। পরদিন প্রাতে তাহাকে আঁধার ঘরে পাঠান হইল। যদুপতি সেখানে গিয়াই জিনিশগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। যে জিনিশটা একটু পরিষ্কার করিলেই নূতনের মত হয়, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া এক এক রকম জিনিশ এক সঙ্গে রাখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কিন্তু সমস্ত জিনিশ আর পরিষ্কার হয় না, এত কাজ! নীচে থেকে বাবু ডাকিলেন—"যদু! হয়েছে?"—বালক বলিল, "আজ্ঞে, এখনও অনেক বাকী।" বাবু বলিলেন—"আচ্ছা! তবে এখন থাক্ ; খাওয়া দাওয়া ক'রে এসে আবার কর্‌বে এখন।" যদুপতি তাহাই করিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বাবু যদুপতিকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময় বালক নীচে গেল,—তাহার মাথা দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। বাবু বলিলেন—"কিহে! হ'ল?" বালক মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল "আজ্ঞে, যতদূর পারি করেছি! আর বাক্সটার সব নীচে এইটা পেয়েছি, নিন।" রামকৃষ্ণ বাবু দেখিলেন একথান মোহর ;—বলিলেন, "জঞ্জালের বাক্সই সোনা রাখবার যায়গা বটে! আচ্ছা, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে, আবার কাল এসো।" বালক চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণ বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া উপরে গেলেন। সে আঁধার ঘরে প্রায় কেহই যায় না—ঘরের মধ্যে মাকড়শার জাল, আরশুলার পাল, আর ইন্দুরের দল। মধ্যের বাক্সে পঁচিশ বছরের জঞ্জাল জমিয়া রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ বাবু গিয়া দেখিলেন, বালক বাক্সের সমস্ত জিনিশ বাহির করিয়া, টিনের পাত দিয়া বাক্সে ঘর করিয়াছে ; এবং এক এক ঘরে এক এক রকম জিনিশ রাখিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দিয়াছে—"ভাল স্ক্রু", "ছবি রাখবার গজাল", "চাবিকাটি", "ছোট প্রেক—একটু বাঁকা", "চেপ্‌টা লোহা, কি করে জানিনা", 'মর্চেধরা স্ক্রু", "বঁটির মা কি যেন" ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া আনন্দে হো! হো! করিয়া হাসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"এই ছেলেই চাই। যে এই সব সামান্য বিষয়েই এতো মনোযোগী, সে তো বড় বিষয়ে আরও মনোযোগী হবেই।"

রামকৃষ্ণ বাবুর দোকানে আর বিজ্ঞাপন ঝুলিল না। যদুপতি ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকানে চিঠি বিলি করিবার কাজে নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাকে বেশী দিন এ কাজ করিতে হয় নাই। রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব এতদিনে বোঝা গেল ; তিনি চিঠি বিলি করিবার জন্য লোক চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরকাল তাহাকে দিয়া চিঠি বিলি করাইতে চাহেন নাই। যদুপতি ভট্টাচার্য্য কালে দোকানের একজন প্রধান বাবু হইল, এবং রামকৃষ্ণ বাবু মরিয়া গেলে, দোকানের একজন কর্তা হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ বাবু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, যদুপতিকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং লোকে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "এ লোকটা কোথা থেকে এসে আপনার ভালবাসা পেয়ে ব'স্‌লো" তখন তিনি হাসিয়া উত্তর করিতেন—"আঁধার ঘরের জঞ্জালের বাক্স থেকে!"

বাস্তবিকই যে সামান্য কাজে মনোযোগী, তাকে বড় কাজে দিয়া বিশ্বাস করা যায়। আর যে সামান্য কাজ সামান্যভাবে করে, তার কপালে কি আছে, সে কথা যারা ভুগিতেছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিও।

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, ১৬১-১৬৩।

একটা কিছু

প্রমদাচরণ সেন



হুবাজারের চৌরাস্তার ধারে অনেকদিন হইল একদিন একটী বালক দাঁড়াইয়া "চাই দেশলাই, পয়সায় দুটো দেশলাই"—বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ছেলেটীর মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সে কাহাকেও ঠকাইতে জানে না। বালকটী প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া দেশলাই বিক্রী করিল এবং কাজ শেষ হইলে আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাড়ী চলিল।

কলিকাতার একটা বিশ্রী গলিতে গোষ্টবিহারীর বাড়ী। বালক বাড়ী যাইবার সময় পথ হইতে কিছু খাবার কিনিয়া লইল, এবং তাহা খুব সাবধানে কাপড়ে বাঁধিয়া, কত পয়সা লাভ হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু এ ভাবনায় ওই দেখ উহার মুখে আহ্লাদের হাসি দেখা যাইতেছে, "এই পয়সা দিয়ে একটা কিছু ক'রব"—বালক মনে মনে ইহাই ভাবিতেছে আর আপনার মনে হাসিয়া খুন হইতেছে।

পচা নর্দমার উপরে কাঠ ফেলা তাহার উপর দিয়া যাইতে ভয় করে, পাছে টিপ্ করে পড়িয়া যাই, কিন্তু বালক গোষ্ঠ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং খানিক চলিয়া একখানি ছোট খোলার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইল। তখন সে আস্তে আস্তে দরজাটী খুলিয়া সেই ভাঙ্গা ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং দেশলাই ঘষিয়া একটা আলো জ্বালিল। বালকের পায়ের শব্দ শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতে একটী বালিকা বলিয়া উঠিল "কে দাদা এলে? দেখ দাদা! আজ আমি সূয্যি একটু দেখেছি, সেই সাদাপানা দেখ্‌তে না?" বালিকার নাম লক্ষ্মীমণি, সে অন্ধ, আজ সূর্য দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার বড় আনন্দ ; কিন্তু দাদা বই তারতো আর কেউ নাই, কাহাকে এ সুখের খবর দিবে? তাই দাদা আসিবামাত্র তাঁহাকে খবর দিল। গোষ্ঠ মহা আনন্দিত হইয়া বলিল—"বটে? বটে? এই আর বেশী দিন নয়—আর ৭দিন দেশলাই বিক্রী কর্‌তে পার্‌লেই আমার সবশুদ্ধ ৪৲ টাকা হবে, তা হলেই তোমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে নতুন চোখ বসিয়ে এনে দেব।" এই কথা বলিতে বলিতে বালক ভগিনীর নিকটে ছুটিয়া গেল এবং তাহার মুখে চুমো খাইয়া বলিল, "এসো, খাবে এসো।" অন্ধ বোন, চলিতে পারে না,—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা ভাঙ্গা আসনে বসাইল এবং খানিকটা গরম দুধ ও খাবার তাহাকে খাইতে দিল। বালিকা দুধ খাইতে খাইতে বলিল "দাদা! এ যে বেশ মিষ্টি দুধ ; তুমিও খাবে?" গোষ্ঠ বলিল "দুর পাগ্লী! পুরুষ ছেলেয় আবার দুধ কি খাবে, পুরুষ ছেলেরা জল খেয়েই বড় হয়।" ইহার পর গোষ্ঠও নিজে কিছু খাইল, পরে দুইভাইবোনে পাশাপাশি শুইয়া নিদ্রা গেল।

ইহার পর আর ৭ দিন চলিয়া গেলে আট দিনের দিন প্রাতঃকালে গোষ্ঠবিহারী লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া সেই পচাগলি হইতে বড় রাস্তায় বাহির হইল। চোখের ডাক্তার ভাল কে? তিনি কোথায় থাকেন? কত টাকা দিতে হয়? এসব খবর বালক আগেই জানিয়া রাখিয়াছিল। আজ বড় রাস্তায় বাহির হইয়াই বালক এক হাতে বহু কষ্টের ধন চারিটী টাকা মুটো করিয়া এবং আর এক হাতে অনেক ভালবাসার ধন আপনার অন্ধ ভগিনীকে ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গেল।

বড় ডাক্তারের বড় কারখানা; সদর দরজার কাছে একটা ঘরে একখানা দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া ফোঁটা কাটা, পেট মোটা একটা দর্‌ওয়ান 'কাহেকা রামুয়ারে বলিয়া কি যেন পড়িতেছিল। বালক বালিকাকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়াই আমাদের দর্‌ওয়ানজী আরও চেঁচাইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। গোষ্ঠ একটু নিকটে গিয়া ডাক্তার বাবু আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। দ্বারবান বলিল—"কোন হ্যায় রে!" গোষ্ঠ আবার বলিল "ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন?" তখন দ্বারবান মহাশয় দাড়ী চুমরাইয়া, ঢেকুর তুলিয়া, বলিলেন—"তুহার লোকের জন্যে ডাংতার কাঁহা মিল্‌বে রে? টাকা চাই। ভাগ্‌ ভাগ্‌।" বেচারা লক্ষ্মীমণি বিপদ বুঝিয়া দাদার হাত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল। গোষ্ঠ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "ওগো তোমার পায়ে পড়ি; এই দেখ, বেচারী লক্ষ্মী দুটী চোখে দেখ্‌তে পায় না।" লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া দ্বারবানের একটু দয়া হইল, সে তখন বয়ের পাতা মুড়িয়া "রহো হামি দেখে" বলিয়া ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে গেল।

গোষ্ঠ এবং তাহার ভগিনীকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। খানিকক্ষণ পরেই দ্বারবান আসিয়া তাহাদিগকে একটা ঘরে লইয়া গেল, একটু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। বালক ভগিনীর সমস্ত কথা বলিয়া বলিল "বাবু! আপনি একে দুটো নতুন চোখ্‌ বসিয়ে দিন।" ডাক্তার বাবু গোষ্ঠের কেউ নাই শুনিয়া এবং কেমন করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খুব যত্ন করিয়া লক্ষ্মীর চোখ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল—বলিলেন "কোন ভয় নাই। একে সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া থাকিতে হবে। ব্যারাম কিছু শক্ত নয়, বোধ হয় এক মাসেই ভাল হবে।" গোষ্ঠ বলিল—"আমি সেখানে যেতে পাব?" ডাক্তার বাবু বলিতেছিলেন—"তাও কি হয়?" কিন্তু লক্ষ্মী যে ভাবে ভাইকে ধরিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ব, যেতে পার কিনা।" তখন গোষ্ঠ টাকাগুলি খুলিয়া ডাক্তার বাবুকে দিতে গেল, কিন্তু তিনি নিলেন না, বলিলেন "রেখে দাও, লক্ষ্মীকে ভাল ভাল খাবার, খেলনা, কি আর কিছু কিনে দিও। ভাল ছবিও দিতে পার, কিছুদিন পরে দরকার হবে।"

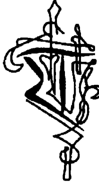
একমাস পরে একদিন গোষ্ঠ লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইল। এ লক্ষ্মী যেন সে লক্ষ্মী নয়, চমৎকার চক্ষু ফুটিয়াছে, চারিদিকে বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, গাছপালা দেখিয়া বালিকা আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিল। বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া বিকাল বেলা আকাশের সুন্দর বর্ণ দেখিয়া বালিকা বলিল—"দাদা! দেখ, দেখ, কি সুন্দর।"—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর চক্ষুতে চুমো খাইয়া বলিল—"আমার কাছে সব চাইতে এই চোখ দুটীই ভাল।"—বালক সেই যে সে দিন টাকা রোজগার করিয়া 'একটা কিছু' করিবে ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহার সেই 'একটা কিছু' করা হইল,—তাহার ভগিনীর সুন্দর চক্ষু ফুটিল। বাড়ীতে আসিয়া লক্ষ্মীমণি দেখে দাদা তাহার জন্য নানারূপ খেলনা, ভাল ভাল ছবি, কিছু ভাল খাবার এই সব জোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে!

কিন্তু একজন ভদ্রলোক এ পচা বাড়ীতে তাহাদিগকে অধিক দিন থাকিতে দিলেন না। ডাক্তার বাবু বালক বালিকাকে নিজের বাড়ীর কাছে আনাইয়া সর্বদা চোখে চোখে রাখিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর দয়ায় দুই ভাই ভগিনী সৎপথে থাকিয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৬৩-১৬৫।

হাইকোর্ট

প্রমদাচরণ সেন

দি যাহারা দোষী তাহারা শাস্তি না পায়, তাহা হইলে দেশে যে কত পাপ বাড়ে, তাহার কি শেষ আছে ? যাহাতে বলবান লোক দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে এবং দোষী লোক নির্দোষী লোককে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে বাধা দিতে না পারে, যদি তাহা দেখিবার লোক না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন দেশে মানুষ থাকিতে পারিত? এই জন্যই সকল সভ্য দেশে রাজা আছে, কর্তা আছে, আইন আছে, এবং বিচারক বা জজ আছে। তবে এক দেশে এবং আর এক দেশে তফাৎ এই যে, এক দেশে হয়ত রাজা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই আইন হয়, এবং তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হয় ; আর এক দেশে হয়ত দশে মিলিয়া নিজেদের সুবিধার জন্য একটা সভা করিয়া, সেই সভাতে যাহা



স্থির করেন তাহাই আইন হয় ; আবার কোথাও বা রাজার অধীনে তাঁহার মন্ত্রীরা বা তাঁহার প্রতিনিধিরা রাজার হুকুম লইয়া সাধারণ লোকের সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহা করেন তাহাই আইন হয়। আইন যেরূপই হউক না কেন তাহার উদ্দেশ্য সকলের মঙ্গল করা। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, যে একটা আইনে উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে; তখন বুদ্ধিমান মন্ত্রীরা বা রাজার লোকেরা সে আইন বদলাইয়া অন্য আইন করেন, কিন্তু যতদিন একটা আইন 'চলতি' থাকে, ততদিন সকলকে সে আইন মান্য করিয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে কি মানুষ এক সঙ্গে চলিতে পারে? যে যাহা খুসী করিবে, অথচ সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে, ইহা

কখনও হয় না। আইন দুষ্ট লোক, অত্যাচারী লোক প্রভৃতিকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আইন বলিতেছে এই কাজ খারাপ, যে করিবে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে, যাঁহার জিনিশ তাঁহাকেই দিতে হইবে, নির্দোষীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং অত্যাচারীকে দমন করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু আইন থাকিলে তো হয় না ; কে অন্যায় কাজ করিতেছে, কে আইন ভাঙ্গিতেছে, তাহা দেখেই বা কে? আর তাহার বিচারই বা কে করে। সকল দেশেই পুলিশ বা মাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্তা আছে, জজ বা বিচারপতি আছে। তুমি ডাকাতি করিয়াছ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, পুলিশ শুনিতে পাইয়াই তোমাকে ধরিল, ধরিয়া তোমার ডাকাতী করার কি কি প্রমাণ আছে, তাহার সহিত তোমাকে মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইল। সেখানে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া তোমাকে জজের নিকট পাঠাইলেন, এদিকে তুমি বুঝিতেছ তুমি নির্দোষী, কিন্তু জজ ওদিকে ঠিক করিয়া বসিলেন, তুমি ভয়ানক দোষী, কেবল লুঠপাট করিয়াছ, তাহা নহে, অনেক মানুষও মারিয়াছ। জজ বলিলেন "তোমাকে চিরকালের মত দেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সমুদ্রের মধ্যে একটা বুনো দ্বীপে, (আন্দামান দ্বীপে) স্ত্রী পুত্র, মা বাপ, ভাই বোন ছাড়িয়া তোমাকে কয়েদী হইয়া থাকিতে হইবে।" তুমি দেখিলে তোমার প্রতি অবিচার হইল, তুমি জজের অপেক্ষা বড় যাঁহাদের আদালত, তাঁহাদের নিকট 'আবার বিচার হউক', এই প্রার্থনা করিলে। এই সর্বাপেক্ষা বড় আদালতের নাম হাইকোর্ট।

পুনর্বার বিচার করিবার প্রার্থনাকে ইংরাজীতে আপীল (Appeal) বলে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ আদালত হাইকোর্ট। নীচে অন্যান্য আদালতে অবিচার হইয়াছে মনে হইলে লোকে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টের বিচারপতিরা প্রায়ই বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক ; তাঁহারা সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া মত দেন না। তাঁহাদের বিচারের উপরে আর কাহারও কথা চলে না, তবে ইচ্ছা করিলে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিল নামক সভা এবং আমাদের দেশের গবর্ণর জেনেরল্ অর্থাৎ বড়লাট বাহাদুর হাইকোর্টের বিচারও উল্টাইয়া দিতে পারেন।

আমরা হাইকোর্টের একটা ছবি দিলাম। হাইকোর্ট হইবার পূর্বে মুসলমানী ধরণের দুটী আদালত ছিল,—সেই দুটী মিশিয়াই বর্তমান হাইকোর্ট হইয়াছে।

হাইকোর্টে অনেকদিন হইতে একজন করিয়া বাঙ্গালী জজ আছেন। এই সকল বাঙ্গালী মহাত্মাদিগের মধ্যে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র এবং বর্তমান জজ রমেশচন্দ্র মিত্রই বিশেষ বিখ্যাত। দুজনেই সুপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং ঘোর সাহসী। মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথের গল্প শুনিয়াছি যে একবার একটা বিচারে ১২ জন জজ এক সঙ্গে বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি একলা বাঙ্গালী আর সব সাহেব। মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষ দোষী কোন্ পক্ষ নির্দোষী এই কথা লইয়া তাঁহার সহিত এগার জন সাহেব জজের মতের অমিল হয়। দ্বারকানাথ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি বুদ্ধির সহিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, যে শেষকালে সাহেবেরা তাঁহার মতে মত দিলেন। গল্পটা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না ; তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন, কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। আর আমাদের বর্তমান জজ মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও খুব সাহসী, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কোন বিষয় লইয়া গবর্ণমেন্ট হাইকোর্টের মত চান ; তাহাতে অধিকাংশ সাহেব জজ এক দিকে এবং রমেশ বাবু একলা অন্য দিকে মত দিলেন।

হাইকোর্টের জজ দুই প্রকার ; এক যাঁহারা বিলাতে মাজিষ্ট্রেটী (Civil Service) পরীক্ষায় পাশ হইয়া আসিয়া পরে জজ হন ; আর বারিষ্টার অর্থাৎ কৌন্সলী বা উকীলদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া যাঁহাদিগকে জজিয়তি দেওয়া হয়। আমাদের রমেশবাবু উকীল জজ। মাজিষ্ট্রেটী বা সিবিল জজ এবং বারিষ্টার বা কৌন্সলী জজ বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ নাই। তবে এর পরে কেহ কেহ হইতে পারেন।

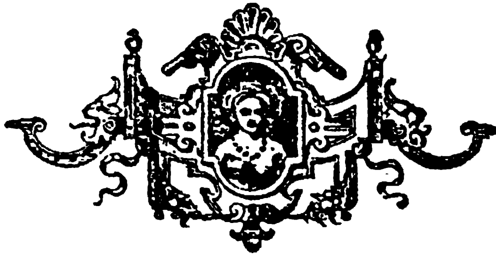
সম্প্রতি শুনিতেছি, হাইকোর্টে আরও কয়েকজন নূতন জজ হইবেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালী থাকিবেন কিনা বলিতে পারি না।

হাইকোর্টের জজ হওয়া খুব গৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এ গৌরব কি কেবল টাকাতে হয়? কখনই না। দেশের কত হাজার হাজার লোক ন্যায় বিচার পাইবে বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে, নির্দোষীকে মুক্তি দিতে হইবে এবং দোষীকে শাস্তি দিয়া দেশের মধ্য হইতে পাপের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হইবে,—আমার দ্বারা এই কার্যের সাহায্য হইবে, ইহাতেই আমার জজিয়তির গৌরব, নতুবা আর কিসে?

শেষকালে একটা কথা বলি। আমরা হাইকোর্টের সিংহাসনে জজ হইয়া বসি আর নাই বসি, আমরা সকলেই যে বিচারক এবং সকলেই যে বিচারিত হইতেছি, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে। যেমন আমরা দোষ করিলে বাপ মা শাস্তি দেন বা দাদা বিচার করেন, তেমনি পুঁটী বা ভোঁদা বা কেবলা বা অন্য কোন ছোট ভাই বোন দোষ করিলে আমরাই বিচার করি। তখন যেন মনে থাকে যে যার যতটুকু দোষ তার ততটুকু শাস্তি হওয়া উচিত, নির্দোষী যেন শাস্তি না পায় এবং অল্পদোষে যেন বেশী শাস্তি না হয়। মনে রাখিও, একজন বড়লোক বলিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও"

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৬৫-১৬৮।



বোকা রামমোহন

প্রমদাচরণ সেন



মরা এক বৎসর পূর্বে (গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসের সখায়) হাবা গঙ্গারামের কথা লিখিয়াছি। তখনই বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে লোকে যারা বোকা তাহাদিগকে 'বোকা রামমোহন' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকে। আমরা অনেক কষ্টে এই বোকা রামমোহনের কতকগুলি গল্প জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব।

বোকা রামমোহন বাঁকুড়া জেলার এক ভট্টাচার্যের ছেলে। রামমোহনের বড় ভাইয়ের নাম হরিমোহন। তিনি বেশ্ লেখাপড়া জানেন। যেখানে তাঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে ১০ ক্রোশ দূরে এক রাজার বাড়ীতে হরিমোহন সভা পণ্ডিত। তিনি ছয় মাস নয় মাসে এক আধবার বাড়ীতে আসিতেন। ছোট ভাই রামমোহনই বাড়ীর কর্তা। বাড়ীতে একটী বিধবা ভগ্নী আর একটী চাকর, হরিমোহনের স্ত্রী ও গোপাল নামে একটী ছেলে। তাহারা কখনও ওখানে কখনও হরিমোহনের শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন। একবার গোপালের মামার বাড়ী হইতে খবর আসিল গোপালের মার বড় ব্যারাম। রামমোহন খবর পাইয়া বলিলেন—"এইখানে আসতে বলগে যাও।" যে খবর আনিয়াছিল সে বলিল " বিছানা ছেড়ে চলতে পারেন না, কেমন করে আসবেন?" রামমোহন উত্তর করিলেন "তা বিছানা ছেড়ে আসতে কে বলেছে বিছানা শুদ্ধই আসুন না।"—পাশে বিধবা ভগ্নী দাঁড়াইয়া ছিলেন তিনি বলিলেন—"বলিস কি আহাম্মকের মত? আজই খেয়ে দেয়ে দাদার কাছে খবর নিয়ে যা। তিনি যা বলেন তাই করতে হবে।" রামমোহন কিছু থত মত খাইয়া বলিল "আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি কিন্তু তোমাদের বাপু! যেন কেমন বুদ্ধি! বিয়ে না, শ্রাদ্ধ না নেমন্তনের বিদায় না, খপ্ করে খবর দিতে গিয়ে হাজির হব, দেখে শুনে দাদা কি বলবে?" এই বলিয়া রামমোহন যাইবার আয়োজন করিতে পাড়ায় গেলেন।

পাড়ার কেশব ভাণ্ডারী অনেক যায়গায় ঘুরিয়াছে এবং অনেক রকম খবর রাখে। আমাদের রামমোহন এই কেশব ভাণ্ডারীর কাছে পরামর্শের জন্য আসিলেন এবং বলিলেন "ভাণ্ডারী দাদা একবার দাদার কাছে যেতে হবে ; কেমন করে যাওয়া যাবে বলতো।"—ভাণ্ডারী বলিলেন "এই খাওয়া দাওয়া ক'রে হেঁটে গেলে, তুমি যেরকম চল, তাতে রাত দেড় প্রহরের সময় যেতে পারবে। আর যদি ঘোড়ায় যাও তা'হলে একপ্রহর বেলা থাকতে যেতে পার। এখন যেটা তোমার সুবিধা।" রামমোহন বলিলেন—"তবে ঘোড়াতেই যাব।" গাঁয়ের এককোণে ফকীরে হাড়ির বাড়ী ও তাহার ভাল একটা ঘোড়া আছে, শুনিয়া রামমোহন তাহার নিকট গেলেন। ফকীর যখন শুনিল রামমোহন তাহার ঘোড়ার জন্য আসিয়াছেন, তখন সে তাড়াতাড়ি সুন্দর ঘোড়াটী সাজাইয়া রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী পর্যন্ত রাখিয়া গেল।

রামমোহনের বিশ্বাস ছিল, সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে পারে! রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া, হাতে ছড়ি লইয়া লাফাইয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল। ঘোড়াও আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। ফকীরে হাড়ি খানিকদূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ সে সঙ্গে ছিল

ততক্ষণ ঘোড়াটী চলিয়াছিল। কিন্তু আর চলে না। কি রকম লোক পিঠে চাপিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘোড়া পেছনে হটিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে একটু চলিতে লাগিল। রামমোহন ভাবিলেন "স্রোতের উল্টাদিকে নৌকা পড়িলে যেমন গুণ টানিয়া নৌকা চালাইতে হয় ঘোড়ারও বুঝি সেইরকম করিতে হয়। এই ভাবিয়া রামমোহন ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটাকে এবং নিজের 'জালার' মত শরীর এই দুটোকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। ঘোড়া দেখিল মজা মন্দ নয় ; সেও সুবিধা বুঝিয়া যখনই রামমোহন পিঠে চাপিতে যায় তখনই দুষ্টামি করিয়া পেছনে হাটিতে থাকে। বেচারা রামমোহন কি করেন, কাজেই গুণটানা গোছ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় দাদার বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাহার পরদিন রামমোহন বাড়ী ফিরিলেন ; আসিবার সময় ঘোড়াটা বেশ চলিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া দিয়াই রাম ভাণ্ডারী দাদার কাছে গেলেন এবং চোখ লাল করিয়া বলিলেন—"তোমাকে বুদ্ধিমান বলে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছিলাম ; তা বেশ্ পরামর্শই তুমি দিয়েছিলে। ঘোড়ায় গেলে কখনই হেঁটে যাবার আগে যাওয়া যা না আবার মধ্যে থেকে গুণ টেনে প্রাণ যায়। কেশব ভাণ্ডারী সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল "ঘোড়ার পিঠে মানুষই চড়ে তাই জানতাম ; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে গরু চাপিলে ঘোড়া চলিবে কেন?"

গোপালের মার ব্যারাম সারিয়া গেল। কিন্তু তিনি অনেক দিন বাপের বাড়ীতে আছেন। একবার খবর লওয়া প্রয়োজন এই মনে করিয়া রামমোহনের ভগ্নী একদিন রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ অনেক দিন হইল গোপালদের খবর পাই না। তুমি এক কাজ কর, তারা কে কেমন আছে খবর জেনে এসো। এই দুটী টাকা নেও, পথ থেকে তাদের জন্যে যা হয় কিছু কিনে নিয়ে যেও।" রামমোহন টাকা দুটী চাদরে বাঁধিয়া ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে চলিলেন। যাবার সময় ভগ্নী বলিয়া দিলেন "দেখ, তুমিতো যে বোকা, ভদ্রলোকদের বাড়ীতে যাচ্ছ, বেশী কথা ব'লে ফ্যাচ ফ্যাচ করে বকনা ; তারা যেটী জিজ্ঞাসা করিবে তুমি সেইটীরই উত্তর দিও ; অনেক কথা ব'লনা—মাথা হেঁট করে থাকবে ; তারা পাঁচটা কথা বলিলে তুমি একটা বলিবে, বুঝিলে?" রামমোহন একে পুরুষ মানুষ তাতে নিজের খুব বুদ্ধি আছে এই তাঁহার বিশ্বাস—কাজেই একজন মেয়ে মানুষ মুখ নেড়ে বোকা বলে উপদেশ দেয় ইহা তাঁহার বড়ই কষ্টের কারণ হইল। তিনি ভগিনীর কথায় বলিলেন—"বুঝেছিগো বুঝেছি এমনিই বোকা পেয়েছ সব ঠিক ক'রে আসব।"

এই বলিয়া রামমোহন বাড়ীর বাহির হইলেন। পথে গিয়া মনে হইল গোপালের জন্য 'যা হয় কিছু' কিনে নিয়ে যেতে দিদি বলিয়া দিয়াছেন। তাই, একটা বাজারের কাছে গিয়া রামমোহন এক দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো তোমাদের এখানে 'যা হয় কিছু' পাওয়া যায়? দোকানদার একজন নাপিত, ভয়ানক দুষ্ট লোক, সে বলিল "পাবেন কিন্তু সে দামী জিনিষ দোকানে রাখি না বাড়ীতে আছে। দুটাকা ক'রে পড়বে। আপনার কতটুকু চাই।" রামমোহন বলিলেন "এক সের"। নাপিত বলিল—"একটু বসুন, আমার বাড়ী কাছে, ওই দেখা যায় ; এখনি নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া নাপিত মনে মনে হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে গেল এবং কতকগুলো চুল এবং নখ একসঙ্গে একটা হাড়িতে পুরিয়া তাহার মুখে ভাল ক'রে ন্যাকড়া জড়াইয়া দিল। পরে সেই হাঁড়িটা হাতে করিয়া দোকানে আসিয়া রামমোহনকে দিল। রামমোহন বলিলেন—"ঠিক ওজনে দিয়েছ তো?" নাপিত বলিল "ও আর দেখতে হবেনা।

বাড়ীতে গিয়ে মেপে নেবেন।" রামমোহন এই কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নাপিতকে দুটী টাকা দিয়া চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে রামমোহন দাদার শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং পৌঁছিয়াই হাঁড়িটা বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গোপালের মা হাঁড়ি খুলিয়াই অবাক, বুঝিলেন "ঠাকুরপো তামাসা করিয়াছেন।" কিন্তু এদিকে যে ঠাকুরপোকে নাপিতের পো তামাসা করিয়াছে তাহাতো আর তিনি জানেন না। রামমোহন বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটা স্ত্রীলোক ভিতরবাড়ী হইতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথে আসতে" কোন কষ্ট হয়নি তো? গোপালের বাপ কেমন আছেন?—রামমোহন ভগিনীর কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলেন "পাঁচটা কথা বলিলে তবে একটা কথা বলিতে হয় ;" মোটে একটা কথা বলা হইয়াছে, এর মধ্যে কথা বলিলে এরা বোকা মনে করিবেন। কাজেই রামমোহন চুপ করিয়া মনে মনে কটা কথা হয় তাহাই গুণিতে লাগিলেন—"এই এক।" স্ত্রীলোকটী আবার বলিলেন "কথা কওনা যে গোপালের বাপের কোন অসুখ হয়নিতো।" রামমোহন এবারেও চুপ মনে মনে গুণিলেন "এই দুই।" স্ত্রীলোকটী কিছু ভয় পাইয়া মনে মনে বলিলেন "ওমা! একিগো! তবে কি কিছু ভালমন্দ হ'ল নাকি?" রামমোহন মাথা হেঁট করিয়া গুণিলেন "এই তিন" ; তখন মেয়ে মহলে ভয়ানক কান্নার ধূম পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক আসিয়া যুটিল। রামমোহন দেখিলেন পাঁচটার অনেক বেশী কথা চলিতেছে, তখন তিনি মুখ খুলিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কান্না কেন?" তিনি বলিলেন "বলেন কি মশাই? গোপালের মা বিধবা হ'ল,—ওর চাইতে কি আর কিছু কষ্ট আছে?" রামমোহন বুঝিলেন গোপালের মার বড় একটা বিপদ ঘটিয়াছে বড় দুঃখ হইল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন, আসিয়াই দিদিকে দেখিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রামমোহন বলিয়া উঠিলেন—"দিদি সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়েছে! গোপালের মা বিধবা হয়েছে।" দিদি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "রক্ষা কর! আরে আহাম্মক! তাও কি কখনও হয়?" রামমোহন তখন চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস না হয়, নাই মানলে কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম গোপালের মা বিধবা হয়েছে বলে বাড়ীর সকলে কাঁদছে!" ভগিনী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ও অলুক্ষণে কথা আর বলিসনে। দাদা বেঁচে আছেন গোপালের মা কি ক'রে বিধবা হবে?" রামমোহন কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন, "দাদা বেঁচে আছেন তাতেই কি একজন মেয়েমানুষ বিধবা হবে না? ভাল দাদাতো বেঁচে আছেন, তা হলে তুমি বিধবা হ'লে কেন?"—তখন তাহার ভগিনী তাহাকে বিলক্ষণ তাড়া দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং একখানা পত্র লিখিয়া কেশব ভাণ্ডারীকে দিয়া তখনই গোপালের মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই অবধি রামমোহনের নাম 'বোকা রামমোহন' হইয়া গেল এবং সেই অবধি লোকে নির্বোধকে গালাগালি দিতে গিয়া 'বোকা রামমোহনের' নাম করিতে লাগিল।

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৮০-১৮২।

দুষ্ট বাঘ

উপেন্দ্রকিশোর রায়



কটা বাঘ রাজবাড়ীর সিংহ দরজার সম্মুখে একটা খোঁয়াড়ে বদ্ধ ছিল। রাজারবাড়ীতে কত লোক যায়, বাঘ সকলকেই হাত জোড় করিয়া বলে "দোহাই দাদা! তুমি বড় ভাল লোক ; তোমাকে আমি বড় ভালবাসি ; আমাকে বাহির করিয়া দাও।" কেহই কিন্তু দরজা খুলিয়া দেয় না। অবশেষে এক ফলারে বামন রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল, তাহাকেও ঐ কথাগুলি বলিল। ঠাকুর বলিল "তুমি বাঘের জাত, তোমাকে কি বিশ্বাস করিতে আছে? আমি দরজাটী খুলিলেই তুমি আমাকে ফলার করিয়া বসিবে।" বাঘ বলিল "না ভাই তোমাকে কি ফলার করিতে আছে। তুমি কত ভাল লোক। রাজার বাড়ীতে নিরামিষ খাইয়া খাইয়া আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি আমি আর এখন মাংস খাই না। দোহাই ঠাকুর মশাই! তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব দরজাটা খুলিয়া দাও।"

ইহা শুনিয়া ঠাকুর একবার বিশ্বাস করিল, একবার অবিশ্বাস করিল, তারপর দরজা খুলিয়া দিল। বাঘ বাহির হইয়াই বলিল "ঠাকুর তোমাকে খাইব।" শুনিয়াই তো ঠাকুরের প্লীহা কাঁপিয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ঠাকুর বলিল "আচ্ছা ভাই! আমার তিনজন সাক্ষী আছে তারা যদি বলে তবে খাইও।" বাঘ স্বীকৃত হইল, দুজনে কতদূর গেলে পর ঠাকুর একটা বটগাছ দেখাইয়া বলিল "এই আমার একজন সাক্ষী।" এই কথা বলিয়া বটগাছকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাইরে, উপকারীর অনিষ্ট কি কেউ করে।" বটগাছ বলিল "করে বইকি? সকলেই করে। এই দেখ আমার ছায়ায় কত পরিশ্রান্ত পথিক লোক বসিয়া ঠাণ্ডা হয়। আবার তাহারাই যাইবার সময় আমার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়।" বাঘ বলিল "কি ঠাকুর?" ঠাকুর একটু বিপদে পড়িল। আর দুজন সাক্ষীও যদি ঐরূপ বলে তাহা হইলেই ত গেল।

আর কতদূর যাইয়া একটা ক্ষেতের আলকে জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি ভাই, উপকারীর অনিষ্ট কে করে?" আল উত্তর করিল "সকলেই করে। দুই চাষার ক্ষেতের মধ্যে আমি থাকি। বাড়ী ঘর কিছুই নাই। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর রৌদ্রে শুকাইয়া তাহাদের একজনার ক্ষেত আর একজন যাহাতে না লইয়া যাইতে পারে তাহাই করি। তবু হতভাগাদের কেমন বুদ্ধি দু-পাশে দুই বেটা লাঙ্গল দিয়া আমার গা কাটিয়া নিজের ক্ষেত বাড়াইতে চায়। তুমি ঠাকুর কেমন বোকা। কোন দিন কি কাহারও উপকার করিয়া ঠক নাই।" বাঘ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর মশাই কেমন বুঝ?" ঠাকুর কি করে ; সে চুপ করিয়া থাকিল।

আর কতক দূর যাইয়া এক শেয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শেয়াল বাঘের গন্ধ পাইয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াছে। বামণ অনেক ডাকাতে সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল "কাছে আসিয়া কাজ নাই। যাহা বলিতে হয় ঐখান হইতেই বল।" ঠাকুর তাহার অবস্থা সমুদায় খুলিয়া বলিল। শেয়াল মনোযোগ দিয়া শুনিয়া একটু মাথা নাড়িয়া বলিল "বড় বোকার কর্ম করিয়াছ ঠাকুর ! তোমার মোকদ্দমাও বড় কঠিন ; বোধ হয় মামারই (বাঘ শেয়ালের মামা একথা সকলেই জানে) জিৎ হইবে। কিন্তু না দেখিয়া শুনিয়া আমি কোন রকম মতই দিতে

পারিব না। এই মোকদ্দমার সুবিচার করিতে হইলে, ইনি কোথায় কিরূপ ভাবে বদ্ধ ছিলেন, আর তুমিই বা কিরূপে দরজা খুলিলে সমস্ত স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক। সুতরাং আমার মত, ঐ স্থানে পুনরায় যাইয়া মামাকে পুনরায় খোঁয়াড়ে যাইতে দেখিয়া সব মীমাংসা করা হউক।"

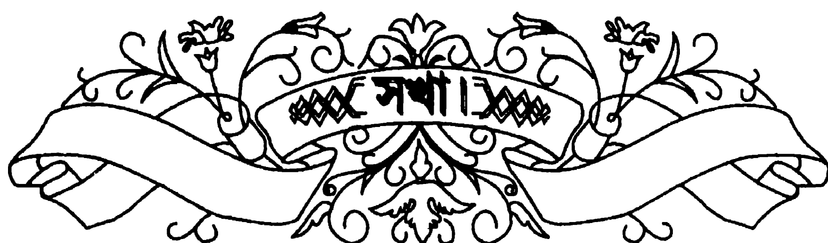
এই পরামর্শ স্থির হইলে পর তাহারা তিনজনে সেই খোঁয়াড়ের কাছে আসিল। বাঘ খোঁয়াড়ের ভিতর গেল। শিয়াল স্বহস্তে খিল আঁটিয়া দিল। তারপর ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে যাইয়া দৈ চিড়ে খাইতে উপদেশ দিয়া যোড় হাতে মামাকে বলিল "মামা সেলাম।"

এই গল্পটি হইতে আমরা এক উপদেশ পাই যে দুষ্ট লোকের উপকার করিলেও তাহার নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাইব এরূপ আশা করা যায় না। খারাপ লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করিও না।

আজ বাঘের সম্বন্ধে একটী মিথ্যা গল্প বলিয়া তোমাদিগকে একটু আমোদ দিতে চেষ্টা করিলাম, সম্পাদক মহাশয় অনুমতি করিলে এবং সময় হইলে ভবিষ্যতে আর একদিন সত্য গল্প বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৮৮-১৯০।





কবিতা, ধাঁধাঁ ও অন্যান্য



বাগানেতে খেলা

শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী

১

বাগানে ফুটেছে ফুল—
কত বরণের আহা!
কি সুন্দর সাজিয়াছে,
বলিতে না পারি তাহা ;

২

কেউ সাদা ধপ-ধপে,
কেউ রাঙ্গা টুক টুক,
কেউবা শতেক রং
কারোবা সোণার মুখ।

৩

ধীরে ধীরে বহে বায়ু,
ধীরে মেঘ খেলিতেছে,
গাছের আড়ালে হোথা
চাঁদ উঁকি মারিতেছে।

৪

বালক বালিকা দুটি।
খেলিছে মনের সুখে,
করিতেছে ছুটাছুটী,
হাসিটী না ধরে মুখে।

৫

"আয় হেথা আয় বোন,
দেখ হেথা দেখ চেয়ে
বকুলের ফুলে আহা!
তলাটী ফেলেছে ছেয়ে।"

৬

"আমি দাদা এক ছড়া
গাঁথি ভাই তবে মালা ;
তোমারে পরায়ে দিয়ে
আবার করিব খেলা।"

৭

"ওই দিক পানে চেয়ে,
একবার দেখ বোন!
গোলাপ একটী ফুটি
রূপে আলো করি বন।"

৮

"আহা কি সুন্দর ফুল,
দাওনা আমারে পাড়ি?
মাকে গিয়ে দিব আমি,
যখন যাইব বাড়ী।"

৯

মেঘ সনে চাঁদ হোথা
খেলিতেছে লুকোচুরী ;
বালিকা, খেলিতে সাধ,
ডাকিল আদর করি—

১০

"এস চাঁদ, মেঘ সনে
শুধু লুকোচুরী খেল,
খেলিবে মোদের সাথে
কত খেলা আরও ভাল?"

১১

"মিছে ডেকে কাজ নাই
আসিবে না, বোন! শশী ;
রাখিবারে কথা তোর
(ওই) তারাটী পড়িল খসি!"

•

২ : ২ : ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ৩০।

কওনা কথা, কাকাতুয়া!

শ্রী নিঃ শিলং



কওনা কথা কাকাতুয়া! চাওনা একটীবার!
অমন তর ঘাড়্টি গুঁজে, চুপটি করে চক্ষু বুজে,
আজ কেন রয়েছ যাদু! মুখটি করে ভার!
আস্‌লে আমি তোমার কাছে, রঙ্গ কর নেচে নেচে
কত খেলা খেল তুমি,—আজ কেন বিরসে
মন্‌টি-মরা হয়ে আছ একটী পাশে বসে!
বল বল কি হয়েছে, কে তোমারে কি বলেছে,
তাইতে এমন অভিমানে হচ্চো জ্বলে খুন্?
তোল পাখী ঘাড়টি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল
বুকটি কেমন করে তোমার মুখ্‌টি দেখে চুণ!
মায়ের কাছে পড়া নিতে, তোমায় যাদু খাবার দিতে
একটুখানি তিলের তরে হয়ে গেছে বেলা,
তাইতে কিরে এমন করে, বসে আছ রাগের ভরে,
মুখটি বুজে চুপটি করে ভুলে সাধের খেলা?
ছি ছি ছি ছি লজ্জা বড়, দুষ্ট ছেলে এমন তর
একটু খানি ছুতোয়-নাতায় মুখটি করে ভার!
সেই কারণে সবাই মিলে নিন্দা করে তার!
এই দেখ ধন! বাটি ভরে, খাবার নিয়ে তোমার তরে
মুখটি পানে চেয়ে আছি দাঁড়িয়ে কত বেলা ;
ছোট খাট ঠোঁট্‌টি দিয়ে, খাওনা যাদু নিয়ে নিয়ে,
আর কেন দুখ দাওরে মনে, কথায় করে হেলা?
তোল যাদু মুখটি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল,
রাগ করোনা রাগ করোনা একটী কথা কও
যাদু একটী কথা কও!
ছোট খাট ঠোঁট্‌টি দিয়ে খাবার তুলে লও!

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৫৯।

বালকের মন (প্রাপ্ত)

(ঠাকুরমার মৃত্যু দেখিয়া মাতার প্রতি বালকের উক্তি)

বিপিনবিহারী সেন

১

"কেনমা! ঠাকুমা আজি উঠানে শুইয়া?
কেনবা রেখেছ ওঁরে কাপড়ে ঢাকিয়া?
হাত পা নড়েনা কেন, শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড যেন,
পড়িয়া আছেন হায়! কেহ নাহি ধরে—
কেন সবে ধরাধরি আনেনাকো ঘরে?

২

"ওকি মা! চোখের পাতা পড়ে না যে আর—
বহেনা নিশ্বাস কেন বল দেখি তাঁর?
যাওনা মা ত্বরা করি, লয়ে এস হাত ধরি
জ্বরে বুঝি অচেতন হয়েছেন হায়—
যাও না মা! যাও যাও! ধরি তব পায়।

৩

"একি মা! কাঁদিছ তুমি কাহার লাগিয়া!—
চোখের জলেতে বুক যেতেছে ভাসিয়া।
লওমা আমারে কোলে, দুঃখ তব যাবে চলে;
ঠাকুমা উঠিবে নিজে জ্বর গেলে পরে
হবেনা তোমার তাঁকে ধরে নিতে ঘরে।"

৪

চুম্বিলা জননী তায় তুলিয়া আদরে
দুখের মাঝারে সুখ উদিল অন্তরে—
বলিলেন "বাপধন! নন উনি অচেতন ;
পরাণ উড়িয়া গেছে, আঁধার করিয়া
কে আর নাচাবে তোরে আদরে ধরিয়া?"

৫

"কেনমা অমন কথা বলিছ, আমারে?
এই যে দাঁড়ায়ে আছি ঠাকুমার ধারে,—
আছে কি প্রাণের পাখা? তাহলে যেত যে দেখা;
ধরিতাম জোরে তারে দুই হাত দিয়া,
দিতাম বক্ষেতে তাঁর আবার ভরিয়া।"
হায়রে! অবোধ শিশু! ঠাকুমা তোমার—
গেছে চলি ; মিছে সাধ। আসিবে না আর।

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৭২।

ধাঁধা

১। তিনটী জেলের মেয়ে কচ্ছপের ডিম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেল ; একজন ৫০, দ্বিতীয় জন ৩০ এবং তৃতীয় জন মোটে ১০টি লইয়া গেল। প্রথমে ডিমের যে দর ছিল, তাহার পর তাহা অপেক্ষা অনেক চড়িয়া গেল। সকলেই এক দরে বিক্রয় করিল, যখন বাজার নরম ছিল, তখন নরম দরে এবং যখন চড়া হইল, তখন চড়া দরে, এইরূপে দুই দরে তাহাদের সমস্ত বিক্রয় হইল।—ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা দেখে সকলের সমান পয়সা হইয়াছে। কেমন করিয়া হইল বল দেখি?

২। দুটী অক্ষরে আমার নাম, শুনিলে মনে হয় আমাকে দেখা যায় না, অথচ দিনরাত খোলা থাকি, আমি একটী সহর। আমার ঘরে অনেক মুসলমান বাস করে, আমার স্কুল কালেজে অনেক ছেলে মানুষ হল। বলত আমি কে?

৩। বলত কোন পশুর গলা কাটিয়া একটু না দিলেই, দিব্যি একটী বাচ্ছা হয়?
৪। একটী ছোট গোয়ালের মধ্যে দুটী গরু বাঁধা, একটী পূর্ব দিকে আর একটী পশ্চিম দিকে। ছোট ঘর, ঘুরাইয়া বাঁধিবার যো নাই। এখন বল দেখি কোন্ যায়গায় খড় রাখিলে দুটো গরুতেই খেতে পাবে?

২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১৪-১৫।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। প্রথম দর ৭টা করে পয়সায়, দ্বিতীয় দর তিন পয়সায় প্রত্যেকটা। প্রথম বারে প্রথম দরে প্রথম বালিকা ৪৯টা, দ্বিতীয় বালিকা ২৮টা, তৃতীয় বালিকা ৭টা। বাকী গুলি দ্বিতীয় বারে দ্বিতীয় দরে বিক্রীত হইল। প্রত্যেকের দশ পয়সা করিয়া লাভ হইল। ২। ঢাকা। ৩। ছাগল। ৪। গরু দুটী মুখোমুখি বাঁধা আছে গোলমাল কি?
[হাসাড়া স্কুলের হরিচরণ সেন প্রথমটীর অন্যরূপ উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরও ঠিক হইয়াছে।]

নূতন।

১। ১২৬ কে এমন চারভাগ কর, যে প্রথম ভাগে ২ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ২ বাদ দিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে, চতুর্থভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যোগফল, বিয়োগ ফল, গুণফল, ও ভাগ ফল চারিটীই সমান হবে।
২। সে কোন্ ব্যবসায়, যার সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষগুলিকেও লোকে পায়ের তলে মাড়ায়?
৩। এক গাছের ডালে ৭টা পাখী বসেছিল। একজন দুষ্ট ছেলে ঢেলা ছুঁড়িয়া দুটী পাখীকে মারিয়া ফেলিল। ডালে আর কটা পাখী রহিল?
৪। যাহার অৰ্দ্ধেকের চতুর্থাংশ পাঁচ টাকা, তাহার পঞ্চমাংশের চতুর্গুণ যত, তাহার ৫ গুণ কত মোহর? (১৬ টাকায় এক মোহর হয়।)

২ : ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ৩১-৩২।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ২৬, ৩০, ১৪, ৫৬। ২। যুতোর ব্যবসায়। ৩। একটীও রহিল না, সবগুলি ভয়ে উড়িয়া গেল। ৪। ১০ মোহর।

নূতন।

১। কোন্ জিনিষ এত হাল্কি যে কথা কহিলেই ভাঙ্গিয়া যায়?
২। সে কোন্ পুস্তক যাহা চিরকালই নূতন?
৩। হিন্দুর ছেলে ব্যারাম হয়ে পড়েছে; ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গরুটী খাবে?" ইহা লইয়া ভয়ানক গোল বাধিয়া গেল। রোগী বলিল "আমাকে গরু খাইতে বলিয়াছে।" পাশের একজন লোক বলিল, "না না! তোমাকে গরু বলিয়াছে এবং 'টী' অর্থাৎ চা খাবে, কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে।" ডাক্তার বলিলেন, "আমি যা বলিয়াছি, তাতে দুই

বুঝা যায়, কিন্তু আমি দুয়ের একটীও বলি নাই; তোমাদের শোনবার বা বোঝবার ভুল।" বলতো কেমন করে ভুল হ'ল।

৪। সে কোন্ খাবার যা খেলে পেটও ভরে না, পয়সাও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে লোকেও নিন্দা করে?

৫। ভাল করে রাখ মোরে, আমি সবই হই,
আঁচড় দিলে মোর পিঠে আমি কেহ নই।

৬। দুইটী অক্ষর মোর—প্রথম থাকে সঙ্গে,
দ্বিতীয় বলিলে শিশু ধেয়ে যায় রঙ্গে;
সবে ভাল বাসে মোরে, বল দেখি সখা,
কে আমি?—না জান যদি তুমি বড় বোকা।

২ : ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৪৭-৪৮।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। নিস্তব্ধতা। ২। নূতন পঞ্জিকা। ৩। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "ওগো, রুটী খাবে?" ৪। নেশার জিনিষ। ৫। আয়না। ৬। সখা।

নূতন

১। আমার আশায়, পথ পানে চেয়ে শত শত নরনারী; দুখের দিবস, ভাবিছে সকলে, দিব আমি দূর করি। হায়রে কপাল! যবে আমি আসি, আশার মুখেতে ছাই; আগের যা ছিল, তাহাই রাখিয়ে, হেসে হেসে চলে যাই। যা আছে করিতে, আজিকেই কর—থেকনা আমার আশে। আমি বড় চোর, আয়ু চুরি করি—বাঁধি অলসের ফাঁসে।

২। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কত ছেলে মেয়েকে পড়াইতে হয়?" আমি বলিলাম, "এই দেখ না কেন? $^১/_২$ অঙ্ক পড়ে। $^১/_৪$ বিজ্ঞান পড়ে; $^১/_৭$ চুপ করে থাকে, কিছুই করে না; এ ছাড়া আমার তিনটী মেয়েকেও পড়াইতে হয়। এ থেকে তুমি বুঝে দেখ আমার কত ছাত্র-ও ছাত্রী"?

৩। ভয়েতে প্রথম তার নাহি রয় বনে;
গহনে দ্বিতীয়ে হেরি, গজগণ সুনে;
তৃতীয় বাগান মাঝে বাহারেতে রয়;
চতুর্থ নদীর ধারে ভ্রমে সুখময়;
বল সখা! সেই জন কোন মহাজন—
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের সেই সে কারণ?

২ : ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ. ৬৩-৬৪।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। কল্য। ২। ২৮ জন। ৩। ভগবান।

নূতন

১। নিম্নলিখিত কথাগুলিতে যে যে স্থানের নাম লুকাইয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করতো :—

(ক) তোমার কায মুনাসেফ হইলে টাকা দিব ; আগে দিব না।

(খ) এক জন চাষা গান করিতেছিল—"গেঁটে কল্‌কে, তামাক খর্‌সান ; খেতে খেতে যায় গো পরাণ।"

(গ) একটা জমীদারী নিলাম হইতেছিল ; এক সাহেব কিনিল। দুর্গাচরণ লাহা এবং সাগর দত্ত কিনিতে গিয়া হারিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া পাশের একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এ লাহা বা দত্তের কর্ম নয় ; এর নাম সাহেব!"

(ঘ) আমি আর দাঁড়াতে পারি না, হিঃ হি! মা, চলতো চল ; না হয় আমি তোমায় ফেলে বাড়ী যাই।

২। আমার প্রথম খণ্ড দেবতাদের রাজা দ্বিতীয় খণ্ড চওড়া ; এক সঙ্গে একটী সেকেলে রাজ্য, যেখানে দ্বাপর যুগে ভয়ানক—যাক্ আর বল'ব না! বলতো কি?

৩। "কেরেও পাখীর বাছা! ডালেতে আমার। দেও পরিচয়।"
শুনি পাখি ডেকে বলে—"জাননা আমায়?
তবে শোন, মহাশয়!
প্রথম আমার সদা কোলে বসি রয়
যেন, আদুরে গোপাল!
দ্বিতীয় খাইতে সাধ কারো নাহি হয়
শুধু, বোকার কপাল!
গুরু হাতে তার পিঠে পড়ে যেন তাল।"

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৮০।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর

১। যমুনা, কল্‌কেতা (কলিকাতা), এলাহাবাদ, হিমাচল। ২। ইন্দ্রপ্রস্থ। ৩। কো-কিল।

নূতন

১। আমার উপরের অঙ্গটা খেলে মানুষ মরে যায় ; নীচের অঙ্গটা ভয়ানক শক্ত। কিন্তু এক সঙ্গে করলে সমস্ত আমি এক চমৎকার বিলাতী খাবার হই। বলতো আমি কে?

২। একটী ছেলে কি একটা মশলা হাতে করে যাচ্ছিল। পথে কি একটা পোকা তাতে ব'সে হুল ফুটিয়ে দিলে। ছেলে চেপে ধরাতে সেই প্রাণীটার শরীরের তিন ভাগের এক ভাগ মাটীতে পড়ে গেল, আর দুভাগ ছিঁড়ে মশলায় লেগে রহিল। ওমা, ছেলেটী চেয়ে দেখে একটী চমৎকার ফুল গাছ হয়েছে! কেমন করে বলতো!

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯৬।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। বিষ্কুট। ২। লবঙ্গ + (বো) লতা = লবঙ্গলতা

নূতন

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে যে যে পাখীর নাম লুকাইয়া আছে তাহা বাহির কর—

(ক) অভিমন্যু রণসাজে মাগিছে বিদায়—
দেখিয়া উত্তরা বালা করে হায় হায়!
কেঁদে বলে "রণে যদি যাবে বীরবর!
মোর গতি কি হইবে, কত অতঃপর।"

(খ) গতি নাই, দীন হীন, পড়িলাম পায়।
রাখ যদি, বাঁচি তবে ; নহে প্রাণ যায়।

২। একজন গোপালক খাল ছেড়ে বনের পাশে গেল, অমনি সে একটা রাক্ষস হয়ে গেল; বলতো কেমন ক'রে?

৩। আমার নাম শুনিলে ভয় হয়, অথচ আমি ধার্মিক বলিয়া অমর হইয়াছি ; আমি রাক্ষস, অথচ কাহারও হিংসা করি নাই, অনেক দিন হ'ল আমি একজন ধার্মিক লোককে সাহায্য ক'রে আমার ভাইয়ের সিংহাসন পেয়েছিলাম ;—বলতো কে আমি?

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ১১২।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। (ক) মোরগ ; (খ) পায়রা ২। রাখাল। ৩। বিভীষণ।

নূতন

১। পক্ষী নয় তবু দুটী পক্ষ আছে তার।
সাদা, কাল, পক্ষ দুটী অতি চমৎকার।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে কোনজন।
কোথা দিয়া চলে যায় না হয় দর্শন।

২। কাণে ধরে না চালালে সোজা কভু যায় না।
এমন বেহায়া আর কোথা আমি দেখিনা।
হাত পা নাই ক তার বুক-ভরে চলে।
বল দেখি ভাই তুমি এটাকে কি বলে?

৩। (১) মনুমেণ্টে বাস মম আমেরিকা ঘর।
খুঁজিয়া পাবেনা কিন্তু পৃথিবী ভিতর।
(২) "থাকা ভাল কিন্তু পাওয়া মন্দ"—বল দেখি কি?

৪। "রাজার ছেলে ও কুম্ভকারে তফাৎ নাই কেন?"

৫। দেখিলে তা পায় না,
পেলে কিন্তু দেখে না, বল দেখি কি?

৬। একটী ছেলে একটী বাটীতে ম্যাজেণ্টা ভিজাইতোছিল ; সেইখানে এক জন একটা মাছ আনিয়া রাখিল। হঠাৎ বাটী উল্টাইয়া পড়িয়া ম্যাজেণ্টা মাছের গায় লেগে গেল, আর অমনি একটা পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। বলত কেমন ক'রে হল!

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৮।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর

১। মাস। ২। নৌকা। ৩। (১) ম। (২) লজ্জা। ৪। দুজনকেই কুমার বলে। ৫। ঘুম। ৬। মাছ্-রাঙ্গা।

নূতন

১। তিনটী অক্ষর মম সুগোল শরীরে—
প্রথম চড়িলে পরে কেহ না আদরে ;
দ্বিতীয় ছাড়িয়ে, দেখ! সকলেই করি—
শেষ ছেড়ে ভেঙ্গে খেয়ে মুখ চুল্‌কে মরি।

২। মস্তকেতে দীপ্তি ছিল, দুষ্টলোকে কেড়ে নিল
তখনই লাগিলাম কাজে ;
মধ্যদেশ করি ছেদ পাষণ্ডে করিল ভেদ
চেয়ে দেখ খাদ্য দ্রব্য সাজে।
পদ কাটি খান খান কৃরিল বিঁধিয়া বাণ
বোঝা হয়ে পড়িলাম খসি ;
বালক বালিকাগণ, বল স্থির করি মন,
কে আমি, পরের আজি দাসী?

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৪৪।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর

১। কচুরি। ২। ভারত।

নূতন

১। বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে, হঠাৎ দেয়াল থেকে একটা কি জন্তু তার মাথায় পড়িল, সে যেই হাত দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল অম্নি উহার লেজটা তাহার মাথায় লাগিয়া গেল। বাঃ! বৈদ্যনাথ যে ভট্টাচার্য হয়ে গেল! বলত কি করে?

২। যখন আমার পেটের ভিতর থাক যাদুধন
শান্ত ছেলে হয়ে সবে ঘুমাও তখন।
বাইরে এসে মুখটি ঘসে কর মহা রোষ
আপনি জ্বলে সারা হও, আমার কি তা দোষ।

৩। আমাকে যদি কেউ পা দেয় তবে তার যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করে প্রাণ যায়, আর যদি না দেয় তবে তখনি শুয়ে পড়ি ; বলত আমি কোন্ জন্তু?

৪। ছোট বই বড় নই
কে আমি বলত ভাই
থাকি আমি পণ্ডিতের ঘরে।
আমিতে নাইক যাহা
কোথা নাহি পাবে তাহা
তাই সবে মোর সেবা করে।

২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৬০।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর

১। টিক্‌টিকি (টিক+ টিকি)। ২। বিলাতী দেশলাই। ৩। বিছা (বিছা+ না) ৪। অভিধান।

নূতন

১। রাজার পায়রা আমি অতি সুগঠন
দুই পক্ষে উড়ে ঘুরি ভারত ভুবন।
প্রাণপণে করি সদা পর উপকার
দুঃখ, চিন্তা, ভয় দূর করি সবাকার।
যার কাছে যাই কিন্তু চাকর হইয়া
এক পক্ষ কাটি সেই দেয় তাড়াইয়া।

২। কাপড় দিয়ে ঘর ছায় এমন ধনী কে?
সে ঘর আঙ্গুলে ঝোলে এমন ঘর সে।

৩। আমি একজন রাজা কিন্তু আমার একটিও প্রজা নাই। আমার পোষাক সব রাজাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমি অর্থহীন। আর দেবতাদের রাজা যা মাথায় পরে, আমার তাই সিংহাসন। বলত আমি কে?

৪। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মোর ধাম
কিন্তু দুই পাশে মোর বাস।
বাটী মোর কাড়ি নিল অমনি খেলিতে গেল
দেখ দেখ তাদের উল্লাস।

৫। যার আছে সে ব্যবহার করে না। কিন্তু যে ব্যবহার করে নিশ্চয় তার নাই। কি?

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৭৬।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড। ২। ছাতা। ৩। প্রজাপতি। ৪। বাতাস। ৫। আত্মগৌরব (কোন না, যাঁর সদ্‌গুণ আছে তিনি নিজের প্রশংসা কখন করেন না, আর যে নিজের সুখ্যাতি করিয়া বেড়ায়, নিশ্চয় তার গুণ বা গৌরব কিছুই নাই।)

২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৯২।

৫। দেখিলে তা পায় না,
পেলে কিন্তু দেখে না, বল দেখি কি?

৬। একটী ছেলে একটী বাটীতে ম্যাজেণ্টা ভিজাইতেছিল ; সেইখানে এক জন একটা মাছ আনিয়া রাখিল। হঠাৎ বাটী উল্টাইয়া পড়িয়া ম্যাজেণ্টা মাছের গায় লেগে গেল, আর অমনি একটা পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। বলত কেমন ক'রে হল!

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৮।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর

১। মাস। ২। নৌকা। ৩। (১) ম। (২) লজ্জা। ৪। দুজনকেই কুমার বলে। ৫। ঘুম। ৬। মাছ-রাঙ্গা।

নূতন

১। তিনটী অক্ষর মম সুগোল শরীরে—
প্রথম চড়িলে পরে কেহ না আদরে ;
দ্বিতীয় ছাড়িয়ে, দেখ! সকলেই করি—
শেষ ছেড়ে ভেঙ্গে খেয়ে মুখ চুল্‌কে মরি।

২। মস্তকেতে দীপ্তি ছিল, দুষ্টলোকে কেড়ে নিল
তখনই লাগিলাম কাজে ;
মধ্যদেশ করি ছেদ পাসণ্ডে করিল ভেদ
চেয়ে দেখ খাদ্য দ্রব্য সাজে।
পদ কাটি খান খান কুরিল বিঁধিয়া বাণ
বোঝা হয়ে পড়িলাম খসি ;
বালক বালিকাগণ, বল স্থির করি মন,
কে আমি, পরের আজি দাসী?

২ . ৯ সেপ্টেম্বব ১৮৮৪, পৃ ১৪৪।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর

১। কচুরি। ২। ভারত।

নূতন

১। বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে, হঠাৎ দেয়াল থেকে একটা কি জন্তু তার মাথায় পড়িল, সে যেই হাত দিয়া ফেলিযা দিতে গেল অম্নি উহার লেজটা তাহার মাথায় লাগিয়া গেল। বাঃ! বৈদ্যনাথ যে ভট্টাচার্য হয়ে গেল! বলত কি করে?

২। যখন আমার পেটের ভিতর থাক যাদুধন
শান্ত ছেলে হয়ে সবে ঘুমাও তখন।
বাইরে এসে মুখটি ঘসে কর মহা রোষ
আপনি জ্বলে সারা হও, আমার কি তা দোষ।

৩। আমাকে যদি কেউ পা দেয় তবে তার যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করে প্রাণ যায়, আর যদি না দেয় তবে তখনি শুয়ে পড়ি ; বলত আমি কোন্ জন্তু?

৪। ছোট বই বড় নই
কে আমি বলত ভাই
থাকি আমি পণ্ডিতের ঘরে।
আমিতে নাইক যাহা
কোথা নাহি পাবে তাহা
তাই সবে মোর সেবা করে।

২ : ১০ : অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১৬০।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর

১। টিক্‌টিকি (টিক+ টিকি)। ২। বিলাতী দেশলাই। ৩। বিছা (বিছা+ না) ৪। অভিধান।

নূতন

১। রাজার পায়রা আমি অতি সুগঠন
দুই পক্ষে উড়ে ঘুরি ভারত ভুবন।
প্রাণপণে করি সদা পর উপকার
দুঃখ, চিন্তা, ভয় দূর করি সবাকার।
যার কাছে যাই কিন্তু চাকর হইয়া
এক পক্ষ কাটি সেই দেয় তাড়াইয়া।

২। কাপড় দিয়ে ঘর ছায় এমন ধনী কে?
সে ঘর আঙ্গুলে ঝোলে এমন ঘর সে।

৩। আমি একজন রাজা কিন্তু আমার একটিও প্রজা নাই। আমার পোষাক সব রাজাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমি অর্থহীন। আর দেবতাদের রাজা যা মাথায় পরে, আমার তাই সিংহাসন। বলত আমি কে?

৪। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মোর ধাম
কিন্তু দুই পাশে মোর বাস।
বাটী মোর কাড়ি নিল অমনি খেলিতে গেল
দেখ দেখ তাদের উল্লাস।

৫। যার আছে সে ব্যবহার করে না। কিন্তু যে ব্যবহার করে নিশ্চয় তার নাই। কি?

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৭৬।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড। ২। ছাতা। ৩। প্রজাপতি। ৪। বাতাস। ৫। আত্মগৌরব (কোন না, যাঁর সদ্‌গুণ আছে তিনি নিজের প্রশংসা কখন করেন না, আর যে নিজের সুখ্যাতি করিয়া বেড়ায়, নিশ্চয় তার গুণ বা গৌরব কিছুই নাই।)

২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৯২।

কে মজা কোরবে?

(১) "বোতলের ভিতর হাঁসের ডিম্ বাহবা বাহবা!!"

একটা মুখ সরু বোতল আন, তাহার ভিতরে খানিক জল রাখ। তার পর হাঁসের ডিমটী একটা পাত্রে সির্কেতে[১] ভিজাইয়া খানিক রাখ, পরে যখন দেখিবে ডিমটী বেশ নরম হইয়াছে তখন আস্তে আস্তে লইয়া "দেখো বাবু! দেখো বাবু!" বলিয়া সেই বোতলের মুখ দিয়া ঠেলিয়া দাও। জলে পড়িলেই ডিম আবার কঠিন হইবে; তখন জল ফেলিয়া দিয়া বলিবে "বোতলের ভিতর আস্তো ডিম! বাহবা বাহবা।" কেমন?

*সির্কা বা ভিনেগার ডাক্তারী ঔষধের দোকনে পাওয়া যায়।

(২) "একটা পাতায় কুড়ীটী গাছ, বাহবা বাহবা!!"

একটা বড় পাতরকুচী পাতা সূতাতে বাঁধিয়া ঘরের খড়খড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখ, দিন কতক পরে পাতাটীর সর্বাঙ্গে প্রায় ২০।২৫টী চারাগাছ বাহির হইবে, তখন তাহাকে লইয়া সকলকে দেখাইবে "একটী পাতায় ২০টী গাছ, বাহবা বাহবা!!" কেমন?

(৩) "ছাই-এর সূতায় আংটী ঝোলে, বাহবা বাহবা!!"

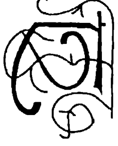
এক গাচি সূতাতে একটী ছোট আঁংটী বাঁধিবে। ঠিক স্থির হইলে পর তাহাতে একটী দেশলাই ধরাইয়া দিবে; আস্তে আস্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, তথাপি আঁংটী ঝুলিবে। সূতাটী কিন্তু পূর্বে খুব লবণ গোলা জলে ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। দেখিয়া সকলে অবাক হইবে, তুমি বলিবে "ছাই-এর সূতোয় আঁংটী দোলে বাহবা বাহবা"। কেমন?

২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১৫।



সম্পাদকের পত্র

প্রমদাচরণ সেন



মাদের সখা-সম্পাদক কিছুকালের জন্য বিদেশে গিয়াছেন ; তিনি সেখান হইতে তোমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র

আমার প্রিয় বালক-বালিকাগণ!

আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, এখন যেখানে আছি সেখানে ও তাহার চারিদিকে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিতে পাইতেছি তাহার কথা তোমাদিগকে বলি। পরমেশ্বর কত কত আশ্চর্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যাহারা দেশ বিদেশে বেড়ায় তাহা যত ভাল বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে? এই জন্য যাঁরা পাহাড় পর্বত, নদী সাগর, সরোবর, হ্রদ, অগ্নির গিরি এবং বরফের গিরি, লবণের খণি এবং কয়লার খণি, প্রভৃতি দেখিয়া বেড়ান, তাহাদিগকে আমার বড়ই 'হিংসা' হয়। অনেক দিন হইতে মনে মনে ইচ্ছা ছিল দেশে দেশে ঘুরিব, কিন্তু এতদিন সে ইচ্ছা কাজে আসে নাই, এখন একটু একটু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া এইখানে আসিয়াছি, কিন্তু আর যে বেশী দূর যাইতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। ইহাই আমার বড় দুঃখের কারণ। তোমরা বোধ হয় জান যে, যে ব্যক্তি রসগোল্লার স্বাদ একবার পাইয়াছে, সে সর্বদাই তাহা খাইতে চায়, আর জন্মেও ভুলে না ; আমারও তাই হইয়াছে। এইখানে আসিয়া চারিদিকের সুন্দর শোভা ও চমৎকার শ্রী দেখিযা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, এখন ক্রমাগত এইরূপ দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, কাজে আটকাইতেছে। তাই আমাব কষ্ট। তোমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, সেই সময় তোমার চারিদিকে ভাল ভাল রসগোল্লা সাজাইয়া যদি তোমার হাত পা কেহ বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তাহাই হইয়াছে। আমি চারিদিকের সুন্দর শোভার বাহার বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ ছুটিয়া গিয়া সেই শোভার নিকট বসিতে পারিতেছি না, এই আমাব কষ্টের কারণ।

দুর্গাপূজার ছুটির সময় আমি কলিকাতা হইতে বাহির হই। এই আমার প্রথম পশ্চিমদিকে যাত্রা। তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমে থাকে, তারা হয়ত মনে মনে হাসিবে, কিন্তু আমি পশ্চিমে বর্ধমানের এদিকে আর আসি নাই, কাজেই যতটুকু আসিয়াছি, তাহাতেই মনে হইতেছে ভয়ানক পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি। এই স্থানটীর জলবায়ু খুব ভাল, চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড়, দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমি যে বাড়ীতে থাকি তাহার বারান্দা এবং উঠান হইতে গাঢ় ঘনমেঘের ন্যায় পরেশনাথ পাহাড় দেখা যায়। এইখানে আসিয়া প্রথমেই দুটী বিষয় আমার চক্ষে লাগিল ; প্রথমতঃ থাকিবার স্থান, দ্বিতীয়তঃ খাদ্য দ্রব্য। এখানে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই খোলার চাল, কোটাবাড়ী পাওয়া শক্ত—এপর্যন্ত মোটে তিনটী কোটাবাড়ী দেখিয়াছি,—একটা জমিদারের বাড়ী আর দুটো দোকান। খোলার বাড়ীগুলিতে জানালা প্রায় নাই, প্রথমে মনে হইল বুঝি বড় শীত বলিয়া জানালা রাখেনা, কিন্তু শেযে শুনিলাম,

তাহা নহে। "সিন্ধুক্কা মাফিক্ ঘর" অর্থাৎ সিন্দুকের মত চারিদিকে আটা সাটা ঘরই এখানকার লোকের মনের মত। জানালা রাখিতে বলিলে, তাহারা চটিয়া যায়, বলে—"বাতাসই যদি খাবে, তবে মাঠে যাও না কেন?" এইতো ঘরের দশা। তারপর খাদ্য দ্রব্যের কথা কিছু বলি। এদেশে ভয়ানক কাঁকর। ভাত, ডাল, তরকারি, সমস্ত জিনিষেই কে জানে কেমন করিয়া কাঁকর মিশিয়া থাকে ;—কেবল দুধটা খুব ভাল ও খুব শস্তা। তরকারির মধ্যে কেবল ঝিঙ্গে ও লাউ, আর কিছু পাওয়া শক্ত। একটী বন্ধু আমার চাকরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের এখানে পটল পাওয়া যায় না?" সে উত্তর করিল "পরোল? সেই বেগুনের মত? মিলে!" বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "চিচিঙ্গে পাওয়া যায়?" চাকর খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল "বাবু! ও আংরেজী বাত হাম নেহি সমঝ্তা হ্যায়" অর্থাৎ ও "ইংরেজী কথা আমি বুঝি না'!!

এখানকার যিনি জমিদার তাঁহাকে টিকাইত বলে। তাঁহার বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। এখানকার কুমারেরা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে না, টিকাইতের বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা আমাদের ওদিককার একজন কুমার আসিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের দেশের প্রতিমায় ও এখানকার প্রতিমায় কোন তফাৎ নাই। তবে পূজার রকমে একটু তফাৎ দেখিলাম। আমাদের যেমন তিন দিন পূজা হয়, এখানে সেরূপ না হইয়া নবমীর দিন পূজা হইল। সেই দিন মস্ত মেলা বসিয়াছিল, এবং দুই তিন দল সাঁওতাল মেয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিয়াছিল। আমি সাঁওতালদের নাচ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সাঁওতাল পুরুষেরা কেহ বাঁশি বাজাইতেছে, কেহ 'মাদোল' নামক মৃদঙ্গের মত একরূপ যন্ত্র বাজাইতেছে, আর দলে দলে মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতে করিতে মাদোলের তালে তালে নাচিতেছে। আমাদের দেশের কোমোর-দোলান বিশ্রী নাচের চেয়ে সাঁওতালদের নাচ অনেক ভাল। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে আর কিছু কথা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

মেলাতে সাঁওতাল নাচ দেখিয়া আমরা কিছু উত্তরে পদ্ম-ঝিল দেখিতে গেলাম। সেই ঝিলটীতে রাশি রাশি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে। যাইবার সময় পথে এক যায়গায় ভয়ানক ভিড় দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে কান্না পায়। দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মাঠের এক পাশে একটা সাদা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে, আর এক পাশ হইতে বাবুরা 'বাজি' রাখিয়া বন্দুক চালাইতেছেন, কে ছাগলটাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে। শুনিলাম যাহার গুলিতে ছাগল মরিবে, টিকাইত তাহাকে পুরস্কার দিবেন। হায়! হায়! মূর্খদের কি দুর্বুদ্ধি! আর নাইবা হবে কেন! যাদের "দারু" অর্থাৎ মদ না হইলে দিন চলে না, যাহাদিগের মদ ছাড়িতে বলিলে, উল্‌টে বলিয়া ফেলে "আপ কলম্ ছোড়িয়ে, তব হামলোগ্ দারু ছোড়েঙ্গে" অর্থাৎ "আপনি লেখাপড়া ছাড়ুন, তবে আমরা মদ ছাড়িব", যাহারা জুয়া খেলিয়া সমস্ত টাকাকড়ি নষ্ট করিতে বসিয়াছে তবুও সে পাপখেলা ছাড়িবে না, যাদের স্ত্রী-পুরুষের দশহাজারের মধ্যে দশজন ধার্মিক লোক পাওয়া যায় না, তাদের আর কত হবে! যাহাহউক, আমরা আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পদ্মঝিলের সুন্দর শোভা দেখিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম যে, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সবই সুন্দর, কেবল মানুষই খারাপ।

সাঁওতালদের কথা বলিতেছিলাম, সাঁওতালেরা এর চাইতে অনেক ভাল। তাহারা অসভ্য বটে, বনে জঙ্গলে থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও ঠকাইতে জানে না, চুরি বা মিথ্যা কথার

কোন ধার ধারে না, এবং অকারণে কাহাকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না। আজকাল গাঁয়ের কাছে যারা থাকে, তাহারা দেখিয়া দেখিয়া দু-পাঁচ জন ঠকামি শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে ইহারা আপন মনে নিজের দলে, সভ্য লোকদের সীমার বাহিরে আপনাদের 'মাঝি' অর্থাৎ দলের কর্তার অধীনে বাস করে, সেখানে ইহারা বড়ই ভাল লোক। আমি একদিন এই স্থানের নিকটে এক যায়গায় পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণা হওয়ায়, কাছে একজন সাঁওতাল ক্ষেত চষিতেছে দেখিয়া তাহার নিকট জল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে সাঁওতাল আমাদের লোকের নিকটে থাকিয়া কিছু সভ্য হইয়াছে, কাজেই ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। আমি বলিলাম "বাপু! আমার তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, একটু 'পাণি' দিতে পার।" সে লোকটা কেউ মেউ করিয়া কি বলিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল গুটী দুই কথা বুঝিলাম—"কুঁইয়া? কুঁইয়া? হূইরে খাব্‌রিয়া" অর্থাৎ "পাতকূয়া ওই খাব্‌রা অর্থাৎ খোলার বাড়ীর কাছে আছে।" সভ্য সাঁওতাল জল দিল না, কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের কথা বলি শুন। আমি পরেশনাথ পাহাড়ে যাইতেছিলাম, পথে তৃষ্ণা হওয়াতে একটা জঙ্গুলে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। ছোট রাস্তা, দুপাশে বড় বড় কালকাশুন্দের গাছ। তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক সাঁওতালকে পাইলাম। সে একটী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গরু চরাইতে যাইতেছিল। আমি জল চাহিবা মাত্র ছেলেটীকে গরুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বড় সাঁওতাল নিজে বাড়ীতে গেল এবং পরিষ্কার মাজা ঘটিতে করিয়া আমাকে অতি সুমিষ্ট ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষ মানুষ দেখিলে লজ্জায় কোন্ কোণে পলাইবে, তাহার ঠিক থাকে না, সাঁওতাল মেয়েদের সেরূপ ভাব নহে। তাহারা নিঃসঙ্কোচে রাস্তা দিয়া ছেলেদের মাই খাওয়াইতে খাওয়াইতে চলিয়া যাইতেছে, কাহারও ভয় নাই। খুব গভীর জঙ্গলে যে সব সাঁওতাল থাকে, তাহাদের পুরুষ মেয়ে কেউ কাপড় পরে না, কেবল কোমরে পাতা সেলাই করিয়া জড়ায়। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত যত সাঁওতাল দেখিয়াছি, তার মধ্যে পুরুষদের কাপড়ের কৌপিন এবং মেয়েদের প্রায় আমাদের মত বড় কাপড় এবং রূপার গয়না, মল, নথ, ইত্যাদি দেখিয়াছি।

আমার একটী বন্ধুর নিকট শুনিলাম অসভ্য সাঁওতাল যায়গা জমি লইয়া আমাদের মত মোকদ্দমা মাম্‌লা করেনা, জমীদার বেশী টাকা খাজানা চাহিলে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এবং বনের মধ্যে আপনাদের 'মাঝি'র অধীনে অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে। সাঁওতাল যে ঠকাইতে জানেনা, ইহা আমার কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন জিনিষের জন্য আগের দিন পয়সা দিলে, পরের দিন যে সেই দামের জিনিষ ঘরে বসিয়া পাইবে, এবিষয়ে তোমরা সভ্য জনকে, চতুর লোককে বিশ্বাস করিতে পার আর নাই পার, অসভ্য সাঁওতালকে বিশ্বাস করিতে পার। সাঁওতাল যে মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, তাহার একটা গল্প শুন। একবার এক সাঁওতাল অন্য একজন লোককে মারিয়া ফেলে। ইংরাজের রাজ্যে কি খুন করিয়া বাঁচিবার যো আছে ? সাঁওতালকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। একজন মোক্তার (সভ্য লোক কি না!) প্রাণপণে সাঁওতালকে শিখাইলেন, "বলিস আমি খুন করি নাই।" সাঁওতাল বলিল "আচ্ছা।" সকলি ঠিক। মাজিষ্ট্রেট সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করাইলেন "তুমি অমুককে মারিয়াছ কেন?" সাঁওতাল বলিল "আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছিল, মারিব নাতো কি?"

এবারকার এই পত্র বড় মস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ এইখানেই শেষ করি। আগামীবারে, কয়লার খণি, শ্লেটপাথরের নদী বা জলপ্রপাত, এবং পরেশনাথ পাহাড়ের কথা বলিব। দেখিবার বিষয়, জানিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে পরমেশ্বরের আশ্চর্য দয়ার কাণ্ড বুঝিতে না পারে তাদের বেড়ানই মিথ্যা, তাদের চোখ কাণ কেবল বোঝার মতন, তাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

পচম্বা, গিরিধি। সম্পাদক

২ : ১১ : নভেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৭৩-১৭৬।

দ্বিতীয় পত্র

সখা সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্র আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিলাম। আমার প্রিয় বালক বালিকাগণ।—যাহা দেখি সবই যদি খুলিয়া বলিতে পারি তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না, কিন্তু আমার সে সাধ্য নাই। বড় হইয়া নিজে যদি কখনও দেশ বিদেশে বেড়াইতে পার এবং ভাল চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কত সুন্দর, কত মধুর, কত চমৎকার।

আমি যেখানে আছি এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে কয়লার খণি আছে, খণি কাহাকে বলে জান? এক একটা যায়গার অনেক দূর পর্যন্ত মাটির নীচে কয়লা পাওয়া যায়, এই কয়লাতে সমস্ত বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ কল চলে। লোকে মাটীর নীচে গর্ত করিয়া, মাটীর নীচ দিয়াই বরাবর পথ করিয়া কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত করে, ইহারই নাম খণি বা খাদ, মাটীর অনেক নীচ পর্যন্ত কয়লা থাকে এই জন্য দুতলা, তিনতলা, চারতলা, এই রকম তলা আছে। কোন কোন খণিতে অনেক তলা আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যেটাতে গিয়াছিলাম, সেটা ছোট তাহাতে দুতলা বই নাই।

আমি ঘোড়ায় চড়িয়া খণি দেখিতে গিয়াছিলাম। খনিতে নামিবার রাস্তা ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে গিয়াছে সুতরাং বেশ হাটিয়া যাওয়া যায়, নামিবার দরজাটায় একটু আলো আছে বটে; কিন্তু মধ্যে আলো জ্বালিয়া যাইতে হয়।

আমাদের সঙ্গে কয়লার খণির একজন লোক আলোক ধরিয়া যাইতেছিল, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে যাইতে লাগিলাম, দুপাশে কয়লার দেওয়াল। উপরে কয়লার ছাদ আঁটা, নীচে কয়লার রাস্তা :—আমরা এইরূপ স্থানে এইরূপ পথে সাবধানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু একটা বিপদে পড়িলাম, খণির মধ্যে তো বাতাস যাইবার পথ নাই, সুতরাং তোমরা বুঝিতেই পার সেখানকার বাতাস লোকের নিশ্বাসে নিশ্বাসে কত ভারী হইতে পারে, আমার কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। আর দুতলায় নামিতে ইচ্ছা করিলাম না। সঙ্গের আলোধারী লোককে বলিলাম "বাপু আমা-দিগকে বাহিরে লইয়া চল। আর নীচে যাইব না।" কিন্তু বাহির হইবার রাস্তা ত সহজ নয়, দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে অনেক পথ গেলে তবে বাহির হইবার রাস্তা পাওয়া গেল। কিন্তু ইতি মধ্যে কি কি দেখিলাম তাহা বলি। খনির অনেক যায়গাতেই সোজা হইয়া চলিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও কোথাও কুঁজো হইয়া পথ চলিতে হয়। আমরা কখনও কুঁজো হইয়া কখনও সোজা হইয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম, মজুরেরা কয়লা কাটিয়া বাহির করিতেছে।

তাহাদের কাছে একটা আলো ও হাতে এক-এক খানা মাটী খোঁড়া কুড়াল, মজুরদের মধ্যে দু একজন স্ত্রীলোক এবং অনেক বালক দেখিলাম। সেখানে সাদা কালো নাই। সবই কালো দেখিলাম। অনেক সুশ্রী ছেলে কয়লাতে এমনি কালো হইয়া গিয়াছে যে ঠিক যেন চূণাগলির কালো পোষাক পরা ফিরিঙ্গী। যেখানে কয়লা কাটা হইতেছে তাহার নিকটে সরু রাস্তা, তাহাতে কয়লা টানিবার জন্য রেল ফেলা। কয়লা কাটা হইলে বড় বড় লোহার বা টিনের বালতিতে বোঝাই করিয়া, রেলের উপরে খোলা ঠেলা গাড়ীতে সরাইয়া দেয় ; সেখান হইতে অল্প ঠেলিয়া দিলেই কয়লার গাড়ী, যেখানে উঠিবার রাস্তা, সেই পর্যন্ত চলিয়া আসে, কখনও বা লোকে ঠেলিয়া সে পর্যন্ত লইয়া যায়। উঠিবার রাস্তা সিঁড়ির মতন মনে করিতেছ বুঝি? না, না, তা নয়। আমরা এখন যেখানে পৌছিলাম সেখানে গিয়া দেখিলাম উপরের সূর্যের আলো দেখা যাইতেছে। এবং উপর হইতে লম্বা একটা লোহার শিকল নামিতেছে, এই শিকলের শেষ ভাগটায় তিনটা মুখ ; এই তিনটা মুখ বালতির চারিদিকের তিনটা কড়ার সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইল, আর সঙ্কেত করিবা মাত্র বালতি কয়লা শুদ্ধ উঠিয়া চলিয়া গেল। আবার বালতি ফিরিয়া আসিল। এই বারে আমরা তাহাতে দাঁড়াইয়া শক্ত করিয়া শিকল ধরিলাম। পাশের লেকেরা উপর দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আস্তে মানুষ বালতি", আর অমনি আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেলাম। কোথায় নামিয়া ছিলাম আর কোথায় আসিয়া উঠিলাম, চাহিয়া দেখি একটা বাষ্পীয় যন্ত্র কপিকলে করিয়া আমাদিগকে টানিয়া তুলিয়াছে এবং আমরা যেখান দিয়া নামিয়াছিলাম তাহা হইতে বহুদূরে আসিয়া উঠিয়াছি।

কয়লার খণিতে বিস্তর টাকা লাভ হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সেদিকে মতি নাই। যত কয়লার খণি, হয় গবর্ণমেণ্টের না হয় রেলওয়ে কোম্পানীর না হয় অন্য কোন ইংরেজ কোম্পানীর। আমরা যে খণি দেখিতে গিয়াছিলাম সে জায়গাটা এখানকার চিকাইতের ছিল। কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কিছু কারিতে না পারিয়া নয় লক্ষ টাকা মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, আর এখন কত নয় লক্ষ টাকা তাহা হইতে লাভ হইবে কে জানে?

বিনা পরিশ্রমে বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে কি কখনও কোন কাজ হয়? খণি হইতে কয়লা উঠাইতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কখনও কখনও মজুরদের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। অন্ধকারে সামান্য আলোতে কাজ করা সহজেই বুঝিতে পার কত বিপদের সম্ভাবনা। আবার ইহা ছাড়া খণিতে আর একটা মহা বিপদের ভয় আছে। খণির মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে না, পূর্বেই বলিয়াছি বাতাস ঢুকিতে না পারায় মধ্যের বাতাস খারাপ হইয়া গিয়া লোকের নানারূপ ব্যারাম হইয়া থাকে এবং মধ্যের খারাপ হাওয়া কখন কখনও প্রদীপের আলো লাগিয়া জ্বলিয়া ওঠে ; তখন মজুরদের প্রাণে বাঁচা শক্ত। যদিও এই শেষের লিখিত বিপদ বারণ করিবার জন্য আজকাল "অভয় প্রদীপ" নামে একরকম নূতন আলোর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই খণিতে তাহার একটীরও বন্দোবস্ত দেখিলাম না।

এখন শ্লেট পাথরের নদীর কথা কিছু বলিব। এই নদী আমার থাকিবার যায়গা হইতে আধ মাইলের অধিক হইবে না ; সুতরাং আমি হাঁটিয়াই গেলাম। নদী বলিলে যদি তোমাদের গঙ্গা বা অন্য কোন নদীর কথা মনে হয়, তাহা হইলে আমি নদী না বলিয়া অন্য কিছু বলি, কেননা আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার উপর দিয়া পথ গিয়াছে, এবং গরু, মহিষ, গাড়ী, ঘোড়া, তাহার উপর দিয়াই যাইতেছে উপরে এক হাত কি দেড় হাত বালি। তাহার নীচে

চমৎকার শ্লেট পাথর, আমরা দেখিলাম নদীর যে ভারে উপর দিয়া পথ হইয়াছে সেখানে ঝির ঝির করিয়া একটু একটু জল আসিতেছে, আরও নীচে আসিয়া তাহার সহিত এইরূপ দশ জায়গা হইতে দশটী ছোট ছোট জলের স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে এবং সকলগুলি এক হইয়া একটু তেজের সহিত পাথর ডিঙ্গাইয়া কুল কুল শব্দে নীচে চলিয়া যাইতেছে। আমরা এইখানে একটা পাথরের উপরে বসিলাম, এবং সেই নির্জন স্থানের সুন্দর শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে মনে মহাসুখী হইতে লাগিলাম। এখানে জলের তেজে বালি দাঁড়াইতে পারে না, কেবল কালো পাথরের উপর দিয়া সাদা জল সূর্যের কিরণে চিক্ চিক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। শ্লেট পাথরগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজান, তাহা আর কি বলিব? কোন যায়গাটা ত্রিকোণ, কোন যায়গাটা অর্ধচন্দ্রের মত, কোন যায়গাটা চারিকোণ, এইরূপ নানারূপ সুন্দর ভাবে সাজান রহিয়াছে। শ্লেট পাথরে সুন্দর লেখা যায়, আমি এক খণ্ড পাথর লইয়া বড় একটা পাতের উপর লিখিলাম "ঈশ্বরের কি দয়া!" আর তাহার উপর দিয়া শীতল জল ঝির ঝির করিয়া যেন সেই লেখা দেখিতে দেখিতে নামিয়া চলিল।

একবার ইচ্ছা হইল, এই সকল জল কোথা হইতে আসিতেছে তাহা খুঁজিয়া দেখি। এই ভাবিয়া পাথরের নুড়ি কুড়াইতে কুড়াইতে নদীর যেদিক হইতে জল আসিতেছে সেই দিকে চলিলাম। অনেক দূর গেলাম, কিন্তু সেখানে হায়েনার গায়ের যেমন গন্ধ সেইরূপ গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। আমরা সেই "বোটকা" গন্ধে ভয় পাইয়া, আর যাইতে সাহস করিলাম না। আর একটু গেলেই হয়ত এখন যে সকল কথা লিখিতেছি তাহা আর লিখিবার লোক থাকিত না। আমরা বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আরো অনেক কথা বলিবার রহিল ; বারান্তরে তোমাদিগকে জানাইব।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

পচম্বা, গিরিধি। সম্পাদক

২ : ১২ : ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৯০-১৯২।



আমাদিগের আগামী বর্ষের পুরস্কার।

গত বৎসরে ধাঁধার জন্য শ্রীমতী অলকাসুন্দরী রায়ের একটী পুরস্কার এবং চিত্রের জন্য আমাদের একটী পুরস্কার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসর কেহই ঐ দুটী পুরস্কারের উপযুক্ত হন নাই। সুতরাং এ বৎসরেও ঐ দুটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, আমরা আরও কতকগুলি পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সমস্ত পুরস্কারের খবর আগামী মাসে প্রকাশ করিব।

সখা-কার্যাধ্যক্ষ

২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ১৬।

আগামী বর্ষের পুরস্কার।

আমরা আগামী বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রং-এ বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব :—

(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য ; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য ; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই :—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুঁকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্চা, কি সর্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

২ : ২ . ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪, পৃ. ৩১-৩২।

আমাদিগের পুরস্কার।

আমরা এই বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রং বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব ;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য ; (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য ; এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই :—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে, না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে!" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন," এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তাল গাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্চা, কি সর্বনাশ! জামা জোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। আর এক মাস সবে সময় আছে ; এর মধ্যেই সকলে পাঠাইবেন। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৭৯।

আমাদিগের পুরস্কার বিজ্ঞাপনের ফল।

আমরা বালক বালিকাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য স্বীকার করিয়াছিলাম যে (১) বার বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকা যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে (২) ১৬ বৎসরের কম বয়সের বালক বালিকা, যিনি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এবং (৩) যিনি সর্বাপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এই রচনার মধ্যে তিনটী শ্রেণী ছিল—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত, (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত, (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ৭ই জুন চিত্র এবং রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ছিল। সুতরাং বোধ হয় বালক বালিকাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে পুরস্কার কে পাইল। ধাঁধার পুরস্কার বৎসরের শেষে দেওয়া যাইবে, সুতরাং কেবল চিত্র ও রচনার পুরস্কারের কথা বলা যাইতেছে।

১। চিত্র।—৯জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঢাকা নিবাসী শ্রীমান বিনয়চন্দ্র গুপ্ত (বয়স ১৪ বৎসর) প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমান সেখ সমসুদ্দীনের চিত্র মন্দ হয় নাই, তবে প্রথমটীর মত নয়, সুতরাং আমরা প্রথমটীকেই পুরস্কার দিব।

২। রচনা।

(ক) এই বিভাগে কেহই পরীক্ষা দেয় নাই।

(খ) রচনার বিষয়—“একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে ; তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন।” এই বিষয়ে পদ্য।

সর্বশুদ্ধ ৮ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে মোটের উপর শ্রীমতী সরলা দেবী (১১ বৎসর ৯ মাস) প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার রচনাটী প্রকাশ করা গেল। এই বিভাগের আরও দু-জনের রচনার ভাল অংশগুলি তাঁহাদের উৎসাহের জন্য প্রকাশ করা গেল।—

“প্রাণের বাছারে মোর, হৃদয়েরি ধন!
মা বলে আয়রে কোলে জুড়াক্ জীবন।
তেমনি সুধার স্বরে একবার কথা ক’রে।
কেন মুখে নাই তোর একটী বচন?
কোথা সেই হাসিরাশি খেলাধূলা সব?
উঠ যাদু, প্রাণ যায় দেখিয়ে নীরব!
আকুল প্রাণের মাঝে আয় প্রাণধন!
আয় আয় প্রাণভোরে বুকেতে চাপিয়া ধ’রে
ও চাঁদ মুখেতে তোর করিরে চুম্বন।
তবু কথা কহিলিনে? তবু কেন জাগিলিনে
এখন রহিলি যেরে মুদিয়ে নয়ান!
কি দশা হয়েছে মার দেখ চেয়ে একবার
কি দোষ হয়েছে—কেন হেন অভিমান?
মায়ের প্রাণের বাছা কোথা ছেড়ে যাবি?
দিব না যাইতে তোরে বুকেতে রাখিব ধ’রে
হৃদয়ের দেবী হৃদি উজলি রাখিবি।
সাধের প্রতিমা! তোরে দিয়ে বিসর্জন
কেমনে, কি লয়ে, আর ধরিব জীবন?
প্রাণের আলোক তুই, জীবন আমার,
ও আলো নিভিলে সব আঁধার আঁধার।
ত্যাজিয়া এজন্মভূমি ভুলি এ মায়েরে তুমি
কোন্ জননীর কোলে লভিবে বিরামে?
জনম লইতে যাস্ কোন্ পূণ্যধামে?

অগণন দেব দেবীগণ আলোকের—
যেথায় খেলিছে বসি চরণে মায়ের,
চেয়ে সে মায়ের পানে কচি মুখে কচি প্রাণে
হাসিতে যাস কি ধন তুই (ও) সেই লোকে?
আমিও যাইব ওরে নিয়ে যারে সাথে করে
একেলা যাইতে ছেড়ে দিবনারে তোকে!"

শ্রীসরলাদেবী, কলিকাতা।

"কেন একাকিনী পড়ে নীরবে শয্যায়!
সুখের খেলার কাল বৃথা বয়ে যায়।
উঠ বাছা, একবার চাও আঁখি মেলি,
কোলে বসি একবার ডাক 'মা' 'মা' বলি।
আর কি ও চাঁদ মুখে কথা না শুনিব?
আর কি সোনার চাঁদে কোলে করিব?
উঠ উঠ প্রাণ-ধন! উঠ একবার,
তোমার বিহনে দুঃখ নাহি সহে আর।
হের দেখ তব মা তোমায় হয়ে হারা,
দুঃখে তাপে হইয়াছে পাগলিনী পারা।"

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাদ্যায়, শালডাঙ্গা।

"কি খেয়ে এখন আমি বাঁচিয়া থাকিব?
কেমনে এ পোড়া প্রাণে অন্নজল দিব?
আয় আয় কোলে আয় ওরে যাদুমণি!
কাঁদে তোর মুখ চাহি অভাগা জননী।
খাওয়া পরা কাজ কর্ম যে কিছু আমার—
যে কিছু আছিল সব লাগিয়া তোমার—
এবে যে হইল বাছা সকলি নিঃশেষ,
মায়ের কপালে এই ছিল অবশেষ!
মানুষের হাত নাই বিধাতার বিধি।
আমিও যাইব চল তুই গেলি যদি।"

শ্রীরামচরণ চৌধুরী, নলডাঙ্গা।



(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তাল গাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্চা, কি সর্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকারী।"—এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া একটী রচনা। এই বিভাগে ৯ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইহাঁদের রচনা প্রায় সমান হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কে প্রথম ইহা স্থির করিতে আমাদের অনেক সময় গিয়াছে। আমরা অনেক ভাবিয়া অবশেষে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে প্রথম স্থান এবং হিরণ্ময়ী দেবীকে দ্বিতীয় স্থান দিলাম। উভয়ের রচনাই প্রকাশ করা গেল। কিন্তু পুরস্কার প্রথম বালক পাইবেন।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ১০৯-১১০।

বিবিধ সংবাদ।

বিগত ১লা ডিসেম্বর শনিবার বড় লাট লর্ড রিপণ কলিকাতায় আইসেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলের ঘরের নিকটে প্রায় ৫০,০০০ লোকের ভিড় হয়। কেহ বাদ্য বাজাইয়াছিল, কেহ নিশান উড়াইয়াছিল, কেহবা রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়াছিল। আমরা বড় লাট সাহেবকে বড় ভালবাসি, কারণ তিনি যাতে আমাদের উপকার হয় এই চান।

* * *

৩রা ডিসেম্বর, সোমবার মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অভ্ কনাট তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসাতে সহরের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহার শেষ দিনে খুব আলো দেওয়া হয় এবং নানা রকমের বাজি পোড়ান হয়। একখানি খবরের কাগজের সম্পাদক বলেন "বাজি না পোড়াইয়া, খুব ঘটা করিয়া গরিব দুঃখীদিগকে খাওয়াইলে বা তাহাদিগকে কাপড় দিলে ভাল হইত।"

* * *

আজকাল চারিদিকেই তামাক খাওয়া ও মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে সভা হইতেছে। শুনিলাম সংপ্রতি কোড়কদি গ্রামে এইরূপ একটী সভা হইয়াছে। তথাকার যুবকদিগের সকলেরই এই সভাতে যোগ দেওয়া উচিত। নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম সহি করিলেই তো আপদ চুকিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইতে পারে বটে কিন্তু শেষে বেশ সহ্য হইয়া যায়। এইরূপে অনেক বড় বড় মাতাল ভাল হইয়াছে, যাঁরা তামাক খান তাঁরাতো দূরের কথা। যদি বাস্তবিক মনে প্রতিজ্ঞা জন্মে, তাহা হইলে কার সাধ্য আমাকে লোভে ফেলে?

* * *

কয়েক মাস গত হইল, ইংলণ্ডের কোন এক যায়গায় একজন লোক এক বোতল মদের জন্য তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করে। স্ত্রীও সেই দ্বিতীয় লোকটীকে বিবাহ করে। জজ সাহেব জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে সাজা দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বারের বিবাহটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কি লজ্জার কথা! মাতাল হইলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? ছি! ছি! ছি!

* * *

কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গত ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে খুলিয়াছে। যতগুলি অঙ্গন বা ঘর, এক এক দেশের দ্রব্যে সাজান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারত—অঙ্গন যে ঘরে

আমাদের দেশের দ্রব্য জাত আছে, তাহাই সবচেয়ে ভাল বোধ হয়।

* * *

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে এই এক বৎসরের মধ্যে সখা'র একজন বালিকা পাঠিকা এবং একজন বালক পাঠকের মৃত্যু হইয়াছে। বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা এবং বালকের নাম শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র। ছেলেটী যে 'সখা' অতি যত্নের সহিত পড়িতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে ইহাঁরা নিশ্চয়ই 'সখা'র দ্বারা নানারূপে উপকার পাইতেন। ঈশ্বরের ধর্ম ঈশ্বর লইয়াছেন, তাহার উপরে আর কি বলিব?

* * *

মদে অনেক অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে আবার খোলা ভাঁটী হইয়া সব দিকে মদ সস্তা হওয়াতে আরও ক্ষতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের বাঙ্গলা দেশের ছোট লাট সাহেব কয়েকজন সাহেব এবং বাঙ্গালী লইয়া একটী কমিশন বা সভা করিয়াছেন ; তাঁহারা দেশে বিদেশে ঘূরিয়া ঘূরিয়া কোথায় মদে কিরূপ অপকার হইতেছে তাহা দেখিবেন। ইহাঁরা সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে গিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাঁদের চেষ্টায় মদের তেজ একটু কমে কি না।

* * *

নীচের লিখিত ঔষধগুলির কথা এক খানি কাগজে বাহির হইয়াছে :—

শিশুদিগের জ্বরের মহৌষধ।—পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের জ্বর হইলে এইরূপ ঔষধ বিশেষ কার্যকরী হইবে ;—অর্ধাঙ্গুলি পরিমাণ মানকচুর সরু সরু সাদা শিকড় লইয়া আড়াই খানি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে। ইহা প্রতিদিন একবার করিয়া সেবন করাইলে তিন চারিদিনের মধ্যে জ্বর ভাল হইয়া যায়।

কাশি।—শিশুদিগের কাশি হইলে পাতলা মিসির গুঁড়ো (ধূলির ন্যায় সরু) কিঞ্চিৎ মধু অঙ্গুলি করিয়া লইয়া প্রত্যহ জিহ্বায় ঠেকাইয়া দিলেই তিন চারিদিনের মধ্যে কাশি ভাল হইয়া যায়।

পিপীলিকা নিবারক।—যে সকল খাদ্য দ্রব্যে সচরাচর পিপীলিকা ধরিয়া থাকে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর ফেলিয়া রাখিলে পিপীলিকা আর সে সকল খাদ্য দ্রব্যের নিকট আসিতে পারে না।

পিপীলিকা, বোলতা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোময় দ্বারা দষ্ট স্থান আবদ্ধ করিলে আরোগ্য হয়।

কৃমি নাশক।—আনারসের পাতার একছটাক আন্দাজ রস অল্প পরিমাণ চুণের জলের* সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কৃমি একেবারে বিনষ্ট হয়।

শাল, রেশমী ও পশমী কাপড়ের সহিত কালজিরা ও মাথাঘসার সহিত যে পচা পাতা ব্যবহৃত হয়, সেই পচা পাতা রাখিলে উক্ত সকল প্রকার বস্ত্র পোকায় কাটিতে পারে না।

২ : ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ১৩-১৪।

* একটা বোতলে খানিকটা চুন এবং জল একসঙ্গে ঝাঁকড়াইয়া কিছুকাল রাখিয়া দিলে চুনটা তলায় পড়িয়া গিয়া উপরে যে জল থাকে তাহাকেই চুনের জল বলে। ইহাই আস্তে আস্তে ঢালিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

বিজ্ঞাপন।

গত বৎসরে যাঁহারা সখার গ্রাহক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পাঠাইতে বারণ করেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই নিকট নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা পাঠান গেল। যাঁহারা জানুয়ারি মাসের মধ্যে মূল্য না পাঠাইবেন বা মূল্যের সম্বন্ধে পত্র না-লিখিবেন অথবা যাঁহাদের নিকট হইতে 'সখা' ফিরিয়া আসিবে, তাঁহাদের নিকট আর 'সখা' পাঠান যাইবে না।

কেহ কেহ এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অপরিচিত স্থলে অগ্রিম মূল্য জমা না রাখিলে, আমরা কাহাকেও এজেণ্ট করিতে পারিনা। এজেণ্টদিগের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যিনি ১০ খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে একখণ্ড বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। টাকা লইতে ইচ্ছা করিলে ঐ হিসাবে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

"সখা" কার্যাধ্যক্ষ।

২ . ১ : জানুয়ারী ১৮৮৪, পৃ ১৫-১৬।

বিজ্ঞাপন।

আমরা পাঠকপাঠিকাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে সখার মূল্য অগ্রিম দেয়। দুঃখের বিষয় অনেকে এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই। আমরা আশা করি যাঁহারা এখনো মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্যাধ্যক্ষ।

২ . ৩ : মার্চ ১৮৮৪, পৃ ৪৮।

বিশেষ বিজ্ঞাপন

'সখা' প্রত্যেক ইংরাজী মাসের ৭ দিবসের মধ্যেই বাহির হয়। কিন্তু মুদ্রা-যন্ত্রের গোলমালে এই দুই মাস তাহা না হইয়া ৭ দিন পিছাইয়া পড়িতেছে। এজন্য আমরা বড় লজ্জিত আছি। আমরা আশা করি আগামী মাস হইতে 'সখা' যথা সময়ে সকলকে দেখা দিতে পারিবে। বাঙ্গালার অনেক মাসিক পত্র যেমন যে মাসের কাগজ, তাহার ৪/৫ দিন পরে বাহির হয়, অনেকে মনে করেন, ইহারও সেই দশা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে বলিতে পারি যে সেরূপ অবস্থা হইলে, 'সখা' আর কাহাকেও আপনার মুখ দেখাইবে না। মূল কথা, পত্রিকাখানির যদি সুবন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে আমরা উহাকে রাখিতে চাই না। আগামী মাস হইতে এইরূপ সুবন্দোবস্ত হইবে, আমরা আশা করি।

কার্যাধ্যক্ষ।

২ · ৩ . মার্চ ১৮৮৪, পৃ ৪৮।

বিজ্ঞাপন

আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে দুঃখের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি যে, সখার মূল্য এক টাকা মাত্র হইলেও, অনেকের নিকট আজি পর্যন্ত এই সামান্য মূল্য পাওয়া গেল না। আমরা আশা করি সকলেই এক মাসের মধ্যে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। আগামী বারে যেন এইরূপ বিজ্ঞাপন আর প্রকাশ করিতে না হয়।

কার্যাধ্যক্ষ।

২ . ৪ : এপ্রিল ১৮৮৪, পৃ ৬৪।

বিজ্ঞাপন।

সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল /১০। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্ধ আনার ডাক টিকিটে সখার মূল্য পাঠাইতে হইবে। ডাক টিকিটে টাকায় অর্ধ আনা কমিশন লাগিবে। যাঁহারা পোষ্টাল নোট বা মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক সেই সঙ্গে এক একখানি পোষ্টকার্ড লিখিবেন, নতুবা আমাদের কাজের ভয়ানক অসুবিধা হয়।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ১১২।

সংবাদ।

বরাহনগর হইতে বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল লিখিয়াছেন—"আমাদের একটী বন্ধু ধূমপান পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে দণ্ড স্বরূপ দশ টাকা দিবেন, বলিয়াছিলাম; আজ অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে তিনি জানুয়ারি মাস হইতেই ধূমপান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সভার সভ্য হইয়াছেন। তিনি ইহার দ্বারা আমাদিগকে যারপর নাই উৎসাহিত করিয়াছেন।" সুখের কথা সন্দেহ নাই, তবে এরূপ ভাল কাজে নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য টাকা 'বাজি' রাখা ভাল নহে। তূষের আগুণের মত প্রতিজ্ঞা ভিতরে জ্বলিবে, লোকে সেই প্রতিজ্ঞার কাজ দেখিবে, কিন্তু বাহিরে জাকজমক দেখাইয়া লাভ কি?

তেলিনীপাড়া গ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম যে, সেখানকার বালকেরা ৪০।৫০ জন একসঙ্গে মিশিয়া নিজেদের সব রকমের উন্নতির জন্য "বালক মিলনী" নামে একটী সভা করিয়াছেন। আমাদিগের কয়েকজন বন্ধু প্রতি সপ্তাহে এই বালক দিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা বড় সুখের কথা। বালকগণ এইরূপে এক সঙ্গে মিশিয়া সকলের চেষ্টায় কাজ না করিলে তো তাহাদের পরে সৎ ও বড়লোক হইবার উপায় দেখি না। আমরা আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক বয়স্ক, তাঁহারা নিজেদের জন্য এবং ছোট বালক বালিকাদিগের জন্য স্থানে স্থানে এইরূপ যত্ন করিবেন। নিজেদের যত্ন থাকিলেই ঈশ্বর সহায় হন।

আমরা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, যে আমাদের একজন গ্রাহিকা—কুমারী লীলাবতী সেন ওলাউঠা রোগে মারা পড়িয়াছেন। বাপের আদরের ধন, ও তাহার প্রাণের আশার বস্তু বাপকে দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া গিয়াছে। বাপের যে কি কষ্ট, তাহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। পরমেশ্বর তাঁহাকে এই শোকের সময় শান্ত করুন।

২ : ৫ : মে ১৮৮৪, পৃ. ৮০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত বর্ষের (১৮৮৩ সালের) সখার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। উত্তম কাগজে, উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। সমুদয় বৎসরের সখা, ১৯২ পৃষ্ঠা, একত্রে উত্তমরূপে বাঁধান। মূল্য অতি সুলভ,—

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র ; মফঃস্বলের জন্য ডাকমাসুল ৵০ আনা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং সখা কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

"সখা" কার্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।
"সখা" কার্যাধ্যক্ষ।

২ : ৮ : আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১২৮।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার ছুটী উপলক্ষ্যে সখার গ্রাহক এবং গ্রাহিকাগণের মধ্যে অনেকেরই আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এখন যে স্থানে আছেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী বা অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনা ; এই জন্য আমরা আগামী (অক্টোবার) মাসের সখা উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির না করিয়া উক্ত মাসের শেষ সপ্তাহে বাহির করিব।

"সখা" কার্যালয়,
২য় নং বেনিয়াটোলা লেন
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা

"সখা" কার্যাধ্যক্ষ।

২ : ৯ : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, পৃ. ১৪৪।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।



মরা ইতিপূর্বে এলাইচের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে এলাইচের পাতায় গন্ধ নাই ; আমাদের একজন বালিকা পাঠিকা, এই কথা ভুল, ইহা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি এলাইচের পাতা ও ফুল পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম এ পাতার বেশ গন্ধ আছে, ফুলগুলির গন্ধ আরও চমৎকার। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "এলাইচ"-প্রবন্ধের লেখক মান্দ্রাজ অঞ্চলে যে পাতা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে গন্ধ ছিল না ; বাঙ্গালা দেশে এলাইচের গাছে ফল হয় না, এই জন্যই হয়ত পাতায় ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে এলাইচের গাছ লতার মত, কিন্তু এখানে ঝোপের মত। যেখানকার গাছ সেখানে যেরূপ হয়, অন্য দেশে উঠাইয়া আনিলে কিরূপে সেরূপ থাকিতে পারে?

২ : ৬ : জুন ১৮৮৪, পৃ. ৯৬।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত শম্ভুগঞ্জ হইতে সখার একজন গ্রাহক বালক বালিকার প্রতি "উপদেশ" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছেন, তা তুলিয়া দিলাম—"সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্বক "বালক বালিকার প্রতি উপদেশ" আপনার সখায় মুদ্রিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন। আজ প্রায় ১৪।১৫ মাস যাবত সখা লইতেছি, এলাগাত ১৪।১৫টী প্রবন্ধ পাঠাইলাম দুঃখের বিষয় তাহার একটীও মুদ্রিত হইলনা। হা বিধি! ** এই প্রবন্ধ জুলাই মাসে মুদ্রিত হইয়া আসিলে সখার মূল্য পাঠাইব। ****। আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে এতদিন বহু গ্রাহক যুঠাইয়া

দিতাম, তাহাও হ'লনা, আমিও দিলামনা! এইক্ষণ প্রার্থনা যে আমি একজন এজেন্ট হইব— সখায় আমার নাম ধাম স্পষ্টভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবেন।"—আমাদের পত্রপ্রেরক সখার কেমন হিতৈষী! তিনি এতদিন সখা লইয়া মূল্য দিতেছেন না, আর ছাপাইবার উপযুক্ত নয় এমন প্রবন্ধ সকল পাঠাইয়া, না ছাপাইলে বেচারা সম্পাদককে গালাগালি দিতেছেন! আমরা ভাবিয়াছিলাম ইঁহার নাম প্রকাশ করিবনা কিন্তু এমন হিতৈষীর নাম সকলেরই জানা উচিত; ইহাঁর নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

শ্রীজয়কিশোর সেন, কাছাড়।—আপনার প্রেরিত "পাখীর প্রতি অত্যাচার করিওনা" নামক প্রবন্ধটীর ভাষা তত ভাল না হইলেও, ভাবটী বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের একটী প্রবন্ধ এবারকার সখায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আপনার প্রবন্ধটী দেওয়া গেলনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ময়মনসিংহ।—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলের ছাত্রেরা একটী সভা করিয়াছেন ; সেখানে একদিন "মাদক দ্রব্য সেবন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সকলেই "মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি মহাশয় ছেলেদের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অনেক দিনের তামাক খাওয়া অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ চৌধুরী, নলডাঙ্গা।—ধূমপানের কি কি দোষ, তাহা গত বৎসর মার্চ মাসের সখাতে লেখা হইয়াছে, তাহাই দেখিবেন।

শ্রীহরিহর মিত্র, কলিকাতা।—এ কি রকম পদ্য! না আছে ছন্দ না আছে ভাব? চাঁদ উঠিলে কি "পদ্মিনী" হাসে? এত বানান ভুল? লিখিলেই যে ছাপাতে হবে, তার কোন মানে নাই বোধ হয়! তবে চেষ্টা করিলে দু একটী কবিতা ভাল হতে পারে, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করা ভাল হয়। লাইন মিলাইলেই পদ্য হয়না—চেষ্টা করিলেই কবি হয় না।

২ : ৭ : জুলাই ১৮৮৪, পৃ ১১১-১১২।

পত্র প্রেরকদের প্রতি।

শ্রীপ্রিয়বন্ধু নিয়োগী।—"সখা" পড়িয়া বালকদের উপকার হইতেছে, ইহা শুনিলে আমরা বড়ই সুখী হই। যাহারা উপকার পান, তাঁহারা যদি সেই কথা বলিয়া এক বয়সী আর দশ জনকে "সখা" পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আরও সুখী হই। এবৎসর যেমন রচনার পুরস্কার দেওয়া গেল, আগামী বৎসরেও আমাদের এইরূপ পুরস্কার দিবার ইচ্ছা আছে।

২ ১০ : অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ ১৬০।

একটী দুঃখের খবর।

আমাদের দেশের কপাল বড়ই মন্দ। এই সেদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেশকে আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপরই এবার আমরা মৃত মহাত্মা শ্যামাচরণ বিশ্বাসের জীবনী দিলাম। আবার এরই মধ্যে দেশের মুখ-উজ্জ্বল আর একজন মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। দেশের অধিকাংশ বড়লোক এইরূপে মরিয়া যাইতেছেন। বালকগণ! তোমরা এইবেলা ঐ সকল বড়লোকের স্থান অধিকার করিতে যত্ন কর। দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে ও যত্ন করিলে ঈশ্বর সহায় হইবেন। মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনের কথা আমরা আগামী বারের সখায় লিখিব।

২ : ৮ . আগষ্ট ১৮৮৪, পৃ. ১১৩।